উচ্চ মনোবল

পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে

শাইখ মুহাম্মাদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম

RUHAMA
PUBLICATION

উচ্চ মনোবল

পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে

বই	উচ্চ মনোবল
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম
অনুবাদ	হাসান মাসরুর

উচ্চ মনোবল

পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম

রুহামা পাবলিকেশন

উচ্চ মনোবল

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম

প্রথম প্রকাশ

জুমাদাল উলা ১৪৪১ হিজরি / জানুয়ারি ২০২০ ইসায়ি

একমাত্র পরিবেশক

শিশুরাজ্য প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com
rokomari.com
boibazar.com

মূল্য : ৬৬৮ টাকা

ISBN : 978-984-94820-0-0

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের প্রকৃত সাফল্যের সংজ্ঞাই আজ আমরা ভুলে বসেছি। বিস্মৃত হয়ে পড়েছি নিজেদের সোনালি অতীত সম্পর্কে। তাই তো দেখা যায়, কোথাও কোনো রকম একটা চাকরি জুটলেই, একটু পার্থিব অনুদান মিললেই আজ আমরা বেজায় খুশি। শত অন্যায়-অনাচারের মাঝে থেকে নিজেদের নিগৃহীত অবস্থান দেখেও স্বাচ্ছন্দ্যে বলি, এই তো বেশ আছি। বস্তুত, মনোবল যখন শূন্য হয়ে পড়ে, সাফল্যের প্রকৃত স্বরূপ যখন অজানা থাকে—তখন ভালো থাকার অবস্থা এমনই হয় মানুষের কাছে। আমাদের অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকালেই স্পষ্ট যে, কত বিশাল ব্যবধান গড়ে উঠেছে সালাফে সালিহিন আর আমাদের মাঝে! সালাফের পথ থেকে আজ আমরা কত দূরে! ইলম শেখা-শেখানোর পথে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা, দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অবিরাম দাওয়াতের ময়দানে ছুটে চলা, দ্বীনের ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আল্লাহর রাহে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করা—দ্বীনের প্রতিটি অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্রে সালাফের তুলনা শুধু তাঁরাই। আর আমরা তো হলাম কেবল সংখ্যাধিক্যের পাল্লায় ভারী আর মুখে 'এটা কীভাবে সম্ভব?' 'এটা কীভাবে সম্ভব?' বুলি আওড়াতে থাকা দুর্বল ও মনোবলহারা! রাসুল ﷺ আমাদের সম্পর্কেই বলেছেন, (بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ) '...বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো।...' অবশ্য এ লাঞ্ছনা-অপদস্থতা থেকে মুক্তির পথও তিনি বাতলে দিয়েছেন। প্রয়োজন শুধু আমাদের সে পথে ফিরে আসা—সালাফের মতো উচ্চ মনোবলে বলীয়ান হয়ে দ্বীনের ঝান্ডাকে সমুন্নত করা।

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, হীনম্মন্যতা ঝেড়ে আমরা যেন উচ্চ মনোবলে বলীয়ান হতে পারি, সালাফে সালিহিনের পদাঙ্ক অনুসরণের দীক্ষা লাভ করতে পারি, এ শিক্ষাই রয়েছে শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাইল আল-মুকাদ্দামের (**علو الهمة**) গ্রন্থটির পরতে পরতে। আর অতীব উপকারী এ গ্রন্থটির সরল অনুবাদই হলো, 'উচ্চ মনোবল - পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে'। গ্রন্থটির কলেবর একটু বড় হওয়ায় এবং এর শুরুর দিকে কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা

আসায় পাঠকের অধ্যয়ন-আগ্রহে হয়তো ভাটা পড়তে পারে, তাই বলে রাখছি, হিম্মত ও আগ্রহের সাথেই পূর্ণ গ্রন্থটি পাঠ করতে হবে—বিশেষ করে শেষভাগের অধ্যায়গুলো পাঠ করে যেকোনো পাঠকই বিস্ময়ে অভিভূত হবেন যে, কত উন্নত ও উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছিলেন আমাদের পূর্বসূরিগণ! জানতে পারবেন হীনম্মন্যতার বিবিধ কারণ এবং উচ্চ মনোবল অর্জনের পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে আমরা যেন উচ্চ মনোবলে বলীয়ান হতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সেই তাওফিক দান করুন (আমিন)।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়
উচ্চ মনোবলের ক্ষেত্রসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

লেখকের কথা

পবিত্রতা ও বরকতপূর্ণ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যেমনটি আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের জন্য, যে নিয়ামতের সাগরে আমরা ডুবে রয়েছি প্রতিনিয়ত। প্রশংসা করছি সে মহান সত্তার—তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, তিনিই প্রশংসার যোগ্য। ক্ষমা প্রার্থনা করছি তাঁরই নিকট; তিনিই তো তাওবাকবুলকারী এবং সঠিক পথের দিশা-দানকারী।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরিক নেই। এমন সাক্ষ্য, যার দ্বারা আমরা লাভ করতে পারব তাঁরই অনুগ্রহ; প্রশমিত হবে তাঁর ক্রোধ; সঞ্চিত থাকবে তাঁর দয়া সেদিনের জন্য—

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

'যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো উপকারে আসবে না।'[১]

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

'তবে যে নির্মল অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।'[২]

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল; তাঁর সৃষ্টির সেরা এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু। আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি—যাঁরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের জন্য তারকাসদৃশ এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তোপস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হোন প্রিয় নবিজির পুণ্যবান সাহাবিদের প্রতি—যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যের হক যথাযথভাবে আদায় করেছেন; তাঁর শরিয়তের হিফাজত করেছেন এবং তা পৌঁছে দিয়েছেন পুরো উম্মাহর নিকট—তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতি, যাঁদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণার্থে।

....

১. সুরা আশ-শুআরা : ৮৮

২. সুরা আশ-শুআরা : ৮৯

হামদ ও সালাতের পর...

এক শতাব্দী কালের ভেতরে মুসলিমরা উন্নতির এমন শিখরে আরোহণ করেছিল যে, গোটা পৃথিবী তাদের শক্তি ও ক্ষমতা, ইলম ও প্রজ্ঞা, আলো ও হিদায়াতে পূর্ণ হয়ে গেল। তারা অধীন করে নিয়েছিল অন্য সব জাতি-গোষ্ঠীকে—চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল কুফরি রাজ্যগুলোকে। ফলে এশিয়াবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হলো তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। আফ্রিকা-ইউরোপবাসীর হৃদয়রাজ্যও তাদের দখলে এল। তারা নিজেদের ধর্ম-মতবাদ, ভাষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিদ্যাকে পরিত্যাগ করেছে এমন দ্বীনের জন্য—হৃদয়গুলো যার জন্য অবনত, জবান যার প্রশংসায় অবিরত। তাদের মধ্যে তৈরি হলো অনুপম উপমা। তারা ছিলেন 'শ্রেষ্ঠ উম্মত'—যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। অথচ কিছু দিন পূর্বেও তারা ছিলেন শতধা বিভক্ত। তাদের মাঝে ছিল না কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা, ছিল না (আলোকিত) কোনো জ্ঞানবিদ্যা ও বিধান-সংবিধান।

মুসলিমরা সে সময়টি অতিক্রম করেছে—যখন যুগ তাদের প্রভাবে প্রকম্পিত হয়েছে; ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করেছে তাদের কারনামায়। তারা জানতেন, কী শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি। জানতেন, ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের নিয়মনীতি। তারা দৃঢ়তার সাথে বিরল সকল পদ্ধতি আর প্রতিরোধশক্তি নিয়ে এ পথে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন, সূক্ষ্মতার সাথে পথের সকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কেমন যেন একটি স্পষ্ট ও বিস্তারিত মানচিত্র ছিল তাদের সামনে। যা তাদের ইলমি শক্তি এঁকেছিল স্বীয় মনন জগতে। গন্তব্যের চূড়ান্তে পৌঁছাতে ইন্ধন হিসেবে যে পাথেয় তারা সাথে নিয়েছিলেন, তা ছিল আমলি শক্তি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

'ইলম' ও 'দৃঢ় ইচ্ছা'—এ দুটোই মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার রহস্য। এ দুটোর মাধ্যমেই তারা অন্য সকল জাতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল অন্যান্য সবার ওপর।

'ইলম' রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধনসম্পদ ও কলমের ওপর কর্তৃত্ব করে। জ্ঞানে অসমৃদ্ধ রাষ্ট্র কখনো স্থায়ী হয় না। ইলমবিহীন তরবারি খেলনার ছুরি। জ্ঞানহীন কলম

তামাশাকারীর নাড়াচাড়া। ইলম এ বিষয়গুলোর ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু এর কোনোটিই ইলমের ওপর কর্তৃত্ব করে না।

আমরা এখানে ইলমের মর্যাদা ও ফজিলত নিয়ে আলোচনা করব না। কেননা, এর আলোচনার পরিধি বেশ বিস্তৃত। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলিমই ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি করেছেন। আমরা আলোচনা করব ইলমের একটি অংশ নিয়ে। যা মর্যাদাবান মানুষ হতে সাহায্য করবে। প্রেরণা জোগাবে নতুন করে উম্মাহকে জাগিয়ে তোলতে। আমাদের আলোচনা হবে আমলি শক্তি নিয়ে—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে। আলোচনা হবে বড় হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।

প্রবেশিকা

হিম্মত কী?

কোনো কাজ সাধিত হওয়ার জন্য যার মাধ্যমে কর্তা প্ররোচিত হয়, তাকে বলে الهَمُّ।

আর الهمة (আল-হিম্মাহ) হচ্ছে, কাজের উদ্দীপক মনোবল। মনোবল উচ্চও হতে পারে, আবার নিম্নও হতে পারে।

মিসবাহুল লুগাতে বলা হয়েছে, হিম্মত হলো প্রাথমিক সংকল্প। কখনো কখনো দৃঢ় সংকল্প অর্থেও ব্যবহৃত হয় এটি। তখন বলা হয় 'তাঁর দৃঢ় সংকল্প রয়েছে।'

কেউ কেউ বলেন, 'علو الهمة (উলুয়্যুল হিম্মাহ) তথা উচ্চ মনোবল হলো বড় বড় উদ্দেশ্য সাধনকে সহজ ও অনায়াস মনে করা।'[৩]

আরও বলা হয় যে, 'উচ্চ মনোবল' হলো নিজেকে এমন লক্ষ্যে পরিচালিত করা, ইলম ও কর্মে যা নিজের পক্ষে সম্ভব।

ইমাম জুরজানি ﵀ 'আত-তারিফাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, هم (হাম্মুন) হলো, কোনো কাজ সম্পাদনের আগে তার ওপর হৃদয়কে দৃঢ় করে নেওয়া; চাই সে কাজ ভালো হোক কিবা মন্দ।

আর পূর্ণতা অর্জন বা অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মিক সকল শক্তির সাথে অন্তর ও ইচ্ছাকে সত্যের পক্ষে নিবিষ্ট করার নাম হিম্মত।[৪]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন :

الهَمُّ থেকে فِعْلَةٌ ওজনে গঠিত হয় الهِمَّةُ শব্দটি। الهَمُّ অর্থ প্রাথমিক সংকল্প। কিন্তু الهِمَّةُ শব্দটি নির্দিষ্টভাবে 'চূড়ান্ত সংকল্প' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং الهَمُّ শব্দটি হলো সংকল্পের প্রাথমিক পর্যায়, আর الهِمَّةُ হলো তার চূড়ান্ত পর্যায়।

....

৩. রাসায়িলুল ইসলাহ : ২/৮৬

৪. আত-তারিফাত, পৃষ্ঠা নং ৩২০

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ-কে হাদিসে কুদসির অংশবিশেষ বলতে শুনেছি, 'আমি কোনো জ্ঞানীর কথার প্রতি লক্ষ করি না; বরং আমি লক্ষ করি মানুষের হিম্মতের প্রতি।'

সাধারণ মানুষজন বলে, মানুষ মূল্যায়িত হয় তার সুন্দর কর্মের মাধ্যমে। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিরা বলেন, মানুষের মূল্যায়ন তার লক্ষ্য ও অভিলাষে।

'আল-মানাজিল' গ্রন্থ-প্রণেতা বলেন, 'হিম্মত হলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিশুদ্ধভাবে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত হওয়া। ফলে উদ্দীপনার অধিকারী নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না এবং অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না; (বরং সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।)'

এখানে 'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত হওয়া' দ্বারা বোঝানো হয়েছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মনোবল ও স্বপ্ন এমনভাবে ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, যেমন গোলামের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব থাকে।

'বিশুদ্ধভাবে' বান্দার ইচ্ছা ও স্বপ্ন যখন আল্লাহ তাআলার হকের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং সেটি হবে সততা ও একনিষ্ঠতা বজায় রেখে কেবল আল্লাহর জন্য, তখনই তা 'আল-হিম্মাতুল আলিয়া' বা 'উচ্চ মনোবল' বলে গণ্য হবে।

'উদ্দীপনার অধিকারী নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না' তথা এমন ব্যক্তি অবহেলা করবে না। লক্ষ্য অর্জনে তার তর সইবে না। কেননা, হিম্মতের উৎসাহ-উদ্দীপনায় সে উদ্দীপ্ত। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে স্বীয় দৃঢ় মনোবলের কারণে অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না সে। এমন উচ্চ মনোবলের অধিকারী লক্ষ্য অর্জনে দ্রুতগামী হয়—উদ্দেশ্য পূরণে হয় সফলকাম, যদি দুর্লঙ্ঘ্য কোনো বাধাবিপত্তির আগমন না ঘটে তার সম্মুখে। বস্তুত আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[৫]

তিনি আরও বলেন, 'উচ্চ মনোবল হলো, তুমি শুধু আল্লাহর সামনেই দাঁড়াবে। তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অপর কিছু বিনিময় হিসেবে চাইবে না। তাঁকে ছাড়া ভিন্ন কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিদান, তাঁর

৫. মাদারিজুস সালিকিন : ৩/৩-৪

নৈকট্য ও ভালোবাসা এবং তাঁর মাধ্যমে আনন্দ ও প্রফুল্লতা অর্জন—এসব তুমি নশ্বর নিকৃষ্ট কোনো জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে না। উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থান সর্ব উর্ধ্বে উড়ন্ত পাখির ন্যায়। নিম্নগামিতায় সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অন্যদের ওপর আপতিত বিপদ-দুর্যোগ তার কাছে পৌঁছায় না। কেননা, মনোবল যত উচ্চ হবে, বিপদাপদ থেকে তত দূরত্ব বাড়বে। আর মনোবল যতই নিচে নামবে, ততই দুর্যোগের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হবে। সব দিক থেকে বিপদাপদ ধেয়ে আসবে। কারণ, বিপদাপদ নিম্নগামী এবং তা আকর্ষণ করে নিম্ন ভূমিতে। উচ্চ স্থানে উঠতে সক্ষম হয় না যে সেখান থেকে টেনে আনবে। তবে নিম্ন স্থান থেকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই বলি, উচ্চ মনোবল সফলতার চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে দুর্বল মনোবল বঞ্চিত হওয়ার কারণ।'[৬]

হিম্মত হলো কাজের সূচনা। কর্মের প্রবেশিকা। জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, 'নিজ হিম্মতকে হিফাজত করো। কারণ, সকল কর্মের সূচনা হলো হিম্মত। যার হিম্মত ঠিক থাকে এবং তাতে যদি সে সততার ওপর থাকে, তার সামনের কর্মও সঠিক হয়ে যায়।'[৭]

উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ বিন জাবইয়ান ﷺ বলেন, 'কালব গোত্রীয় আমার এক মামা ছিলেন। তিনি আমাকে বলতেন, "হে উবাইদ, হিম্মত করো। নিশ্চয় হিম্মত হলো পুরুষত্বের অর্ধেক।"'

মানব জন্মের সাথেই হিম্মতের উদ্ভব

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন :

'হীনতার কারণেই উচ্চ মনোবল নষ্ট হয়। অন্যথায় যখন অভিলাষ সুউচ্চ হয়, তখন নিম্ন মানে তুষ্টি আসে না। আর দলিল দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, মানুষের জন্মের সাথেই হিম্মতের উদ্ভব ঘটে। তবে কখনো কখনো তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অনুপ্রেরণা পেলে হিম্মত আবার সচল হয়ে ওঠে। তাই

....

৬. মাদারিজুস সালিকিন : ৩/১৭১-১৭২

৭. বাসায়িরুন তারবাবিয়্যাহ : ১৩৭

নিজের মাঝে দুর্বলতা দেখলে অনুগ্রহকারী মহান সত্তার কাছে প্রার্থনা করবে। আলসেমি এলে সাহায্য কামনা করবে মহান তাওফিকদাতার কাছে। কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই তুমি লাভ করতে পারবে সমূহ কল্যাণ। কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে এসে ফিরে যায়! আর কে আছে তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে সফলতা পায়! অথবা নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়?'[৮]

শাইখ ﷺ-এর কথা 'তবে কখনো কখনো হিম্মত দুর্বল হয়ে পড়ে' এটি হয় অক্ষমতা বা অলসতার কারণে, অথবা শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে, কিংবা কুপ্রবৃত্তির সামনে হাঁটু গেড়ে দেওয়ার কারণে, কিংবা মন্দ আত্মার মন্দকে সাজিয়ে তোলার কারণে। এ সময় হিম্মতকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। সতর্কতা বা উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। এমতাবস্থায় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, তুমি কার সন্তুষ্টি তালাশ করছ? কোন সুখের প্রতি উৎসুক হয়ে আছ বা কোন শাস্তিকে ভয় করছ? যেমনটা করেছেন এক মহান বীর—যার নাম পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। আসলে নিজেকে সে আড়াল করে রাখায় তা জানা সম্ভব হয়নি। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ তাআলা সব জানেন। তিনিই একক সত্তা, যিনি তাকে যথাযথ প্রতিদান দেবেন।

আব্দুল্লাহ বিন কাইস আবু উমাইয়া আল-গিফারি ﷺ বলেন :

'আমরা কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। শত্রুরা উপস্থিত হলে মানুষের মাঝে হইচই পড়ে গেল। সবাই নিজ নিজ কাতারে ফিরে গেল। আমি লক্ষ করলাম, আমার সামনে এক লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আমার ঘোড়ার মাথা তার ঘোড়ার পেছনেই ছিল। সে নিজেকে লক্ষ্য করে বলছে, "হে আমার নফস, আমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি? তুমি আমাকে বলেছিলে, আমি ও আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাব। তখন কি আমি তোমার কথা শুনে ফিরে এসেছি? আল্লাহর শপথ, আজ আমি তোমাকে আল্লাহর সামনে সঁপে দেবো। তিনি তোমাকে গ্রহণ করুক বা না করুক।" আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। এরপর মানুষজন শত্রুদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। সে ছিল তখন সবার অগ্রভাগে। পরক্ষণে শত্রুরা আমাদের ওপর

....

৮. লাফতাতুল কাবিদ ইলা নাসিহাতিল ওলাদ

আক্রমণ করলে মানুষজন পেছনে সরে পড়ল। এ সময় সে ছিল সবার পেছনে। তারপর আবার লোকেরা হামলা করলে সে ছিল সবার আগে। পুনরায় শত্রুরা আক্রমণ করলে লোকেরা পেছনে সরে আসলো, আর সে ছিল সবার পেছনে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর শপথ, এভাবেই চলতে থাকল। অবশেষে আমি তাকে ভূপাতিত দেখলাম। দেখলাম, তাঁর শরীর ও বাহন-জন্তুর দেহে ষাটেরও অধিক বর্শার আঘাত!'[৯]

হিম্মত ও ইলমের আবশ্যকতা

দ্বীনের পথের পথিকের জন্য এমন হিম্মত আবশ্যক, যা তাকে এ পথে পরিচালিত করবে। ধাবিত করবে উন্নতির দিকে। তার এমন ইলমের প্রয়োজন, যা তাকে পথ দেখাবে। তাকে পরিচালিত করবে সঠিকভাবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ ﷺ বলেন :

'যখন আল্লাহ তাআলার দয়া ও প্রজ্ঞার দাবি ছিল, আদম ﷺ ও তাঁর পরিবারকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া, তখন এর বিনিময়টা এর চেয়ে বড় কিছু দেওয়াই উচিত। আর সেটি হলো, আল্লাহ তাআলার দেওয়া প্রতিশ্রুতি, যেটিকে তিনি মানুষের জন্য নিজের নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যে সে পথ আঁকড়ে ধরবে, সে সফলতা ও হিদায়াত পাবে। আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে অবশ্যই হতভাগ্য ও দিকভ্রান্ত হবে। আল্লাহ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি, সঠিক পথ ও মহা সুসংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র পথ হলো, ইলম ও ইরাদাহ (ইচ্ছাশক্তি)।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হলো আল্লাহর নৈকট্যলাভের দরজা। আর ইলম হলো সে বন্ধ দুয়ারের চাবি। প্রতিটি মানুষের পূর্ণতা লাভ হয় এ দুটি জিনিসে—সুউচ্চ মনোবল, যা তার উন্নতি সাধন করবে এবং ইলম, যা তাকে বিচক্ষণতা দান করবে এবং সঠিক পথ দেখাবে। বান্দার সৌভাগ্য ও সফলতার স্তরসমূহের ব্যবধান ঘটে এ দুটি দিক থেকে অথবা এর যেকোনো একটি দিক থেকে। সে হয়তো সফলতা ও কল্যাণের স্তরসমূহ সম্পর্কে কোনো ইলম রাখে না,

....

৯. সিফাতুস সাফওয়া : ৪/৪২১

যার ফলে সেগুলো অর্জনের জন্য সামান্যও কোশিশ করে না। অথবা এগুলো সম্পর্কে অবহিত তো থাকে, কিন্তু অর্জন করার মতো মনোবল তার মাঝে থাকে না। ফলে সে সব সময় নিজের নীচু প্রকৃতিতে বন্দী থাকে। তার হৃদয় সর্বদা নিজের জন্য সংকীর্ণতা ও দুরবস্থার মাঝেই আটকে থাকে। সজল চোখে নিজেকে সে চতুষ্পদ জন্তুর মতো ছেড়ে দেয় ঘাস খাওয়ার তরে। তার মাঝে ও জন্তুর মাঝে বলতে গেলে কোনো তফাতই থাকে না। আরাম ও কর্মহীনতাই তার কাছে উৎকৃষ্ট মনে হয়। অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তাই যেন তার পরম প্রাপ্তি। সে এমন ব্যক্তির মতো নয়, যার জন্য পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে সে যাত্রা শুরু করেছে পতাকা-অভিমুখী হয়ে। যার লক্ষ্য অর্জনের পথে তার জন্য বরকত ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আর তা-ই সে আঁকড়ে ধরে তার ওপর অবিচল রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথে হিজরতের তামান্না তার হৃদয়ে জাগরূক আছে। নিজের গন্তব্যের অভিযাত্রী ছাড়া বাকি বন্ধুদের সে বিদায় জানিয়েছে।

যেহেতু লক্ষ্যের পূর্ণতা অনুযায়ী ইচ্ছার পূর্ণতা আসে। বিষয়বস্তু অনুযায়ীই ইলমের মর্যাদা হয়ে থাকে। তাই বান্দার চূড়ান্ত সফলতা ও একমাত্র জীবন হচ্ছে, তার ইচ্ছাশক্তিটা এমন লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করা—যা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং যা হাতছাড়া করা যায় না। বান্দা নিজের দৃঢ় সংকল্পসমূহ এমন সত্তার সামনে পেশ করবে, যিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। মহৎ এ লক্ষ্য অর্জন ও পূর্ণতা প্রাপ্তির একমাত্র পদ্ধতি হলো জ্ঞানের সে উত্তরাধিকার, যা রেখে গেছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ—যাঁকে আল্লাহ তাআলা এ ইলমের প্রতি আহ্বানকারী এবং এ পথে রাহবার হিসেবে পাঠিয়েছেন; যাঁকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মাধ্যম বানিয়েছেন; বান্দাদেরকে শান্তির আবাসের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের রেখে যাওয়া মাধ্যমেই কারও জন্য ইলমের দ্বার উন্মোচন করেন। দ্বীনের পথের এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি চেষ্টা তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন তার শুরু ও শেষ হবে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণে।'[১০]

....

১০. মিফতাহু দারিস সাআদা : ১/৫৯

ইলমি ও আমলি শক্তির দিক থেকে মানুষের প্রকারভেদ

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন :

'মানুষের পূর্ণতা নির্ভর করে দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে : এক. হক ও বাতিল চিনতে পারা। দুই. হককে বাতিলের ওপর প্রাধান্য দিতে পারা।'[১১] বস্তুত, দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দাদের মর্যাদার তারতম্য হয় এ দুটির পার্থক্যের ভিত্তিতে। এ দুটি নবিদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন :

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

"আর স্মরণ করো, আমার বান্দা ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা—তাঁরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।"[১২]

(الْأَيْدِي) অর্থাৎ সত্যকে বাস্তবায়নের শক্তি। আর (وَالْأَبْصَارِ) হলো দ্বীনের ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দান করেছেন হকের পূর্ণ উপলব্ধি। দিয়েছেন পূর্ণভাবে তা বাস্তবায়নের শক্তি ও মনোবল। এখানেই মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর বান্দাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সর্বোচ্চ স্তরের বান্দা হলেন এঁরাই—নবিগণ ﵈।

দ্বিতীয় প্রকার : (এ শ্রেণির লোক) নবিদের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। এবং সত্য বাস্তবায়নেও কোনো ক্ষমতা নেই।

....

১১. কতিপয় সালাফ এই দুআ করতেন : (اللَّهُمَّ أرني الحق حقاً وأرزقني إتباعه وارني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه) - 'হে আল্লাহ, আমাকে সত্যের পথ দেখান, আর তার অনুসরণ করার তাওফিক দিন। বাতিল পথ দেখিয়ে দিন, আর তা বর্জন করার তাওফিক দিন।' এ তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দাগণ হলেন তারা, যারা প্রকৃত ইলম লাভ করেছেন, যারা আমলে দৃঢ় শক্তিমান। তাদের কথাই কুরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ- 'যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে।' তাদের ব্যাপারে আল্লাহ আরও বলেন : أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا - 'আর যে মৃত ছিল, অতঃপর তাকে আমি জীবিত করেছি, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে—সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখান থেকে বের হতে পারছে না?' (সুরা আল-আনআম : ১২২)। জীবনদানের অর্থ দৃঢ় সংকল্পে সজ্জিত করা। আলো দেওয়ার অর্থ ইলম প্রদান করা। আর এমন দৃঢ় সংকল্পে সজ্জিত লোকদের সর্বাগ্রে হলেন নবি-রাসুলগণ।

১২. সুরা সদ : ৪৫

সৃষ্টির মাঝে এ দলটিই ভারী। এরাই সেসব মানুষ, যাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের আত্মা জ্বরগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এদের কারণে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায়। পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। অসৎ ও দুষ্ট লোকেরাই এদের সংশ্রবে উপকৃত হয়।

তৃতীয় প্রকার : সত্যের ব্যাপারে যাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। কিন্তু তা ক্ষীণ। সত্যকে বাস্তবায়ন করার শক্তি তাদের মধ্যে নেই। সত্যের প্রতি দাওয়াতও দিতে পারে না এরা। এটাই হলো দুর্বল মুমিনের অবস্থা। কিন্তু শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়।

চতুর্থ প্রকার : যাদের শক্তি, উচ্চ মনোবল ও দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তারা ক্ষীণ দৃষ্টির অধিকারী। তারা শয়তানের বন্ধু ও রহমানের বন্ধুদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না; বরং তারা সব কালোকেই খেজুর মনে করে, সব সাদাকেই মাখন ভাবে। আবার শরীর ফুলে যাওয়াকেই সুস্বাস্থ্য ভেবে বসে। অন্যদিকে উপকারী ওষুধকে ভাবে বিষ।

এখানকার প্রথম শ্রেণিটিই কেবল দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

> “আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত—যতদিন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।”[১৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা ধৈর্যধারণ ও আল্লাহ তাআলার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জন করেছে। এরা ওই সকল লোক, যাদের তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের কাতার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আসরের কসম করেছেন—যা সফল ও ক্ষতিগ্রস্ত উভয় শ্রেণির পরিশ্রমের সময়। তিনি এ সুরাতে যাদের কথা বলেছেন, যে সকল গুণের কথা বলেছেন, সে সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি সকলেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

....

১৩. সুরা আস-সাজদা : ২৪

وَالْعَصْرِ -إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"সময়ের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় সবরের।"'[১৪_১৫]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ আরও বলেন :

'কতক মানুষের পর্যাপ্ত ইলমি শক্তি রয়েছে—তাদের নিকট সঠিক পথ স্পষ্ট। স্পষ্ট গন্তব্য, সুব্যক্ত সঠিক পথের দিশা। এ পথের বাধাবিপত্তি সবকিছুর ব্যাপারেই তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু তাদের ইলমি শক্তির ওপর আমলি শক্তি প্রবল নয়। এরা আমলি শক্তির দিক থেকে দুর্বল, সত্য উপলব্ধি করেও তদনুযায়ী আমল করে না। সত্য কথা বলা ও সৎপথে চলার মাঝে তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি দেখে—ফলে তারা ভীত হয়ে সরে আসে, কষ্টে পা দিতে চায় না। চায় কেবল শান্তিতে শয়ান থাকতে।[১৬] কিন্তু আদতে যে ভয়ে তারা ভীত ছিল, শেষ পর্যন্ত তা থেকে আর বাঁচতে পারে না। তারা এমন ফকিহ, যারা এখনো আমলের ময়দানে হাজির হয়নি। কিন্তু যখন প্রাজ্ঞ লোকেরা আমলে প্রবৃত্ত হতে চান, তখন জাহিলরা পেছন থেকে তাদের টেনে ধরে। প্রকৃত ইলম থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বর্তমানে ইলমের ময়দানে যারা আছেন, তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমনই। এ থেকে কেবল সে ব্যক্তিই মুক্ত, যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে রক্ষা করেছেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আর কতক মানুষের আমলি ইচ্ছাশক্তি বেশি। তাদের মাঝে ইলমের তুলনায় আমলি শক্তিটাই প্রবল থাকে। আমলি শক্তি তাকে আদর্শ ও চরিত্রের ওপর

....

১৪. সুরা আল-আসর : ১-৩

১৫. আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা নং ৮২।

১৬. তাদের উদাহরণ কবির কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

'তাদের কাছে কুফরিকে নিকৃষ্ট মনে হয় না যে, তারা তাকে ঠেকাবে।

কারণ, কুফরির সাথে তারা বেঁধে দেওয়া তিরটা দেখেনি, তাই তারা নড়ে না।

তুলে আনে। তাকে দুনিয়াবিমুখ করে তোলে। উৎসাহিত করে রাখে আখিরাতের প্রতি। এমন ব্যক্তি আমলের দিকে একাগ্র হয়ে সেদিকেই ছুটে যায়। কিন্তু এ লোকটি আকিদার ক্ষেত্রে আসন্ন সন্দেহ-শুবহাতের ব্যাপারে অন্ধ। আমল, কথাবার্তা, বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানের বিকৃতির ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে। প্রথম ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার সামনে দুর্বল ছিল। ঠিক তেমনই দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্দেহ-সংশয়ের সামনে দুর্বল। দ্বিতীয় ব্যক্তির রোগ হলো অজ্ঞতা। আর প্রথম ব্যক্তির রোগ হলো ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং দুর্বল বিবেক। এটাই (অজ্ঞতা) হলো অধিকাংশ ফকির-দরবেশ ও সুফিদের পথে চলা লোকদের অবস্থা। যারা ইলমের পথে না হেঁটে জজবা, মজা বা অভ্যাসের পথে হাঁটে। তাদের কেউ কেউ নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই অজ্ঞ। সে জানে না যে, কার ইবাদত করছে? কেন ইবাদত করছে? তাই কখনো সে ইবাদত করে জজবা ও আবেগে; আবার কখনো করে নিজ সম্প্রদায় বা সাথিদের অভ্যাস অনুকরণে। এমন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে নেয়, খালি মাথায় দাড়ি মুণ্ডিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো-বা সে এমন শরিয়ত বহির্ভূত নিয়মনীতিতে ইবাদত করে, যা কোনো জ্ঞানপাপী নির্ধারণ করে দিয়েছে। কখনো ইবাদত করে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির পছন্দমাফিক পদ্ধতিতে। তাদের এমন অনেক পথপন্থা ও নিয়মনীতি রয়েছে, যার মোট হিসাব একমাত্র রাব্বুল ইবাদই বলতে পারবেন।

এরা সকলেই নিজেদের রব, দ্বীন ও শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন ও শরিয়ত দিয়ে রাসুল প্রেরণ করেছেন, যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন—এসবের কিছুই জানে না তারা। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন বা মতবাদ গ্রহণ করবেন না। এসব লোকেরা আল্লাহ তাআলার সেসব গুণ সম্পর্কে জানে না, যার মাধ্যমে তিনি রাসুলদের ভাষ্যে বান্দাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন; বলে দিয়েছেন নিজের পরিচয় ও ভালোবাসার পথপদ্ধতি। রব ও রবের ইবাদতের ব্যাপারে তাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই।

কিন্তু যার এ দুটি শক্তিই থাকবে—যে নিজের মাঝে ইলমি ও আমলি শক্তি রাখবে, সে আল্লাহর পথে সঠিকভাবে চলতে পারবে। তার থেকেই এগুলো বাস্তব কর্মে পরিণত হওয়া সম্ভব। এমন ব্যক্তিই আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। কারণ,

বাধাবিপত্তি অনেক বেশি, অনেক কঠিন। এসব বাধাবিপত্তিকে এক এক করে ডিঙিয়েই তবে সামনে যেতে হয়। যদি বাধাবিপত্তি ও বিপদাপদ না থাকত, তাহলে আল্লাহর পথের অভিযাত্রীর অভাব হতো না। আল্লাহ চাইলে এ সকল বিপদাপদ দূরও করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার যা ইচ্ছা, তিনি তা-ই করেন। সময়ের ব্যাপারে বলা হয় যে, সময় হলো তরবারি, যদি তুমি তা দিয়ে কর্তন না করো, তবে সে তোমাকে কর্তন করবে। যদি পথচলা দুর্বল হয়, অন্তরে সাহস ও উচ্চ মনোবল না থাকে, পথের ব্যাপারে ইলম স্বল্প হয়, আর ভেতর ও বাহিরের বাধাবিপত্তি বেশি হয়—তবে বিপদ আসন্ন, দুর্ভাগ্য সুনিশ্চিত, শত্রুর আনন্দ অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য আল্লাহ তাআলা যদি নিজ রহমতে অজানা কোনো স্থান থেকে রক্ষা করেন, তবে ভিন্ন কথা। তখন আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তাকে ধরে রাখবেন—রক্ষা করবেন সকল দুর্যোগ থেকে। আর আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।'

অন্তরই মনোবলের ক্ষেত্র

মনোবল অন্তরের কর্ম। আর অন্তরের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব চলে না। পাখি যেমন নিজ ডানার ওপর ভর করে উড়ে যায়, তেমনই মানুষ তার হিম্মত বা মনোবলের ওপর ভর করে চলে। দেহকে বন্দী করে রাখা হয়—এমন সকল বন্দিশালা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে উড়ে বেড়ায় দিগন্তের খোলা আকাশে।

ইবনে কুতাইবা ﷺ হিকমত সম্পর্কে লিখিত কোনো এক গ্রন্থ থেকে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন :

'উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি যদি নিচে পতিত হয়, তবুও তার হৃদয় উচ্চাসনই কামনা করে। যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—প্রজ্জ্বলনকারী যতই তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তা শুধু ওপরেই উঠতে চায়।'[১৭]

....

১৭. উয়ুনুল আখবার : ৩/২৩১

মুমিনের মনোবল তার কর্মের চেয়েও শক্তিশালী

রাসুল ﷺ (হাদিসে কুদসিস্বরূপ) তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করে বলেন :

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً

'যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল করার ইচ্ছা করেও আমল করতে পারেনি, আল্লাহ তাআলা তার জন্য পূর্ণ একটি নেকি লিখে দেন।'[১৮]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

'যে সত্য দিলে আল্লাহ তাআলার কাছে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদদের মর্যাদা দান করেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।'[১৯]

জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার পর জিহাদে যোগ দেওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে—এমন ব্যক্তির ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

قَدْ أَوْقَعَ اللهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ

'আল্লাহ তাআলা তাকে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন।'[২০]

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

....

১৮. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯১; ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।
১৯. সহিহু মুসলিম : ১৯০৯, সুনানু আবি দাউদ : ১৫২০
২০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৩০০, সুনানুন নাসায়ি : ১৮৪৬, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩১৮৯, মুসনাদু আহমাদ : ২৩৭৫৩। এ হাদিসের সনদ সহিহ।

'নিশ্চয় মদিনাতে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা তোমাদের ভ্রমণ ও অতিক্রম করা প্রতিটি উপত্যকায় তোমাদের সাথেই থাকবে, অসুস্থতা (অপর বর্ণনায়, অপারগতা) তাদের আটকে রেখেছে।'[২১]

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنَ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً

'যে ব্যক্তি রাতে সালাতের ইচ্ছা করলেও ঘুম তাকে কাবু করে নেয়, তার জন্য রাতে সালাত আদায়ের প্রতিদান লেখা হয় এবং তার ঘুম তার জন্য সদাকা হয়ে যায়।'[২২]

যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে, (উল্লিখিত) বিশেষ এ মর্যাদা তার জন্য নয়; বরং যে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে সকালে জাগ্রত হয়ে দেখে, রাত শেষ হয়ে গেছে, তার সালাত আদায়ের সময় চলে গেছে—তার জন্যই এ মর্যাদা। সে নিজের উচ্চ মনোবল, হৃদয়ের স্বচ্ছতা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও একনিষ্ঠতার কারণে ওই ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কবি বলেন :

مَنْ لِيْ بِمِثْلِ سَيْرِكَ الْمُدَلَّلِ *** تَمْشِيْ رُوَيْدًا وَتَجِيْءُ فِيْ الْأَوَّلِ

'তোমার মৃদুমন্দ পথচলায় আমি অভিভূত হই! মন্থর গতিতে চলো তুমি, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাও সবার আগে!'

জনৈক কবি হজগামীদের উদ্দেশ্য করে কত সুন্দর বলেছেন :

يَا رَاحِلِيْنَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ لَقَدْ *سِرْتُمْ جُسُوْمًا وَسِرْنَا نَحْنُ أَرْوَاحًا

إِنَّا أَقَمْنَا عَلَى عُذْرٍ وَعَنْ قَدَرٍ ***وَمَنْ أَقَامَ عَلَى عُذْرٍ فَقَدْ رَاحَا

'শোনো হে বাইতুল্লাহর মুসাফির, তোমরা পথ চলছ সশরীরে আর আমরাও বসে নেই—তোমাদের সাথে আমাদের হৃদয়ও চলছে

২১. সহিহু মুসলিম : ১৯১১, সহিহুল বুখারি : ৪৪২৩
২২. সুনানুন নাসায়ি : ১৭৩৪, সুনানু আবি দাউদ : ১৩১৪। হাদিসের মান : সহিহ।

কাবার পথে। তাকদির আমাদের সঙ্গ দেয়নি তাই অপারগ হয়ে পড়ে আছি আপন দেশে। তবে অনিবার্য কারণে যে পিছিয়ে পড়ে, সে তো সফরকারীর মতোই।'

মুমিন নিজ উচ্চ মনোবলের মাধ্যমে অনেক উচ্চাসনে সমাসীন হতে পারে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন সত্যবাদী নবি ﷺ। তিনি বলেন :

«سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ»

'এক দিরহাম এক লক্ষকে ছাড়িয়ে গেছে।'

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ؟

সাহাবিগণ তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তা কীভাবে?!'

قَالَ: «رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا»

তিনি জবাব দিলেন, 'একজনের দুই দিরহাম ছিল, সে এ দুটি থেকে একটি নিয়ে দান করে দিল; আর অন্যজনের অনেক সম্পদ ছিল, সে তা থেকে এক লক্ষ (দিরহাম) নিয়ে দান করেছে।'[২৩]

মুমিনের শক্তি তার হৃদয়ে

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'জেনে রেখো, আল্লাহর পথে কিছু মনজিল রয়েছে। বান্দা এসব মনজিল অতিক্রম করে তার হৃদয়ের শক্তি ও মনোবলের মাধ্যমে। দেহের মাধ্যমে নয়। বস্তুত প্রকৃত তাকওয়া হলো হৃদয়ের তাকওয়া; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তাকওয়া নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

২৩. সুনানুন নাসায়ি : ২৫২৮, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩৩৪৭, সহিহু ইবনি খুজাইমা : ২৪৪৩। শব্দউৎস : সুনানুন নাসায়ি। হাদিসের মান : হাসান।

“এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।”[২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَن يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

“এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের (অন্তরের) তাকওয়া।”[২৫]

নবিজি ﷺ (التَّقْوَى هٰهُنَا) “তাকওয়া এখানে” বলে নিজের বুকের দিকে ইশারা করেছিলেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি দৃঢ় সংকল্প, উচ্চ মনোবল, ইচ্ছার স্বচ্ছতা ও নিয়তের বিশুদ্ধতা সাথে নিয়ে জীবনসফরের দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে অল্প আমল নিয়েই। এ অল্প আমলই তার নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যে লোকটি এসব মহৎ গুণ থেকে শূন্য, তাকে অনেক অবসাদ পোহাতে হয়; কষ্টকর ও ক্লান্তিকর এক সফর করতে হয়। অথচ শুরু থেকে যার উচ্চ মনোবল থাকে, তার সফর হয় সহজ-অনায়াসে। কারণ, দৃঢ় সংকল্প আর ভালোবাসা দুঃখকষ্ট দূর করে দেয়; ফলে পথচলা হয়ে ওঠে আনন্দময়।

আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে সত্যিকারের হিম্মত, দৃঢ়তা ও আগ্রহ। সুতরাং দৃঢ় হিম্মতের অধিকারী বেশি আমলকারীদের চেয়ে অনেক ধাপ সামনে চলে যায়। অবশ্য যদি উভয়ে হিম্মতের দিক থেকে বরাবর হয়, তবে আমলকারী আমলের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, এখানে ইসলাম ইহসানের অনুগামী হয়।

প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম পথ হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর পথ। তিনি ইসলাম ও ইহসান উভয়টিরই পূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট তাঁর পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি রাতে দাঁড়িয়ে এত অধিক সময় ধরে

২৪. সুরা আল-হাজ : ৩২
২৫. সুরা আল-হাজ : ৩৭

সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত; এত সাওম পালন করতেন যে, মনে হতো তিনি সাওমে বিরতি দেন না। তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতেন; সাথি-সঙ্গীদের এড়িয়ে না গিয়ে তাঁদের সাথে মিশতেন। যে সকল নফল আদায়ে বেশ শক্তিশালী মানুষও অক্ষম হয়ে পড়ে, তার কোনোটিই তিনি পরিত্যাগ করতেন না।'

ইলম ও হিম্মতে হৃদয়ের জাগরণ

ইচ্ছা ও হিম্মতের দুর্বলতা হৃদয়ের জীবনীশক্তি দুর্বল হওয়ার আলামত। হৃদয় যখন পূর্ণ জীবিত হয়, তখন হিম্মত উচ্চ হয়—ইচ্ছা ও ভালোবাসা হয় শক্তিশালী। কারণ, ইচ্ছা ও ভালোবাসার ফলেই মানুষ প্রিয়জনের চাহিদার অনুসরণ করে। মানবহৃদয় নিরাপদ থাকে ইচ্ছা ও অভিলাষের পথে আসা নানা দুর্যোগ থেকে। বস্তুত ইচ্ছা ও হিম্মতের অবনতি ঘটে হয়তো অনুভূতি ও উপলব্ধির দুর্বলতা থেকে, না হয় জীবনকে দুর্বলকারী দুর্যোগসমূহের কারণে। উপলব্ধি ও ইচ্ছাশক্তি জীবনীশক্তির প্রতীক। আর এগুলোর দুর্বলতা জীবনীশক্তির দুর্বলতার প্রতীক। উচ্চ মনোবল, স্বচ্ছ ইচ্ছা ও জীবনের পূর্ণতা কামনা পবিত্র ও পূর্ণ জীবন প্রাপ্তির কারণ। কেননা, পবিত্র জীবন অর্জিত হয় উচ্চ মনোবল, স্বচ্ছ ভালোবাসা ও একনিষ্ঠ ইচ্ছার মাধ্যমে। এগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী জীবন পবিত্র হবে। আর জীবনের দিক থেকে যারা নীচু, হিম্মত বা মনোবলের দিক থেকেও তারা নীচু। ভালোবাসা ও উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকেও তারা সবচেয়ে দুর্বল। চতুষ্পদ প্রাণীর জীবন তাদের যে কারও জীবন থেকে উত্তম। যেমন কবি বলেন :

نَهَارُكَ يَا مَغْرُوْرُ سَهْوٌ وَغَفْــلَةٌ *** وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدَى لَكَ لَازِمُ

وَتَكْدَحُ فِيْمَا سَوْفَ تُنْكِرُ غِبَّهُ * كَذَالِكَ فِيْ الدُّنْيَا تَعَيْشُ الْبَهَائِمُ

تُسَرُّ بِمَا يَفْنَى، وَتَفْرَحُ بِالْمُنَى *** كَمَا غُرَّ بِاللَّذَّاتِ فِيْ النَّوْمِ حَالِمُ

'হে প্রবঞ্চিত, হেলায় ফেলায় কেটে যায় তোমার দিনগুলো। আর ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যায় রাতের প্রহর। সাবধান হে গাফিল, পতনের ঘণ্টাধ্বনি ওই বাজছে শোনো। এমন কাজে খাটছ তুমি যার ফলাফল

খোদ তোমার কাছেই অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হবে একদিন। এটি তো মানুষের নয়—চতুষ্পদ জন্তুর জীবন। স্বপ্নের ঘোরে মানুষ যেমন সুখে বিভোর হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই তুমিও কাল্পনিক সুখে জাবর কাটছ আর খুশি হয়ে আছ এমন বস্তু নিয়ে, যা হারিয়ে যাবে অচিরেই।'[২৬]

কেন তারা উত্তমের পরিবর্তে অনুত্তম কামনা করছে?

কতক মানুষ উচ্চতার পরিবর্তে নিম্নতায় সন্তুষ্ট হয়। কল্যাণকর বস্তু ও অবস্থানের পরিবর্তে ক্ষতিকর অনর্থক জিনিস চায়। তাদের এ সন্তুষ্টি ও চাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে, ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান, অজ্ঞতার আধিক্য ও দুর্বল হিম্মত। যখন কেউ পরিশুদ্ধ ইলমের অধিকারী হয়, তার থেকে অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়, তার সংকল্প দৃঢ় ও মনোবল উচ্চ হয়—তখন সে উত্তম জিনিস কামনা করতে শেখে।

কতক মানুষের হিম্মত হলো ক্ষুধা নিবারণ হয়—এমন লোকমা পরিমাণ। কারও হিম্মত হলো তৃষ্ণা মিটে যায়—এমন সামান্য পানীয় পরিমাণ। কারও হিম্মত আবরু ঢাকার মতো একটি পোশাক-সমান। এ ধরনের মনমানসিকতাধারী লোকদের জাহিলি যুগের মানুষরা পর্যন্ত ভর্ৎসনা করত। এদের ব্যাপারেই হাতিম তাই বলেছিল :

لَحَى اللهُ صُعْلُوْكًا مُنَاهُ وَ هَمُّه* مِنَ الْعَيْشِ أَنْ يَّلْقَى لَبُوْسًا و مَطْعَمًا

يَرَى الْخَمْصَ تَعْذِيْبًا وَإِنْ يَلْقَ شَبْعَةً * يَبِتْ قَلْبُهُ مِن قِلَّةِ الْهَمِّ مُبْهَمًا

'খাওয়া-পরাই যার জীবনের একমাত্র ভাবনা ও পরম লক্ষ্য, আল্লাহ এমন কপর্দকহীনকে লাঞ্ছিত করুন। ক্ষুধাকে সে মনে করে শাস্তি। কখনো যদি তৃপ্তি ভরে খেতেও পায়, চিন্তা ও পেরেশানি কমে যাওয়ার কারণে সে রাত যাপন করে সন্দিগ্ধ চিত্তে।'[২৭]

....

২৬. তাহজিবু মাদারিজিস সালিকিন : ২/৯৪৫

২৭. কারণ সে খাওয়া-পরার জন্য সর্বদা চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত। এখন পেটপুরে খেতে পেয়ে তার চিন্তা অনেকখানি কমে গেল। তাই ঠিকমতো পেরেশানিতে ভুগতে না পেরে সে হৃদয়ে অস্থিরতা অনুভব করে। (অনুবাদক)

আর কতক মানুষ আছে, যাদের কামনা হলো দুনিয়ার ভোগবিলাস। যেমন তারাফা বিন আবদের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'পার্থিব জীবন সর্বোত্তম সুন্দর হয় কী করে?' সে বলেছিল, 'সুস্বাদু খাবার, উষ্ণ পোশাক ও আরামদায়ক বাহন পেলে।'

পার্থিব জীবনে অনেকেরই কামনা হলো এই মিসকিন কবির মতো। মদপান, সুন্দরী নারী উপভোগের মাঝে সীমাবদ্ধ। ভীতসন্ত্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীর পক্ষে প্রতিরোধে দাঁড়াতে খুব কম মানুষেরই হিম্মত হয়।

কখনো কখনো মানুষের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য এমন উচ্চ কোনো বিষয় হয়, যার কামনাকারীকে উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ও উত্তম সংকল্পকারী বলে মনে হয়। যেমন আরব্য কবি ইমরুল কাইসের অবস্থা। মদমত্ত হয়ে একদিন বেঘোরে ঘুমন্ত ছিল সে। উঠে শুনে তার রাজ্য আরেকজনের দখলে। পিতৃপ্রদত্ত রাজত্ব হারিয়ে সে তা উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করে :

فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ * كَفَانِي -وَلَمْ أَطْلُبْ- قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ

وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ *** وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِيْ

'যদি সাধারণ প্রথাগত জীবনযাপনের চেষ্টা করতাম, তবে সামান্য সম্পদই আমার জন্য যথেষ্ট হতো—তবে এমন সাধারণ জীবন আমি চাইনি। বরং আমি চেষ্টা করেছি রাজত্ব ও ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করতে। আর আমার মতো লোকেরাই পারে এমন মর্যাদা লাভ করতে।'

সে নিজের দীর্ঘ জীবনে রাজত্ব উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। অবশেষে উদ্ধার চেষ্টাতেই নিঃশেষ করেছে নিজের জীবনসময়।

بَكَى صَاحِبِيْ لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُوْنَهُ * وَأَيْقَنَ أَنَّا لَاحِقَانِ بِقَيْصَرَا

فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنُكِ إِنَّمَا *** نُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ نَمُوْتَ فَنُعْذَرَا

'সামনে গিরিপথ দেখে কেঁদে ওঠে আমার সাথি। তার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল আমরা রোমের বাদশাহর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি।

আমি তাকে বললাম, তুমি কেঁদো না। আমরা আমাদের রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করব কিংবা এই চেষ্টায় জীবন বিলিয়ে দেবো—তবেই আমরা নিষ্কৃতি পাব।'[২৮]

ইমরুল কাইস নিজ জীবনের প্রথম অংশটা ব্যয় করেছিল ভোগবিলাস ও কামনা-বাসনার পেছনে। আর জীবনের দ্বিতীয় অংশ ব্যয় করেছিল হারানো রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টায়। এরপর জীবনের অবসান হলো তার, কিন্তু আপন উদ্দেশ্য অর্জিত হলো কই আর! সে মৃত্যুবরণ করল, যেমন তার পরে মুতানাব্বি মৃত্যুবরণ করেছিল—কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্জনের লোভে। (পার্থিব) চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাদের উভয়কে ক্লান্ত করে দিয়েছিল।[২৯]

এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কামনা করেছিল আর সে চেষ্টায় নিজেদের দাড়ি-গোঁফ সাদা করে ফেলেছিল। ক্ষমতার লোভে তারা উচ্চাভিলাষে ভুগেছিল। তাদের দৃঢ় ইচ্ছা ক্রমান্বয়ে তাদের স্ফীত করে তুলছিল। আবিওয়ারদি প্রত্যেক সালাতের পর দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে পূর্ব-পশ্চিমের কর্তৃত্ব দান করুন।'[৩০] এ ব্যাপারে তার উচ্চাঙ্গের কিছু কবিতা রয়েছে—যা তার ব্যক্তিত্ব ও প্রবল কামনার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে, যা অনেকটা মুতানাব্বির ব্যক্তিত্বের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে বলা হলো, 'আপনি গৃহ নির্মাণ করছেন না যে?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমার গৃহ হলো প্রধানমন্ত্রীর ভবন অথবা জিন্দানখানা।'

জনৈক কবি বলেন :

وعِشْ مَلِكًا أوْ مُتْ كَرِيْمًا، وَإِنْ تَمُتْ

وَسَيْفُكَ مَشْهُوْرٌ بِكَفِّكَ تُعْذَرِ

'হয় রাজা হয়ে বাঁচো, না হয় মর্যাদার সাথে মরো। খোলা তরবারি উঁচিয়ে ধরে যদি মরতে পারো, তবেই তো তুমি সফল হলে।'

২৮. ইমরুল কাইসের গোত্র 'কিন্দা' যুদ্ধে হেরে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়। পালিয়ে সে রোমের বাদশাহর কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়ার সময় তার সাথিকে এই কথাগুলো বলে।

২৯. ড. উমর আশকার কৃত মাকাসিদুল মুকাল্লিফিন : ৩৬৬-৩৬৭। ঈষৎ পরিমার্জিত।

৩০. আলি তানতাবি কৃত ফিকর ওয়া মাবাহিস : ১৯৬।

মানুষে মানুষে হিম্মতের পার্থক্য হয়, এমনকি প্রাণীতেও

একেক প্রাণীর হিম্মত একেক পর্যায়ের।

মাকড়সা জন্মের পর থেকেই নিজের জাল নিজে বোনা শুরু করে। মায়ের অনুগ্রহ গ্রহণ করে না।

সাপ অন্যের তৈরি করা গর্ত খুঁজে বেড়ায়। কারণ, তার স্বভাবে রয়েছে জুলুম।

কাক খোঁজে মৃত প্রাণী।

বাজপাখি শুধু জীবিতদের ওপরই হামলা করে।

সিংহ বাসি খাবার খায় না।

হাতি খাবার পাওয়ার আগ পর্যন্ত চাটুকারিতা করতে থাকে।

আর গুবরে পোকা বিতাড়িত হয়েও ফিরে আসে।

মুতালম্মিস বলেন :

إِنَّ الْهَوَانَ حِمَارُ الْبَيْتِ يَأْلَفُهُ *** وَالْحُرُّ يُنْكِرُهُ وَالْفِيْلُ وَالْأَسَدُ

ولا يُقِيمُ بِدَارِ الذُّلِّ يَأْلَفُهَا *** إِلَّا الذَّلِيْلَانِ عَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ

هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوْطٌ بِرُمَّتِهِ *** وَذَا يُشَجُّ فَمَا يَأْوِيْ لَهُ أَحَدُ

'গাধাই কেবল ভালোবাসতে পারে লাঞ্ছনা। (যত অপমানই আসুক, সে ঘরে লেপ্টে থাকে। কারণ, এখানে আরামসে দুবেলা খেতে পায় সে।) কিন্তু স্বাধীনচেতা হাতি আর সিংহ মাত্রই লাঞ্ছনাকে ঘৃণা করে। লাঞ্ছনার ঘরকে ভালোবেসে কেউ সেখানে নিজের আবাস গড়ে না—কেবল গাধা আর তাঁবুর খুঁটি ছাড়া। একটা বাঁধা থাকে অপমানের রশিতে। আরেকটার মাথা ফাটিয়ে পুঁতে রাখা হয় মাটিতে—তাদের প্রতি কারও করুণাও হয় না কখনো।'[৩১]

....

৩১. বাহজাতুল মাজালিস ওয়া আনসুল মাজালিস : ১/২৩৮

হিম্মত মর্যাদার মাপকাঠি

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

'নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।'[৩২]

হিম্মত হলো আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক। আল্লাহ তাআলা যার জন্য চান, এ রিজিক প্রশস্ত করে দেন। যার জন্য চান, তা সংকীর্ণ করে দেন। আল্লাহ তাআলার হিকমতের দাবি হলো, বান্দাদের মাঝে ইলমি শক্তির মতো আমলি শক্তির মাঝেও পার্থক্য রাখবেন।

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِيْ الْعَزَائِمُ

وَتَأْتِيْ عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ

وَتَعْظُمُ فِيْ عَيْنِ الصَّغِيْرِ صِغَارُهَا

وَتَصْغُرُ فِيْ عَيْنِ العَظِيْمِ الْعَظَائِمُ

'যার হিম্মত যত বড় হয়, সে তত বড় কাজের সংকল্প করে। আর যে যত বেশি মহানুভব হয়, সে তত বড় মহৎ কাজে হাত দেয়। ছোটদের দৃষ্টিতে তার ছোট কাজগুলোও অনেক বড় মনে হয়। কিন্তু বড়দের চোখে তার বড় কাজগুলোও মনে হয় তুচ্ছ।'

আব্দুল্লাহ বিন উমর, উরওয়া বিন জুবাইর, মুসআব বিন জুবাইর, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান কাবার আঙিনায় একত্র হলেন। মুসআব ﷺ বললেন, 'তোমরা কে কী কামনা করো?' তখন সবাই বলল, 'তুমিই শুরু করো।'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকের নেতৃত্ব, হুসাইনের মেয়ে সুকাইনা এবং তালহা বিন উবাইদুল্লাহর মেয়ে আয়িশাকে বিয়ে করতে চাই।' তিনি তেমনই পেলেন; প্রত্যেককে তিনি পাঁচ লক্ষ দিরহাম মোহর দিলেন এবং সমসংখ্যক উপহারও দিয়েছিলেন।

....

৩২. সুরা আল-লাইল : ৪

উরওয়া বিন জুবাইর ﷺ ফিকহ অর্জনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এবং তাঁর কামনা ছিল, মানুষ তাঁর কাছে হাদিস শিখবে। আর তিনি তা-ই পেলেন।

আব্দুল মালিক খিলাফাহ অর্জন করতে চাইলেন। পরে তিনিও তা-ই পেলেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর জান্নাত চাইলেন।

মানুষের হিম্মতের পার্থক্য এখান থেকেও বোঝা যায় যে, কিছু মানুষের পক্ষে রাত জেগে গান শোনা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহর কালাম শ্রবণের জন্য তারা রাত জাগতে পারে না। কেউ আছে, কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ (হিফজ) করতে পারেনি। কেউ ফিকহের সামান্য কিছু অর্জন করে ক্ষান্ত। আর কেউ-বা রাতে দুই রাকআত সালাত আদায় করেই তুষ্ট। কেউ আছে, বড় কিছু করতে চায়, কিন্তু তার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে না; বাস্তবায়নের চেষ্টা করে না। এরা মূলত মিথ্যা আশার শিকার।

وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّيْ *** وَلَكِنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيَا غِلَابًا

وَمَا اسْتَعْصَى عَلَى قَوْمٍ مَنَالٌ *** إِذَا الْإِقْدَامُ كَانَ لَهُمْ رِكَابًا

'আশা করলেই কোনো লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় না। দুনিয়ার সবকিছুই জয় করে নিতে হয়। কেউ যখন নির্ভীক দুঃসাহসে এগিয়ে যায়, তার জন্য লক্ষ্য অর্জন কঠিন কিছু নয়।'

জীবন নিয়ে যাদের শত অভিযোগ—যদি তারা উচ্চ মনোবলের অধিকারী হতো, তবে প্রতিটি ফজিলত ও মর্যাদা অর্জনে যথাযথ চেষ্টা করত; অবহেলা ও ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকত; নিজেদের কাজে লাগাত। যেমন কবি বলেন :

وَلِكُلِّ جِسْمٍ فِيْ النُّحُوْلِ بَلِيَّةٌ *** وَبَلَاءُ جِسْمِيْ مِنْ تَفَاوُتِ هِمَّتِيْ

'রুগ্ণতা প্রতিটি দেহের জন্য বিপদ। আর আমার দেহের বিপদ হলো, আমার হিম্মত ও সংকল্পের উচ্চতা।'

মুতানাব্বি বলেন :

وَإِذَا النُّفُوْسُ كُنَّ كِبَارًا *** تَعِبَتْ فِيْ مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ

'কারও হিম্মত ও আকাঙ্ক্ষা যদি বড় হয়, তবে তা অর্জন করতে গিয়ে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।'

অন্য এক কবি বলেন :

وَقَائِلَةٍ: لِمَ عَرَتْكَ الْهُمُوْمُ *** وَأَمْرُكَ مُمْتَثَلٌ فِيْ الْأُمَمْ

فَقُلْتُ: ذَرِيْنِيْ عَلَى غُصَّتِيْ *** فَإِنَّ الْهُمُوْمَ بِقَدْرِ الْهِمَمْ

'কত নারী বলে, এত দুশ্চিন্তা কেন তোমায় ঘিরে ধরে? অথচ তোমার কথায় চলে তোমার সমাজ! আমি বলি, আমাকে আমার ফিকির নিয়ে থাকতে দাও। যার হিম্মত ও সংকল্প যত বড়, তার দুশ্চিন্তাও তত বড়।'

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি তখন তাঁর স্ত্রী ফাতিমাকে বললেন, 'তোমার জন্য আমি অবসর সময় বের করতে পারছি না, তাই তুমি চাইলে আমার সাথে অবস্থান করতে পারো, আর চাইলে তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে পারো।' এ কথা শুনে ফাতিমা কাঁদতে লাগলেন। পাশের দাসীগুলোও কাঁদছিল তার সাথে। কান্নার কারণে তাদের ঘরে একধরনের কোলাহল শোনা যাচ্ছিল বাইর থেকে। ফাতিমা সর্বাবস্থায় আমিরুল মুমিনিনের সহাবস্থানকেই গ্রহণ করলেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।

জনৈক লোক উমর বিন আব্দুল আজিজকে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমাদের জন্য কিছু সময় বের করুন।' তখন তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করলেন :

قَدْ جَاءَ شُغْلٌ شَاغِلٌ *** وَعَدَلْتُ عَنْ طُرُقِ السَّلَامَةْ

ذَهَبَ الْفَرَاغُ فَلَا فَرَا *** غَ لَنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةْ

'ব্যস্ততা এসে আমায় ঘিরে ধরেছে। ছিটকে পড়েছি আমি আয়েশি জীবনধারা থেকে। কর্মহীন প্রহরগুলো দলবেঁধে হারিয়ে গেছে কোথাও—কিয়ামত পর্যন্ত আর এতটুকু অবসরও মেলার সুযোগ নেই।'

ইমাম ইবনে দাকিকুল ইদ ﵀ বলেন :

اَلْجِسْمُ يُذِيْبُهُ حُقُوْقُ الْخِدْمَةِ *** اَلْقَلْبُ عَذَابُهُ عُلُوُّ الْهِمَّةِ

وَالْعُمْرُ بِذَاكَ يَنْقَضِيْ فِيْ تَعَبٍ *** وَالرَّاحَةُ مَاتَتْ فَعَلَيْهَا الرَّحْمَةُ

'বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ক্রমশ ভেঙে পড়ে মানুষের শরীর। আর অন্তরের কষ্ট হলো সুউচ্চ হিম্মত ও মনোবল। পরিশ্রমের মাঝেই এভাবে কেটে যায় মানুষের জীবনকাল। সুখ বিসর্জনের মধ্য দিয়েই সে লাভ করে রহমত।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

যেমন হতে হবে

যত কষ্ট তত অর্জন

স্বাপ্নিক। উচ্চাভিলাষী। যে বড় স্বপ্ন দেখে। তাকে লক্ষ্য অর্জনে সুন্দরভাবে তৈরি করে নিতে হবে নিজেকে। আমরা সকলেই জানি, সম্মান কষ্টের বেড়ায় আবদ্ধ। কষ্টের প্রাচীর ডিঙিয়েই তবে সম্মান হাসিল হতে পারে।

যত কল্যাণ আর স্বাদ-আহ্লাদ আছে, নিজেকে পূর্ণ করার যত আশা আছে—সবকিছুই কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত হয়। পরিশ্রম আর ক্লান্তির সাঁকো অতিক্রম করা ছাড়া এসব অর্জিত হয় না। কবি বলেন :

بَصُرْتُ بِالرَّاحَةِ الْكُبْرَى فَلَمْ أَرَهَا *** تُنَالُ إِلَّا عَلَى جِسْرٍ مِنَ التَّعَبِ

'আমি পরম প্রশান্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। কিন্তু ক্লান্তি ও পরিশ্রমের সাঁকো পার হওয়া ছাড়া তা অর্জনের কোনো পথ দেখলাম না।'

অন্য একজন বলেন :

فَقُلْ لِمُرَجِّيْ مَعَالِيَ الْأُمُوْرِ *** بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ: رَجَوْتَ الْمُحَالَا

'কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া যে বড় কিছু চায়, তাকে বলো দাও—এ তোমার আকাশ কুসুম কল্পনা।'

কবি বলেন :

لَوْلَا الْمَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ *** الْجُوْدُ يُفْقِرُ، وَالْإِقْدَامُ قَتَّالُ

'যদি আত্মত্যাগ ও পরিশ্রম করার দরকার না হতো, তবে সবাই নেতা বনে যেত। (নেতৃত্বের পরিপন্থী জিনিস দুটি : কৃপণতা ও কাপুরুষতা। দানশীলতা ও সাহসিকতা ছাড়া মানুষ নেতা হতে পারে

না।) বদান্যতা মানুষকে দরিদ্র করে আর যুদ্ধে বাহাদুরি মানুষের জীবন কেড়ে নেয়।'

জনৈক কবি বলেন :

وَالَّذِيْ يَرْكَبُ بَحْرًا سَيَرَى *** قُحَمَ الأَهْوَالِ مِنْ بَعْدِ قُحَمِ

'সমুদ্র সফরে যে বের হয়েছে, অচিরেই সে দেখতে পাবে, ভয়াবহ সব মুসিবত একে একে ধেয়ে আসছে তার দিকে।'

আরও বলেন :

اَلذُّلُّ فِيْ دَعَةِ النُّفُوْسِ وَلَا أَرَى *** عِزَّ الْمَعِيْشَةِ دُوْنَ أَنْ يُشْقَى لَهَا

'আয়েশি জীবনেই রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান—নিজেকে কষ্টে নিপতিত করা ছাড়া আমি গৌরবময় জীবনের কোনো পথ দেখি না।'

আবু মুসা আল-আশআরি ﷺ রোজা রাখতে রাখতে দাঁত খোঁচানোর কাঠির মতো চিকন হয়ে গেলেন। বলা হলো, 'যদি আপনি নিজেকে একটু বিশ্রাম দিতেন!' অর্থাৎ যদি নিজেকে একটু আরাম দিতেন! তিনি জবাবে বললেন, 'অসম্ভব! নাদুসনুদুস ঘোড়া প্রতিযোগিতায় জেতে না।'

বলা হয়ে থাকে যে, 'সুখ পেতে হলে আগে কিছু সুখ ত্যাগ করতে হয়।'

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'সকল জাতির জ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে, কষ্ট ব্যতীত সুখ-আরাম অর্জিত হয় না। বস্তুত যে আরামকে প্রাধান্য দিয়েছে, সে আরাম থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। যতটুকু পরিশ্রম আর কষ্ট সহ্য করা হবে, আনন্দ আর স্বাদ ততটুকুই অর্জিত হবে। যার পেরেশানি নেই, তার আনন্দ নেই। আর যার সবর নেই, তার কোনো স্বাদও নেই। যার দুর্ভাগ্য নেই, তার সৌভাগ্যও নেই। যে পরিশ্রম করে ক্লান্ত হতে প্রস্তুত নয়, তার কপালে আরাম বলতে কিছুই নেই। বরং বান্দা যখন সামান্য কষ্ট করে, সে দীর্ঘ আরাম ভোগ করতে পারে। দুনিয়ার এই ক্ষণিকের জীবনসময়ে কষ্ট করে সবর করলে সুখী হবে অনন্ত জীবন। চিরস্থায়ী

জান্নাতবাসী যা কিছু পাবে, সবই সবরের মিষ্ট ফল। আল্লাহ তাআলার কাছেই সাহায্য কামনা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

যার ব্যক্তিসত্তা মহৎ, যার মনোবল দৃঢ়, যে বড় হওয়ার ও বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে—আরামের চেয়ে পরিশ্রমই বেশি করতে হবে তাকে।

ইমাম মুসলিম ﵀ তাঁর সহিহ গ্রন্থে বলেন, ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির ﵀ বলেন :

لا يُنال العلم براحة البدن

"দৈহিক সুখ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া ইলম অর্জিত হয় না।"

জ্ঞানী মাত্রই এ কথা স্বীকার করেন যে, যত কষ্ট তত অর্জন। কষ্ট অনুযায়ীই ফলাফল লাভ হয়। লক্ষ্য অর্জনের পথে কষ্ট করলে তবেই কাঙ্ক্ষিত সুখ পাওয়া যায়। তবে পরিপূর্ণ আরাম, স্বাদ ও সুখ তো শান্তির আবাস জান্নাতেই পাওয়া যাবে। বস্তুত এ দুনিয়াতে সুখের পরশ মিলবে সামান্যই।'[৩৩]

আবু বকর সিদ্দিক ﵁ বলেন :

'আল্লাহর শপথ, আমি স্বপ্ন দেখার মতো কোনো নিদ্রা গ্রহণ করিনি। ভুল করার মতো কোনো ধারণায় লিপ্ত হইনি। আর আমি পথভ্রষ্ট হইনি।'

অর্থাৎ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিভিন্ন শহর বিজয় ও খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিন্যাসে তিনি এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর জন্য গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া বা ঘুমের ঘোরে কোনো স্বপ্ন দেখা সম্ভবপর হয়নি।

ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক আমিরুল মুমিনিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর ব্যাপারে বলেন, 'তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কখনো ফরজ গোসল করেছেন বলে আমি জানি না।'

ইমাম আহমাদ ﵀ তাঁর ছেলেকে পরিশ্রমের ব্যাপারে বলেন, 'হে বৎস, আমি আমার পক্ষ থেকে পরিশ্রম উপহার দিচ্ছি তোমাকে।'

৩৩. মিফতাহু দারিস সাআদাহ : ৩৬৬-৩৬৭

শাইখ মুহাম্মাদ খাজির হুসাইন ﷺ বলেন :

'উচ্চ মনোবলের অধিকারী সব সময় পরিশ্রমের মাঝেই ব্যস্ত থাকে। তাকে সর্বদা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখা যায়। কারণ, যার মনোবল উচ্চ ও দৃঢ় হয়, সে প্রত্যেক বিষয়ের ইলম অর্জন করতে চায়। কিছু বিষয় শেখার মাঝেই কেবল সে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ইলমের প্রতিটি শাখায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে চায় সে। আর এটি দৈহিক শক্তিতে অসহনীয় মনে হতে পারে। এরপর সে উপলব্ধি করে যে, এসবের উদ্দেশ্য হলো আমল। তাই কিয়ামুল লাইলের প্রতি সে যত্নশীল হয়। দিনে সাওম, রাতে কিয়াম—দুটোকে একত্র করে সে। ইলম ও আমলের সমন্বয় করা, দুটো একই সাথে চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিনই বটে। উচ্চ মনোবলের অধিকারীই পারে তা আঞ্জাম দিতে। এরপর সে দুনিয়া পরিত্যাগের প্রতি দৃষ্টি দেয়। দুনিয়াকে প্রয়োজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। সে অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে শেখে। কৃপণতা থেকে দূরে থাকে। দান ও দয়ার চাদর পরিধান করে। দুনিয়াবিমুখতায় তার আত্মমর্যাদাবোধ উপার্জনের নানা খাত তৈরিতে বাধা প্রদান করে। কারণ, তার স্বভাব এখন মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট—যা তার দেহ ও পরিবারকে প্রভাবিত করে। যদি সে পার্থিব মোহের দিকে ফিরে আসতে চায়, তবুও তার স্বভাব তাকে বাধা দেয়। বরং তখন সে প্রকৃত আরামের খোঁজে উচ্চ মনোবল সাথে নিয়ে পরিশ্রম করে চলে। পক্ষান্তরে নিম্ন মনোবলধারী লোকেরা কিছুটা কষ্ট করে অল্প পরিমাণ অর্জন করে, কিন্তু বড় কিছু অর্জনের মতো সম্মান তারা পায় না।'

বড় আবিদদের একজন রবি বিন খুসাইম। তাঁকে একবার বলা হলো, 'যদি নিজেকে একটু আরাম দিতেন!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি আরামেরই প্রত্যাশী।'

وَرُبَّمَا كَانَ مَكْرُوْهُ النُّفُوْسِ إِلَى *** مَحْبُوْبِهَا سَبَبًا مَا مِثْلُهُ سَبَبُ

'অনেক সময় অপ্রিয় জিনিসও প্রিয় বস্তু অর্জনের কারণ হয়। প্রিয় বস্তু লাভ করার জন্য এমন মাধ্যম আর হয় না।'

আহমাদ বিন দাউদ আবু সাইদ ওয়াসিতি ﵀ বলেন :

'আমি আহমাদ ﵀-কে বন্দী অবস্থায় নির্যাতনের আগ মুহূর্তে গিয়ে কিছু কথা বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, তোমার পরিবার রয়েছে। রয়েছে শিশু সন্তানেরা। আর তুমি তো মাজুর।" কেমন যেন আমি তাঁর জন্য উত্তর প্রদান সহজ করে দিয়েছিলাম। আহমাদ বিন হাম্বল আমাকে বললেন, "হে আবু সাইদ, যদি তোমার চিন্তাভাবনা এমনই হয়ে থাকে, তবে তুমি সুখ খুঁজছ।"'

ইমাম আহমাদ ﵀-কে বলা হলো, 'বান্দা কখন সুখের স্বাদ অনুভব করে?' জবাবে তিনি বললেন, 'জান্নাতে প্রথম কদম রাখার সময়।'

أَحْزَانُ قَلْبِيَ لَا تَزُوْلُ *** حَتَّى أُبَشَّرَ بِالْقَبُوْلْ

وَأَرَى كِتَابِيَ بِالْيَمِيْنْ *** وَتُسَرَّ عَيْنِيَ بِالرَّسُوْلْ

'হৃদয়ের দুঃখগুলো ফুরোবে না কিছুতেই, যতক্ষণ না সুসংবাদ পাই পরম সাফল্যের। যতক্ষণ না ডান হাতে পাই আমার আমলনামা আর প্রিয় নবির দিদারে প্রশান্ত হয় আমার নয়নযুগল।'

আমির শামসুল মাআলি কাবুস বলেন, 'মর্যাদার ভিত্তি তৈরি হয় কষ্টের মাধ্যমে। কঠিন সময়েও লক্ষ্য অর্জনে অবিরত প্রচেষ্টারত মানুষই আসল প্রশংসার হকদার।'

وَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ عِنْدَنَا *** لَنَا الصَّدْرُ دُوْنَ الْعَالَمِيْنَ، أَوِ الْقَبْرُ

تَهُوْنُ عَلَيْنَا فِيْ الْمَعَالِيْ نُفُوْسُنَا * وَمَنْ خَطَبَ الْحَسْنَاءَ لَمْ يَغْلُهُ الْمَهْرُ

'সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে আমরা আপস করি না। আমাদের জন্যই জগতের নেতৃত্ব—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আমরা কোনো কিছুকেই পরোয়া করি না। আমাদের জন্য সব সহজ। সুন্দরী ললনাকে যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, মোহরের চিন্তা তাকে আটকাতে পারে না।'

জনৈক সালাফ অত্যধিক ইবাদতে ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'দুনিয়া ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম না। ভবিষ্যতেও দুনিয়া থাকবে, কিন্তু আমি থাকব না। মাঝ দিয়ে কিছু সময় পেয়েছি। এ সময় তো বৃথা যেতে দেওয়া যায় না।'

أَنْفُضُوْا النَّوْمَ وَهُبُّوْا لِلْعُلَا *** فَالْعُلَا وَقْفٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَنَمْ

'ঘুমের ভাব ঝেড়ে ফেলো। ঝাঁপিয়ে পড়ো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংগ্রামে। তার হাতেই ধরা দেয় শ্রেষ্ঠত্বের সোনার হরিণ, যে যাপন করে বিনিদ্র রজনী সাফল্যের সন্ধানে।'

ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম। অস্থিরতার চেয়ে অবিচলতা উত্তম। হীনতার চেয়ে মৃত্যু উত্তম। বস্তুত যে সম্মান লাভ করেছে, সে বিজয়ী হয়েছে।

فَثِبْ وَثْبَةً فِيْهَا الْمَنَايَا أَوِ الْمُنَى *** فَكُلُّ مُحِبٍّ لِلْحَيَاةِ ذَلِيْلٌ

'ঝাঁপিয়ে পড়ো! হয় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য নয় মৃত্যু। নিশ্চয় জীবনপ্রেম কেবল লাঞ্ছনাই ডেকে আনে।'

যে স্বাপ্নিক, যে উচ্চ মনোবলের অধিকারী—সে নিজের লক্ষ্যপানে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। যে লক্ষ্য সে ইলম ও দূরদর্শিতার সাথে নির্ধারণ করেছে, তা অর্জনে দুর্যোগ ও বিপর্যয়েও সে নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে। কঠিন থেকে কঠিন বিষয়গুলোকেও হালকাভাবে নেয় সে।

আমর বিন আস ﷺ বলেন, 'ধ্বংসাত্মক পিচ্ছিল পথ আঁকড়ে ধরো।' অর্থাৎ মহৎ বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরো। ছোটখাটো বিষয় নয়।

আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া ﷺ বলেন, 'যে বড় কিছু করতে চায়, তাকে সে পরিমাণ ঝুঁকি নিতে হয়।'

কবি বলেন :

ذَرِيْنِيْ أَنَلْ مَا لَا يُنَالُ مِنَ الْعُلَا

فَصَعْبُ الْعُلَا فِيْ الصَّعْبِ، وَالسَّهْلُ فِيْ السَّهْلِ

تُرِيْــدِيْــنَ إِدْرَاكَ الْمَــعَـــالِيْ رَخِــيْــصَــةً
وَلَا بُــدَّ دُوْنَ الشَّـــهْــدِ مِــنْ إِبَــرِ النَّــحْــلِ

'আমাকে ছাড়ো নারী, আমার লক্ষ্য সে তুঙ্গে, যেখানে কেউ পৌঁছায়নি আজ অবধি। বড় কিছু অর্জন করা কঠিন কর্ম। ছোট কিছু হাসিল করা সহজ কর্ম। তুমি চাও, সহজেই বড় কিছু করে ফেলবে! অথচ সামান্য মধু নিতে গেলেও মৌমাছির হুল খেতে হয়।'

যে স্বাপ্নিক, যে উচ্চ মনোবলের অধিকারী, উচ্চাভিলাষী যে, সে সব সময় নিজের লক্ষ্যপানে যাত্রা অব্যাহত রাখে। যেখানেই তা উদ্ভাসিত হয়, সেদিকেই সে ছুটে চলে।

কবি বলেন :

إِذَا لَمْ أَجِدْ فِيْ بَلْدَةٍ مَا أُرِيْدُهُ *** فَعِنْدِيْ لِأُخْرَى عَزْمَةٌ وَرِكَابُ

'আমি যা চাই, তা যদি কোনো শহরে না পাই, তবে অন্য কোনো নগর পানে ছোটার সংকল্প ও বাহন আমার আছে।'

যে বড় কিছু করতে চায়, সে সবর্দা নিজের হিম্মতের ডানায় ভর করে উড়ে যায় লক্ষ্যপানে। সে অন্যের ওপর ভর করে চলে না। পশ্চাদ্‌গামীদের অনুৎসাহ আর তিরস্কারকারীদের তিরস্কার তার পথে এতটুকুও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

سَبَقْتُ الْعَالَمِيْنَ إِلَى الْمَعَالِيْ *** بِصَائِبِ فِكْرَةٍ، وَعُلُوِّ هِمَّةْ
وَلَاحَ بِحِكْمَتِيْ نُوْرُ الْهُدَى فِيْ *** لَيَالٍ لِلضَّلَالَةِ مُدْلَهِمَّةْ
يُرِيْدُ الْجَاهِلُوْنَ لِيُطْفِئُوْهُ *** وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّهْ

'উন্নত মনোবল ও বিশুদ্ধ চেতনা বুকে পুরো জগৎকে পেছনে ফেলে আমরা আসীন হয়েছি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। ঘোর অমানিশার কালো রাতে আমাদের প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে হিদায়াতের অনির্বাণ দীপশিখা। মূর্খরা মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় এই আলোকে। কিন্তু আল্লাহ এই আলোকে বিকশিত করবেন পরিপূর্ণরূপে।'

যে মানুষটি আল্লাহর উপহার পেতে চায়, যে জান্নাতের প্রত্যাশা করে—সে কখনো কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করে না। ভয় করে না কোনো অবমাননাকারীর অবমাননার। বরং সে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যায় আপন লক্ষ্যপানে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

'আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে।'[৩৪]

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ

'যে ভ্রমণ পথে কোনো বিপদের আশঙ্কা করে, সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে। যে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। জেনে রাখো, আল্লাহর পণ্য খুবই মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর পণ্য হচ্ছে, জান্নাত।[৩৫]

পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় ক্রেতার মর্যাদা, অর্থের পরিমাণ ও বিক্রেতার ধরন অনুযায়ী। যদি ক্রেতা মহান হন, মূল্য অনেক বেশি হয় এবং বিক্রেতাও দৃঢ় হন—তবে পণ্যটি মূল্যবান হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।'[৩৬]

....

৩৪. সুরা আল-ইসরা : ১৯

৩৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৫০ (হাদিসের মান : হাসান গরিব), মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৫২।

৩৬. সুরা আত-তাওবা : ১১১

অনেক সময় বহিরাগত কিছু কারণে লক্ষ্য অর্জন বা বাস্তবায়ন সহজসাধ্য হয় না। তবে এতে যেন দৃঢ় সংকল্পে চিড় না ধরে, উচ্চ মনোবলে কমতি না আসে; বরং নিজেকে সবরের ওপর অটল রাখবে এ বলে যে, যা করার আছে, তা করে যাব।

কবি বলেন :

سَأَضْرِبُ فِيْ طُوْلِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا *** أَنَالُ مُرَادِيْ أَوْ أَمُوْتُ غَرِيْبًا

فَإِنْ تَلِفَتْ نَفْسِيْ فَلِلّٰهِ دَرُّهَا *** وَإِنْ سَلِمَتْ كَانَ الرُّجُوْعُ قَرِيْبًا

'আমি চষে ফিরব গোটা পৃথিবী। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুব কিংবা সফরেই স্বাগত জানাব মৃত্যুকে। যদি মারা যাই পথের পরে, তাহলে কত সৌভাগ্যবান আমি! আর যদি বেঁচে থাকি, তবে দ্রুতই ফিরে আসব সাফল্যের পয়গাম হাতে।'

অন্য এক কবি বলেন :

عَجِبْتُ لَهُــمْ قَالُوْا: تَمَــادَيْتَ فِيْ الْمُــنَى

وَفِيْ الْمُثُلِ الْعُلْيَا، وَفِيْ الْمُرْتَقَى الصَّعْبِ

فَاقْصِرْ، وَلَا تُجْــهِدْ يَــرَاعَــكَ إِنَّــمَا

سَتَبْذُرُ حَبًّا فِيْ ثَـرًى لَيْـسَ بِالْخَصِـبِ

فَقُلْتُ لَهُمْ: مَهْلًا، فَمَـا الْيَأْسُ شِيْـمَتِيْ

سَـأَبْـذُرُ حَـبِّيْ، وَالثِّـمَارُ مِـنْ الـرَّبِّ

إِذَا أَنَا أَبْلَـغْـتُ الرِّسَــالَةَ جَــاهِــدًا

وَلَمْ أَجِدِ السَّمْعَ الْمُـجِيْبَ فَمَـا ذَنْبِيْ؟

'তাদের কথায় আশ্চর্য হলাম। তারা বলে, সাফল্য অর্জনের নেশায় আদর্শ পুরুষদের অনুসরণে বন্ধুর পথে চলতে গিয়ে তুমি সীমা ছাড়িয়ে

গেছ। এবার ক্ষান্ত হও। নিজেকে আর কষ্ট দিও না। তুমি ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করতে চলেছ। আমি বলি, থামো! হতাশ হওয়ার লোক আমি নই। আমি বীজ বপন করবই। ফসল দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ। পূর্ণ উদ্যমে আমি পৌঁছে দেবো হকের পয়গাম। সাড়া দেওয়ার মতো কাউকে যদি না পাই, তবে সে দোষ তো আমার নয়।'[৩৭]

৩৭. একজন উচ্চ মনোবলসম্পন্ন দায়ি সর্বদা তার অন্তরকে সালিহিনের মতো করে অটল রাখে। অন্তরে সালিহিনের এ সদুত্তরের প্রতিধ্বনি উচ্চারণ করে, যার উল্লেখ এসেছে পবিত্র কুরআনের আয়াতে—وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ - 'স্মরণ করো, যখন তাদের একদল বলেছিল, তোমরা এমন লোকদের কেন নসিহত করছ, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দেবেন? নসিহতকারীগণ বলেছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়মুক্ত হওয়ার জন্য আর তারা যাতে তাকওয়া অবলম্বন করে, সে জন্য।' (সুরা আল-আরাফ : ১৬৪)

দায়ি যদিও তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন না করতে পারে, তবুও তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট—যা বলেছেন সাইয়িদ কুতুব ﵀। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কিছু কর্মী রয়েছে। তারা এমন যে, আল্লাহ যেভাবে চান, যেখানে চান তাদের কাজ করাতে, তারা কাজ করে এবং তাদের পারিশ্রমিক পায়। তাদের এটা দায়িত্ব নয় যে, উদ্দিষ্ট দিকে দাওয়াতের মাধ্যমে অবস্থাকে ঘুরিয়ে দিতেই হবে। এটা তো আদেশকারী মহান আল্লাহর শান। তিনিই এমনটা করবেন। এটা কর্মী বা শ্রমিকের দায়িত্ব নয়।'

যারা দাওয়াত দিচ্ছেন, কিন্তু নিজেদের পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি—এর অর্থ এ নয় যে, তারা ব্যর্থ। বরং তাদের জন্য এ উদাহরণটিই যথেষ্ট যে, কিয়ামতের দিন এমন কয়েকজন নবি আসবেন, যাঁদের সাথে অনুসারী থাকবে একজন বা দুজন বা তিনজন লোক। আবার এমনও নবি আসবেন, যাঁর সাথে কোনো অনুসারীই থাকবে না। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন : (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ) - 'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। (সুরা আশ-শুরা : ৪৮) আল্লাহ আরও বলেন : (لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) - 'তাদের সৎ পথে আনার দায় আপনার নয়।' (সুরা আল-বাকারা : ২৭২)

উচ্চাভিলাষ দৃঢ়তাকে নষ্ট করে না

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

'এরপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন।'[৩৮]

আল্লাহ তাআলা পুণ্যবানদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন :

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ

'এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।'[৩৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'[৪০]

উহুদ যুদ্ধের আগের কথা। যুবকরা রাসুল ﷺ-কে মদিনার বাইরে গিয়ে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের পরামর্শ দিল। তিনি তাদের অভিমত অনুযায়ী কাজ করলেন। রাসুল ﷺ মুসলিমদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দুটি বর্ম পরে বের হলেন। এরপর যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন। তাদের আদেশ করলেন শত্রু অভিমুখে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু যারা আগে এই অভিমত পেশ করেছিল, তারা যখন উপলব্ধি করতে

....

৩৮. সুরা আলি ইমরান : ১৫৯
৩৯. সুরা আর-রাদ : ২০
৪০. সুরা আল-আহজাব : ২৩

পারল যে, তারা রাসুল ﷺ-এর অপছন্দ সত্ত্বেও শত্রুদের মোকাবেলায় নিজেদের পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে চাপ প্রয়োগ করেছে, তখন তারা লজ্জিত হলো। কারণ, রাসুল ﷺ এর বিপরীত চাচ্ছিলেন। তারা বলল, 'আমাদের জন্য আপনার বিরোধিতা করা উচিত নয়। আর আমরা আপনাকে বের হতে বাধ্য করছি না। আপনি যা চান, তা-ই করুন। আপনি আমাদের যেমন আদেশ করেছিলেন, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।' কিন্তু রাসুল ﷺ নিজের মনোবল ভাঙতে রাজি হননি। তিনি তাদের বের হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'যখন কোনো নবি বর্ম পরিধান করেন, তখন তা খুলে রাখা উচিত নয়—যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আর শত্রুর মাঝে ফয়সালা করেন।'[৪১]

রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর আনসারগণ উমর ﷺ-কে আবু বকর ﷺ-এর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি রাসুল ﷺ কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনীকে অভিযান থেকে বিরত রাখেন অথবা তাদের জন্য উসামা ﷺ থেকে বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। তখন আবু বকর ﷺ বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি আমি জানতে পারি যে, আমি তাদের ফিরিয়ে না আনলে হিংস্র প্রাণী আমার পা টেনে নিয়ে যাবে, তবুও আমি ফিরিয়ে আনব না। আমি সে পতাকা খুলে ফেলতে পারি না, যা স্বয়ং রাসুল ﷺ উত্তোলন করে গেছেন।' উমর ﷺ বললেন, 'আমাকে আনসারগণ এ খবর আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। তাঁরা আপনার নিকট আবেদন করেছেন যে, উসামার চেয়ে বয়সে বড় কাউকে সেনাপতি নিযুক্ত করতে।' আবু বকর ﷺ তখন বসা ছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়লেন এবং উমর ﷺ-এর দাড়ি ধরে বললেন, 'হে খাত্তাবের বেটা, তোমার মা সন্তানহারা হোক এবং তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! রাসুল ﷺ যাকে নিয়োগ দিয়েছেন, তাকে অপসারণ করার আদেশ দিচ্ছ তুমি আমাকে?!'

উমর ﷺ লোকদের সামনে বের হয়ে এলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করলেন?' তিনি বললেন, 'তোমাদের মা সন্তানহারা হোক! তোমরা চলে যাও! তোমাদের কারণে আমি রাসুলের খলিফা থেকে যা পেলাম, তা আমার জন্য যথেষ্ট।'

....

৪১. তাবারানি, আহমাদ, বাইহাকি। এ হাদিসটি হাসান।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারটি নিয়ে উমর ﷺ আবু বকর ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'লোকদের ভালোবাসুন এবং তাদের প্রতি কোমল আচরণ করুন।' আবু বকর ﷺ বললেন, 'আমি তোমার সাহায্যের আশা করেছিলাম, কিন্তু তুমি নিরাশ করতে এলে! জাহিলি যুগে ছিলে বীর, আর ইসলামে এসে হলে ভীরু! ওহির পথ বন্ধ হয়ে গেছে, দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন দ্বীনের ওপর আঘাত আসবে আমি জীবিত থাকতে!'

উমর ﷺ বললেন, '(তখন) আমি মনে করলাম যে, আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের ব্যাপারে আবু বকরের হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এমনকি আমিও বুঝতে পারলাম, যুদ্ধ করাই সঠিক।'

শামে যখন মহামারি ছড়িয়ে পড়ল, তখন উমর ﷺ মুহাজিরদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। মুহাজিররা পরস্পর ভিন্ন মত ব্যক্ত করতে লাগলেন। কতক বললেন, 'আপনি একটি উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, আর তা থেকে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।' তাঁদের এ পরামর্শ ছিল আবু বকর ﷺ-এর নীতির ওপর ভিত্তি করে।[৪২]

জাফর আল-খালদি আল-বাগদাদি বলেন, 'আমি আল্লাহর সাথে এমন কোনো অঙ্গীকার করিনি, যা ভঙ্গ করেছি।'

সালিহ বিন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন :

'আমার পিতা মক্কা সফরের দৃঢ় সংকল্প করলেন। সাথে নিলেন ইয়াহইয়া বিন মুইনকে। বাবা বলেন, আমরা হজ করে সানআয়[৪৩] আব্দুর রাজ্জাকের কাছে যাব। তিনি বলেন, এরপর আমরা চলতে থাকলাম এবং একপর্যায়ে মক্কায় পৌঁছালাম। হঠাৎ আমরা আব্দুর রাজ্জাককে তাওয়াফরত পেলাম। আর ইয়াহইয়া তাঁকে পূর্ব থেকেই চিনতেন। আমরা তাওয়াফ করে আব্দুর রাজ্জাকের কাছে এলাম। ইয়াহইয়া তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, "ইনি আপনার ভাই আহমাদ।" আব্দুর রাজ্জাক ﷺ বললেন, "আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন। তাঁর বন্দীদশার প্রত্যেকটি খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দৃঢ়তা দান করুন।" অতঃপর তিনি উঠে চলে গেলেন। তখন ইয়াহইয়া

৪২. ফাতহুল বারি : ১০/১৭৯
৪৩. ইয়ামানের রাজধানী

বললেন, "আমরা কি তাঁর কাছ থেকে কোনো সময় চেয়ে নেব না?" তখন আহমাদ ﷺ নিষেধ করে বললেন, "তাঁর দেশে যাওয়ার ইচ্ছা কেন আমি পরিবর্তন করব?" অথবা এমন কোনো কথা বললেন। তারপর তিনি ইয়ামান সফর করলেন তাঁর কাছে। অনেক কিতাব অধ্যয়ন করলেন।'

হাফিজ আবু ইসহাক আল-হাব্বাল বলেন, 'একদিন আমি আবু নাসর আস-সিজজি-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় কেউ দরজায় করাঘাত করল। আমি গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তখন এক মহিলা প্রবেশ করল। এক হাজার দিনারের একটি থলে বের করে শাইখের সামনে রাখল। বলল, "আপনি যেখানে ইচ্ছা তা ব্যয় করুন।" তিনি বললেন, "তোমার উদ্দেশ্য কী?" সে বলল, "আপনি আমাকে বিয়ে করুন। তবে আমার কোনো চাহিদা নেই তেমন। আমি শুধু আপনার খিদমত করতে চাই।" তিনি থলেটি নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। যখন মহিলাটি ফিরে যাচ্ছিল, তিনি বললেন, "আমি সিজিস্তান থেকে ইলম অর্জনের নিয়তে এসেছি। আমি বিয়ে করলে আমার এ মহান উদ্দেশ্য ছুটে যাবে। আর আমি ইলম অর্জনের প্রতিদানের ওপর অন্য কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিতে পারি না।"'

উচ্চ মনোবলের অধিকারী কখন অনুশোচনায় ভোগে?

উচ্চ মনোবলের অধিকারী সব ক্ষেত্রেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এমনকি অনুশোচনার ক্ষেত্রেও। নিম্ন মানসিকতার লোকেরা অনুশোচনা করে দুনিয়ার কোনো স্বাদ-আহ্লাদ ছুটে গেলে, কিংবা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ না হলে আফসোস করতে করতে শেষ হয়ে যায় তারা। কিন্তু উচ্চ মানসিকতার লোকদের মর্যাদাকর অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অনুশোচনা করে, তবে তা অন্য কারণে। সামনের বর্ণনায় এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

- উচ্চ মনোবলের অধিকারী অনুশোচনা করে দুনিয়াতে তার ছুটে যাওয়া সময়ের জন্য। এ কারণে নয় যে, সময়গুলো সে আল্লাহর অবাধ্যতায় কাটিয়েছে; বরং সে অনুশোচনা করে, তার সময়গুলো আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পারেনি। আল্লাহর আনুগত্য পালনে সময়টা আবাদ করতে পারেনি। তাই তার আফসোস থেকে যায়। রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا

'জান্নাতবাসী কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবে না, তবে ছুটে যাওয়া সে মুহূর্তগুলো নিয়ে আফসোস করবে, যেগুলো তারা আল্লাহ তাআলার স্মরণবিহীন কাটিয়েছিল।'[৪৪]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ জানাজার সালাত আদায় করে চলে আসতেন। কিন্তু যখন তিনি রাসুল ﷺ-এর এ হাদিস শুনতে পেলেন যে,

'যে ইমান ও ইখলাসের সাথে কোনো মুসলিমের জানাজায় অংশ নেবে এবং জানাজার সালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি কিরাত-সম প্রতিদান থাকবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য দুই কিরাত সমান প্রতিদান রয়েছে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, দুই কিরাত কতটুকু?' রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, 'বড় বড় দুটি পাহাড়সম।' (অন্য বর্ণনায়, এক কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।) ইবনে উমর ﷺ মসজিদে এক মুষ্টি কঙ্কর হাতে নিয়ে নাড়ছিলেন, যখন রাসুল ﷺ-এর এ বাণী তাঁর কানে পৌঁছাল, তখন তিনি কঙ্করগুলো জমিনে ছুড়ে মারলেন। অতঃপর বললেন, 'আমি অনেক কিরাত হারিয়ে ফেলেছি।'[৪৫]

- এই তো আল্লাহর তরবারি খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ বিছানায় মৃত্যুবরণ করার কারণে আফসোস করে বলেন, 'আমি এই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার দেহের এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে বর্শা বা তরবারির আঘাত কিংবা তিরের ক্ষত নেই। আর এখন আমি বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করছি! এ মৃত্যু তো সামান্য উটের মৃত্যু! এ মৃত্যু যে কাপুরুষের মৃত্যু!'

- আবু মিহজান আস-সাকাফি ﷺ-এর মদপানের বদ-অভ্যাস ছিল। এ নিয়ে তার খুব দুর্নামও ছিল। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ তাকে এই অপরাধে বন্দী

....

৪৪. আমালুল ইওয়াম ওয়াল লাইলাহ লি ইবনিস সুন্নি : ১/৬

৪৫. সহিহুল বুখারি : ৪৭, সহিহু মুসলিম : ৯৪৫। উল্লেখ্য, এখানে মূল বইতে উল্লেখিত ইবারত অনুযায়ী অনুবাদ করা হয়েছে।

করে রাখলেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধের দিনের কথা। মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের কার্যকলাপের খবর তার কানে পৌঁছালে তিনি বললেন :

كَفَى حَزَنًا أَنْ تُطْعَنَ الخَيْلُ بِالقَنَا *** وأُتْرَكَ مَشْدُوْدًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا

إِذَا قُمْتُ عَنَّانِيْ الحَدِيدُ وغُلِّقَتْ *** مَغَالِيقُ مِنْ دُوْنِيْ تُصِمُّ الْمُنَادِيَا

وَقَدْ كُنْتُ ذَا أَهْلٍ كَثِيْرٍ وإِخْوَةٍ *** فَقَدْ تَرَكُوْنِيْ وَاحِدًا لَا أَخَا لِيَا

هَلُمَّ سِلَاحِيْ، لَا أَبَا لَكَ، إِنَّنِيْ *** أَرَى الحَرْبَ لَا تَزْدَادُ إِلَّا تَمَادِيَا

'মনোবেদনায় জর্জরিত হওয়ার জন্য আর কী লাগে, যখন লড়াই তুমুল হয়ে উঠেছে আর অসহায় আমি পড়ে আছি শিকলে বন্দী হয়ে! দাঁড়াতে গেলেই লোহার কঠিন শৃঙ্খল আমায় টেনে ধরে। দরোজার বন্ধ কপাটে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে আমার মুক্তির আকুতি। আমার ঘর ভরা ছিল পরিবার-পরিজনে আর ছিল অগণিত ভাই-বন্ধু। তারা সবাই আমাকে একা ছেড়ে গেল—আজ আমার কেউ নেই। কেউ আছ?—আমার যুদ্ধাস্ত্রগুলো এনে দেবে? আল্লাহ তোমায় রহম করবেন। লড়াই দেখি, ক্রমশ দীর্ঘ ও তীব্রতর হয়ে উঠছে!'

নিকটে ছিলেন সাদ ﷺ-এর এক দাসী। সে সাদ ﷺ-এর সন্তানের মা হতে চলেছিলেন। ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ। তিনি বললেন, 'তুমি কি আমাকে এ ওয়াদা দিতে পারো যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলে পুনরায় তুমি আমার কাছে চলে আসবে, যাতে তোমাকে আবার বন্দী করে রাখতে পারি?' আবু মিহজান বললেন, 'হ্যাঁ'। তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তিনি সাদ ﷺ-এর সাদা-কালো ডোরাকাটা একটি ঘোড়ায় চেপে বসলেন। মুশরিকদের ওপর প্রবল আঘাত হানলেন। সাদ ﷺ বলেন, 'যদি আবু মিহজান বন্দী না হতো, তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারতাম, এ লোক আবু মিহজান এবং ঘোড়াটি আমার।' মুশরিকরা পরাজিত হলো। আবু মিহজান ফিরে এলেন। মহিলা তাকে শিকলাবদ্ধ করে দিয়ে সাদ ﷺ-এর কাছে এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। এরপর সাদ আবু মিহজানের নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আমি কখনো এ ব্যাপারে তোমাকে বন্দী করব না।' তখন আবু মিহজান বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমিও এরপর আর কোনো দিন মদপান করব না।'

- আবু কাতাদা বলেন, 'যখন আমির বিন কাইস ﷺ-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে বলা হলো, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি মৃত্যুর ভয়ে বা দুনিয়ার মোহে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এই জন্য যে, আমার মৃত্যু এসে গেল। দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণার্ত অবস্থার সাওম ভাগ্যে জুটবে না আর। শীতের রাতের ঠান্ডার প্রকোপের মাঝে সালাত আদায়ের সৌভাগ্য হবে না আর।"'

- শুবাহ ﷺ-এর কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করা হলো, যা তিনি আগে শোনেননি। তখন তিনি দুঃখভরা কণ্ঠে বললেন, 'হায়, আফসোস!' তিনি বলতেন, 'আমার কাছে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছিল, কিন্তু হাদিসটি ছুটে যায়। ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

كَمْ فُرْصَةٍ ذَهَبَتْ فَعَادَتْ غُصَّةً *** تَشْجَى بِطُوْلِ تَلَهُّفٍ وَتَنَدُّمِ

'হাতছাড়া হয়েছে কত সুবর্ণ সুযোগ আর ফিরে এসেছে বিরাট দুর্যোগ হয়ে। কষ্ট ও লজ্জায় ব্যথিত করেছে দীর্ঘ সময় ধরে।'

কাসিম বিন সালাম বলেন, 'হাম্মাদ বিন জাইদ ﷺ-এর কাছে কিছু হাদিস শোনার আশায় আমি বসরায় গেলাম। কিন্তু গিয়ে শুনি, তিনি ইনতিকাল করেছেন। তখন আমি ইবনে মাহদির কাছে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বললাম। তিনি বললেন, "এদিক থেকে তিনি তোমার আগে চলে গেলেও তাকওয়াতে তুমি তাঁকে হারিয়ে দাও।"'

মুআজ বিন জাবাল ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন মালিক বিন ইউখামির সাকসাকি। তিনি ছিলেন মুআজ ﷺ-এর প্রতিচ্ছবি। যেন তাঁর রুহ ও হৃদয়ের অবিকল প্রতিলিপি। যেন তাঁর আকল ও ইমানেরই চিত্র। যখন মুআজ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তাঁর এ ছাত্র কাঁদতে লাগলেন। মুআজ ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি আপনার থেকে দুনিয়ার যা পাই, তার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি, সে ইলম ও ইমানের জন্য, যা আমি আপনার মাধ্যমে অর্জন করতাম। এখন তো আপনি চলে যাচ্ছেন, আমার কী হবে?' তখন মুআজ ﷺ বললেন, 'ইলম ও ইমান যথাস্থানে থাকবে। যে অন্বেষণ করবে, সে পাবে।'

- আবু বকর আস-সামআনি ও আস-সিলাফি হজে গিয়ে আবু মাকতুম ইসা বিন আবু জার ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়ে বেশ সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁরা একটু অমনোযোগী হতেই আবু মাকতুম দ্রুত সামনের লোকদের ভিড়ে ঢুকে পড়লেন। এবং পরে নিজ বাসস্থান বনু শাবাবার আবাসে চলে গেলেন। এদিকে তাঁরা দুজন আবু মাকতুমকে হন্যে হয়ে খুঁজেও পেলেন না। আবু বকর আস-সামআনি বেশ দুঃখবোধ করলেন। তখন আস-সিলাফি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তাঁর কাছে তো শুধু সহিহ বুখারিই ছিল। আর সনদের দিক থেকেও আপনি তাঁর বরাবর।'

- শাইখ জামালুদ্দিন বিন কিফতি ﷺ-এর ঘটনা। তিনি সামআনি ﷺ-এর 'আল-আনসাব' কিতাবের একটি কপি সংগ্রহ করলেন। এ কপিটি লেখকের নিজ হাতে লেখা। কিন্তু এতে সামান্য কিছু পৃষ্ঠা ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শাইখ জামালুদ্দিন অবশিষ্ট অংশটা পেলেন। কিন্তু সে পৃষ্ঠাগুলো একটা টুপির মধ্যে সেলাই করা ছিল। পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই সেগুলো পেয়েও না পাওয়ার মতোই রয়ে গেল। এ দেখে শাইখ জামালুদ্দিন বেশ দুঃখ প্রকাশ করলেন। এমনকি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে কয়েক দিন পর্যন্ত আমিরের সভায় আসতে পারেননি। তাই সভাসদদের অনেক বিশেষ ব্যক্তি তাকে দেখতে এলেন। তার দুঃখে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এ দুঃখ এমন ছিল, যেন শাইখ জামালুদ্দিনের কোনো নিকটাত্মীয় মারা গেছেন, আর তার বন্ধুবান্ধবরা এসে তাকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন।

একাকিত্বে ঘাবড়ে যেও না; মহান লক্ষ্যের পথযাত্রী কমই হয়

উচ্চাভিলাষী সাধারণত শ্রেষ্ঠ বিষয়েরই প্রত্যাশা করে। সামান্য স্বাদ বা প্রাচুর্য, গর্ব বা সৃষ্টির মাঝে বড়ত্বের পেছনে পড়ে না সে। বরং তার কামনা হলো বান্দাদের কল্যাণ সাধন। সে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। এমন মহৎপ্রাণ কখনো সঙ্গী-স্বল্পতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা, মহৎ লক্ষ্যের পথযাত্রী কমই হয়। এ পথের সহযোগীও বেশি নয়।

أُهُمُّ بِشَيْءٍ وَاللَّيَالِيْ كَأَنَّها *** تُطَارِدُنِيْ عَنْ كَوْنِهَا وَأُطَارِدُ

فَرِيْدٌ عَنِ الْخُلَّانِ فِيْ كُلِّ بَلْدَةٍ * إِذَا عَظُمَ الْمَطْلُوْبُ قَلَّ الْمُسَاعِدُ

'এক বড় লক্ষ্য অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি আমি আর প্রতিকূল সময় চায় আমাকে ব্যর্থ করে দিতে। সময় চায় আমাকে হারাতে আর আমি সময়কে। প্রতিটি নগরে আমি বন্ধুহীন একা সংগ্রাম করে যাই। লক্ষ্য যখন বড় হয়, সহযোগী কদাচিৎ মেলে।'

ইবনে জাদআন বলেন, 'উমর ﵁ জনৈক লোককে বলতে শুনলেন, "হে আল্লাহ, আমাকে অল্পসংখ্যকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর বান্দা, অল্পসংখ্যক কারা?" লোকটি বলল, "আমি আল্লাহর কালামে শুনেছি—

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ -"তাঁর সাথে খুব কম লোকই ইমান এনেছে।"[৪৬]

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ -"আর আমার বান্দাদের খুব কমই কৃতজ্ঞ।"[৪৭]

সে আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করল, তখন উমর ﵁ বললেন, "প্রত্যেকেই উমর থেকে বেশি জ্ঞানী।"'

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﵀ বলেন, 'সত্য পথের পথিক হও। সত্য পথের পথিক কম হয় বলে তুমি একাকিত্ব অনুভব কোরো না।'

....

৪৬. সুরা হুদ : ৪০

৪৭. সুরা সাবা : ১৩

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'হিদায়াতের পথ আঁকড়ে ধরো। স্বল্প অভিযাত্রী দেখে হীনবল হোয়ো না। আর গোমরাহির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। গোমরাহদের দল ভারী দেখে প্রবঞ্চিত হোয়ো না।'

সুলাইমান আদ-দারানি ﷺ বলেন, 'যদি সকল মানুষ সত্য নিয়ে সন্দেহ করে, তবুও আমি একাকী হয়েও সত্যের ব্যাপারে সন্দিহান হব না।'

জনৈক সালাফ বলেন, 'লক্ষ্য অর্জনের পথে তোমার একাকিত্ব তোমার প্রতিজ্ঞার সত্যতা প্রমাণ করে।'

উচ্চ মনোবলের অধিকারী পূর্ণতার এমন স্তর অর্জন করে যে, সে স্বল্প অভিযাত্রী ও পথের একাকিত্বের প্রতি কোনো পরোয়া করে না। কেননা, সে প্রতিটি স্তরেই আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করে, যা তার একাকিত্ব দূর করে দেয়। অন্যথায় সে পথহারা হয়ে যেত।

ইমানি শক্তির প্রথম ফল, যা একজন মুমিন উপলব্ধি করতে পারে, তা হচ্ছে, ইসলামের একটি বাস্তবিক শক্তি রয়েছে। সত্য ও ইসলাম একে অপরের সমর্থক। এটি একজন মুসলিমের জন্য যথেষ্ট। একজন মুসলিম বাস্তবেই যদি সত্যের পক্ষে থাকেন, তবে একা হয়েও সে মুসলিম সত্যের ওপর থাকেন। ইসলামের এ বাস্তবিকতার মাধ্যমে অজ্ঞতাপূর্ণ ভ্রান্ত মতবাদসমূহকে সহজেই চেনা যায়। জাহিলি এসব মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে, আধিক্য ও প্রচুর জনসংখ্যার ওপর। যা সাধারণ মানুষদের মানসিকভাবে বন্দী করে। ফলে নির্বোধরা প্রবঞ্চিত হয়। ভ্রান্তির ভেড়াজালে আবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু নিজে যে এক বিরাট ভ্রান্তিতে নিপতিত, তা উপলব্ধি করতে পারে না।

উম্মাতে ইসলামিয়্যার মাঝে এমন একক ব্যক্তির অনেক দৃষ্টান্তই গত হয়েছে, যারা একাই উম্মাহ ছিলেন। উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'নিশ্চয় ইবরাহিম ছিল আল্লাহর অনুগত একনিষ্ঠ এক উম্মত। আর সে মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত ছিল না।'[৪৮]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ তিনি (ইবরাহিম ﷺ) একাই মুমিন ছিলেন, আর বাকি সকল মানুষ ছিল কাফির।'[৪৯] সহিহ বুখারিতে এসেছে, ইবরাহিম ﷺ নিজ স্ত্রী সারাকে বললেন :

يَا سَارَةُ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ

'সারা, তুমি আর আমি ছাড়া ভূপৃষ্ঠে আর কোনো মুমিন নেই।'[৫০]

মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনীতেও রয়েছে একাকিত্বের দৃষ্টান্ত। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا وَارَى إِبْطُ بِلَالٍ

'আমি আল্লাহর জন্য যে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি, তার মুখোমুখি অন্য কেউ হয়নি। আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য যে ভয়ের শিকার আমি হয়েছি, অন্য কেউ তার শিকার হয়নি। আমার ও বিলালের ওপর দিয়ে তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলতলে দাবিয়ে রাখা সামান্য খাবার ব্যতীত এমন কোনো খাবার ছিল না, যা কোনো প্রাণী খেতে পারে।'[৫১]

এ কারণেই মুমিনগণ একাকিত্ব উপলব্ধি করে না। কেননা, তা প্রকৃত ইমানের দৃষ্টান্ত। প্রকৃত বাস্তবতা মুমিনের উপলব্ধিতে বিরাজমান। সে উপলব্ধি করে যে, ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত লোকেরাই মূলত একাকী ও অপদস্থ। জনৈক ব্যক্তি আব্দুল

....

৪৮. সুরা আন-নাহল : ১২০

৪৯. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৪৩৬

৫০. সহিহুল বুখারি : ৩৩৫৮

৫১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫১। হাদিসের মান : সহিহ।

ওয়াহহাব আজ্জাম ﵀-এর ব্যাপারে যখন বলল যে, তিনি একলা-নিঃসঙ্গ—তখন সাথে সাথে তিনি জবাব দিলেন :

قَالَ لِيْ صَاحِبٌ: أَرَاكَ غَرِيْبًا *** بَيْنَ هَذَا الْأَنَامِ دُوْنَ خَلِيْلِ

قُلْتُ: كَلَّا، بَلِ الْأَنَامُ غَرِيْبٌ *** أَنَا فِيْ عَالَمِيْ، وَهَذِيْ سَبِيْلِيْ

'এক বন্ধু আমাকে বলে, তুমি দেখি পৃথিবীতে বড়ই একা—বন্ধুহীন জীবন তোমার। আমি বলি, কক্ষনো না! বরং তোমরাই নিঃসঙ্গ। আমি আছি আমার জগতে—এই আমার চলার পথ।'[৫২]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন :

'উচ্চ মনোবলের অধিকারী পথভ্রষ্টদের বিরোধিতার কোনো পরোয়া করে না। কেননা, এসব পথহারা লোকগুলোই প্রকৃত অর্থে পরিমাণে স্বল্প; যদিও সংখ্যায় বেশি তারা। যেমনটি জনৈক সালাফ বলেছেন, "তুমি সত্যের পথ আঁকড়ে ধরো। সৎ পথের অভিযাত্রী স্বল্প হওয়ায় একাকিত্ব অনুভব কোরো না।" যখনই তুমি একাকিত্ব অনুভব করতে শুরু করো, তখন অগ্রবর্তী অভিযাত্রীদের দৃষ্টান্তের প্রতি খেয়াল করো। তাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রতি উৎসুক হও। পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নাও। কারণ, তারা আল্লাহর সামনে তোমার কোনো উপকারে আসবে না। তোমার চলার পথে তারা শত হইচই করলেও ফিরে তাকিয়ো না। কেননা, তুমি তাদের দিকে তাকালেই তারা তোমাকে ধরে ফেলবে; তোমার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'[৫৩]

পথহারাদের চেঁচামেচির দিকে যে তাকায়, সে হরিণের মতো। কুকুরের তাড়ায় হরিণ জানপ্রাণ দিয়ে দৌড়ে পালায় দ্রুতগতিতে। কুকুরও তার পেছনে থাকে।

....

৫২. আল-মুনতালিক : ২৩৬। এ গ্রন্থের লেখক মহৎপ্রাণ উসতাজ মুহাম্মাদ আহমাদ রশিদ বলেন, 'হাদিস শরিফে গুরাবাদের যে একাকিত্বের কথা এসেছে—সেখানে বলা হয়েছে, "সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য।" এখানে গুরবত/একাকিত্ব পরিস্থিতি হিসেবে। অর্থাৎ তারা খড়কুটার মতো শত শত হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে অল্প কয়েকজন মহামূল্যবান ও বিরল মানুষ। অন্যথায় আধ্যাত্মিকতার জগতে, অনুভূতির জগতে তারা একা নন। কেননা, মুমিন তার ইমানের সঙ্গলাভ করে, ইমানকে সাথি করে চলে। ফলে তার একাকিত্ব ঘুচে যায়।'

৫৩. মাদারিজুস সালিকিন : ১/২১

কুকুর সামান্য কাছে চলে আসলে হরিণ তখন বোকামি করে বসে। হরিণ পেছনে তাকায়, আর তখনই তার গতিবেগ মন্থর হয়ে পড়ে। ফলে কুকুর তাকে সহজে পাকড়াও করে ফেলে।'[৫৪]

এ কথা বোঝাতেই উসতাজ সাইয়িদ কুতুব ﷺ বলেন :

أَخِيْ فَامْضِ لَا تَلْتَفِتْ لِلْوَرَاءْ *** طَرِيْقُكَ قَدْ خَضَّبَتْهُ الدِّمَاءُ

وَلَا تَلْتَفِتْ هَاهُنَا أَوْ هُنَاكَ *** وَلَا تَتَطَلَّعْ لِغَيْرِ السَّمَاءِ

'আলোর পথের পথিক, হে আমার ভাই, নির্ভয়ে এগিয়ে চলো। পেছনে তাকিয়ো না। শহিদের রক্তে রঞ্জিত তোমার এই পথ। এদিক-ওদিক উঁকি দেওয়ার প্রয়োজন নেই তোমার। আসমান ছাড়া অন্য কোথাও যেন নিবদ্ধ না হয় তোমার দৃষ্টি।'

হীনবল লোকদের দুরবস্থা

মানুষের অপর নাম 'হাইওয়ানে নাতিক'। যার অর্থ বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। সে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের গুণের ধারক-বাহক। তার প্রকৃতিতে রয়েছে উত্তম চরিত্র ও নীচু স্বভাব উভয় ধরনের গুণের সন্নিবেশ।

فَيَحِنُّ ذَاكَ لِأَرْضِهِ بِتَسَفُّلٍ *** وَيَحِنُّ ذَا لِسَمَائِهِ بِتَصَعُّدٍ

'কারও আকাঙ্ক্ষা লেপ্টে থাকে জমিনের নিচুতায় আবার কারও প্রত্যাশা ছুঁয়ে যায় আকাশের উচ্চতা।'

আহমাদ বিন খিজরাবিয়্যাহ বলেন, 'মানুষের হৃদয় ভবঘুরে। হয়তো সেগুলো আরশের পাশে ঘোরাঘুরি করে, না হয় টয়লেটের পাশে।'

জনৈক সালাফ বলেন, 'হিম্মতের অধঃপতন মানুষকে মানববর্জ্য পরিষ্কারের গর্তে নামিয়ে দেয়।'

....

৫৪. প্রাগুক্ত

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'পাখি যেমন খাঁচায় বন্দী থাকে, তেমনই মানুষের আত্মাও মানুষের দেহে বন্দী। পাখিদের মধ্যে সব পাখি চিঠিবহনের মহৎ কাজে আসে না। কিছু পাখি স্রেফ বাসায় খায় আর জন্মপ্রক্রিয়া সারে। তেমনই কিছু মানুষও স্রেফ খাওয়া-দাওয়া নিয়েই পড়ে থাকে। তাদের মাধ্যমে উন্নত কিছু অর্জিত হয় না।'

'আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের জন্য কিছু মানুষ তৈরি করেছেন,

পরিচয়ে যাদের বলা হয় বীর।

আবার খাবার ঠেসে ঠেসে খাওয়ার জন্য কিছু মানুষ তৈরি করেছেন,

যাদের আমরা পেটুক বলে জানি।'

যদি মানুষ আকাশের উচ্চতায় আরোহণ করতে না চায়, যদি সে ইল্লিয়্যিনে ওঠার কামনা না করে; বরং অন্ধকারকে ভালোবাসে, আলোকে ঘৃণা করে, নিজেকে কুপ্রবৃত্তির মাঝে ছেড়ে দেয়, মত্ত থাকে কামনা-বাসনা নিয়ে, গাধার মতো চলে, সস্তা বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, শয়তানের কুমন্ত্রণার পথ ধরে, জমিনকে আঁকড়ে ধরে—তবে সে সিজ্জিনে পতিত হয়। এমন ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে নেমে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

> وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

> 'আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে দেখে না; তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে শোনে না—তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। তারা একেবারে বেখবর।'[৫৫]

....

৫৫. সুরা আল-আরাফ : ১৭৯

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

'আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।'[৫৬]

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোই যাদের একমাত্র চিন্তা।

كَالْعَيْرِ لَيْسَ لَهُ بِشَيْءٍ هِمَّةٌ *** إِلَّا اقْتِضَامَ الْقَضْبِ حَوْلَ الْمِذْوَدِ

'যেমন হীনবল গাধা। সুস্বাদু কিছু যার জোটে না। জোটে কেবল পশুর আহারের পর গামলার চারপাশে পড়ে থাকা আধ-খাওয়া লতাপাতা।'

যেমন চতুষ্পদ জন্তু সবকিছু ভুলে খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জবাইয়ের ব্যাপারে একেবারেই বেখবর থাকে। অনুরূপ এসব পথভ্রষ্টরাও আগামী দিন (আখিরাতে) কী হবে, সে ব্যাপারে বেখবর।

এরা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ, প্রাণীগুলো নিজেদের লাভক্ষতি উপলব্ধি করতে পারে। নিজেদের মনিবের আনুগত্য করে। কিন্তু পথভ্রষ্টদের মাঝে এ গুণটাও যে নেই। আতা ﵀ বলেন, 'চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহকে চেনে, কিন্তু কাফির আল্লাহকে চেনে না।'

সাদ বিন মুআজ ﵁ মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন :

'আমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি, যারা তাদের চতুষ্পদ জন্তুরই অনুরূপ। তারা পেট ও পিঠের চিন্তা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। এদের চেয়েও আশ্চর্য সম্প্রদায় হলো তারা, যাদের মাঝে আহার ছাড়াও উচ্চ কোনো বিষয়ের জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদার দিক থেকে তারা এদেরই মতো।'

وَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ *** وَفَرْجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعَا

....

৫৬. সুরা মুহাম্মাদ : ১২

'উদরের প্রতিটি দাবিই যদি পূরণ করো আর জৈবিক তাড়নার প্রতিটি ডাকেই যদি সাড়া দাও, তবে এই দুটি মিলে তোমাকে বদনামের চূড়ান্তে পৌঁছে দেবে।'

উমর বিন খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'অতিভোজন থেকে বিরত থাকো। অতিভোজনে দেহের ক্ষতি। অতিভোজন রোগের জন্ম দেয়। সালাতে অলসতা ঢুকিয়ে দেয়।'

মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া ﷺ বলেন, 'যার নফস তার ওপর মহানুভবতা দেখায়, তার জন্য দুনিয়ার সব সহজ হয়ে যায়।' মুহাম্মাদ বিন ওয়াসিকে বলা হলো, 'আপনি হীনতায় সন্তুষ্ট হচ্ছেন!' তিনি বললেন, 'হীনতায় সন্তুষ্ট হয় সে, যে দুনিয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট।'

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهَا *** تَنَحَّ عَنْ خِطْبَتِهَا تَسْلَمِ

إِنَّ الَّتِيْ تَخْطُــبُ غَرَّارَةٌ *** قَرِيْبَةُ الْعُرْسِ مِنَ الْمَــأْتَمِ

'হে দুনিয়ালোভী, পার্থিব জগতের এই মোহ ছুড়ে ফেলো। তবেই তুমি কামিয়াব হতে পারবে। প্রতারক এই দুনিয়াকে যে ভালোবেসেছে, অচিরেই দুনিয়া তাকে ছুড়ে ফেলবে।'

নিম্ন মানসিকতার লোক তারাই, যাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন :

وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا

'পাঁচ শ্রেণির লোক জাহান্নামি। এক. এমন দুর্বল লোক, যাদের মধ্যে পার্থক্য-ক্ষমতা নেই—যারা তোমাদের এমনরূপে অনুসরণ করে, না তারা পরিবার চায়, আর না চায় ধনসম্পদ।...'[৫৭]

এমন লোক চামচা হয়েই তুষ্ট। কারও ভৃত্য হতে পেরেই সে বেজায় খুশি। তুষ্ট সে কারও পিছু পিছু ঘুরে। তুষ্ট নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পালাতে

৫৭. সহিহ মুসলিম : ২৮৬৫

পেরে। এমন লোকের মাঝে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। থাকে না বড় কিছু করার মুরোদ।

এদের ব্যাপারেই কবি বলেন :

شَبَابٌ قُنَّعٌ لَا خَيْرَ فِيْهِمْ *** وَبُورِكَ فِيْ الشَّبَابِ الطَّامِحِيْنَا

'আত্মতুষ্ট উদ্যমহীন তরুণদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। আর সাফল্যপ্রত্যাশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের মাঝে কল্যাণের সীমা নেই।'

এদেরকেই (হীনবল লোকদের) খড়কুটা বলা হয়েছে হাদিসে। রাসুল ﷺ বলেন :

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

'অচিরেই এমন একটা সময় আসবে, যখন অন্য জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অন্যকে এমনভাবে ডাকবে, যেমন খাবারগ্রহণকারীরা একে অন্যকে খাবারের পাত্রের দিকে ডাকে।' এ কথা শুনে একজন জিজ্ঞেস করল, 'সেদিন আমরা সংখ্যায় কম থাকব বলে এমন হবে?' রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, 'বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো। শত্রুদের অন্তরে তোমাদের যে ভয় বিরাজ করে, আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেবেন।' তখন একজন জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, ওয়াহান কী?' রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, 'দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'[৫৮]

৫৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৭; হাদিসের মান : সহিহ।

এমন হীনবল ও খুড়কুটো সমান অপদার্থদের ব্যাপারেই কবি বলেন :

وَأَفْتَحُ عَيْنِيْ حِيْنَ أَفْتَحُهَا *** فَأَرَى كَثِيْرًا ، وَلَكِنْ لَا أَرَى أَحَدًا

'চোখ যখন খুলি অনেককেই তো দেখি, কিন্তু আসল পুরুষ তো একজনও দেখি না।'

এরা হলো আবর্জনার মতো। যারা মরলেও কিছু আসে যায় না। বেঁচে থাকলেও কোনো মূল্য নেই। এদের ব্যাপারেই ইবনুল জাওজি ﷀ বলেন :

'এরা জানে না, কেন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। জানে না, তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী। তাদের মনোবলের শেষ স্তর হলো, নানান চাহিদা পূরণ। নিজেদের কাম্য জিনিসগুলো কী লাঞ্ছনা টেনে আনে, সে ব্যাপারে জানতেও চায় না তারা। তাই উদ্দেশ্যহীনভাবেই তারা নিজেদের সম্মান বিকিয়ে দেয় এবং সাময়িক মজাকে প্রাধান্য দেয়; যদিও তাদের তুচ্ছ কামনা-বাসনা পূরণ করার কারণে যুগের সকল ব্যাধি টেনে আনে তারা। ব্যবসার সময় তারা ধোঁকা ও প্রতারণার পোশাক পরিধান করে। আর লেনদেনের সময় নিজেদের আচ্ছাদৃত করে অবস্থা গোপন রেখে। তাদের উপার্জন সন্দেহপূর্ণ। তাদের আহার আসলে প্রবৃত্তির ভোজন। তাদের রাত কাটে ঘুমে ঘুমে। যদিও এক হিসেবে দিনেও তারা ঘুমন্তই থাকে। দিনে তারা জেগেও ঘুমায়, আর এটাই প্রকৃত ক্ষতির ঘুম। রাতের ঘুম তো আসল ঘুম নয়। যাহোক, রাত শেষে যখন দিন আসে, তখন তারা শূকরের মতো লোভ, কুকুরের মতো চাটুকারিতা, সিংহের মতো হিংস্রতা, চিতার মতো ধূর্ততা, শিয়ালের মতো প্রতারণা সাথে নিয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পেছনে লেগে যায় জোরেশোরে। মৃত্যুর সময়ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে পারেনি বলে তারা আফসোস করে। অন্তরে তাকওয়ার শূন্যতার কারণে তাদের আফসোস হয় না তখনও। তাদের জ্ঞানে দুনিয়া, শাহওয়াত ও কামনাই সব। প্রবৃত্তিই তাদের কাছে সর্বসেবা।'

কেউ মহান কিছু হওয়ার ইচ্ছা করলে শয়তান তার হৃদয়ে মোহর সেঁটে দেয় যে, 'সামনে বিরাট লম্বা রাত। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।' যখনই সে হোঁচট খাওয়ার পর ওঠার চেষ্টা করে, দৃঢ় মনোবলের সাথে এগিয়ে আসতে চায়— তখন দীর্ঘসূত্রতার চেলাফেলা সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়; তার মনে

ওয়াসওয়াসার বুদবুদ ওঠে—এই করব আরকি, করার এখনো সময় আছে অনেক। এমন দীর্ঘসূত্রতায় ভুগতে থাকে সে। গড়িমসি করে। তার নফসে আম্মারাহ তাকে ডেকে বলে, 'তুমি বড় নাকি বাস্তবতা। বাস্তবতা তো তোমার সামনে কিছুই নয়!'

নফসের এ কথাটি কবি চিত্রায়িত করেন এভাবে—

لَا تَطْلُبِ الْمَجْدَ وَاقْنَعْ *** إِنَّ الْمَجْدَ سُلَّمُهُ صَعْبُ

> 'মর্যাদাবান হতে চেয়ো না। আপন অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকো। মর্যাদার চূড়া সে তো অনেক উঁচুতে, কষ্টের সিঁড়ি ভেঙে এত ওপরে ওঠা বেশ কঠিনই বটে।'

এভাবে বেচারা মানুষটি প্রবৃত্তির নিপীড়নে দুর্বল হয়ে বসে পড়ে। নিজের অবনতি থেকে বেরিয়ে আসার সাহস করে না।[৫৯] উল্টো তার হিম্মতের বাঁধন ছিঁড়ে যায়।

যদি তার পবিত্র আত্মা তাকে উন্নত লক্ষ্য, উচ্চ মনোবল, বিপদাপদ সহ্য করার প্রতি—ধীরতা, দুর্বলতা ও অলসতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার দিকে উৎসাহিত করে, তবে সে এ কথা বলে নিজেকে দমিয়ে দেয় যে—

....

৫৯. হীনবলের ব্যাপারে চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন এক আলিম—
'ধরো, এক কুকুর সিংহের কাছে এল। বলল, 'বনের রাজা, আপনার কাছে আমার আবদার আমার নামটি বদলে দিন। বড় কুৎসিত আমার নাম, কুকুর।'
সিংহ : তুমি বিশ্বাসঘাতক। এ নামই তোমার উপযুক্ত।
কুকুর : তাহলে আমার থেকে পরীক্ষা নিয়ে দেখুন।
সিংহ তাকে এক টুকরো গোশত দিল। বলল, 'আগামীকাল পর্যন্ত এটার হিফাজত করতে পারলে তোমার নাম বদলে দেবো।'
কুকুর গোশতের টুকরোর কাছে বসে পড়ল। একসময় তার খিদে পেল। আড়চোখে সে গোশতের টুকরোর দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু নিজেকে বারণ করে সবর করল। কিন্তু যখনই তার নফস তাকে হারিয়ে দিল, তখন কুকুর মনে মনে বলে উঠল, 'আমার নামে সমস্যা কী?! সুন্দর একটা নাম—কুকুর।' এরপর সে গোশতের টুকরোটা সাবাড় করে নিল।
এ ঘটনার টীকায় ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'হীনবল লোকদের অবস্থা এমনই হয়। তারা হীনতা ও নীচতায় থেকেই তুষ্ট। সম্মান ও মর্যাদা একটু দেরিতে আসে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে নগদ সন্তুষ্ট করা গেলে একটু দেরিতে যে সম্মান আসে তার কী দরকার! এমনই মনোভাব তাদের। তারা নগদে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাকেই প্রাধান্য দেয়।...সুতরাং প্রবৃত্তি দমনে আল্লাহকে স্মরণ করো। কীভাবে কুপ্রবৃত্তির আগুন নেভানো যায়, তা চিন্তা করো।'

ذَرِيْنِيْ تَجِئْنِيْ مِيْتَتِيْ مُطْمَئِنَّةً *** وَلَمْ أَتَقَحَّمْ هَوْلَ تِلْكَ الْمَوَارِدِ

فَإِنَّ كَرِيْمَاتِ الْمَعَالِيْ مَشُوْبَةٌ *** بِمُسْتَوْدَعَاتٍ فِيْ بُطُوْنِ الْأَسَاوِدِ

'আমার মৃত্যুকে ধীরে-সুস্থে আমার কাছে আসতে দাও। ওই সব ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি মরতে চাই না। উন্নত লক্ষ্যের বুলি ছুড়ে তুমি কী হাসিল করতে চাও? এসব যে নোংরা সাপের পেটের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'কারও জন্য এর চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু নেই যে, সে দ্বীনি ফজিলতসমূহ, উপকারী ইলম ও নেক আমলসমূহ থেকে গাফিল থাকে। যে এমন, সে ইতর; সে নিম্নশ্রেণির একজন। যারা পানি ঘোলাটে করে খায়। পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। তারা জীবনযাপন করে অপ্রশংসিত হয়ে। মৃত্যুবরণ করে বিস্মৃত হয়ে। কারও কিছু যায় আসে না তাদের বাঁচা-মরায়। আকাশ তাদের মৃত্যুতে এক ফোঁটা অশ্রুও বর্ষায় না। জমিনের ধূলিকণাও তাদের হারিয়ে যাওয়া অনুভব করে না।'[৬০]

যারা ইলম ও বিচক্ষণতা, হিম্মত ও দৃঢ়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

"আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ওই সব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বোঝে না (বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না)।"[৬১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

৬০. মিফতাহু দারিস সাআদাহ : ১/১৩৪

৬১. সুরা আল-আনফাল : ২২

"আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং আরও পথভ্রান্ত।"[৬২]

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

"আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদের এবং বধিরদেরও না। যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।"[৬৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

"আপনি কবরে শায়িতদের শোনাতে সক্ষম নন।"[৬৪]

এরা হলো সৃষ্টির নিকৃষ্ট শ্রেণি। তাদের দৃষ্টি ক্ষীণ। হৃদয়গুলো রোগাক্রান্ত। তাদের আত্মা কলুষিত। তারা জনপদসমূহকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। বাজারমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সংশ্রবে হীনতা আর অপমানই অর্জিত হয়। তারা মনে করে, তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে জানে। বস্তুত তারা পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখে, কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন। তারা জানে বটে, কিন্তু যা তাদের ক্ষতি করে—তারা তার জ্ঞান রাখে এবং তা-ই করতে থাকে। কিন্তু তাদের উপকারী ইলম শূন্যের কোটায়। তারা কথা বলে কেবল প্রবৃত্তির পক্ষে। তারা যা বলে, তা (অধিকাংশই) মূর্খতাপূর্ণ। তারা বিশ্বাসী, তবে শয়তান ও তাগুতের প্রতি। তারা উপাসনা করে, তবে আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের—যা তাদের কোনো লাভ বা ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম নয়। তারা তর্ক করে, তবে বাতিলের পক্ষ নিয়ে হককে মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এমন সব কথা বলে, যা সন্তোষজনক নয়। তারা আল্লাহকে ছেড়ে ভিন্ন সত্তাকে ডাকে। তারা শাসন ও বিচার করে, তবে জাহিলি বিচার-শাসনই কামনা করে। আর বলে, আমরাই সংশোধনকারী। অথচ এরাই বিশৃঙ্খলাকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারছে না। এ

৬২. সুরা আল-ফুরকান : ৪৪
৬৩. সুরা আন-নামল : ৮০
৬৪. সুরা ফাতির : ২২

ধরনের লোকেরা আকারে ইনসান, প্রকারান্তরে শয়তান। তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে চিন্তা করলে আপনি তাদের দেখবেন, তাদের খোলসটা মানুষের হলেও ভেতর থেকে তারা হয় গাধা, নয় কুকুর, নয়তো ধূর্ত নেকড়ে।

এ বিষয়টিকে কবি বুহতারি নিজ কথায় এভাবে সত্যায়ন করেছেন :

لَمْ يَبْقَ مِنْ جُلِّ هَذَا النَّاسِ بَاقِيَةٌ *** يَنَالُهَا الْوَهْمُ إِلَّا هَذِهِ الصُّوَرُ

'অনেক ফিকির করেও এই লোকগুলোর মধ্যে হিম্মত ও সাহসের কিছুই পাওয়া যায় না—এদের আছে কেবল বাহ্যিক অবয়ব। (আকলহীন এই লোকগুলোর সংখ্যাধিক্যে ভাবিত হওয়ার কিছু নেই। যুদ্ধে এরা একেবারেই আনাড়ি)।

অন্য একজন বলেন :

لَا تَخْدَعَنَّكَ اللِّحَاءُ وَالصُّوَرُ *** تِسْعَةُ أَعْشَارِ مَنْ تَرَى بَقَرُ

فِيْ شَجَرِ السِّــدْرِ مِنْهُمْ مَــثَلٌ *** لَهَا رُوَاءٌ وَمَا لَهَـا ثَــمَرُ

'বাইরের খোসা আর অবয়ব যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। ওদের দশ জনের নয় জনই গরু হয়ে থাকে। তাদের মিল খুঁজে পাবে তুমি কাঁটাদার গাছের সাথে। সৌন্দর্য ও কমনীয়তা তো আছে কিন্তু কোনো ফল দেয় না কিছুতেই।'

এসব উপমার চেয়ে আল্লাহ তাআলার বাণীতে (তাদের অবস্থা) ফুটে উঠেছে আরও সুন্দরভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

'আপনি যখন তাদের দেখেন, তখন তাদের দেহ-অবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শোনেন। তারা দেয়ালে ঠেস দেওয়া কাঠের মতো '[৬৫]

....

৬৫. সুরা আল-মুনাফিকুন : ৪

কবি বলেন :

زَوَامِلُ لِلْأَسْفَارِ لَا عِلْـمَ عِنْدَهُمْ *** بِجَيِّدِهَا إِلَّا كَعِلْمِ الْأَبَـاعِرِ

لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِيْ الْبَعِيْرُ إِذَا غَدَا *** بِأَوْسَاقِهِ أَوْ رَاحَ مَا فِيْ الْغَرَائِرِ

'জীবনসফরে এমন অনেক সঙ্গী তুমি পাবে, যাদের জিন্দেগির ভালো-মন্দের কোনো জ্ঞান নেই। থাকলেও তা উটের জ্ঞানের মতো। উট যেমন সকাল-সন্ধ্যা বোঝা বয়ে বেড়ায়; কিন্তু সে জানে না, তার পিঠের বোঝায় কী আছে।'

এর চেয়েও বেশি সুন্দর সাহিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত কথা হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণী—

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'যাদের তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, এরপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট! আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।'[৬৬]

সবচেয়ে যথার্থ নাম : হারিস ও হাম্মাম

মুমিন ও কাফির সকল মানুষেরই বিশেষ কোনো লক্ষ্য থাকে। যার দিকে সে ছুটে চলে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন স্বভাবের ওপরই সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ সব সময় আপন ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মে সচল থাকে। আর এ কারণেই 'সবচেয়ে যথার্থ নাম হচ্ছে, হারিস ও হাম্মাম।' যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[৬৭] প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনোভাবে হারিস। 'হারিস' মানে উপার্জনকারী। 'হাম্মাম' মানে আকাঙ্ক্ষী। আর এ অর্থেও সকল মানুষ হাম্মাম।

....

৬৬. সুরা আল-জুমুআ : ৫

৬৭. বুখারি ﷺ কৃত আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮১৪। হাদিসের মান : সহিহ।

কোনো বিষয়ের ইচ্ছা, কারও কাছে সাহায্য চাওয়া এবং লক্ষ্য অর্জনে কারও প্রতি নির্ভরশীলতার প্রকৃতি নিয়েই মানুষের সৃষ্টি। তবে কখনো উদ্দিষ্ট সত্তা হয় আল্লাহ। কখনো অন্য কিছু। তবে মানুষ মাত্রই তার একটি লক্ষ্য থাকে। এমন একটি বিষয় থাকে, যার প্রতি সে অভিমুখী হয়ে থাকে।

কারণ, সকল মানুষই অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে। যাতে নিজের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়। তার এ মুখাপেক্ষিতা সব সময়ের জন্য। কখনো সে এ মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয় না।

মানুষের একটি আশ্চর্যজনক স্বভাব হলো, যখন একটি বস্তু কামনার পর পেয়ে যায়, প্রাপ্ত জিনিসের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়—তখন আরেকটা বস্তু কামনা করে বা একই বস্তু আরও বেশি পরিমাণে চায়। আর এ ব্যাপারেই রাসুল ﷺ বলেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى الثَّالِثَ

'যদি আদম-সন্তান দুটি স্বর্ণ-উপত্যকারও অধিকারী হয়, তবে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে।'[৬৮]

মানুষ যা পায়নি বা যার কাছে পৌঁছতে পারেনি, সব সময় তা অর্জনের আশায় থাকে। আর এই প্রয়োজন ও আশা-প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন শুধু তার প্রতিপালক ও মাবুদ মহান আল্লাহ তাআলা। তাই তার জন্য আবশ্যক আপন প্রতিপালককে চেনা এবং তাঁর কাছেই সব আশা ব্যক্ত করা। তবেই প্রশান্তি আসবে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে। অর্জিত হবে হৃদয়ের প্রশান্তি, স্থিরতা ও সুখ-শান্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।'[৬৯]

....

৬৮. মুসনাদু আহমাদ : ২১১১১

৬৯. সুরা আর-রাদ : ২৮

প্রশান্তি অর্জনের একমাত্র পথ হলো এক প্রতিপালকের প্রতি অভিমুখী হওয়া, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা এবং তাঁর পরিচয় আত্মস্থ করা।'[৭০]

'নফস লক্ষ্য অর্জনে উত্তরোত্তর উন্নতি প্রত্যাশা করে। সে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে পূর্ণ বিষয়টি চায় নিজের করে পেতে। আর সকল পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বেই রয়েছে। যখন মানুষ নিজের ইচ্ছা ও হিম্মতকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর অভিমুখী করে, তখন সে অনিবার্যভাবে ব্যর্থতার শিকার হয়। কারণ, তখন তার চিন্তাশক্তিগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যখন বান্দার চিন্তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কিছু হবে, তখন দুনিয়ার পেরেশানি তাকে টুকরো টুকরো করে দেবে। সে বুঝতে পারবে না, কোথায় যাবে? কোন দিকে অভিমুখী হবে? কখনো পূর্বের চিন্তা করবে, কখনো পশ্চিমের; কখনো মূর্তির পূজা করবে, কখনো-বা চন্দ্র-সূর্যের; কখনো এটিকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে, কখনো সেটিকে; কখনো একে সন্তুষ্ট করতে চাইবে, কখনো ওকে। আজ যার জন্য সুন্দর করে কাজ করছে, উদ্দিষ্ট সে ব্যক্তি সন্তুষ্টিও হচ্ছে। কিন্তু একদিন উদ্দিষ্ট সে ব্যক্তি তার এ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়বে। ফলে বিষয়টি বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, আত্মিক উৎকণ্ঠা ও মানসিক অবরুদ্ধতার দিকে ধাবিত হবে। কখনো এগুলোর অবসান ঘটবে আত্মহত্যার মাধ্যমে।

কিন্তু একজন মুসলিমের লক্ষ্য থাকে একটি। লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাকারী বাস্তবায়ন পদ্ধতিও থাকে একটি। সে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহর পথেই চলে। আর এভাবেই তার সকল আকাঙ্ক্ষা এক বিন্দুতে এসে জড়ো হয়। তার মনোবল শক্তিশালী হয়। সে কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারেই রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَشَتَّتَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ

"যার চিন্তারাজ্য জুড়ে হবে আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন, তার বিক্ষিপ্ত কাজ একত্র করে দেবেন। দুনিয়া তার

৭০. মাকাসিদুল মুকাল্লিফিন : ৩৬৫-৩৬৬

নিকট তখন তুচ্ছ-নগণ্য হয়ে যাবে। আর যার চিন্তারাজ্য দুনিয়া অর্জনের লোভে ছেয়ে যাবে, আল্লাহ তার দুচোখের সামনে অভাব-অনটন লাগিয়ে রাখবেন। তার কাজগুলো এলোমেলো ও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করে দেবেন আর দুনিয়াতে সে কেবল তার জন্য নির্ধারিত রিজিকটাই পাবে, এর বেশি নয়।'"[৭১-৭২]

وَمُشَتَّتُ الْعَزَمَاتِ يُنْفِقُ عُمْرَهُ *** حَيْرَانَ لَا ظَفَرٌ وَلَا إِخْفَاقٌ

'বিক্ষিপ্ত চিন্তার অধিকারী লোকেরা জীবন কাটিয়ে দেয় উদ্ভ্রান্তের মতো। তাদের জীবনে না আছে বিজয় আর না আছে ব্যর্থতা।'

আত্মার ঊর্ধ্বগামিতা আর দেহের নিম্নগামিতা

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'মানুষের দেহ মাটি থেকে সৃষ্ট। আর আত্মা সৃষ্ট আসমানি শক্তি থেকে। এ দুটিকে একত্র করা হয়েছে। যখন দেহকে ক্ষুধার্ত ও অনিদ্রায় রাখা হয় এবং কাজকর্মে ব্যাপৃত করা হয়, তখন আত্মা হালকা অনুভব করে, প্রশান্তি লাভ করে। আত্মা তখন আপন নীড়ে ওড়ার শক্তি পেয়ে ঊর্ধ্বজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন দেহ খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত থাকে, ভোগবিলাস আর নিদ্রায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং নিজেকে নিজের খিদমত আর আরামে ব্যস্ত রাখে, তখন দেহ আপন নীড়ে ফিরে যেতে চায়—ঝুঁকে পড়ে নিম্ন ভূমির দিকে। দেহকে যে জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিকেই সে আকর্ষণ অনুভব করে। আত্মাও তখন তার টানে পড়ে যায়, কিন্তু সে এসে কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি সে কারাগারকে পছন্দ না করে, তবে নিজের জন্মস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ছটপট করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে—যেমন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করে।

মোটকথা, যখন দেহ হালকা হয়, আত্মা তখন সূক্ষ্ম ও হালকা হয়ে যায় এবং নিজের জন্মভূমি ঊর্ধ্বজগতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু দেহ যখন ভারী হয়ে

---

৭১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩০৭

৭২. মাকাসিদুল মুকাল্লিফিন : ৩৭১; ঈষৎ পরিমার্জিত।

ওঠে, প্রবৃত্তি ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়ে—তখন আত্মাও ভারী হয়ে যায়; আত্মা তখন নিজের ঊর্ধ্বজগৎ থেকে পড়ে গিয়ে নিম্নজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয়। তুমি কারও রুহকে দেখবে, ঊর্ধ্বজগতের মহান বন্ধুর দিকে ধাবিত, কিন্তু তার দেহ তোমার সামনেই রয়েছে। সে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তার রুহ হলো সিদরাতুল মুনতাহায়, সে আরশের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। কেউ আবার নিজের দেহের সেবায় ব্যস্ত। তার রুহ নিম্ন ভূমিতে নিম্নমানের বস্তুর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। যখনই রুহ দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তা গিয়ে তার ঊর্ধ্বজগতের বন্ধু কিংবা নিম্নজগতের বন্ধুর সাথে মিলিত হয়। ঊর্ধ্ব ভুবনের বন্ধুর নিকট রয়েছে চক্ষু শীতলকারী সকল জিনিস। সব ধরনের আনন্দ ও প্রফুল্লতা, স্বাদ ও আহ্লাদ। রয়েছে পবিত্র জীবন। আর নিম্নজগতের বন্ধুর নিকট রয়েছে দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা ও পেরেশানি, জীবন ও জীবিকার সংকীর্ণতা আর অপবিত্র জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

“যে আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবন হবে সংকীর্ণ।”[৭৩]

এখানে আল্লাহর “জিকির” অর্থ তাঁর কালাম, যা তিনি রাসুল ﷺ-এর ওপর নাজিল করেছেন। “মুখ ফিরিয়ে নেওয়া” মানে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও তার ওপর আমল পরিত্যাগ করা। আর “সংকীর্ণ জীবন” সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসিরে বলা হয়েছে এটি হলো “কবরের আজাব”। এটি ইবনে মাসউদ, আবু হুরাইরা, আবু সাইদ খুদরি ও ইবনে আব্বাস ﵃-এর অভিমত। এ ব্যাপারে মারফু সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসও রয়েছে। الضَنك- এর শাব্দিক অর্থ “সংকীর্ণতা ও কঠোরতা”। যা কিছুই সংকীর্ণতা তৈরি করে তাকেই ضَنك বলে। যেমন বলা হয়ে থাকে—منزل ضنك و عيش ضنك অর্থাৎ “সংকীর্ণ গৃহ বা সংকীর্ণ জীবন।” আয়াতে যে সংকীর্ণ জীবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো দেহ ও মনের প্রশস্ততার বিপরীত প্রবৃত্তির চাহিদা, স্বাদ-আহ্লাদ ও আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করা। তুমি যখন নফসকে প্রশস্ত করবে, তখন হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে তোমার জীবনটাই সংকীর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন নফসের ব্যাপারে সংকীর্ণ হবে, তখন হৃদয় প্রশস্ত হবে; অন্তর প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হবে।

....

৭৩. সুরা তহা : ১২৪

তাকওয়া অবলম্বনে পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তবে এতে বারজাখ ও আখিরাতের জীবনে প্রশস্ততা মিলে। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসে প্রবৃত্তির অনুকরণে, কিন্তু এতে বারজাখ ও আখিরাত-জীবনে সংকীর্ণতা অবধারিত। সুতরাং দুই জীবনের মাঝে সর্বোত্তমটি প্রাধান্য দাও। যে জীবন সর্বোত্তম ও পবিত্র এবং যা চিরস্থায়ী, সেটিকে প্রাধান্য দাও। আত্মার প্রশান্তি অর্জনে দেহকে কষ্ট দাও। দেহের শান্তির জন্য আত্মাকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা, আত্মার সুখ বা দুঃখ হয় বড় ও চিরস্থায়ী। কিন্তু দেহের সুখ ও দুঃখ সংক্ষিপ্ত, ক্ষণস্থায়ী ও হালকা। সাহায্য প্রার্থনার স্থল একমাত্র আল্লাহ।'[৭৪]

উচ্চ মনোবলের অধিকারী উন্নত লক্ষ্য অর্জনেই কেবল সন্তুষ্ট হয়

উচ্চ মনোবলের অধিকারী সামান্য জিনিসে তুষ্ট হয় না কখনো। উন্নত লক্ষ্য অর্জিত হলে তবেই সে সন্তুষ্ট হয়। কবি বলেন :

قُلْتُ لِلصَّقْرِ وَهُــوَ فِيْ الْجَوِّ عَالٍ *** اِهْبِطِ الْأَرْضَ فَالْهَوَاءُ جَدِيْبُ

قَالَ لِيَ الصَّقْرُ: فِيْ جَنَاحِيْ وَعَزْمِيْ *** وَعَنَانِ السَّمَاءِ مَرْعًى خَصِيْبُ

'আসমানের শূন্যতায় বহু উঁচুতে উড়ে চলা বাজপাখিকে আমি বলি, হে বাজ, নেমে এসো জমিনে। শুষ্ক এই হাওয়া যে তোমার প্রতিকূলে! বাজ আমাকে বলে, আমার আছে শক্ত ডানা—আছে দৃঢ় সংকল্প। আকাশের রাজা আমি—মহাশূন্যের উচ্চতাই আমার উর্বর চারণভূমি।'

ভূমিতে বিচরণকারীরা নিঃসন্দেহে এ বিচরণক্ষেত্রের ব্যাপারে অজ্ঞ। কারণ, জমিনের লোকেরা কেবল মাটি আর মাটির লোভনীয় বস্তুই দেখেছে। বিশাল আকাশে মুক্ত মনে বিচরণের স্বাদ কী করে সে জানবে!

إِذَا مَا كُنْتَ فِيْ أَمْرٍ مَرْمُوْمٍ *** فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُوْنَ النُّــجُوْمِ

فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِيْ أَمْرٍ حَقِيْرٍ *** كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِيْ أَمْرٍ عَظِيْمِ

৭৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩৩-১৩৪

'অভীষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনে যদি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো, তবে তারকার উচ্চতায় না পৌঁছে তুমি ক্ষান্ত হয়ো না। কেননা, তুচ্ছ কাজে মরো কিংবা শ্রেষ্ঠ কাজে মরো—উভয় ক্ষেত্রে তো মৃত্যুর স্বাদ একই। (পরিণাম যেহেতু একটিই, কেন তুমি শ্রেষ্ঠ কাজটি বেছে নেবে না?!)

শফি উদ্দিন হিল্লি ﵀ বলেন :

لَا يَظْهَرِ الْعَجْزُ مِنَّا دُوْنَ نَيْلِ مُنَى

وَلَوْ رَأَيْنَا الْمَـنَــايَا فِيْ أَمَـانِــيْنَـا

'অভীষ্ট লক্ষ্য সাধন ব্যতীত আমার পক্ষ থেকে কোনো অক্ষমতা যেন প্রকাশ না পায়; যদিও লক্ষ্য অর্জনের পথে আমাদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়।'

বারুদি বলেন :

فَانْهَضْ إِلَى صَهَوَاتِ الْمَجْدِ مُعْتَلِيًا *** فَالْبَازُ لَمْ يَأْوِ إِلَّا عَالِيَ الْقُلَلِ

وَدَعْ مِنَ الْأَمْرِ أَدْنَاهُ لِأَبْعَدِهِ *** فِيْ لُجَّةِ الْبَحْرِ مَا يُغْنِيْ عَنِ الوشَلِ

قَدْ يَظْفَرُ الْفَاتِكُ الْأَلْوَى بِحَاجَتِهِ *** وَيَقْعُدُ الْعَجْزُ بِالْهَيَّابَةِ الْوَكَلِ

'ওঠো, আরোহণ করো মর্যাদার শিখরে—চূড়ায় নয় একেবারে চূড়ান্তে গিয়েই থামবে। তুমি তো এক বাজ! বাজের স্থান তো জমিনে নয়—পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায়। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের খাতিরে তুচ্ছ কাজগুলো ছেড়ে দাও। সুবিশাল সিন্ধুর মালিক যে হবে, বিন্দু বিন্দু জলে তার কী আসবে-যাবে? দুঃসাহসী অদম্য লোকেরাই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। আর ভীরু বেকারদের অক্ষমতা ঝাপটে ধরে।'

আলি বিন মুহাম্মাদ আল-কাতিব আল-বুসতি বলেন :

إِذَا مَا مَــضَى يَوْمٌ وَلَمْ أَصْــطَنِعْ يَــدًا

وَلَمْ أَقْتَبِسْ عِلْمًا فَمَا هُوَ مِنْ عُمْرِيْ

'কাজকর্মহীন বা ইলম অন্বেষণ ব্যতীত যেদিনটি হারিয়ে যায়, সেই দিনটি তো আমার জীবনের অংশ নয়।'

উচ্চ মনোবলের অধিকারীও মানুষ। তারা ভিন্ন কিছু নয়। তাদের মাঝে ও সাধারণ মানুষের মাঝে এতটুকু ব্যবধান যে, তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্যে নিজেদের দৃঢ় হিম্মতে অসম্ভবকে চ্যালেঞ্জ করে। নিজেদের লক্ষ্যকে অসম্ভব মনে করে না। মনে করে শক্তিশালী যুবকরাও যে কাজে পিছিয়ে গেছে, আল্লাহর সাহায্য ও শক্তিতে সে তাতে সফল হবেই। আল্লাহর ওপর ভরসা করে সে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতেও প্রবৃত্ত হয়। কোনো বিপদকেই সে পরোয়া করে না।

لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا *** وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ

'তার হিম্মতের চূড়া উঠে গেছে ওই আকাশ ফুঁড়ে। ছোট হিম্মতও তার ছাড়িয়ে গেছে সময়কে।'

আর এ কারণেই বলা হয়, 'প্রকৃতপক্ষে উচ্চাভিলাষে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।' সুউচ্চ হিম্মত সর্বদা ক্রমবর্ধমান। সর্বদা তা ওপরের দিকে উঠতে থাকে। হিম্মত জানে না, নিশ্চলতা কী। ছেড়ে দেওয়া বা পিছিয়ে যাওয়া তার অভিধানে নেই।

فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ فِيْ الثَّرَى *** وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِيْ الثُّرَيَّا

'এমন মানুষ হও, যার পা ভূপৃষ্ঠে হলেও তার হিম্মতের চূড়া তারকালোকে।'

বরং তার হিম্মত সুরাইয়া তারকাকেও ছাড়িয়ে যায়। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান অর্জন ব্যতীত সে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর নিকট দুকাইন আসলে তিনি তাকে বলেন :

'হে দুকাইন, আমার প্রবল প্রত্যাশী একটি নফস রয়েছে। সে সব সময় নেতৃত্ব-প্রত্যাশী ছিল। যখন তা পেয়ে গেল, তখন খিলাফতের প্রত্যাশা শুরু করল। এরপর যখন খিলাফত পেয়ে গেল, তখন জান্নাতের প্রত্যাশা শুরু করল।'

ইমাম ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'স্বচ্ছ চিন্তাকে কাজে লাগালে তা সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জনের প্রতি পথ প্রদর্শন করে এবং যেকোনো অবস্থাতেই হীনতায় সন্তুষ্ট হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কবি আবুত তাইব মুতানাব্বি বলেন :

وَلَمْ أَرَ فِيْ عُيُوْبِ النَّاسِ عَيْبًا *** كَنَقْصِ الْقَادِرِيْنَ عَلَى التَّمَامِ

"সম্পূর্ণ কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তির অর্ধসমাপ্ত কাজ ফেলে যাওয়ার মতো মন্দ বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে আমি আর দেখিনি।"

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। যদি আদম-সন্তানের জন্য আকাশে আরোহণ করা সম্ভব হতো, তবে আমি জমিন নিয়ে পড়ে থাকাদের সবচেয়ে হীন মনে করতাম। আর নবুওয়াত যদি চেষ্টা করে অর্জন করা যেত, তবে এতে ত্রুটিকারীকে আমি নিম্ন প্রকৃতির লোক মনে করতাম।

কিন্তু যেহেতু এটি অর্জন সম্ভব নয়—তবে যা সম্ভব, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানীদের নিকট উত্তম আদর্শ হলো, নিজেকে এমন কোনো লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা, যা ইলম ও আমল উভয়ভাবে পূর্ণ করা সম্ভব।

এ ব্যাপারে আমি সামান্য ব্যাখ্যা পেশ করছি :

দৈহিক সৌন্দর্য : মানুষ কিছু করে নিজের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না। এটা তার হাতে নেই। তার হাতে এতটুকু আছে যে, সে তার দেহকে সুন্দর-পরিপাটি রাখতে পারে, সাজতে পারে। তাই সক্ষম হয়েও নিজের দেহের ব্যাপারে অবহেলা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের নিকট অপছন্দনীয়। শরিয়ত-প্রণেতা এ ব্যাপারে আংশিক উল্লেখ করে পুরোটার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তাই তো নখ কাটা, বগলের পশম ও নাভির নিচের পশম কাটার আদেশ করা হয়েছে। দুর্গন্ধের কারণে পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এতটুকু বর্ণনা থেকেই অন্য বিষয়গুলোও এর ওপর অনুমান করা যায়। এ উপসংহারে অনায়াসে আসা যায় যে, পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যই শরিয়তে কাম্য। রাসুল ﷺ-এর আতরের ঘ্রাণের মাধ্যমেই তাঁর আগমন উপলব্ধি করা যেত। তিনি পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রতি ছিলেন পূর্ণ সতর্ক।

আমি কুমন্ত্রণাপ্রবণ লোকদের মতো সীমাতিরিক্ত সাজসজ্জার কথা বলছি না। মধ্যপন্থাই প্রশংসিত...'

ইবনুল জাওজি ﷺ আরও বলেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পরিশ্রম করা উচিত। উন্নত মনোবলের অধিকারীর ওপর অন্য কেউ শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করতে পারে না। তবে এ লক্ষ্য অর্জন যেন জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়; বরং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আসন লক্ষ্য বানিয়ে নিতে হবে।

সবচেয়ে মন্দ একটি স্বভাব হলো, অন্যের অন্ধ অনুসরণ। মনোবল শক্তিশালী হলে নিজের পথ নিজেই বের করে নেওয়া উচিত। নিজেই ইসতিম্বাত করে প্রাপ্ত সমাধানের ওপর আমল করা উচিত। অন্যের মাজহাবের অনুসরণ এমন লোকের জন্য কাম্য নয়। কেননা, অনুসারী হলো অন্ধের ন্যায়। সামনের ব্যক্তিটিই তাকে পরিচালনা করে।

মানুষের উচিত আল্লাহ তাআলাকে চেনা এবং তার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা। মোটকথা, কোনো কল্যাণই হাতছাড়া করা যাবে না। যা অর্জন করা সম্ভব, তা-ই অর্জন করবে। কারণ, এ ব্যাপারে অল্পতুষ্টি নিকৃষ্ট শ্রেণির কাজ।

فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ فِيْ الثَّرَى *** وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِيْ الثُّرَيَّا

'এমন মানুষ হও, যার পা ভূপৃষ্ঠে হলেও তার হিম্মতের চূড়া গিয়ে ঠেকেছে তারকালোকে।'

যদি তোমার পক্ষে সকল আলিম ও সাধককেও অতিক্রম করা সম্ভব হয়, তবে তা-ই করো। কারণ, তারাও মানুষ ছিলেন। আর তুমিও একজন মানুষ।[৭৫] যারা পিছু হটে যায়, তারা শুধু হীনবলতা আর নিম্ন মানসিকতার কারণেই পিছিয়ে যায়।

---

৭৫. বলা হয়ে থাকে, ইলম অন্বেষণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো এ ধারণা যে, 'আগের প্রজন্ম সব হাসিল করে নিয়েছেন, পরের প্রজন্মের জন্য কিছুই রাখেননি!' কেননা, এমন ধারণার কারণে ইলম অর্জনের আশায় ব্যাঘাত ঘটে। ফলে ছাত্ররা ইলম অর্জন থেকে বিরত হয়ে যায়, হীনবল হয়ে পড়ে। মনীষীগণ বলেন, ইলম অর্জনের প্রতি সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কথাটি হচ্ছে, আলি ﷺ-এর এ কথাটি। তিনি বলেন, 'প্রতিটি মানুষের মূল্য তার সবচেয়ে সুন্দর কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।' দেখুন, কাসিমি কৃত কাওয়ায়িদুত তাহদিস : ৩৮-৩৯।

জেনে রাখো, তুমি প্রতিযোগিতার মাঠে রয়েছ। আর অন্যদিকে তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে! তাই অলসতা-গড়িমসি করার এতটুকু অবকাশও নেই।

فَمَا فَاتَ مَنْ فَاتَ إِلَّا بِالْكَسَلِ *** وَلَا نَالَ مَنْ نَالَ إِلَّا بِالْجِدِّ وَالْعَزْمِ

'যা হাতছাড়া হয়েছে, অলসতার কারণেই হয়েছে; আর যা হাতে এসেছে, তা চেষ্টা ও সংকল্পের কারণে এসেছে।'

উচ্চাভিলাষীর হৃদয়ে হিম্মত ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করতে থাকে।'[৭৬]

হৃদয় হিম্মতের তাড়নার কারণেই হিম্মতওয়ালা সম্মান ও মর্যাদার পোশাকে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারে। কবি বলেন :

إِذَا ذُكِرَ الْمَجْدُ أَلْفَيْتَهُ *** تَأَزَّرَ بِالْمَجْدِ ثُمَّ ارْتَدَى

'যে মর্যাদার কথাই মানুষকে বলতে দেখো, প্রতিটি মর্যাদাই তিনি[৭৭] সর্বাঙ্গে ধারণ করে আছেন।'

উচ্চ মনোবলসম্পন্ন লোকের সংখ্যা স্বল্প

উচ্চ মনোবলসম্পন্ন লোকেরা সর্বোত্তম গুণাবলি অর্জনে প্রতিযোগিতা করে। তারা ক্লান্ত হয় না। বিরক্ত ও নিরাশ হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

'আর পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?'[৭৮]

কবি বলেন :

وَجَدَ الْقُنُوْطُ إِلَى الرِّجَالِ سَبِيْلَهُ *** وَإِلَيْكِ لَمْ يَجِدِ الْقُنُوْطُ سَبِيْلَا

....

৭৬. সাইদুল খাতির : ১৮৯-১৯২

৭৭. আরব কবি খানসা এই কবিতাগুলো পড়েছেন তার ভাই সাখারের শোকগাথায়। এখানে 'তিনি' বলে কবি সাখারকেই বুঝিয়েছেন। এখান থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা হলো, যখনই কোনো মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমরা শুনব, আমাদেরও সেটা অর্জনে ব্রতী হতে হবে। (অনুবাদক)

৭৮. সুরা আল-হিজর : ৫৬

وَلَرُبَّ فَرْدٍ فِيْ سُمُوِّ فَعَالِهِ *** وَعُلُوِّهِ خُلُقًا يُعَادِلُ جِيْلًا

'হতাশা অনেক মানুষকেই আক্রান্ত করেছে, কিন্তু তোমার দিকে যাওয়ার পথও পায়নি। অনেক মানুষ এমন আছেন, যাদের একজনের বিস্তৃত কর্মগাথা ও মহৎ গুণাবলি এক প্রজন্মের সমান হয়।'[৭৯]

মানুষের মাঝে তারা বিরল। রাসুল ﷺ বলেন :

تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

'তোমরা লোকদের পাবে উটের মতো। একশ উটের মধ্যে বহুকষ্টে একটি বাহনযোগ্য উট পাওয়া যায়।'[৮০]

তারা (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ - وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ)-এর দৃষ্টান্ত। সংখ্যাগণনায় তাদের সংখ্যা কম হতে পারে, কিন্তু শক্তিতে তারা অনেকের সমান। তাদের একজন একটি জাতি। তাদের একজন এক হাজারের সমান। কবি বলেন :

يُعَدُّ بِأَلْفٍ مِنْ رِجَالِ زَمَانِهِ *** لَكِنَّهُ فِيْ الْأَلْمَعِيَّةِ وَاحِدُ

'প্রকৃতপক্ষে মানুষ তো সে একজন, কিন্তু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সে এক হাজারের সমান।'

وَلَمْ أَرَ أَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوُتًا *** إِلَى الْمَجْدِ حَتَّى عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدِ

'মানুষের মধ্যে মর্যাদায় এমন তফাত আমি আর দেখিনি—অনেক সময় একেকজন এক হাজার জনের সমকক্ষ হয়ে যায়।'

এ কারণেই উম্মাহর জন্য তাদের বিদায়ের ক্ষত ছিল বেশ গভীর। এমন মানুষের অভাবে যন্ত্রণা ব্যাপকতা লাভ করেছে।

تَعَلَّمْ مَا الرَّزِيَّةُ فَقْدَ مَالٍ *** وَلَا شَاةٌ تَمُوْتُ وَلَا بَعِيْرُ

....

৭৯. এডমিরাল মাহমুদ শিত খাত্তাব ﷺ তার দাদির শোকগাথায় এই কবিতাগুলো বলেছেন। (অনুবাদক)

৮০. সহিহু মুসলিম : ২৫৪৭

وَلَكِنَّ الرَّزِيَّةَ فَقْدُ حُرٍّ *** يَمُوْتُ بِمَوْتِهِ بَشَرٌ كَثِيْرُ

'জেনে রেখো, সম্পদ বিনষ্ট হওয়া বিপর্যয় নয়। উট-ছাগল মারা গেলেও অত বেশি ক্ষতি নেই। বরং বিপর্যয় হলো এমন মহান ব্যক্তিত্বের বিদায়, যা শত শত মানুষের মানসিক মৃত্যুর কারণ হয়।'

فَمَا كَانَ قَيسٌ هَلْكُهُ هَلْكَ وَاحِدٍ *** وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قومٍ تَهَدَّمَا

'কাইসের মৃত্যু তার একার মৃত্যু নয়। তার মৃত্যুতে বিধ্বস্ত হয়েছে একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো।'

জনৈক সালাফ বলেন, 'একজন আলিমের মৃত্যু এমন এক ফাটল, কোনো কিছুতেই যার নিরাময় হয় না।'

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর শোকবার্তায় বলা হয়েছিল :

عَمَّتْ صَنَائِعُهُ، فَعَمَّ هَلَاكُهُ *** فَالنَّاسُ فِيْهِ كُلُّهُمْ مَأْجُوْرُ

وَالنَّاسُ مَأْتَمُهُمْ عَلَيْهِ وَاحِدٌ *** فِيْ كُلِّ دارٍ رَنَّةٌ وَزَفِيْرُ

يُثْنِي عَلَيْكَ لِسَانُ مَنْ لَمْ تُولِهِ *** خَيْرًا، لِأَنَّكَ بِالثَّنَاءِ جَدِيْرُ

رَدَّتْ صَنَائِعُهُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ *** فَكَأَنَّهُ مِنْ نَشْرِهَا مَنْشُوْرُ

'তার মহৎ কর্ম ও অবদান যেমন বিস্তৃত ছিল, তার মৃত্যুর প্রভাবও বিস্তৃত হলো। প্রতিটি মানুষ তার কর্ম থেকে উপকৃত হয়েছে। তাই সবার হৃদয়ে আজ একই মাতম, সবার মুখে আজ একই আহাজারি। প্রতিটি ঘর থেকেই আজ উচ্চকিত বিলাপের ধ্বনি আর ব্যাথাতুর দীর্ঘশ্বাস। যে তোমার কাজে উপকৃত হয়নি, সেও আজ তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেননা তুমি প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠেছ। কীর্তিমানের মৃত্যু নেই—তোমার কর্মের মাঝেই তুমি বেঁচে রবে যুগ যুগ ধরে।'

আবু বকর ﵁ বলেন, সৈন্যদের মাঝে 'কা'কা' (ইবনে আমর আত-তাইমি)-এর এক আওয়াজ এক হাজার লোক অপেক্ষা উত্তম।'

আমর বিন আস ﵁ মিশর বিজয়ের পথে। সাহায্য চাইলেন উমর বিন খাত্তাব ﵁-এর নিকট। উমর ﵁ লিখে পাঠালেন—

'পরসমাচার। আমি তোমার সাহায্যার্থে চার হাজার সেনা পাঠাচ্ছি। আর তাদের প্রত্যেক হাজারে এমন একজন লোক আছে, যে এক হাজারের সমান—জুবাইর বিন আওয়াম, মিকদাদ বিন আমর, উবাদা বিন সামিত ও মাসলামা বিন খালিদ।'

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﵁ একদিন তাঁর সাথিদের বলেন, 'তোমরা কে কী আকাঙ্ক্ষা করো, বলো।'

একজন বলল, 'আমি আকাঙ্ক্ষা করি, যদি এ ঘরটি পূর্ণ স্বর্ণ হতো আমার আর আমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারতাম!'

তারপর তিনি বললেন, 'আর কে কী তামান্না করো?'

তখন অন্য একজন বলল, 'আমি তামান্না করি যে, যদি ঘরটি মণিমুক্তা আর রত্নভান্ডারে পূর্ণ হতো, যা আমি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারতাম এবং সদাকা করতে পারতাম!'

এরপর তিনি বললেন, 'আর কী চাও?'

তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমরা কী বলব, বুঝতে পারছি না।'

উমর ﵁ বললেন, 'কিন্তু আমি তামান্না করি যে, যদি এ গৃহটি আবু উবাইদা বিন জাররাহ ﵁-এর মতো লোকদের দিয়ে পূর্ণ হতো!' [সিফাতুস সাফওয়ার বর্ণনায় এতটুকু এসেছে। আর ফাজায়িলি বর্ণনায় আরেকটু যোগ করেন।] তখন জনৈক লোক বলল, 'আপনি ইসলামের কল্যাণ কামনায় ত্রুটি করেননি।' তিনি বললেন, 'আমি তা-ই ইচ্ছা করেছি।'

আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি আল-বাকির ﷺ বলেন :

'প্রতিটি জাতির মাঝেই কতিপয় মহান লোক থাকে। বনু উমাইয়ার মহান ব্যক্তি হলেন, উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ। তিনি একাই একটি জাতি হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।'

আসমায়ি ﷺ বলেন, 'কুতাইবা বিন মুসলিম তুর্কিদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন যুদ্ধের জন্য। তিনি অনেক ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তখন তিনি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, "তিনি ডানদিকের বাহিনীতে নিজ তির শক্তভাবে ধারণ করে আছেন। আর আকাশের দিকে আঙুল তুলে নাড়ছেন।" কুতাইবা তখন বললেন, "সে আঙুল আমার কাছে এক হাজার ধারালো তরবারি ও সুঠামদেহী যুবক থেকে উত্তম।"'

উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা কখনো কখনো বিস্ময়কর সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। সেগুলোতে পূর্ণতাও অর্জন করে।

ইমামুল মুহাদ্দিসিন ইয়াহইয়া বিন মুইন ﷺ বলেন :

'আমি মিশরে বিস্ময়কর তিনটি জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি—নীলনদ, পিরামিড ও সাইদ বিন আফির।'

সাইদ বিন আফির ছিলেন আবু উসমান আল-মিশরি ﷺ। তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, হাফিজ, আল্লামা, সিকাহ। ছিলেন একাই একটি তথ্যভাণ্ডার। ছিলেন ইলমের সাগর। আমাদের বিস্ময়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্বয়ং যুগের বিস্ময় ইয়াহইয়া বিন মুইন তাঁর ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

ইমাম ইবনুল মুবারক ﷺ-কে জামাআহ'র ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বলেন, 'আবু বকর ও উমর ﷺ।' তাঁকে বলা হলো, 'আবু বকর ও উমর ইনতিকাল করেছেন।' তিনি বললেন, 'তাহলে জামাআহ হলো, অমুক ও অমুক। বলা হলো, 'অমুক অমুকও ইনতিকাল করেছেন।' তখন ইবনুল মুবারক ﷺ বললেন, 'আবু হামজা আস-সুক্কারি ﷺ একাই একটি জামাআহ।'[৮১]

....

৮১. তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন মাইমুন মারুজি ﷺ। সিকাহ। সপ্তম তবকার লোকদের মধ্যকার গুণধর এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছ থেকে এক জামাআহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নামের সাথে সুক্কারি শব্দটি

উচ্চ মনোবলের অধিকারী জান্নাত ছাড়া সন্তুষ্ট হতে পারে না

কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের পূর্ণতার মাধ্যমে যেহেতু ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে, তাই মানুষের মাঝে সবচেয়ে পূর্ণ ইচ্ছার অধিকারী সে, যে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার ইচ্ছা করে। তাঁকে এক মানে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে না। মহান বন্ধুর প্রতিবেশিত্বে যে আবাস প্রিয় বন্ধুদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা লাভের চেষ্টা করে সে। সে এমন জগৎকে এড়িয়ে চলে, যাকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য বন্দিশালা আর কাফিরদের জন্য জান্নাত বানিয়েছেন। আত্তাবিকে বলা হলো, 'অমুক ব্যক্তি উচ্চ মনোবলের অধিকারী।' তিনি বললেন, 'তাহলে জান্নাত ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য নেই তার।'

প্রতিটি মানুষ নিজ সামর্থ্য, হিম্মত ও রুচিবোধ অনুযায়ী নিজের প্রফুল্লতার দিকটি নির্ধারণ করে থাকে। তাই মানুষের মধ্যে রুচিবোধ অনুযায়ী সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উচ্চ মনোবলের অধিকারী এবং মর্যাদায় সর্বাধিক উঁচু সে ব্যক্তি—যে আল্লাহ তাআলার মারিফাত ও মহব্বতের মাঝে প্রফুল্লতা খুঁজে পায়; তাঁর সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহী হয়; সে এমন সবকিছু ভালোবাসে, যা তার রব পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

'তুমি বলে দাও, আল্লাহর এই দান ও রহমতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। এ নিয়ামত ওটা হতে বহুগুণে উত্তম, যা (পার্থিব সম্পদ) তারা সঞ্চয় করছে।'[৮২]

ইমাম গাজালি ﷺ বলেন :

'দুনিয়ার প্রকৃত রাজত্ব ও সম্মান আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের জন্য; সেসব বিশেষ মানুষের জন্য, যারা তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট। জল ও স্থল, জমিন ও পাথর, স্বর্ণ ও মুদ্রা, মানুষ ও জিন, চতুষ্পদ প্রাণী ও পাখপাখালি সবই তাদের অনুগত।

এসেছে। সুক্কারি শব্দের অর্থ হলো চিনি বিক্রেতা। কিন্তু তিনি চিনি বিক্রি করতেন না। তাঁর কথার মিষ্টতার ফলে তাঁর এ নাম পড়ে। -সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/৩৮৬। আরও দেখুন, শারহুস সুন্নাহ : ১/২১৬।

৮২. সুরা ইউনুস : ৫৮

তারা তা-ই চায়, যা আল্লাহ তাআলা চান। আর আল্লাহ তাআলা যা চান, তা-ই হয়। তারা সৃষ্টির কাউকে ভয় করেন না। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি তাদের ভয় করে। তারা শুধু আল্লাহ তাআলারই (তাঁর দ্বীনের) খিদমত করেন। আর আল্লাহ ছাড়া বাকি সব তাদের খিদমতে নিয়োজিত। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা কোথায় পাবে এমন মর্যাদা? বরং তারা হলো হীন ও নিকৃষ্ট। প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের রাজত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

'তুমি যখন সেখানে তাকাবে, দেখবে, নিয়ামতরাজির নানা উপকরণ আর এক বিশাল রাজ্য।'[৮৩]

কল্পনা করুন, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন, 'তা হলো এক বিশাল রাজত্ব।' আর তুমি তো এটা নিশ্চয়ই জানো যে, পুরো দুনিয়া আকারে সামান্য। দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্বকালও স্বল্প। আর আমাদের কেউ কেউ এ সামান্য দুনিয়া থেকে খুব অল্প কিছুই অর্জন করতে পারে। অথচ দুনিয়ার এই সামান্য জিনিস অর্জনে কেউ কেউ তার সমুদয় সম্পদ ও জীবন নিঃশেষ করে দিয়েছে। এত কিছুর পর হয়তো দুনিয়ার সামান্য কিছু তাদের হাতে আসে। আর যা হাতে আসে, তা স্বল্প সময়ের জন্যই আসে। এ সামান্য দুনিয়ার সামান্য সম্পদ অর্জন করেও সে বিপদে পড়ে যায়। সে তখন ঈর্ষার পাত্র হয়ে যায়। এই ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য ব্যয় করা নিজের সম্পদ ও সময়কে অধিক মনে করে না। এদের ব্যাপারেই কবি ইমরুল কাইস বলেন :

بَكَى صَاحِبِيْ لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُوْنَهُ *** وَأَيْقَنَ أَنَّا لَاحِقَانِ بِقَيْصَرَا

فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنُكِ إِنَّمَا *** نُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ نَمُوْتَ فَنُعْذَرَا

'সামনে গিরিপথ দেখে কেঁদে ওঠে আমার সাথি। তার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাল আমরা রোমের বাদশাহর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। আমি তাকে বললাম, তুমি কেঁদো না। আমরা আমাদের রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করব কিংবা এই চেষ্টা করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব—তবেই আমরা নিষ্কৃতি পাব।'

৮৩. সুরা আল-ইনসান : ২০

এটা হলো দুনিয়ার সামান্য এক অংশের রাজত্ব নিয়ে সংকল্পের নমুনা। যে সংকল্প পূরণ করার আগেই হয়তো মৃত্যু এসে যাবে। বিপরীতে সে ব্যক্তির অবস্থাটা কেমন, যে স্থায়ী জগতের সুখময় জান্নাতের প্রত্যাশায় ছোটেন? তার কি আল্লাহ তাআলার জন্য দুই রাকআত সালাত আদায় বা দুটি টাকা দান অথবা দুনিয়ার এ দুটি রাত জেগে থাকাকে বিশাল কিছু মনে করা উচিত? না; বরং সে চিন্তা করবে, যদি তার হাজার হাজার প্রাণ থাকত, হাজার হাজার রুহ থাকত, তার জীবন থাকত হাজার হাজার বছরের এবং প্রতিটি জীবন দুনিয়ার সমবয়সী বা তার চেয়েও অধিক হতো! এবং এসব কিছু যদি সে ব্যয় করতে পারত মহান লক্ষ্য সাধনে, জান্নাত অর্জনে—তবে এ ত্যাগও খুবই সামান্য হতো। কারণ, সে যদি কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সফল হতে পারে, তবে তা হবে বিরাট গনিমত। নিজের ব্যয়িত জিনিস থেকে, নিজের কৃত পরিশ্রম থেকে অনেক অনেক গুণে বেশি পাওয়া।'[৮৪]

রাসুল ﷺ বলেন :

> لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ، مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ، هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
>
> 'যদি কোনো ব্যক্তি জন্মের পর থেকে বার্ধক্যকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত (লাগাতার) ইবাদত করতে থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন তার কাছে তা খুবই নগণ্য বলে মনে হবে।'[৮৫]

এমন মনে হওয়ার কারণ হলো, সে যেমন নিয়ামত পেয়েছে, সে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় হয়—এমন পর্যাপ্ত ইবাদত সে করতে পারেনি। যে জান্নাত সে পাবে, তার তুলনায় তার পুরো জীবনের আমল কিছুই নয়।

উচ্চ মনোবলের অধিকারী ধ্বংসশীল জিনিস গণনায় ধরে না। অস্থায়ী জীবনে সন্তুষ্ট হতে পারে না সে। ক্ষণস্থায়ী জিনিস উপার্জনে তার তৃপ্তি আসে না। বরং তার লক্ষ্য হলো, স্থায়ী নিয়ামত অর্জন এবং চিরস্থায়ী জীবন। সে

....

৮৪. মিনহাজুল আবিদিন : ২৪৭-২৪৮; আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার ঘটনাটি দেখুন : ৩০৬-৩০৭।
৮৫. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৩০৩, মুসনাদু আহমাদ : ১৭৬৪৯, বুখারি ﷺ কৃত আত-তারিখ। হাইসামি ﷺ বলেন, ইমাম আহমাদের সনদ জাইয়িদ পর্যায়ের।

উচ্চাকাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তাঁর এ প্রদক্ষিণতা ইল্লিয়্যিনে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে। আর সেটাই হলো তার মহান লক্ষ্য। শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেখানে নেই কোনো ক্রুটি ও অপবিত্রতা। নেই ক্লান্তি-বিস্বাদ, দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা। ইল্লিয়্যিনে রয়েছে চমকানো আলো। ছড়িয়ে পড়া ঘ্রাণ। সুদৃঢ় অট্টালিকা। প্রবাহিত ঝরনা। পরিপক্ব ফল। সুন্দরী রমণী। এবং আরও বহু কিছু। চিরস্থায়ী আবাস, সবুজশ্যামল উদ্যান এবং সুউচ্চ প্রাচীর। সেখানে রয়েছে চোখের শীতলতা, নফসের প্রফুল্লতা, হৃদয়ের প্রশান্তি। আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাওস।'[৮৬]

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।'[৮৭]

জান্নাতই আসল বাসস্থান। এ বাসস্থানকে ঘিরেই মূলত আশা-আকাঙ্খা। আর দুনিয়াতে আমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়া ﷺ এসেছেন অল্প কিছু সময় থাকার জন্য। তাঁদের মতো আমাদেরও পুনরায় প্রত্যাবর্তন হবে জান্নাতে। কবি বলেন :

نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى *** مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيْبِ الْأَوَّلِ

كَمْ مَنْزِلٍ فِيْ الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى *** وَحَنِيْنُهُ أَبَـدًا لِأَوَّلِ مَـنْزِلِ

فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا *** مَنَازِلُنَا الْأُوْلَى وَفِـيْهَا الْمُـخَيَّمُ

وَلَكِنَّنَا سَبِيُّ الْعَـدُوِّ فَـهَلْ تَرَى *** نَعُوْدُ إِلَى أَوْطَـانِنَا وَنَسْـلَمُ

....

৮৬. সুরা আল-কাহফ : ১০৭

৮৭. সুরা আল-কাহফ : ১০৮

‘পৃথিবীর যেখানেই যাও প্রেমের টানে—মহব্বত তো কেবল প্রথম মাহবুবের জন্যই। কত জায়গায় মানুষ বাস করে। সখ্যতা গড়ে ওঠে কত ঘরের সাথে। তবুও জীবনের প্রথম ঘরটির ভালোবাসা তার হৃদয়ে জেগে থাকে। সুতরাং হে যুবক, চলো জান্নাতের সীমানায়। ওখানেই আমাদের প্রথম বাস; আমাদের ঘর ওখানেই। কিন্তু পরদেশে আজ আমরা বন্দী শত্রুর হাতে। চলো ফিরে যাই আপন দেশে, বাস করি সুখ ও নিরাপত্তার উদ্যানে।’

দুনিয়া মৃত-লাশের ন্যায় আর সিংহ কখনো মৃত-লাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে না

বিলকিস সুলাইমান ﷺ-এর নিকট কিছু হাদিয়া পাঠালেন। উদ্দেশ্য, এর মাধ্যমে তাঁর হিম্মতের পরিমাণ পরখ করে দেখা। যদি তাঁর হিম্মত কম হয়, তাহলে বোঝা যাবে, তিনি ঘনিষ্ঠতার উপযোগী নন। আর যদি দেখা যায়, তিনি সুউচ্চ হিম্মতের অধিকারী, তাহলে বোঝা যাবে, তিনিই যোগ্য।

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ- فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

‘আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কী জবাব নিয়ে আসে। এরপর যখন দূত সুলাইমানের কাছে আগমন করল, তখন সুলাইমান বললেন, “তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো।”’[৮৮]

দুনিয়ার ধনসম্পদই ছিল বিলকিসের হাদিয়া। তাই সুলাইমান ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করলেন—আকাঙ্ক্ষী হলেন তার চেয়েও দামি জিনিসের প্রতি।

৮৮. সুরা আন-নামল : ৩৫-৩৬

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন :

'যে আখিরাত প্রত্যাশী, সে দুনিয়ার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে দুনিয়া প্রত্যাশী, সে আখিরাতের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আমার জাতি, ক্ষণস্থায়ী জিনিসের ক্ষতির বিনিময়ে চিরস্থায়ী জিনিস গ্রহণ করো।'

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন :

وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّيْ طَعِمْتُهَا *** وَسِيْقَ إِلَيْنَا عَذْبُها وَعَــذَابُهَا

فَلَمْ أَرَهَا إِلَّا غُرُوْرًا وَبَاطِلاً *** كَمَا لَاحَ فِيْ ظَهْرِ الفَلَاةِ سَرَابُهَا

وَمَا هِيَ إِلَّا جِيْفَةٌ مُسْتَحِيْلَةٌ *** عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا

فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لِأَهْلِهَا *** وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا

'হৃদয়ে জাগে লালসা সাধের দুনিয়ার। আমিও দেখেছি চেখে জগতের স্বাদ! দুনিয়ার যত মিষ্টতা আর যত অনিষ্ট ধরা পড়েছে আমার চোখে। দুনিয়াকে দেখেছি আমি ভাগাড়ে ছুড়ে ফেলা লাশ বৈ কিছু নয়। লোলুপ দৃষ্টি মেলে যাকে পাহারা দেয় কুকুরের দল। যদি মুখ ফিরিয়ে নাও এই পচা লাশ থেকে, তবে নিরাপদ তুমি। আর যদি আকৃষ্ট হও তার দিকে, তবে তুমিও লেগে যাও ঝগড়ায় কুকুরদের সাথে।'

কাফির কেন উচ্চ মনোবলের অধিকারী হতে পারে না?

কতক মানুষ বিভিন্ন কাফির জাতিকে উচ্চ মনোবলের অধিকারী উপাধি দিয়ে ভুল করে বসে। যেমন জার্মান ও জাপান জাতি, অথবা তাদের গবেষক ও আবিষ্কারকদের। কাফিরদের উচ্চ মনোবলের অধিকারী বলা একটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ, উচ্চাভিলাষ, উচ্চ মনোবল আখিরাত অর্জনে উৎসাহিত করে। উচ্চাভিলাষের মর্যাদা ও সম্মান এতেই নিহিত। উচ্চাভিলাষ অন্তরে শিরিক ও কুফরে কলুষিত থাকাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৮৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

'আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। এরপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করল।'[৯০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এর চেয়ে নিচের যেকোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।'[৯১]

পূর্বে উল্লেখ করেছি, পরিপূর্ণ লক্ষ্য হলে ইচ্ছাটাও পরিপূর্ণ হয়। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ না করে শুধু ইচ্ছার প্রতি লক্ষ করলে ভুল অনিবার্য।

দুনিয়ার হীনতা ও তুচ্ছতার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রচুর বর্ণনা এসেছে। প্রচুর বর্ণনা এসেছে আখিরাতের প্রশংসা ও মহত্ত্ব নিয়ে। অথচ এসব কাফিরের একমাত্র লক্ষ্যই হলো দুনিয়া আবাদ করা। দুনিয়ার জন্যই সে যত শ্রম ব্যয় করে। আর এ উদ্দেশ্যেই সে যুদ্ধ করে। সাথে সাথে আখিরাত থেকে বিমুখ

....

৮৯. সুরা আল-মায়িদা : ৭২
৯০. সুরা আল-হাজ : ৩১
৯১. সুরা আন-নিসা : ৪৮

হয়ে থাকে। তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ - أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর—এমন লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম তাদের কৃত কর্মের কারণে। [৯২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

'তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত। অথচ পার্থিব জীবন তো পরকালের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।'[৯৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেজগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বোঝো না?'[৯৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

....

৯২. সুরা ইউনুস : ৭-৮

৯৩. সুরা আর-রাদ : ২৬

৯৪. সুরা আল-আনআম : ৩২

‘কাফিরদের নিকট পার্থিব জীবন মোহনীয় করা হয়েছে। অথচ তারাই মুমিনদের নিয়ে হাসাঠাট্টা করে।’[৯৫]

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

‘লোকদের কেউ কেউ বলে, “হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দুনিয়াতেই দান করুন।” তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই।’[৯৬]

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আখিরাতের জীবনই সত্যিকারের জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

‘পার্থিব এ জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত!’[৯৭]

পার্থিব জীবনকে জীবন হিসেবেই স্বীকৃতি দেননি প্রভু। এ জন্যই যারা দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়, দুনিয়াকে ঘিরেই যাদের ব্যস্ততা, তারা তিরস্কৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

‘বস্তুত, তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।’[৯৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ - وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

....

৯৫. সুরা আল-বাকারা : ২১২

৯৬. সুরা আল-বাকারা : ২০০

৯৭. সুরা আল-আনকাবুত : ৬৪

৯৮. সুরা আল-আলা : ১৬-১৭

‘কখনো না, বরং তোমরা ইহজীবনকেই ভালোবাসো। আর পরকালকে উপেক্ষা করো।’[৯৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

‘এ লোকেরা তো পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে আর তাদের আড়ালে আগত কিয়ামতের কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে।’[১০০]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَمَّا مَنْ طَغَى - وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

‘সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে আর পার্থিব জীবনকে (পরকালের ওপর) প্রাধান্য দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল।’[১০১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

‘যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে আর পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছে, তুমি তাদের বর্জন করো।’[১০২]

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের প্রতি উঁকি মেরেও তাকাতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

....

৯৯. সুরা আল-কিয়ামাহ : ২০-২১

১০০. সুরা আল-ইনসান : ২৭

১০১. সুরা আন-নাজিআত : ৩৭-৩৯

১০২. সুরা আল-আনআম : ৭০

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করবেন না।[১০৩] আপনার প্রতিপালক-প্রদত্ত রিজিকই সর্বোত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী।'[১০৪]

আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশে বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। ওরাই তো পাপাচারী।'[১০৫]

আবু হুরাইরা ও আবু সাইদ ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

يُؤْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي

'কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে নিয়ে আসা হবে। বলা হবে, "আমি কি তোমাকে কান, চোখ, ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দান করিনি? এবং তোমার জন্য চতুষ্পদ জন্তু ও চাষাবাদ অনায়াস করে দিইনি? তোমাকে তো আমি অবকাশ দিয়েছিলাম সর্দারি করতে এবং অন্যের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে।[১০৬] তুমি কি কখনো মনে রেখেছ

....

১০৩. নাসাফি ﵀ তাঁর তাফসির গ্রন্থে বলেন, 'জুলুমের পয়সায় তৈরি অট্টালিকা, পাপিষ্ঠদের গায়ের পোশাক-আশাক ও তাদের বাহনের দিকে না তাকানোর প্রতি জোরদার গুরুত্ব দিতেন মুত্তাকিগণ। এমনকি হাসান বসরি ﵀ বলতেন, 'তোমরা পাপিষ্ঠদের সুন্দর অবয়ব ও সুন্দর চলন-বাহনের দিকে তাকিয়ো না। তাকিয়ো না তাদের ঐশ্বর্যের দিকে। বরং তোমরা এসব পাপিষ্ঠের মুখের দিকে তাকাও। দেখো, দুনিয়ার গোলামদের মুখে পাপাচারিতার লাঞ্ছনা কেমন বিশ্রীভাবে লেগে আছে।' - তাফসিরে নাসাফি : ২/৩৮২।

১০৪. সুরা তহা : ১৩১

১০৫. সুরা আল-হাশর : ১৯

১০৬. জাহিলি যুগের একটি নিয়ম।

যে, একদিন তোমাকে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে?” সে লোকটি বলবে, “না।” তখন আল্লাহ বলবেন, “তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে থেকেছিলে, আজও আমি তোমাকে ভুলে থাকলাম[১০৭]।”’[১০৮]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

‘জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষাকারীকে এবং জান্নাতের প্রত্যাশীকে আমি কখনো ঘুমাতে দেখিনি।’[১০৯]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا

‘দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়াতে যা আছে, সব অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর জিকির ও তার সংশ্লিষ্ট[১১০] বিষয়াদি, আলিম বা ইলম অর্জনকারী ব্যতীত।’[১১১]

দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতা বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসুল ﷺ দুনিয়াকে এক শব্দে ‘বাতিল’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন :

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ

....

১০৭. অর্থাৎ তোমাকে আজাব দিয়ে আমি তোমাকে ভুলে গেলাম। -অনুবাদক।

১০৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৪২৮। তিরমিজি ﷺ বলেন, হাদিসটি সহিহ গরিব।

১০৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৬০১। হাদিসের মান : হাসান।

১১০. অনেকে (وَمَا وَالَاهُ)-এর অর্থ করেন, ‘জিকিরের মতো অন্য যেসব কাজ দুনিয়াতে প্রচলন হওয়া আল্লাহর পছন্দ। আবার বলা হয়, (وَمَا وَالَاهُ)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, জিকিরের মতোই অন্যান্য পুণ্যের কাজগুলো। যেমন : আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশের অনুসরণ, তাঁর নিষিদ্ধ কর্ম-বস্তু থেকে বিরত থাকা। কেননা, আল্লাহর জিকির এসব কিছুরই দাবি করে।

১১১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১১২ (হাদিসের মান : হাসান)। সুনানুত তিরমিজি : ২৩২২

‘কবি লাবিদের এ কথাটি অতি সত্য, সে বলেছে, “জেনে নাও, আল্লাহ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই বাতিল (নশ্বর)।”’[১১২]

আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি খেজুর গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটি বিছানায় শায়িত ছিলেন। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুর গাছের আঁশ-ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। তখন কক্ষে একাধিক সাহাবি প্রবেশ করেন। তাঁদের একজন ছিলেন উমর ﵁। রাসুল ﷺ তখন একপাশে ফিরলেন। উমর ﵁ দেখতে পেলেন, রাসুল ﷺ-এর পার্শ্বদেশ ও ছাটাইয়ের মাঝখানে কাপড় না থাকায় তাঁর পার্শ্বদেশে ছাটাইয়ের ছাপ লেগে আছে। এ দৃশ্য দেখে উমর ﵁ কেঁদে ফেলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “উমর, কাঁদছ কেন?”

উমর ﵁ বললেন, “আল্লাহর শপথ, আমি শুধু এ কারণেই কাঁদছি, আপনি কিসরা ও কাইসারের তুলনায় আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। তারা দুনিয়ার প্রাচুর্যে ডুবে আছে, আর আপনি আল্লাহর রাসুল হয়েও যে অবস্থায় আছেন, তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।”

নবিজি ﷺ তখন বললেন, (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟) “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখিরাত!”

উমর ﵁ বললেন, “কেন নয়? অবশ্যই আমি তাতে সন্তুষ্ট।”

নবিজি ﷺ এবার বললেন, “তাহলে বিষয়টি এমনই।”’[১১৩]

আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ

১১২. সহিহুল বুখারি : ৩৮৪১
১১৩. মুসনাদু আহমাদ : ১২৪১৭

الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

'কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপযোগী দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষটিকে একবার জাহান্নামে ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে আনা হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "হে আদম-সন্তান, দুনিয়াতে কখনো উপভোগের কিছু দেখেছ? কোনো কিছু উপভোগ করেছ বলে মনে হয়?" সে মানুষটি বলবে, "না, আল্লাহর শপথ, হে আমার রব।" এরপর দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে দুরবস্থায় কাটানো জান্নাতের উপযোগী একজন মানুষকে একবার জান্নাতে ডুবিয়ে আবার নিয়ে আসা হবে। জিজ্ঞেস করা হবে, "আদম-সন্তান, দুনিয়াতে কখনো কোনো দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তোমাকে? কখনো তোমাকে কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে?" এ লোকটি বলবে, "না, আল্লাহর কসম, হে আমার রব! আমি কখনো কষ্ট পাইনি। কখনো দারিদ্র্য দেখিনি।"'[১১৪]

উচ্চ মনোবলের অধিকারী সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, যে ক্ষমতাবান মহান অধিপতি আল্লাহর সামনে দৃঢ়পদের অধিকারী হবে? ফিরিশতাগণ তাঁর খিদমতে নিয়োজিত থাকবেন এবং তাঁকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহ্বান করে বলবেন : سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ 'তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার!'[১১৫] কিন্তু যদি সে নিজের জন্য ইমানের পথ বন্ধ করে রাখে, কুফর-ফিসক আর অবাধ্যতার অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যায়, জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং জাহান্নামের ইন্ধন হতে চায়, তাহলে তার পরিণতি কী হবে?

....

১১৪. সহিহু মুসলিম : ২৮০৭, মুসনাদু আহমাদ : ১৩১১২
অর্থাৎ জাহান্নামে একটি ডুবে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটি দুনিয়ার বুকে যত উপভোগ করেছে, সব ভুলে যাবে। আর দুনিয়ার বুকে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি কষ্টে জীবনযাপন করেছে, তাকে একবার কিছু সময়ের জন্য জান্নাতে ঘুরিয়ে আনা হলে তার জীবনের সব দুঃখ-দুর্দশা সে ভুলে যাবে। (অনুবাদক)

১১৫. সুরা আর-রাদ : ২৪

সে নিজের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিকে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে রাখার পেছনে ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا

'নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে।'[১১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

'যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদের আজাবের পর আজাব বাড়িয়ে দেবো। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।'[১১৭]

এমন ব্যক্তি কীভাবে উচ্চ মনোবলের অধিকারী হয়? কীভাবে তাকে এমন মহৎ উপাধি দেওয়া যায়?

যাকে আল্লাহ তাআলা তাওহিদের ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সে এখন সেই ফিতরাত নষ্ট করে ফেলেছে, সে কীভাবে উচ্চ মনোবলের অধিকারী হতে পারে?! আল্লাহ তাকে বিবেকের নিয়ামত দান করেছেন, কিন্তু সে বিবেককে অকেজো করে রেখেছে—এমন ব্যক্তি কী করে উচ্চ মনোবলের অধিকারী হতে পারে? আল্লাহ তাআলা তার জন্য তাওহিদের নিদর্শনাবলি ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে, প্রতিটি স্থানে। রাসুল ﷺ-এর সততার প্রমাণ স্থাপন করেছেন দিগন্তের চারদিকে। প্রমাণ রেখেছেন তার নিজের শরীরের মাঝে। বিস্ময়কর এক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু সে এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এদিকে মাথা তুলেও তাকায়নি সে। দুনিয়াকে তার প্রধান চিন্তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। এমন লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

....

১১৬. সুরা আন-নিসা : ১৬৭

১১৭. সুরা আন-নাহল : ৮৮

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ - حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ

'যেদিন আমি প্রত্যেকটি সম্প্রদায় হতে একটি দলকে সমবেত করব, যারা আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করেছিল, অতঃপর তাদের সারিবদ্ধ করা হবে। যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, "তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করছিলে?" সীমালঙ্ঘন করার অপরাধে তাদের ওপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।'[১১৮]

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ

'প্রত্যেক রূঢ় অহংকারী, বাধাদানকারী দাম্ভিক, বাজারে ঝগড়াটে-গণ্ডগোলকারী, রাতের বেলা মৃতের মতো ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তি, দিনের বেলা গাধার মতো পরিশ্রমকারী, দুনিয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞ আখিরাতের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন।'[১১৯]

এ হাদিসটি এ সকল কাফিরের চেয়ে আর কার ব্যাপারে বেশি প্রযোজ্য হবে! এরা আখিরাতের জন্য চিন্তা করে না এতটুকুও। কেবল দুনিয়ার বিষয়ে জ্ঞাত তারা। দুনিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল। আখিরাতের দিকে তাদের একটুও ভ্রুক্ষেপ নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

....

১১৮. সুরা আন-নামল : ৮৩-৮৫

১১৯. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৭২। হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহিহ। তাহকিক : শুআইব আরনাউত।

'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে, আর পরকাল সম্পর্কে তারা গাফিল।'[১২০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا -ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

'অতএব, তার থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।'[১২১]

এরা পার্থিব জ্ঞান অর্জনে অনেক পরিশ্রম করে। তা অর্জনে গভীর মনোযোগ দেয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ব্যাপারে থাকে পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো আখিরাতের জ্ঞান। এ জ্ঞান অর্জনেই রয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। কখনো তা হারাবে না বা ধ্বংস হয়ে যাবে না।

সুতরাং যারা শ্রেষ্ঠ বিষয়ের বিনিময়ে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর ক্রোধেরই উপযুক্ত। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন তাদের দুর্ভাগ্য ও পশ্চাদপসরণতার কারণে। আল্লাহ তাআলা তাদের বিবেক দিয়েছেন। মহান এক নিয়ামতে সম্মানিত করেছেন। অন্যান্য জীবজন্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিন্তু তারা এসবকে নিকৃষ্ট দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, কামনা-বাসনা আর বিলাসিতায় বিভোর থেকেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য পূরণ করেনি তারা। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য—যাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নবি আলাইহিমুস সালামদের আনুগত্যের জন্য। আল্লাহ তাআলা এদের ব্যাপারে বলেন :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

....

১২০. সুরা আর-রুম : ৭

১২১. সুরা আন-নাজম : ২৯-৩০

'এ কাফিরদের তুলনা সেই ব্যক্তির মতো, যে এমন কিছুকে ডাকে, যা হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না, বধির, মূক ও অন্ধ; কাজেই তারা বুঝবে না।'[১২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

'আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং আরও পথভ্রান্ত।'[১২৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

'আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।'[১২৪]

আল্লাহ তাআলা সুরা রুমে বলেন :

وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।'[১২৫] অর্থাৎ কাফিররা।

(لَا يَعْلَمُونَ) 'তারা জানে না' জগতে তাঁর রহস্যসমূহ ও দৃঢ় কার্যাবলি সম্পর্কে—যা ইনসাফের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তারা অজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার অভাবে এসবের ব্যাপারে জানে না।

....

১২২. সুরা আল-বাকারা : ১৭১
১২৩. সুরা আল-ফুরকান : ৪৪
১২৪. সুরা মুহাম্মাদ : ১২
১২৫. সুরা আর-রুম : ৬

(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) 'তারা দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়ে জানে।' অর্থাৎ যা তাদের কামনা-বাসনা আর প্রবৃত্তির অনুকূলে হয়, তারা কেবল সে বিষয়ে জ্ঞাত।

(وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ) 'আর তারা পরকালের সম্পর্কে...।' যা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য।

(هُمْ غَافِلُونَ) 'তারা গাফিল।' অর্থাৎ আখিরাতের ব্যাপারে তাদের হৃদয়ে সামান্য চিন্তাও আসে না। এ ব্যাপারে তারা অজ্ঞ, আখিরাতের আমল পরিত্যাগকারী।

আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়ার জ্ঞানের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন (يَعْلَمُونَ) 'তারা জানে।' আখিরাতের জ্ঞানের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, (لَا يَعْلَمُونَ) 'তারা জানে না।' যেন একটিকে অপরটির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এটার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, আখিরাতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই এবং তারা মূর্খ। আবার দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের যে জ্ঞান রয়েছে, সে জ্ঞান দুনিয়ার সীমানা অতিক্রম করে না। এ দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের জ্ঞান থাকার কারণে তারা জ্ঞানী হয়ে যায় না; বরং তারা জাহিল ও মূর্খই থাকে।

(ظَاهِرًا) 'বাহ্যিক' দ্বারা বোঝা যায় যে দুনিয়ার দুটি দিক আছে। 'বাহ্যিক'—যা হলো অজ্ঞদের জানা দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগবিলাস এবং এর স্বাদ-আহ্লাদ। আর দুনিয়ার 'অভ্যন্তরীণ' একটি বিষয় আছে, যা দুনিয়ার বাস্তবতা। আর তা হলো, দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়াতে আনুগত্য ও নেক আমলের মাধ্যমে পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। বলা হয়েছে : (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) অর্থাৎ 'তারা দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ব্যাপারে জ্ঞাত।' কখন চাষ করবে? কখন ফসল কাটতে হবে? কখন বীজ বপন করবে? কীভাবে (বাড়িঘর ইত্যাদি) নির্মাণ করবে? এগুলোই তারা জানবে স্রেফ।

বর্তমান যুগে কাফিররা বিশেষ করে পশ্চিমারা পার্থিব বিদ্যা ও তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে ডুবে আছে, অন্যদিকে আখিরাতের বিদ্যা থেকে পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কাফিরদের কেউ কেউ আছে জান্নাত কামনা করে। সে জন্য পরিশ্রম করে। কিন্তু সে ভুল পথ গ্রহণ করে। কারণ, জান্নাতে প্রবেশের সকল পথ বন্ধ। শুধু একটি পথই খোলা রয়েছে। এ পথের মূলে রয়েছেন সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ। কিন্তু এ প্রকারের কাফির রিসালাতের প্রতি ইমান আনতে অস্বীকার করে। সে অস্বীকার করে, তাঁর আনিত শরিয়তের সামনে অবনত হতে। সত্য উদ্ভাসিত ও তার প্রমাণাদি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সে আত্মঅহমিকায় ডুবে আছে, অথবা নিজের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করছে। সে যথেষ্ট মনে করছে নিজের শাসক ও নেতাবর্গের অনুসরণকে। তাই যখন কবরে তাকে রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে, তখন তার উত্তর হবে, 'আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছিলাম, তা-ই বললাম।'

عَاشُوْا كَمَا عَاشَ آبَاءٌ لَهُمْ سَلَفُوْا * وَأَوْرَثُوْا الدِّيْنَ تَقْلِيْدًا كَمَا وَجَدُوْا

'তারা জীবনযাপন করেছে তাদের চলে-যাওয়া বাপ-দাদাদের মতো—যারা তাদের ওয়ারিশ বানিয়ে গেছে এমন দ্বীনের, যেটি তারাও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল তাদের বাপ-দাদা থেকে।'

সত্য পথ তালাশের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখা যায় না। দলিল-প্রমাণ দেখার প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ একই সময়ে সে পার্থিব তুচ্ছ-নগণ্য বিষয়ে খুব সচেতন। সত্য খুঁজতে অগ্রসর হতে রাজি নয় সে। তাই রাসুল ﷺ-এর প্রতি ইমান না এনে নিজের পূর্বপুরুষের ধর্ম ও মতবাদকেই যথেষ্ট মনে করে। আর আশা করে সে জান্নাতে যাবে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেন :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।'[১২৬]

১২৬. সুরা আল-গাশিয়াহ : ২-৪

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا -الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

'বলুন, আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা হলো সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।'[১২৭]

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

'সেখানে আল্লাহর নিকট থেকে তারা এমন কিছুর সম্মুখীন হবে, যা তারা কখনো অনুমানও করেনি।'[১২৮]

একজন মুসলিম কীভাবে কোনো কাফিরের কর্মে মুগ্ধ হতে পারে, কীভাবে তার উচ্চ মনোবলের প্রশংসা করতে পারে, অথচ সে কাফিরের সারা জীবনের কর্মের উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনকে নিয়ে!?

এরপরও যদি কোনো কাফির আল্লাহর সামনে নত হওয়া, ইমান আনা ব্যতীত ইবাদত হিসেবে এগুলো করে থাকে, তাহলে এগুলো কখনোই তার উপকারে আসবে না পরকালে। বরং আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'[১২৯]

....

১২৭. সুরা আল-কাহফ : ১০৪-১০৫

১২৮. সুরা আজ-জুমার : ৪৭

১২৯. সুরা আল-ফুরকান : ২৩

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ

'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত হলো সেই ছাইয়ের মতো, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। নিজেদের উপার্জনের কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না।'[১৩০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'আর যারা কুফরি করে, তাদের কাজকর্ম হলো মরুভূমির মরীচিকার মতো। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি সেটাকে পানি মনে করে, অবশেষে নিকটে এসে সেখানে কিছুই পায় না। সে সেখানে পায় আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[১৩১]

১৩০. সুরা ইবরাহিম : ১৮
১৩১. সুরা আন-নুর : ৩৯

দুনিয়ার সম্পদকে সালাফ তুচ্ছ মনে করতেন

উচ্চাভিলাষী মূলত সে, যে বন্যপ্রাণির মতো জীবনযাপনে সন্তুষ্ট নয়। উচ্চাভিলাষী শুধু নিজের পেট ও লজ্জাস্থান হিফাজত করেই সন্তুষ্ট নয়। বরং সে শরয়ি উত্তম চরিত্রাবলির মাধ্যমে নিজেকে সুশোভিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ফলে দুনিয়াতে সে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও খলিফা হিসেবে পরিগণিত হয়, আর আখিরাতে হয় আল্লাহর প্রতিবেশী। কিন্তু নিম্ন মানসিকতার লোকেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

দুনিয়ার তুচ্ছতাই উচ্চাভিলাষীকে মহান করে তোলে। ফলে সে পেটপূজা থেকে বিরত থাকে। দুনিয়ার যা পাবে না, তার কামনা রাখে না। আর পেলেও বাড়াবাড়ি করে না।

সে যৌনাঙ্গের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত থাকে। ফলে নিজের জৈবিক চাহিদার প্রতি লোভাতুর হয় না। আমাদের পুণ্যবান সালাফ আল্লাহর বিধান উপলব্ধি করতেন; দুনিয়ার স্বরূপ চিন্তা করতেন; চিন্তা করতেন আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন নিয়ে। তাই দুনিয়ার রং-তামাশা এড়িয়ে চলতেন। নিজেদের হৃদয়গুলো তা থেকে মুক্ত রাখতেন। তাদের উচ্চাভিলাষ ছাড়িয়ে যেত সকল তুচ্ছ বিষয়কে। তারা নিজেদের সকল চিন্তাকে শুধু একটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করে রাখতেন। আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুগ্রহের আবাসে তাঁর প্রতিবেশী হওয়া।

কবি বলেন :

إِنَّ لِلّٰهِ رِجَالًا فُطُنَا *** طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا

نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا *** أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا

جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا ** صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا

'আল্লাহর অনেক প্রজ্ঞাবান বান্দা আছেন, যারা ফিতনার আশঙ্কায় দুনিয়াকে তালাক দিয়েছেন। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, দুনিয়া স্থায়ী আবাস নয়। পার্থিব জীবনকে তারা মনে করেছেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ

উত্তাল সমুদ্র আর তাই এটি পাড়ি দিতে তারা নেক আমলের নৌকা নির্মাণে ব্যস্ত।'

লক্ষ্যে পৌঁছার পথে যত প্রতিবন্ধকতা আসত, সব দূর করার ব্রতী হতেন তারা। এসব প্রতিবন্ধকতার একটি হচ্ছে, অনর্থক বৈধ কাজসমূহ।

আব্দুল কাদির জিলানি তাঁর এক গোলামকে বলেন, 'হে গোলাম, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়েশাদি, বাসস্থান আর সম্পদ সঞ্চয় করা যেন তোমার লক্ষ্য না হয়। এসবই নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা। এগুলো বুদ্ধি ও হৃদয়ের চাহিদা নয়। তাই তোমার চিন্তা ও পেরেশানির একমাত্র লক্ষ্য যেন হয়, তোমার রব ও রবের কাছে যা আছে তা।'

যখন ইমাম লাইস বিন সাদ ﵀ সামান্য একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলেন—যা ছিল উচ্চ মনোবলের বিপরীত কোনো কাজ—তখন মদিনার ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাইদ আনসারি ﵀ তাকে বললেন, 'তুমি এমনটি কোরো না। কেননা, তুমি এমন একজন ইমাম—লোকজন তোমাকে দেখে শেখে।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'একদিন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ আমাকে কোনো একটি মুবাহ কাজের ব্যাপারে বলেন, "যদিও এটি ত্যাগ করা জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য শর্ত নয়, তবে এটি উচ্চ স্তরের কর্মের বিপরীত।" অথবা এমন কিছু বলেছিলেন।'[১৩২]

হাফিজ আবুল হাসান আলি বিন আহমাদ জাইদি ﵀ বলেন, 'নফলকে ফরজের মতো বানিয়ে নাও, পাপ করাকে কুফরির মতো, কামনা-বাসনাকে বিষের মতো, আর মানুষের সাথে মেশাকে আগুনের মতো মনে করো এবং খাদ্যকে মনে করো ওষুধের মতো।'

ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া শৈশবে ইমাম মালিক ﵀-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করলেন। ফিকহের জ্ঞান অর্জন করলেন। ইমাম মালিক ﵀ তার জ্ঞান-বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি মালিক ﵀-এর নিকট তার কিছু সহপাঠীসহ উপস্থিত ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি

১৩২. মাদারিজুস সালিকিন : ২/২৬

বলল, 'হাতি এসেছে।' ইমাম মালিকের সকল ছাত্র হাতি দেখতে চলে গেল। কিন্তু ইয়াহইয়া ﷺ নিজ স্থানে রয়ে গেলেন। তখন মালিক ﷺ বলেন, 'তুমি হাতি দেখতে বের হলে না যে, স্পেনে তো হাতি নেই?' তখন ইয়াহইয়া ﷺ বললেন, 'আমি নিজ ভূমি থেকে এখানে এসেছি আপনাকে দেখতে; আপনার কাছ থেকে ইলম-আদব শিখতে। হাতি দেখতে আসিনি।' মালিক ﷺ তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাকে 'স্পেনের বুদ্ধিমান' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

বিরল প্রাণীদের দেখা একটি বৈধ ও মুবাহ কাজ। কিন্তু সে মুহূর্তে ইলমের পাঠ চুকিয়ে কোনো মুবাহ কাজে ব্যস্ত হওয়ার মতো সময় ছিল না। দিবানিশি যে কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, তা ছেড়ে ভিন্ন কোনো কাজে জড়িয়ে যাওয়া উচিত হতো না।

আব্বাসীদের থেকে বাঁচতে আব্দুর রহমান দাখিল স্পেনে আশ্রয় নিলেন। তাঁকে একটি সুন্দরী বাঁদি উপহার দেওয়া হলো তখন। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ দাসী হৃদয় ও চোখের রাজ্যে স্থান করে নেওয়ার মতো। যদি আমি তাকে ছেড়ে আমার লক্ষ্য অর্জনে লেগে যাই, তাহলে তার প্রতি অবিচার হবে। আর যদি তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে আমার উদ্দেশ্যের ওপর জুলুম হবে। অথচ এখন তাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।' এ বলে তিনি দাসীটিকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[১৩৩]

ইসলামি ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরি পুণ্যবান লোকদের উন্নত হিম্মতের ভূরিভূরি ঘটনা। এসব ঘটনা জগৎ সংসারের প্রতিটি জিনিসের প্রকৃত তত্ত্বের ব্যাপারে তাদের গভীর দৃষ্টির বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ছড়িয়ে আছে ইথারে ইথারে। তারা মিথ্যা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত ছিলেন। নিজেদের তারা সম্পৃক্ত করেছিলেন একনিষ্ঠ দ্বীনের সাথে, সম্মান ও মর্যাদার দ্বীনের সাথে।

ইবনে শিহাব থেকে এমনই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'উমর বিন খাত্তাব ﷺ শামের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন। আমাদের সাথে আবু

....

১৩৩. নাফহুত তাইয়িব : ৪/৪৩

উবাইদা বিন জাররাহ ﷺ-ও ছিলেন তখন। সকলে অর্ভ্যথনার জন্য একটি অগভীর খালের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তখন উমর ﷺ একটি উটনীর ওপর বসা ছিলেন। তিনি উট থেকে নেমে নিজের পাদুকা খুলে তা কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। হাঁটতে লাগলেন উটনীর লাগাম ধরে। আর এভাবেই তিনি খালটিতে নেমে গেলেন। তখন আবু উবাইদা বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এমন কাজ করলেন? নিজের পাদুকা খুলে তা কাঁধে রাখলেন—উটনীর লাগাম ধরে খালে নেমে পড়লেন?! আমরা চাই না এই শহরবাসী আপনাকে এ অবস্থায় দেখে তাদের চোখ কপালে উঠে যাক।"

তখন উমর ﷺ বললেন, "হায়! আবু উবাইদা, যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথা বলত, তবে আমি তাকে এমন শাস্তি দিতাম—যা উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য দৃষ্টান্ত হতো। আমরা ছিলাম নিকৃষ্ট জাতি। এরপর আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। তাই আল্লাহ আমাদের যার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তা ভিন্ন অন্য কিছুতে যখনই আমরা সম্মান খুঁজতে যাব, আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।" অন্য বর্ণনায় আছে, "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার সৈন্যবাহিনী ও খ্রিষ্টান পাদরিরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে, অথচ আপনি এমন অবস্থায়?!" তখন উমর ﷺ বললেন, "আমরা এমন জাতি, আল্লাহ যাদের ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তাই আমরা অন্য কিছুর মাঝে সম্মান প্রত্যাশা করি না।'"

একদা ধূলিমলিন চেহারায় পুরোনো একটি জুব্বা পরে এক বেদুইন এল আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া ﷺ-এর কাছে। মুআবিয়া ﷺ-এর কাছে এটা অপছন্দনীয় মনে হলো। বেদুইন মুআবিয়া ﷺ-এর মুখ দেখেই সেটা টের পেল। সে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, জুব্বা আপনার সাথে কথা বলবে না; বরং কথা বলবে জুব্বার ভেতরে থাকা লোকটি।' মুআবিয়া ﷺ লোকটিকে কাছে ডেকে নিলেন। তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি ভাষা ও সাহিত্য অনেক উচ্চ স্তরের। তিনি তাকে নিজের বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এ ব্যাপারে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহান আলিমদের জীবনী এমন দৃষ্টান্তে ভরা। এমনই আরেকটি ঘটনা বলছি। ঘটনাটি শাইখুল ইসলাম ইমাম নববি ﷺ-এর। প্রথম দেখায় লোকে মনে করত, উনি গ্রামের একজন হতদরিদ্র

মানুষ। তাই শাইখকে কোনো কেয়ার করত না। ধারণাও করতে পারত না যে, ইনি এক বিশেষ মানুষ। কিন্তু যখন দেখত, তিনি দরস দিচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন বা হাদিস বর্ণনা করছেন—তখন সে লোকটাই বাকরুদ্ধ হয়ে যেত। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত যে, ইনি তো মূল্যবান এক রত্নভান্ডার। ইলম, জুহদ ও তাকওয়ার ময়দানের কিংবদন্তি। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, মাটি সোনা হতে পারে। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ সুন্দর আকৃতি-প্রকৃতি দেখেই প্রবঞ্চিত হয়েছে। মানুষের কর্ম এমন ভুলে ভরা। তারা কারও জাঁকজমক পোশাক দেখেই হকচকিয়ে যায়, গলে যায়। কিন্তু এ জমকালো পোশাকের পেছনে কী রয়েছে, সেটা লক্ষ করে না। তারা বাহ্যিক বেশভূষা দেখেই সম্মান করতে শুরু করে, মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেয়। অথচ দেখা যায়, যাকে তারা সম্মান করছে, যাকে তারা মর্যাদার আসনে আসীন করেছে, সে তার মোটেও উপযুক্ত নয়। সে যে ফাঁপা একটা লোক—খালি কলসি।

تَرَوْنَ بُلُوْغَ الْمَجْدِ أَنَّ ثِيَابَكُمْ * يَلُوْحُ عَلَيْهَا حُسْنُهَا وَبَصِيْصُهَا

وَلَيْـــسَ الْعُلَا دَرَّاعَةً وَرِدَاءَهَا *** وَلَا جُبَّةً مَوْشِيَّةً وَقَمِيْصَـــهَا

‘গায়ের জামার চাকচিক্য আর ঔজ্জ্বল্য দেখেই তোমরা কাউকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে দাও। কিন্তু কারুকাজ করা জুব্বা কিংবা জরিদার আলখাল্লা তো মর্যাদার মাপকাঠি নয়।’

মুতানাব্বি বলেন :

لَا يُعْجِبَنَّ مَضِيْمًا حُسْنُ بِزَّتِهِ *** وَهَلْ تَرُوْقُ دَفِيْنًا جُوْدَةُ الْكَفَنِ؟

‘নিকৃষ্ট ব্যক্তির আপন পোশাকের চাকচিক্যের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়। একটি লাশ কি কখনো তার কাফনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে?!’

সালাফের জীবনজীবিকার সংকীর্ণতা ও দারিদ্র্য সহ্য করার মতো অদম্য স্পৃহা ও ধৈর্য দেখে আমরা বিস্মিত হই। দ্বীনের হিফাজতে তারা কখনো অবরুদ্ধ হয়েছেন। কখনো সুন্নাহর সংরক্ষণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই তো বিখ্যাত ইমাম ইবরাহিম বিন ইসহাক হারবি ﷺ বলেন, ‘আমার জীবনের

ত্রিশটি বছর দুই রুটির ওপর কাটিয়েছি। যদি আমার মা বা বোন তা নিয়ে আসতেন, তবে আমি খেতাম। অন্যথায় দ্বিতীয় রাত পর্যন্ত ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতাম। আর বাকি ত্রিশ বছর কাটিয়েছি দিবারাত্রিতে একটি রুটি খেয়ে। যদি আমার স্ত্রী বা কোনো মেয়ে তা নিয়ে আসত, তবে খেয়ে নিতাম; অন্যথায় পরের রাত পর্যন্ত ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতাম।

আর এখন আমি অর্ধেক রুটি ও চোদ্দোটি খেজুর খাই, যদি তা ভালো মানের হয়। আর যদি নিম্ন মানের হয়, তাহলে বিশটির কিছু বেশি খাই। আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্ত্রী তার কাছে এক মাস অবস্থান করে। ফলে এই মাসে আমার ইফতার বাবদ খরচ হয়েছে এক দিরহাম ও আড়াই দানিক (দানিক হলো এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ।) গোসলখানায় প্রবেশ করে সাবান দেখিনি। তাই তাদের জন্য দুই দানিকে একটি সাবান কিনে আনি। ফলে পুরো রমাজানের খরচ দাঁড়িয়েছে এক দিরহাম ও সাড়ে চার দানিক।'

আবুল কাসিম বিন বুকাইর ﷺ বলেন, 'আমি ইবরাহিম আল-হারবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আমি এই রান্নাঘরের কিছুই চিনতাম না। আমি রাতের প্রথমাংশে আসতাম। আমার মা বেগুনভাজি অথবা এক চামচ চর্বি বা মুলার সবজি আমার জন্য প্রস্তুত করে রাখতেন, আমি তা-ই খেয়ে নিতাম।'

আবু আলি আল-খাইয়াত—যিনি 'আল-মাইয়িত' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি ইবরাহিম আল-হারবির সাথে তাঁর কক্ষে উপবিষ্ট ছিলাম। যখন আমরা প্রভাতে উপনীত হলাম, তখন তিনি বললেন, 'হে আবু আলি, তুমি এখন নিজের কাজে যাও। কারণ, আমার কাছে এখন একটি মুলা আছে, যার সবুজ অংশ গত রাতে খেয়েছি, আর বাকিটা দিয়ে এখনকার নাস্তা সারব।'

মুসলিম উম্মাহর রাজ্যজয়ের দ্রুততা দেখে ঐতিহাসিকগণ হতবাক হয়ে যান। কত দ্রুতই না তাদের সামনে দুটি সাম্রাজ্য শক্তির ধস নেমেছিল! আল্লাহর সাহায্যে সে বিজয় সম্ভব হয়েছিল। মুসলিমদের উত্থান ঘটেছিল পুরো বিশ্বময়। এই উম্মাহর মুজাহিদগণের সফলতার রহস্য অনুধাবন করতে পারেনি অনেক বাঘাবাঘা ঐতিহাসিকও। শুধু ফেরেশতাদের সাহায্যেই মুমিনগণ দৃঢ় থাকতে পেরেছেন বিষয়টা এমন নয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সাহায্য করেছেন

জ্ঞান, বুদ্ধি, মূল্যবোধ ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমেও। যারা মানবসমাজের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবেন, তাদের জন্য এটা জরুরি ছিল। অন্যান্য মূল্যবোধহীন পতনশীল মতবাদ, নষ্ট বিশ্বাস ও জরাজীর্ণ সকল আদর্শ থেকে যথাসম্ভব দ্রুত নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে এটা অত্যাবশ্যক ছিল। অনেক সময় উভয়পক্ষের মাঝে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বাকযুদ্ধও হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার বিধান ও তাঁর অনুপম আইনকানুন সৃষ্টিকে অনুকূলে নিয়ে একটি কল্যাণকর বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করবে, এটা অবধারিত ছিল। এটা হওয়ার ছিল আর তা-ই হয়েছে। মিথ্যা যত অগণিত সংখ্যায় আসুক না কেন, সত্যই টিকে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

> 'ফেনা তো উবে যায়, আর যা মানুষের জন্য উপকারী, তা জমিনে স্থিতিশীল হয়। এভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়ে (মানুষকে বুঝিয়ে) থাকেন।'[১৩৪]

দুটি সভ্যতার মধ্যকার এমন কিছু বাকযুদ্ধের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি এখানে। আল্লাহর দলের সংশোধনের জন্য সামরিক যুদ্ধের আগে এ বাকযুদ্ধের ফলাফল ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'আমর বিন আস ﵁ নিজ বাহিনী নিয়ে মিশরের শাসক মুকাওকিসের কাছে পৌঁছালেন। আমর ﵁ দশজনের একটি বাহিনী তার কাছে প্রেরণ করলেন। তাঁদেরই একজন উবাদা বিন সামিত ﵁। তিনি খুব কালো ছিলেন। আমর ﵁ তাঁকেই আদেশ দিলেন কথা বলার জন্য। মুসলিমদের মুখপাত্র ছিলেন তিনি। আর রোমানদের সামনে দাওয়াতের তিনটি দিক উল্লেখ করা হবে, তাদের এ তিনটি থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে।

মুসলিম দূতগণ মুকাওকিসের দরবারে প্রবেশ করলেন। তাঁদের সর্বাগ্রে ছিলেন উবাদা ﵁। মুকাওকিস উবাদা ﵁-এর কালো ও লম্বা দেহ দেখে ভয় পেয়ে

....

১৩৪. সুরা আর-রাদ : ১৭

গেল। বলল, "তোমরা এ লোকটিকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখো। আমার সাথে কথা বলতে অন্য কাউকে পাঠাও।"

তখন সবাই সমস্বরে বললেন, "এই কালো লোকটিই আমাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমাদের নেতা, আমাদের অগ্রাধিনায়ক। আমরা তাঁর কথা ও মতামতের ওপর ভিত্তি করে কাজ করি। আমাদের আমির তাঁকে যে আদেশ দিয়েছেন, তা অন্য কাউকে দেননি। আমির বলেছেন, তাঁর কথা ও সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু যেন আমরা না করি।" মুকাওকিসের জন্য তাঁদের কথা বড়ই বিস্ময়কর ছিল। তাঁরা আরও বললেন, "আমাদের মাঝে সাদা-কালো সমান। আর আমাদের মাঝে রঙের কারণে কেউ শ্রেষ্ঠ হয় না; বরং শ্রেষ্ঠত্বের গুণ ও জ্ঞান যার আছে, সেই শ্রেষ্ঠ।""[১৩৫]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উবাদা বিন সামিত ﵁-এর উপস্থিতিতে মুকাওকিস বিরক্তিবোধ করছিল। সে ধারণা করেছিল, আমর ﵁ উবাদাকে তার সাথে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছে তাকে হেয় ও তুচ্ছ করার জন্য। যখন দেখল যে, মুসলিম দূতদের সকলেই তাঁকে নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে উল্লেখ করছেন, তখন মুকাওকিস তাঁর সাথে কথা বলার বিকল্প দেখল না। তাই তাঁকে নম্রতার সাথে কথা বলার ইশারা করল, যাতে তার মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। তখন উবাদা ﵁ বললেন, 'আমার যে সকল সাথিকে পেছনে রেখে এসেছি, তাঁদের মাঝে এক হাজার লোক আছে, যাঁরা আমার চাইতে বেশি কালো। আর আমি শত্রুপক্ষের একশ লোককেও ভয় করি না, যদি তারা সকলে মিলেও অস্ত্র দিয়ে আমাকে সংবর্ধনা জানাতে আসে। আর আমার সাথিদেরও একই অবস্থা। এটি এ কারণেই যে, আমাদের জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আমরা পার্থিব কোনো জিনিসের জন্য আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করি না, অথবা দুনিয়ার ধনদৌলত বৃদ্ধিও আমাদের টার্গেট নয়। কেননা, দুনিয়াতে আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য সামান্য কিছু খাবার, যা দিয়ে আমাদের দিনরাতের ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং সামান্য কাপড়, যা দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখা যায়। বস্তুত দুনিয়ার আরাম প্রকৃত আরাম নয়; দুনিয়ার সুখও প্রকৃত সুখ নয়। প্রকৃত আরাম ও সুখশান্তি তো আখিরাতে। আল্লাহ তাআলা ও আমাদের নবি আমাদের এমনটিই আদেশ

১৩৫. আল-খুতাত লিল মুকরিজি : ১/২৯২

করেছেন। আর আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমাদের সকলের দুনিয়াবি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে, যৎসামান্য খাবারে ক্ষুধা নিবারণ এবং লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড়। আর বাকি সব ব্যস্ততা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদকে কেন্দ্র করে।'[১৩৬]

উবাদা ﷺ-এর কথাগুলো মুকাওকিসের হৃদয়ে হাতুড়ির মতো আঘাত করল। সে তার সাথিদের বলল, 'তোমরা কি এ লোকের কথার মতো কাউকে কথা বলতে শুনেছ!... আল্লাহ এ লোক ও তাঁর সাথিদের পৃথিবীকে বিনষ্ট করার জন্য উত্থান করেছেন।'

এরপর সে উবাদা ﷺ-এর সাথে উপদেশের মোড়কে ত্রাস সৃষ্টির পন্থায় কথা বলল :

'হে ভদ্রলোক, তুমি নিজের ও সাথিদের ব্যাপারে যা বললে আমি তা শুনেছি। আমার জীবনের শপথ, তোমরা যাদের কাছেই পৌঁছেছ এবং যাদের ওপরই বিজয় লাভ করেছ, শুধু দুনিয়ার প্রতি তাদের ভালোবাসা আর আসক্তির কারণেই সক্ষম হয়েছ। মনে রেখো, আমাদের সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমের সে বাহিনী আগমন করছে—যারা সংখ্যায় অগণিত, যারা শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব সম্পর্কে সুবিদিত—তারা কারও মুখোমুখি হলে বা কারও সাথে যুদ্ধ করলে কোনো কিছুর পরোয়া করে না। আর আমরা জানি যে, তোমরা তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে না। দুর্বলতা ও স্বল্পতার কারণে তোমরা তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে পারবে না। তাই আমাদের কাছে ভালো মনে হয়, এই ভিত্তিতে তোমাদের সাথে সন্ধি করে নিই যে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুই দুই দিনার, তোমাদের আমিরের জন্য একশ এবং খলিফার জন্য এক হাজার দিনার ধার্য করব। তোমরা তা নিয়ে নিজেদের ভূমিতে ফিরে যাবে এমন বাহিনীর হাতে পাকড়াও হওয়ার আগে, যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।'[১৩৭]

এ কথা শুনে উবাদা বিন সামিত ﷺ তার ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। শরীরের সব জোর দিয়ে, উচ্চ আওয়াজে ইমান ও দৃঢ়তার সাথে বললেন :

....

১৩৬. আল-খুতাত লিল মুকরিজি : ১/২৯৩

১৩৭. আল-খুতাত লিল মুকরিজি : ১/২৯৩

'হে প্রবঞ্চিত, নিজেকে ও নিজ সাথিদের এ ধোঁকায় ফেলে রেখো না যে, আমরা মুসলিমরা রোমান বাহিনী ও তাদের সংখ্যাধিক্যে ভয় পেয়ে যাব। (ভেবো না) আমরা মুসলিমরা তাদের কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। আমার জীবনের শপথ, আমরা এতে কোনো ভয় পাই না। এমন কোনো জিনিসে আমরা ভীত নই, যা নিজ অবস্থান থেকে আমাদের টলাতে পারে।... যদি আমাদের শেষ ব্যক্তিও নিহত হন, তবুও আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রত্যাশী। বস্তুত আমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক চক্ষুশীতলকারী এবং অধিক প্রিয় কোনো জিনিস নেই। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে বলেন :

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। বস্তুত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন!"[১৩৮]

আমাদের প্রতিটি লোক সকাল-সন্ধ্যায় আপন রবের নিকট শাহাদাত কামনা করে। প্রার্থনা করে আল্লাহ তাআলা যেন তাকে নিজ ভূমি, পরিবার ও সন্তানসন্ততির নিকট ফিরিয়ে না নেন। প্রার্থনা করে যেন জিহাদের পথে মৃত্যু দিয়ে, শাহাদাতের সৌভাগ্য দিয়ে তাঁর কাছে উঠিয়ে নেন। সুতরাং তুমি নিজের কথা পরিষ্কার করে বলো। আমাদের ও তোমাদের মাঝে শুধু তিনটি বিষয়ই গৃহীত হতে পারে। আমরা শুধু এ তিনটি বিষয়েই সাড়া প্রদান করব। এর যেকোনোটি ইচ্ছা তুমি বেছে নিতে পারো। তবে নিজেকে ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়ো না। এ তিনটি বিষয়েই আমাদের আমির ও খলিফা নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এর পূর্বে আমাদের রাসুল আমাদের এ তিনটি বিষয়েই আদেশ করেছেন।'[১৩৯]

মুকাওকিস উবাদা ﷺ-কে কিছুটা নমনীয় করতে চাচ্ছিল। সে চাচ্ছিল, তার পেশকৃত প্রস্তাব উবাদা ﷺ গ্রহণ করে নিক। কিন্তু তাতে সে সফল হলো না। কেমন যেন তার কথাগুলো কেউই শুনতে পায়নি। অন্যদিকে উবাদা ﷺ-এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে তিনি আকাশের দিকে হাত উঁচু করে বললেন, 'না!

....

১৩৮. সুরা আল-বাকারা : ২৪৯

১৩৯. আল-খুতাত লিল মুকরিজি : ১/২৯৪

এই আসমানের অধিপতির শপথ, এ জমিনের অধিপতি মহান পালনকর্তার শপথ, শপথ প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালকের, আমাদের কাছে তোমাদের জন্য এই তিনটি বিষয় ব্যতীত আর কোনো অবকাশ নেই। তাই নিজেদের জন্য যেকোনোটি বেছে নাও।'[১৪০]

তখন মুকাওকিস নিজ সাথিদের সাথে সলা-পরামর্শের জন্য একত্রিত হলো। তার সাথিরা বলল, 'প্রথম শর্তে—ইসলাম গ্রহণে—আমরা কখনোই সাড়া দেবো না। ইসা ﷺ-এর দ্বীন ছেড়ে অপরিচিত কোনো দ্বীন গ্রহণ করব না।' এ বলে তারা ইসলাম গ্রহণের শর্তটি ত্যাগ করল। এখন তাদের সামনে জিজিয়া বা যুদ্ধ ব্যতীত কোনো পথ রইল না। এ ব্যাপারে তারা বলল, 'জিজিয়ার শর্তে গেলে মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের জিজিয়া প্রদান করতে হবে। আমরা কারও গোলাম হতে প্রস্তুত নই। এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।' তখন উবাদা رضي الله عنه তাদের প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যদি তারা জিজিয়া দেয়, তারা নিজেদের, নিজ ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের জানের নিরাপত্তা পাবে। তাদের স্বদেশে নিজেদের সম্পদে তারা দখলে থাকবে এবং নিজেরা পরস্পর সেসব সম্পদের ওয়ারিশ হবে। তাদের গির্জাগুলো নিরাপদ থাকবে। তাদের ধর্মীয় কার্যাবলিতে কেউ প্রতিবন্ধক হবে না।'

তখন মুকাওকিস তার সাথিদের বলল, 'তোমরা আমাকে উত্তর দাও। তিনটি শর্তের যেকোনো একটিতে সাড়া দাও। আল্লাহর শপথ, তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি তোমরা তাদের অধীন হয়ে তাদের জবাব না দাও, তবে সবচেয়ে কঠিন শর্তটি তোমাদের ওপর আপতিত হবে।'[১৪১]

এভাবেই আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাগণ জান্নাতের চাবিকাঠি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে সাথে নিয়ে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে বিজয়ের নিশান উড়িয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তিধর কোনো রাজ্য ছিল না। দুর্গের পর দুর্গ জয় করেছেন তাঁরা। জয় করেছেন মানুষের হৃদয়রাজ্যও। যোগ্যদের হাতে নেতৃত্বভার হস্তান্তরিত হলো। মূল্যবোধের মাপকাঠি সঠিকতা লাভ করল। সামনে আরেকটি দৃশ্য উপস্থাপিত হচ্ছে, যে ঘটনা স্পষ্ট করে দেবে মানুষের জন্য উদ্ভূত

১৪০. ইবনু আব্দিল হাকাম কৃত ফুতুহু মিসর : ৫৯-৬৩
১৪১.ফুতুহু মিসর। দেখুন, আমর ইবনুল আস বাইনা ইয়াদাইত তারিখ। পৃষ্ঠা নং ১৫৮-১৬০।

শ্রেষ্ঠ উম্মতকে মুহাম্মাদি শিক্ষা ও তারবিয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। পার্থিব বিষয় নিয়ে তাঁদের ব্যস্ততা ছিল কম। তাঁদের চিন্তা ছিল দুনিয়া এক তুচ্ছ বস্তু। বস্তুত দুনিয়ার ব্যাপারে এমন বিশ্বাসই যথার্থ। অন্যদিকে তাঁদের চিন্তারাজ্যে ছেয়ে ছিল আখিরাত। তাঁদের সকল ভাবনার কেন্দ্র আখিরাতের অর্জনই ছিল তাঁদের পরম লক্ষ্য। আর এটাই তো যথার্থ ও যথোপযুক্ত। কারণ, আখিরাতের জীবনই চিরস্থায়ী। আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। ঘটনাটি এমন—

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﵁ অবস্থান গ্রহণ করলেন কাদিসিয়া প্রাঙ্গণে। সাথে মুসলিম সেনাবাহিনী। যাঁদের সংখ্যা সাত হাজারের বেশি নয়। আর মুশরিকরা প্রায় ত্রিশ হাজার। মুসলিমদের তিরন্দাজ বাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম ছিল পারস্যদের নিকট হাস্যকর। তারা এগুলোকে সুতা কাটার যন্ত্রের সাথে তুলনা করে ব্যঙ্গ করতে থাকল। তারা 'চরকা চরকা' বলে হাসিঠাট্টা করছিল। মুসলিমদের অবজ্ঞা করে বলছিল, 'তোমাদের না আছে জনবল, আর না অস্ত্রশস্ত্র! কোন জিনিস তোমাদের এখানে নিয়ে এল? তোমরা ফিরে যাও, প্রাণ বাঁচাও!'

যখন মুসলিম প্রতিনিধিদল পারস্য-সম্রাট ইয়াজদিগার্দের কাছে এল, পারস্যবাসী তাদের ও তাদের ঘোড়ার অবস্থা দেখে নাক সিঁটকাতে লাগল। দরবারে প্রবেশ করল মুসলিম প্রতিনিধিদল। ইয়াজদিগার্দ তাদের বসতে বলল। ইয়াজদিগার্দ ছিল ভারি অভদ্র। প্রথমে তাদের মাঝে দুভাষীর বিষয় উত্থাপিত হলো। সে বলল, 'তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের গায়ে জড়ানো এ নর্দমার পোশাককে তারা কী বলে?' ইয়াজদিগার্দের কথা বলা উচিত ছিল মুসলিমদের তার কাছে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সে পোশাক নিয়ে কথা তুলে হাসি-তামাশা করতে শুরু করে।

যখন নুমান বিন মুকরিন ইয়াজদিগার্দের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন শেষ কথায় সে বলল, 'আমার জানা নেই যে, পৃথিবীতে তোমাদের মতো হতভাগা, স্বল্পসংখ্যক ও মন্দ কোনো জাতি ছিল কি না। আমরা তোমাদের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা অনুভব করতাম। তাই তোমাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে এতদিন বিরত ছিলাম। তোমরা পারস্যের সাথে যুদ্ধ করতে এসো না। তাদের দিকে লোভের কদম ফেলো না। তোমাদের সাথে যদি আরও সৈন্যসংখ্যা এসে মিলিতও হয়, তবুও তোমরা আমাদের ব্যাপারে প্রতারিত হোয়ো না। ভুল ধারণা কোরো না যে,

তোমরা আমাদের কিছু করতে পারবে। যদি ভরণপোষণের কষ্টের কারণে তোমরা এখানে এসে থাকো, তবে আমরা তোমাদের উর্বর জমিতে খাদ্যের ব্যবস্থা করব, তোমাদের সম্মানিত করব এবং তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করব। আর তোমাদের জন্য একজন শাসক নিয়োগ করে দেবো, যে তোমাদের সাথে কোমল আচরণ করবে।' এসব শুনে সবাই নীরব হয়ে গেল। তখন মুগিরা বিন জিরারাহ উসাইদি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন :

'হে সম্রাট, তুমি আমাদের সম্পর্কে না জেনে যা তা বলে যাচ্ছ। তুমি আমাদের যে মন্দ অবস্থা তুলে ধরলে আমাদের অবস্থা তার চেয়েও মন্দ ছিল। আর আমাদের ক্ষুধার বিষয়টি অন্য কারও ক্ষুধার সাথে তুলনা হয় না। গুবরে পোকা, বিচ্ছু ও সাপ ছিল আমাদের খাদ্য।

জমিন ছিল আমাদের ঘর। আর পোশাক ছিল উট ও ভেড়ার পশম দিয়ে তৈরি। এগুলোই পরতাম আমরা। আমাদের ধর্ম ছিল একে অপরকে হত্যা করা; একে অপরের ওপর আঘাত হানা। মেয়ে-সন্তান জন্ম নিলে আমাদের ধনসম্পদ খাবে, কিন্তু আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না, এই ভেবে আমরা মেয়ে-সন্তান জন্মালে নিজের জীবন্ত মেয়েকে দাফন করে ফেলতাম। ইতিপূর্বে আমাদের অবস্থা এমনই ছিল, যা আমি এতক্ষণ বললাম।

এরপর আল্লাহ আমাদের নিকট একজন পরিচিত লোক পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ সম্পর্কে জানি। জানি, তাঁর চেহারা ও জন্মস্থান বিষয়ে। তাঁর ভূমি ছিল শ্রেষ্ঠ ভূমি। বংশ ছিল আমাদের মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশ। তাঁর গৃহ ছিল সবচেয়ে সম্মানিত গৃহ। তাঁর গোত্র ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র। এমনকি তিনি নিজেও ছিলেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে সত্যবাদী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি আমাদের একটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করলেন। তাঁর ডাকে তাঁর সমবয়সী বন্ধুই প্রথমে সাড়া দিলেন। যিনি তাঁর পর খলিফা হয়েছেন। তিনি আমাদের আহ্বান করতে থাকলেন; কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করতে থাকলাম। তিনি আমাদের সত্য পথের দাওয়াত দিতে থাকলেন, কিন্তু আমরা তাঁকে মিথ্যুক বলতে কসুর করলাম না। তিনি যথার্থ বর্ণনা করছিলেন, আর আমরা ভুল করছিলাম। তিনি যেভাবে বলতেন, সেভাবেই ঘটত। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদের হৃদয়ে তাঁর ব্যাপারে সত্যায়ন ও আনুগত্যের বারি বর্ষণ করলেন।

ফলে তিনি আমাদের ও রাব্বুল আলামিনের মাঝে একটি মাধ্যম হয়ে গেলেন। তিনি যা-ই বলতেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলতেন। যা আদেশ করতেন, তা আল্লাহরই আদেশ।

তিনি আমাদের বলেন, "তোমাদের রব বলেছেন, "আমিই এক আল্লাহ। আমার কোনো শরিক নেই। যখন কিছুই ছিল না, আমি ছিলাম। তোমাদের প্রতি আমার দয়া হলো। তাই আমি এই ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠালাম। যাতে আমি তোমাদের সে পথ দেখাতে পারি, যে পথে চললে মৃত্যুর পর তোমরা আমার আজাব থেকে রক্ষা পাবে। যাতে তোমাদের শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারি।" আমরা সাক্ষ্য দিলাম, তিনি মহান সত্তার পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে তোমাদের সাথে এ আদর্শ অনুসরণ করবে, সে তা-ই পাবে, যা তোমরা পাও। তার ওপর সে দায়িত্ব বর্তাবে, যা তোমাদের ওপর রয়েছে। আর যে অস্বীকার করবে, তার ওপর তোমরা কর আরোপ করবে। এরপর তোমরা নিজেদের মতো তাদেরও নিরাপত্তা দেবে। আর যে এটাও করতে অস্বীকার করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তোমাদের মাঝে ফয়সালাকারী। তোমাদের মধ্যে যে নিহত হবে, তাকে আমি নিজ জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে বেঁচে থাকবে, তাঁকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করব।" সুতরাং তুমি চাইলে নিজ হাতে অপদস্থ অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করবে। আর চাইলে তরবারির মাধ্যমে সমাধান করবে। না হয় মুসলিম হয়ে নিজেকে মুক্তি দেবে।'

ইয়াজদিগার্দ বলল, 'তুমি আমাকে এই নিয়ে সংবর্ধনা জানাতে এসেছ!?'

মুগিরা ﷺ বললেন, 'আমি যার সাথে কথা বলি, তাকেই সংবর্ধনা জানাই; যদি অন্য কেউ কথা বলত, তবে তোমাকে সংবর্ধনা জানাতাম না।'

ইয়াজদিগার্দ বলল, 'যদি দূত হত্যা নিষিদ্ধ না হতো, তবে আমি তোমাদের হত্যা করতাম। আমি জিজিয়া শর্তে রাজি নই। তোমরা কিছুই পাবে না।'

মুগিরা ﷺ বললেন, 'তুমি আমাদের এক টুকরি মাটি দিয়ে দাও।'

ইয়াজদিগার্দ বলল, 'এদের শ্রেষ্ঠ লোকদের মাথায় কিছু মাটি দিয়ে দাও। এরপর

মাদায়িন শহর থেকে এদের তাড়িয়ে দাও। তোমরা নিজ সাথিদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের জানিয়ে দাও যে, আমি তোমাদের কাছে রুস্তমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমাদের ও তোমাদের আমিরকে কাদিসিয়ার গর্তে দাফন করে দেবে। তোমাদের এমন শাস্তি দেবে, যা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকবে। এরপর তাকে তোমাদের ভূমিতে পাঠিয়ে দেবো। সম্রাট সাফুর তোমাদের কী কষ্ট দিয়েছিল, রুস্তম তোমাদের তার চাইতে বহুগুণে নিষ্পেষিত করে ছাড়বে।'...

আসিম বিন আমর মাটির টুকরিটি মাথায় নিয়ে নিলেন। এটাকে তিনি পারস্য-ভূমি জয়ের আলামত গণ্য করলেন। যেমন রুস্তম এটাকে গণ্য করেছিল একটি অশুভ লক্ষণ হিসেবে। সে মনে করেছিল, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হাতে তাদের রাজ্য ও সন্তানসন্ততি সঁপে দিচ্ছেন।

এরপর পারস্য-সম্রাট সেনাবাহিনী পাঠাল আক্রমণের জন্য। সবার অগ্রভাগে রুস্তম। রুস্তম এসে মুসলিম সেনাবাহিনীর শেষ প্রান্ত 'আকিক' নামক স্থানে থামল।

তখন 'জুহরা' নামক এক মুসলিম দূত হিসেবে তার কাছে গেলে রুস্তম বের হয়ে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে জুহরার সাথে সন্ধি করতে চাইল। তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে মুসলিমদের ফিরিয়ে দিতে চাইল। বলল যে, 'তোমরা আমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের একটি দল আমাদের অধীনস্থই ছিল।'...

তখন জুহরা বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ। বিষয়টি তেমনই ছিল। কিন্তু আমরা আর আগের সেসব লোকের মতো নেই। তারা যা চাইত, সেসবের কিছুই আমরা চাই না এখন। আমরা তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও প্রত্যাশা হলো, আখিরাত। আমরা তেমনই ছিলাম, যেমন তুমি উল্লেখ করেছ। আমাদের যে কেউ তোমাদের কাছে আসত, তোমাদের অনুগত হয়ে যেত। তোমাদের হাতে যা আছে, তার জন্য অনুনয়-বিনয় করত। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠালেন। তিনি আমাদের রবের দিকে আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। আল্লাহ তাঁর নবিকে বললেন, "আমি মুসলিমদের এই দলটিকে আমার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসীদের ওপর কর্তৃত্ব দান করব। এদের

মাধ্যমে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা দ্বীনের ওপর অবিচল থাকবে, আমি তাদের জন্য বিজয় অবধারিত করে রাখব। আর এটিই সত্য দ্বীন। যে দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে লাঞ্ছিত হবে। যে দ্বীন আঁকড়ে ধরবে, সে সম্মানিত হবে।'''

রুস্তম বলল, 'সে দ্বীন কী?'

জুহরা বললেন, 'যা ছাড়া কোনো কিছুই বিশুদ্ধ হয় না, সে দ্বীনের ভিত্তি হলো, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্বীকার করে নেওয়া।'

রুস্তম বলল, 'কতই না চমৎকার কথা! আর কিছু আছে?'

জুহরা বললেন, 'মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যাওয়া।'

রুস্তম বলল, 'সুন্দর কথা, আর কিছু আছে?'

জুহরা বললেন, 'মানুষ হলো আদম ও হাওয়া ﷺ-এর বংশধর। সকলে একই পিতামাতার সন্তান। সকলে ভাইবোন।'

রুস্তম বলল, 'অতি উত্তম কথা!'

এরপর রুস্তম বলল, 'যদি আমি তোমাদের এ বিষয়টিতে বিশ্বাস করে নিই এবং আমার সাথে আমার জাতিও তা করে নেয়, তাহলে তোমরা আমাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবে? তোমরা কি ফিরে যাবে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই, আল্লাহর শপথ, আমরা আর কখনোই তোমাদের দেশে আসব না, শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনো প্রয়োজন ছাড়া।'

রুস্তম বলল, 'আল্লাহর শপথ, তুমি সত্য বলেছ। তবে পারস্যবাসী উরদুশির শাসনভার গ্রহণের পর থেকে কাউকে নিজের নীচু কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে

আসতে দেয়নি। তারা বলত, “নিজেদের কর্ম থেকে বের হয়ে গেলে সীমালঙ্ঘন হয়ে যাবে এবং নেতাবর্গের বিরোধিতা হবে।”’

জুহরা বললেন, ‘আমরা মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আমরা তোমাদের কথার মতো হতে সক্ষম নই। আমরা নিম্ন অবস্থানে থেকেও আল্লাহর আনুগত্য করব। আল্লাহর অবাধ্যতাকারীরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’

এরপর তিনি চলে এলেন। কিন্তু রুস্তম অন্য একজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। এরপর সাদ ﷺ রিবয়ি বিন আমির ﷺ-কে পাঠালেন রুস্তমের কাছে। রুস্তম তার কক্ষটি গালিচা ও রেশমের কার্পেট দিয়ে সজ্জিত করে নিয়েছিল। দামি দামি মণি-মুক্তা ছড়িয়ে রেখেছিল। তার মাথায় ছিল একটি মুকুট। এ ছাড়াও আরও অনেক মূল্যবান জিনিস দিয়ে সে সবকিছু সাজিয়ে নিল। সে সোনার তৈরি খাটে বসল। রিবয়ি ﷺ এসে তার মজলিসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে ছিল ভারী একটি পোশাক। সাথে ছিল একটি ঢাল ও ছোট একটি ঘোড়া। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেই সামনে বাড়তে লাগলেন এবং ঘোড়া দিয়ে গালিচার একপার্শ্ব মাড়িয়ে চললেন। এরপর নেমে গালিচার ওপর থাকা কিছু বালিশের সাথে তা বেঁধে দিলেন। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। তার অস্ত্র ও বর্ম সাথেই ছিল। মাথার শিরস্ত্রাণ মাথায় থাকল। লোকেরা বলল, ‘অস্ত্র রেখে যাও।’ তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের নিকট স্বপ্রণোদিত হয়ে আসিনি। আমাকে তোমরাই ডেকে এনেছ। যদি আমাকে এভাবেই থাকতে দাও, তাহলে ভালো; অন্যথায় আমি ফিরে গেলাম।’ তখন রুস্তম বলল, ‘তাকে আসতে দাও।’ তিনি নিজ বর্শার ওপর ভর করে গালিচার ওপর আঘাত করতে করতে সামনে এগিয়ে গেলেন। এভাবে গালিচার অনেকখানি ছিদ্র করে দিলেন তিনি।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ‘কেন তোমরা এখানে এসেছ?’

তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা আমাদের পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যেতে পারি। তাদের দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে পারি। অন্যান্য ধর্মের জুলুম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে যেতে পারি। তিনি আমাদের তাঁর দ্বীন নিয়ে নিজ বান্দাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তাদের আমরা দাওয়াত দিই। যে

আমাদের থেকে তা গ্রহণ করবে, আমরাও তার থেকে তা গ্রহণ করে নেব; (সেখান থেকে) ফিরে যাব এবং তাকে ও তার ভূমিকে ছেড়ে যাব। কিন্তু যে তা অস্বীকার করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বস্তু পেয়ে যাই।'

রুস্তম বলল, 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কী?'

রিবয়ি ﵁ বললেন, 'অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করে যে মারা যাবে, তাঁর জন্য জান্নাত; আর যে জীবিত থাকবে, তাঁর জন্য বিজয়।'

তখন রুস্তম পারস্যের নেতাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের অভিমত জানতে চাইল। সে বলল, 'তোমরা কী বলো? তোমরা কি এ লোকের কথার চেয়ে স্পষ্ট ও শক্তিশালী কথা ইতিপূর্বে কখনো শুনেছ?' তারা বলল, 'হায়, তুমি কোন বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে গেলে? এই কুকুরের কথায় নিজের দ্বীনকে পরিত্যাগ করবে? তুমি কি এর কাপড়ের দিকে লক্ষ্য করছ না?' রুস্তম বলল, 'তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা তাঁর কাপড়ের প্রতি তাকিও না। তাঁর কথা, অভিমত ও আদর্শের প্রতি লক্ষ করো।' এরপর লোকেরা রিবয়ি ﵁-এর দিকে এগিয়ে এল তাঁর অস্ত্র নিয়ে নিতে।...

পারস্যবাসী হকের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। যুদ্ধ বেছে নিল। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। পারস্যবাহিনী পরাজিত ও বন্দী হলো।

পারস্য-সম্রাট ইয়াজদিগার্দ চীনা-সম্রাটের কাছে সৈন্য চেয়ে দূত পাঠাল এবং তাকে মুসলিমদের অবস্থার বিবরণ দিল। চীনা-সম্রাট উত্তরে জানাল, 'আমি তোমার জন্য এমন এক বাহিনী প্রেরণ করতে পারি, যার শুরুর অংশ থাকবে সিরিয়ায় এবং শেষ অংশ থাকবে চীনে। কিন্তু যদি এ লোকদের অবস্থা বাস্তবে এমনই হয়, যেমন তুমি বলেছ, তাহলে বিশ্বের সবাই মিলেও তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তাই আমি মনে করি, তুমি তাদের সাথে সন্ধি করে নাও। তাদের অধীনে ও ন্যায়পরায়ণতার ছায়ায় বসবাস করো।'[১৪২]

১৪২. ইফাদাতুল আখইয়ার বি বারায়াতিল আখইয়ার : ১/৩৮। দেখুন, তারিখুত তাবারি : ৩/৪৯৬ ও পরের পৃষ্ঠাগুলো। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৩৯; শাইখ সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-আবুদ কৃত ফিকরাতুল কাওমিয়্যাতিল আরাবিয়্যা : ৩৩৩-৩৪০।

উচ্চ মনোবলের অধিকারী নিজ গুণে মহান, বাপ–দাদার উত্তরাধিকারে নয়

যে ব্যক্তি নিজ গুণে নেতার আসনে সমাসীন হন, আরবিতে তাকে (العصامي) 'আল-ইসামি' বলা হয়।

পক্ষান্তরে (العظامي) 'আল-ইজামি' বলা হয় সে ব্যক্তিকে, যে বাপ-দাদার উত্তরাধিকারসূত্রে নেতা হন। 'আল-ইসামি' উপাধিটি ইসাম বিন শাহির-এর সাথে সম্পৃক্ত। ইসাম ছিলেন আরবের হিরা অঞ্চলের রাজা নুমান বিন মুনজিরের সভাপ্রহরী—ইসাম জ্ঞানী ও পরিশ্রমী ছিলেন। স্বয়ং রাজা নুমান তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন[১৪৩]—নাবিগা জুবাইনি জাহিলি যুগের শেষপর্যায়ের একজন প্রসিদ্ধ কবি। একবার রাজা নুমানের অসুখ হয়। কবি নাবিগা তাকে দেখতে যান। কিন্তু ইসাম কবিকে ভেতরে যেতে দিলেন না। এ ব্যাপারে নাবিগা বলেছিলেন :

فَإِنِّيْ لَا أَلُوْمُكَ فِيْ دُخُوْلٍ *** وَلَكِنْ مَا وَرَائَكَ يَا عِصَامُ؟

'আমাকে তুমি ঢুকতে দাওনি, সে জন্য তিরস্কার করি না তোমায়। তবে আমায় বলো, হে ইসাম, ভেতরের কী খবর?'

এ নাবিগা পরবর্তী সময়ে ইসামের প্রশংসা করে। কারণ, ইসাম নিজগুণে নেতৃত্বের আসন পেয়েছিলেন। নাবিগা বলেন :

نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَامَا * وَعَلَّمَتْهُ الْكَرَّ وَالْإِقْدَامَا

فَصَيَّرَتْهُ مَلِكًا هُمَامَا

'ইসাম নিজগুণে নেতৃত্ব পেয়েছে। নিজেকে আক্রমণ ও অগ্রসরের নীতি শিখিয়েছে। ফলে সে আত্মপ্রকাশ করেছে এক মহান রাজা হিসেবে।'

১৪৩. অনুবাদক

نفسُ عصامٍ سودت عصامًا (ইসাম নিজগুণে নেতৃত্ব পেয়েছে) এ কথাটি আরবি বাগধারার রূপ পরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি নিজের বংশমর্যাদার ওপর ভিত্তি না করে নিজেই নিজের মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করে, তার ক্ষেত্রে এ বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়।

তবে ইসামকে আরবরা খারিজিও বলে থাকে। কারণ, সে নিজের পূর্বপুরুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াই নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছে। ইসামের আগে তার দাদা-পরদাদা ও তার গোত্রের কেউই এমন মর্যাদা, সম্মান ও সুখ্যাতি পায়নি। ইসামই যেহেতু মর্যাদা, সম্মান ও সুখ্যাতিতে তার বংশ ও গোত্রের পরিধির বাইরে আসতে পেরেছিল, তাই তাকে খারিজি বলেছে আরবরা। কবি বলেন :

أَبَا مَرْوَانَ لَسْتَ بِخَارِجِيٍّ *** وَلَيْسَ قَدِيْمُ مَجْدِكَ بَانْتِحَالِ

'হে আবু মারওয়ান, তুমি খারিজি নও। তুমি পুরোনো বংশমর্যাদার ধারণকারী কোনো পরগাছা নও, এটাই যথেষ্ট।'

ইসামি—যার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হলো নিজের গুণ। বংশীয় মর্যাদা নয়। আর বংশপরিচয় না থাকাও জাহিলি যুগে তার মর্যাদায় এতটুকু আঁচড়ও লাগায়নি। তার হিম্মতই তার বংশ ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। আমির বিন তুফাইল আমিরি বলেন :

إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابنَ سَيِّدِ عَامِرٍ ** وَفَارِسَهَا الْمَشْهُورَ فِي كُلِّ مَوْكِبِ

فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ *** أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوَ بِأُمٍّ وَلَا أَبِ

وَلَكِنَّنِي أَحْمِي حِمَاهَا وَأَتَّقِي *** أَذَاهَا وَأَرْمِي مَنْ رَمَاهَا بِمَنْكِبِ

'যদিও আমি সর্দার আমিরের পুত্র এবং তার প্রতিটি শোভাযাত্রার প্রসিদ্ধ ঘোড়সওয়ার—তবুও আমির আমাকে তার উত্তরাধিকার হওয়ার কারণে নেতা বানায়নি। বাপ-দাদার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দেননি। বরং আমি সিংহাসন আগলে রেখেছি, সমস্যাগুলো সমাধান করেছি এবং সব আক্রমণ নিজ হাতে প্রতিহত করেছি।'[১৪৪]

১৪৪. আল-ইকদুল ফারিদ : ২/১৪৯। কোনো ব্যক্তির মাঝে যদি তার উত্তম বংশমর্যাদার সাথে উত্তম

আবিওয়ারদি নিজের ব্যাপারে বলেন, তিনি বাপ-দাদার বংশীয় মর্যাদায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত মর্যাদার সাথে নিজের উচ্চ মনোবলের মাধ্যমে সম্মানের সংযোগ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন :

فَشَيَّدْتُ مَجْدًا رَسَا أَصْلُهُ *** أَمُتُّ إِلَيْهِ بِأُمٍّ وَأَبٍ

> 'আমি নিজেকে মর্যাদার আসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তার সঙ্গে যুক্ত করেছি আমার বংশীয় মর্যাদা।'[১৪৫]

উচ্চ মনোবলের অধিকারীর জন্য বংশপরিচয় না থাকা ক্ষতিকর কিছু নয়। যদি কেউ নিজ মনোবলের ওপর ভর করে মর্যাদা অর্জন করে, তবে কোনো নিকৃষ্ট অপদার্থ জাতির সাথে তার রক্তসম্পর্ক থাকলেও তাতে কিছু যায় আসে না। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ বলেন :

কর্ম একত্রিত হয়, তবে তা চমৎকার। শাফিয়ি ﷺ ছিলেন কুরাইশ বংশের। শাফিয়ি মতাবলম্বীগণ শাফিয়ি ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর কুরাইশ বংশীয় হওয়ার কথাটিও উল্লেখ করেন। দেখুন, ইমামুল হারামাইন ﷺ কৃত 'আল-কাফিয়া'।

১৪৫. মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে এ প্রকারটি সবচেয়ে পরিপূর্ণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানমর্যাদার সাথে নতুন মর্যাদা যুক্ত করা একটি উত্তম রূপ। ইজামির সাথে ইসামি যোজিত হলে আরও উত্তম। (হাজ্জাজের কাছে এক লোকের মূর্খতা সম্পর্কে বলা হলো। আলোচিত সে ব্যক্তি এক প্রয়োজনে হাজ্জাজের কাছে এসেছিল। হাজ্জাজ মনে মনে বলল, আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখি। লোকটা যখন এল, হাজ্জাজ বলল, 'তুমি কি ইসামি না ইজামি?' যার অর্থ হচ্ছে, তুমি কি নিজগুণে মর্যাদা অর্জন করেছ, না নিজের পূর্বপুরুষদের অর্জিত মর্যাদা নিয়েই বড়াই করে বেড়াও? লোকটা জবাব দিল, 'আমি ইসামিও, আবার ইজামিও।' হাজ্জাজ বলল, 'এটা তো অতি উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য।' হাজ্জাজ লোকটার প্রয়োজন পূরণ করল। তাকে একটু বেশি পরিমাণেই দিল। তাকে কিছু সময় নিজের কাছে রাখল। এরপর এক এক করে তাকে যাচাই করতে থাকল। ফলাফল বের হলো, লোকটা আসলেই গণ্ডমূর্খ। হাজ্জাজ তাকে বলল, 'আমাকে সত্যটা বলো, নয় তো তোমার গর্দান যাবে।' লোকটা বলল, 'যা জানতে চান, বলুন। আমি সত্যটাই বলব।' হাজ্জাজ প্রশ্ন করল, 'আমি যখন তোমাকে ইসামি-ইজামিসংক্রান্ত প্রশ্ন করলাম, তখন তুমি কীভাবে এত ভালো একটা জবাব দিলে?' লোকটা জবাব দিল, 'আল্লাহর কসম, আমি জানতাম না যে, ইসামি উত্তম, না ইজামি উত্তম। তাই যেকোনো একটা বললে সমস্যা হবে বা ভুল হবে মনে করে আমি চিন্তা করলাম দুটাই বলে দিই। যদি একটার কারণে সমস্যা হয়, তাহলে অপরটা সামলে নেবে।' অথচ হাজ্জাজ প্রথমপর্যায়ের কথোপকথনে ধারণা করেছিল, লোকটার সে কথার অর্থ হচ্ছে, 'আমি নিজের অর্জিত মর্যাদায় গর্ববোধ করি, গর্ববোধ করি আমার সম্মানিত বাপ-দাদাদের নিয়ে, তাদের সম্মান অর্জন করতে পারার কারণে।' কিন্তু আদতে লোকটা নিজে এ অর্থটা বুঝে কথা বলেনি, তার মুখ থেকে সুন্দর সে কথা বের হওয়ার কারণ হচ্ছে তার ভয়; তার পাণ্ডিত্য নয়। পরিশেষে হাজ্জাজ মন্তব্য করল : المقادير تُصَيِّرُ العَيِّ خطيبًا। 'মর্যাদা মূল্যবান নিধি। বংশমর্যাদা কথা বলতে অপারগ একটা লোককে সুবাগ্মী বক্তা বানিয়ে দেয়।' (মাজমাউল আমসাল : ৩/৩৬৯-৩৭০)

'মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হলো নিজের গুণ। যদি সে সম্ভ্রান্ত হয় এবং তার পূর্বপুরুষ নিন্দিত হয়, তাহলে এতে তার কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি সে নিন্দিত হয় আর তার পূর্বপুরুষ নন্দিত হয়, তাহলে বংশমর্যাদায় তার কোনো উপকার নেই।'

এক লোক আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সামনে এমন একটি কথা বলল, যা সকল মতকে ছাড়িয়ে গেল। তার কথা শুনে আব্দুল মালিক খুবই অবাক হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কার ছেলে?' সে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি একাই একশ। নিজের পরিশ্রমেই আমি আপনার সাথে যুক্ত হতে পেরেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করেই কবি বলেন :

مَالِيَ عَقْلِيْ، وَهِمَّتِيْ حَسْبِيْ *** مَا أَنَا مَوْلًى وَلَا أَنَا عَرَبِيّ

إِذَا انْتَمَى مُنْتَمٍ إِلَى أَحَدٍ *** فَإِنَّنِيْ مُنْتَمٍ إِلَى أَدَبِيْ

'আমি কারও মনিব নই—বংশে আরাবিও নই। এসব দিয়ে আমার কী হবে? আমার আকল আর আমার মনোবলই আমার জন্য যথেষ্ট। কেউ যদি মর্যাদা প্রকাশের জন্য আমাকে অন্য কারও দিকে সম্বন্ধিত করতে চায়, তখন আমি নিজেকে আমার জ্ঞান ও শিষ্টাচারের দিকে সম্বন্ধিত করি।'

উচ্চ মনোবলের অধিকারী নিজের পূর্বপুরুষ, কবরে যারা হাড্ডিতে পরিণত হয়েছে, তাদের নিয়ে গর্ব করা পছন্দ করে না। নিজেকে ইজামি বলতে পছন্দ করে না সে।

مَا الْفَخْرُ بِالْعَظْمِ الرَّمِيْمِ وَإِنَّمَا *** فَخَارُ مَنْ يَبْغِيْ الْفَخَارَ بِنَفْسِهِ

'কবরে মাটি হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষদের অর্জিত গৌরব নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। যে নিজে গৌরব অর্জন করে, সে গর্ব করার অধিকার পায়। পূর্বপুরুষদের অর্জিত মানসম্মান নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।'

অন্য এক কবি বলেন :

وَدَعُوْا التَّفَاخُرَ بِالتُّرَاثِ وَإِنْ عَلَا *** فَالْمَجْدُ كَسْبٌ وَالزَّمَانُ عِصَامُ

'বংশীয় মর্যাদা নিয়ে গৌরব করো না; চাই তা যত উচ্চই হোক। মর্যাদা তো নিজে অর্জন করার জিনিস আর জমানা তাদেরই মূল্যায়ন করে, যারা নিজ গুণে গুণী।'

মুতানাব্বি বলেন :

لَا بِقَوْمِيْ شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوْا بِيْ *** وَبِنَفْسِيْ فَخَرْتُ لَا بِجُدُوْدِيْ

'বংশের কারণে আমি সম্মানিত হইনি। বরং আমার বংশই সম্মানিত হয়েছে আমার কারণে। নিজের অর্জিত মর্যাদা নিয়েই আমি গৌরব বোধ করি—আমার বাপ-দাদার বংশকৌলিন্যে নয়।'

জনৈক কবি বলেন :

كُنْ اِبْنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِبْ أَدَبًا *** يُغْنِيكَ مَحْمُوْدُهُ عَنِ النَّسَبِ

إِنَّ الْفَتَى مَنْ يَقُوْلُ: هَا أَنَا ذَا *** لَيْسَ الْفَتَى مَنْ يَقُوْلُ: كَانَ أَبِيْ

'যার ছেলেই হও তুমি, ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করো। জ্ঞান ও শিষ্টাচার তোমাকে বংশ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে। খাঁটি তরুণ তো সে-ই—যে বলে, দেখো আমি এমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি। তরুণ সেই নয়—যে বলে, আমার বাপ অমুক ছিলেন, আমার দাদা তমুক ছিলেন। জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো।'

বংশ নিয়ে গর্ব না করার বিষয়টি বহু শরয়ি নসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে যখন অহংকার করে বা কাউকে তাচ্ছিল্য করে গর্ব করা হবে, তখন তা একেবারেই চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ কারণেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে মানব, আমি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।'[১৪৬]

এই আয়াতে বংশ নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ইশারা করা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, বংশীয় মর্যাদা নিজের অর্জিত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

'আর এই যে, মানুষ তা-ই পায়, যা সে চেষ্টা করে।'[১৪৭]

বোঝা যাচ্ছে যে, সম্ভ্রান্ত বংশ বা সাধারণ বংশ মৌলিক দিক থেকে সমান। কারণ, আমাদের সৃষ্টিগত ধাতু এক এবং সৃষ্টি করেছেনও এক আল্লাহ। তাই বংশের আলাদা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যার ওপর ভরসা করা যায়। এটি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদান পাওয়ারও কোনো ভিত্তি নয়। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সেই সম্মানিত, যে তাকওয়ায় সর্বাগ্রে। তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষের মাঝে পূর্ণতা আসে। তাকওয়ার ফলেই একজন অপরজনকে ছাড়িয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন আমলের ওপর ভিত্তি করে, বংশের ওপর ভিত্তি করে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

'এরপর যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের পরস্পরের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অন্যের খোঁজখবরও নেবে না।'[১৪৮]

....

১৪৬. সুরা আল-হুজুরাত : ১৩
১৪৭. সুরা আন-নাজম : ৩৯
১৪৮. সুরা আল-মুমিনুন : ১০১

রাসুল ﷺ বলেন :

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

'...যে ব্যক্তি আমলে পিছিয়ে যায়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।'[১৪৯]

অর্থাৎ আমলের মাধ্যমেই বান্দা আখিরাতে মর্যাদা লাভ করতে পারে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা (বান্দাদের) পুলসিরাত পার হতে আদেশ করবেন। পুলসিরাত স্থাপিত হবে জাহান্নামের ওপর। মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী দলে দলে তা অতিক্রম করতে থাকবে। তাদের সর্বাগ্রের দলটি বিদ্যুৎ গতিতে পার হবে। এরপরের দলটি বাতাসের গতিতে। পরের দলটি পাখির গতিতে। চতুষ্পদ জন্তুর গতিতে পার হবে এরপরের দলটি। একপর্যায়ে কেউ কেউ দৌড়ে যাবে, কেউ যাবে হেঁটে হেঁটে। এমনকি শেষে কেউ কেউ বুকে ভর দিয়ে যাবে। সে বলবে, "হে আমার রব, কোন জিনিস আমার গতি এত মন্থর করে দিল।" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আমি তোমার গতি মন্থর করিনি; বরং তোমার কর্মই তোমার গতি মন্থর করে দিয়েছে।"'[১৫০]

এই তো রাসুল ﷺ নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের তাকওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁদের সাবধান করে দিচ্ছেন রাসুলের সাথে সম্পর্কের ওপর ভরসা করা থেকে। অথচ তিনি ছিলেন জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশ ও সম্পর্কের অধিকারী। তাই তাঁরা নেককারদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য গুনাহে কম জড়াতেন। যাতে তাঁদের দুটি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়—তাকওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্ব।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

'হে কুরাইশ জাতি, তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহর কাছে সওদা করে নাও। আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কোনো উপকার করতে পারব না। হে আব্দে মানাফের সন্তানেরা, তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহর কাছে সওদা করে

....

১৪৯. সহিহু মুসলিম : ২৬৬৯

১৫০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩/১০২৯

নাও। আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কোনো উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর সামনে তোমার কোনো কাজে আসব না। হে রাসুলের ফুফু সাফিয়্যা, আল্লাহর সামনে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, যত সম্পদ ইচ্ছা আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও, আল্লাহর সামনে আমি তোমার কোনো উপকারে আসব না।'[১৫১]

সহিহ বুখারি ও মুসলিম ভিন্ন অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, 'নিশ্চয় আমার বন্ধু হলো মুত্তাকিগণ। মানুষ নেক আমল নিয়ে আসবে না। তোমরা নিজের ঘাড়ে দুনিয়া বহন করে আসবে আমার কাছে। আর বলবে, "হে মুহাম্মাদ!" আমি তখন বলব, "আমি পৌঁছে দিয়েছি।"'[১৫২]

আর সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, আমর বিন আস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আমার পিতৃগোত্রীয় অমুক অমুক আমার বন্ধু নয়, আমার বন্ধু হলো আল্লাহ ও নেককার মুমিনগণ।'[১৫৩] এ হাদিসের মাধ্যমে রাসুল ﷺ আমাদের নির্দেশ করছেন যে, তাঁর বন্ধুত্ব বংশের ভিত্তিতে অর্জিত হয় না; যদিও সে বংশীয় সম্পর্ক খুবই নিকটের হোক না কেন। বরং ইমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব তাঁর বন্ধুত্ব। সুতরাং যে পূর্ণ ইমান ও নেক আমলের অধিকারী হবে, সে-ই হবে রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে কাছের বন্ধু; চাই রাসুলের সাথে তার বংশীয় কোনো সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।

তাই তাকওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ করো। তাকওয়া অর্জন করো। বংশের ওপর ভরসা করা এবং নিজেকে প্রবৃত্তির হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া দুর্বল চিন্তা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে নুহ ﵇-এর ছেলেকে নিয়ে আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

১৫১. সহিহুল বুখারি : ৩৩৩৬, সহিহু মুসলিম : ২০৬
১৫২. আল-হুকমুল জাদিরাহ বিল ইজাআহ, পৃষ্ঠা নং ৪৫
১৫৩. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯০, সহিহু মুসলিম : ২১৫

‘হে নুহ, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে মন্দকর্ম সম্পাদনকারী।’[১৫৪]

كَانَتْ مَوَدَّةُ سَلْمَان لَهُ نَسَبًا *** وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ نُوْحٍ وَابْنِهِ رَحِمُ

‘সালমান ফারসি দূর দেশের হয়েও নবির কত আপন! কিন্তু নুহ নবির ছেলে তাঁর বংশের হয়েও তাঁর আপন নয়।’

কবি বলেন :

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِيْ كُلِّ حَالَةٍ

وَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اِتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ

فَقَدْ رَفَعَ الْإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ

وَقَدْ وَضَعَ الْكُفْرُ النَّسِيْبَ أَبَا لَهَبِ

‘জীবনের প্রতিটি ক্ষণে তাকওয়া যেন হয় তোমার সঙ্গী। নেককার বংশীয় বলে কখনো তাকওয়াকে অবহেলা কোরো না। কেননা, এখানে বংশের কোনো মূল্যই নেই। ইসলাম পারস্যের সালমানকেও আসীন করেছে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আর কুফর সম্ভ্রান্ত বংশের আবু লাহাবকেও ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে।’

শুরাইহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনি কাদের অন্তর্ভুক্ত?’

তিনি বললেন, ‘যাঁদের ওপর আল্লাহ তাআলা ইসলামের অনুগ্রহ দান করেছেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত আমি। আর আমার সম্পর্ক হলো কিন্দা গোত্রের সাথে।’

সাবিত আল-বুনানি ﷺ বলেন, ‘আবু উবাইদা ﷺ বলেছেন, “হে লোকসকল, আমি কুরাইশ বংশের লোক। তোমাদের মধ্যে সাদা বা কালো যে লোকই তাকওয়ার মাধ্যমে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে, আমি তখন ইচ্ছা পোষণ করি, যদি আমি সে দেহে থাকতাম!”’

১৫৪. সুরা হুদ : ৪৬

বর্ণিত আছে যে, সালমান ﵁-কে বলা হলো, 'হে সালমান, আপনার বংশ বর্ণনা করুন।' তিনি বললেন, 'সালমান নিজের মুসলিম পিতার নাম জানে না। তবে এটা জানে যে, সে ইসলামের পুত্র।'

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন :

دَعِيُّ الْقَوْمِ يَنْصُرُ مُدَّعِيْهِ *** لِيُلْحِقَهُ بِذِيْ الْحَسَبِ الصَّمِيْمِ

أَبَى الْإِسْلَامُ لَا أَبَ سِـوَاهُ *** إِذَا افْتَخَرُوْا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِـيْمِ

'পোষ্যপুত্র নিজেকে বংশের দিকে সম্পৃক্ত করে খাঁটি বংশীয় হওয়ার দাবি করে। যখন তারা কাইস ও তামিম গোত্রের কথা বলে গর্ব করে, তখন ইসলাম তা অস্বীকার করে বলে, কোনো মুসলিমের ইসলাম ব্যতীত কোনো পরিচয় নেই।'

নারীর প্রতি আসক্ত, ফিতনায় পতিত নিম্ন মানসিকতার লোকের ব্যাপারে কবি বলেন :

فَلَا تَدْعُنِيْ إِلَّا بِـــــــــ يَا عَبْدَهُ *** فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِيْ

'আমাকে কখনো "আল্লাহর বান্দা" ছাড়া ভিন্ন কোনো নামে ডেকো না। কেননা, এটিই আমার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নাম।'

অন্যদিকে উচ্চ মনোবলের অধিকারীর নিকট সর্বোচ্চ সম্মান হচ্ছে, তাকে তার রবের দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকা। যেমন কবি বলেন :

فلا تدعني إلا بيا عبده *** فإنه أشرف أسمائي

'আমাকে কখনো "আল্লাহর বান্দা"' ছাড়া ভিন্ন কোনো নামে ডেকো না। কেননা, এটিই আমার সবচেয়ে সুন্দর নাম।'

এর চেয়েও উত্তম কথা হলো, কবির এ কথা—

وَمِمَّا زَادَنِيْ شَـــرَفًا وَّتِيْهًا *** وَكِدْتُّ بِأَخْمَصِيْ أَطَأُ الثُّــرَيَّا

دُخُوْلِيْ تَحْتَ قَوْلِكَ: يَا عِبَادِيْ *** وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِيْ نَبِيًّا

'হে আমার রব, আপনি আমাকে আপনার বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন—এতে আমার গৌরব ও মর্যাদা এতই উঁচু হয়েছে, যেন আমি পা দিয়ে তারকালোক মাড়িয়ে চলেছি।'

কবি বলেন :

كَفَى بِكَ عِزًّا أَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ *** وكَفَى بِكَ فَخْرًا أَنَّهُ لَكَ رَبٌّ

'তোমার সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি আল্লাহর বান্দা। তোমার গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তোমার রব।'

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহিলি যুগের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথা বিলুপ্ত করেছেন। প্রত্যেক মুমিন আল্লাহভীরু। আর প্রত্যেক পাপী হতভাগা। তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি। তোমরা পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব-অহংকার করা ত্যাগ করবে, এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে; অন্যথায় তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট গুবরে পোকার চেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে, যে পোকা তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়।'[১৫৫]

মুআজ বিন জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ তখন মদিনা অভিমুখী ছিলেন, তিনি তাকে বললেন :

১৫৫. সুনানু আবি দাউদ : ৫১১৬। হাদিসের মান : হাসান। একই অর্থের হাদিস এসেছে তিরমিজিতে, আর তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। আরও বর্ণনা করেছেন বাইহাকি ﷺ।

إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا

'আমার পরিবারের এ লোকগুলো মনে করে তারাই আমার অধিক নিকটতর মানুষ, কিন্তু আমার নিকটতর মানুষ হলো মুত্তাকিগণ। তারা যারাই হোক বা যেখানেই থাকুক...।'[১৫৬]

সম্ভ্রান্ত কোনো বংশে জন্ম না হলেও একজন মুসলিমের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার ভয় এবং উত্তম গুণাবলি। এ বৈশিষ্টগুলো অর্জন করলেই একজন মানুষ সম্ভ্রান্ত, অন্যথায় নয়। আবার যারা বংশীয় মর্যাদাসম্পন্ন, তাদেরও পরিপূর্ণভাবে এ গুণগুলো অর্জন করা জরুরি। পূর্বপুরুষদের সাথে বংশীয় সম্পর্ক যুক্ত থাকা যথেষ্ট নয়। যেন পাছে এমন কথা বলা না হয় যে, 'বাপ-দাদারা কত ভালো ছিল, আর তারা এসব কোন প্রকারের বংশধর রেখে গেল?!'

অনেক মানুষই এসব জায়গায় ফিতনায় পড়ে, পরীক্ষিত হয়। আপনি এমন মানুষ দেখতে পাবেন, যে নিজের পূর্বসূরি মহান লোকদের নিয়ে খুব গর্ব করে, কিন্তু নিজের মাঝে সুঁই পরিমাণও উত্তম গুণ ধারণ করে না। সে বলে, 'আমার পিতা এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন।' সে নিজের পিতার প্রশংসা করতে থাকে। তার এমন গর্ব হলো সে ব্যক্তির গর্বের ন্যায়, যার নিজের চেহারায় দাড়ি নেই, কিন্তু ভাইয়ের চেহারার দাড়ি নিয়ে সে গর্বে মেতে থাকে। এমন ব্যক্তির ব্যাপারেই বলা হয়—

وَأَعْجَبُ شَيْءٍ إِلَى عَاقِلٍ *** أُنَاسٌ عَنِ الْفَضْلِ مُسْتَأْخِرَه

إِذَا سُئِلُوْا: مَا لَهُمْ مِنْ عُلَا؟ *** أَشَارُوْا إِلَى عِظَامٍ نَاخِرَه

'ওই সব মর্যাদাহীন লোকদের দেখে জ্ঞানীরা খুব আশ্চর্য হন, যারা বাপ-দাদা নিয়ে গর্ব করে। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের

১৫৬. হাদিসাংশ। সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৪৭, মুসনাদু আহমাদ : ২২০৫২, তাবারানি কৃত আল-মুজামুল কাবির : ২৪১। ইবনু হিব্বান এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন। দেখুন, আল-ইহসান : ৬৪৭।

মর্যাদার কী আছে? তখন তারা কবরের জীর্ণ কিছু হাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে।'

কবি বলেন :

أَقُوْلُ لِمَنْ غَدَا فِيْ كُلِّ وَقْتٍ *** يُبَاهِيْنَا بِأَسْلَافٍ عِظَامِ

أَتَقْنَعُ بِالْعِظَامِ وَأَنْتَ تَدْرِيْ ** بِأَنَّ الْكَلْبَ يَقْنَعُ بِالْعِظَامِ

'এক ব্যক্তি সব সময় তার মহান পূর্বপূরুষদের নিয়ে অহংকার করত। একদিন তাকে আমি বলি, তুমি কি কবরের জীর্ণ হাড় নিয়েই সন্তুষ্ট? অথচ তুমি জানো, কুকুররাই হাড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।'

কবির এ কথাগুলো কতই না সূক্ষ্ম—

لَمْ يُجْدِكَ الْحَسَبُ الْعَالِيْ بِغَيْرِ تُقَى *** مَوْلَاكَ شَيْئًا فَحَاذِرْ وَاتَّقِ اللهَ

وَابْغِ الْكَرَامَةَ فِيْ تَرْكِ الْفَخَارِ بِهِ *** فَأَكْرَمُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهَا

'যদি তোমার ভেতরে রবের ভয় না থাকে, বংশমর্যাদা তোমার কোনো কাজে আসবে না। তাই সতর্ক হও—আল্লাহকে ভয় করো। গৌরব পরিহার করে মর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করো। মানুষের মাঝে মুত্তাকিরাই আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান।'

হীনবল ও মন্দ লোকেরাই কেবল এ ধরনের গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত, যারা সব রকমের মন্দকর্মে জড়িত। যাদের মাঝে উত্তম কাজের ছিটেফোঁটা নেই একটুও। তা সত্ত্বেও তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকদের। তারা সেসব মানুষকে অবজ্ঞা করে, যারা বংশ ও কর্মে তাদের ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অতিক্রম করেছে পিতামাতার দিক থেকেও। এটা চরম ভ্রান্তি। চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা।

রাসুল ﷺ-এর সাথে সম্পর্ক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। যে এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে, তার জন্য তাকওয়া থেকে হাত গুটিয়ে বসে থেকে নিজেকে প্রবৃত্তির হাতে সঁপে দেওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়। উত্তম সত্তাগতভাবে উত্তম। যদি

সে উত্তম প্রকাশিত হয় নববিঘর থেকে, তবে তা সর্বোত্তম। মন্দ সত্তাগতভাবে মন্দ। আর নববি পরিবার থেকে তা প্রকাশিত হওয়া আরও বেশি মন্দ। অনেক সময় এ শ্রেষ্ঠ বংশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েও প্রবৃত্তির অনুসারীরা এমন সব মন্দ কর্মের সাথে জড়িত হয়। যার ফলে রাসুল ﷺ-এর সাথে এদের সম্পৃক্ত করতেও লজ্জাবোধ করে। অনেক সময় রাসুল ﷺ-এর সাথে এদের বংশসম্পর্ককেও অস্বীকার করা হয়।

সম্মানিত বংশের কোনো লোক মন্দ কাজ করলে সে নিন্দিত হবে। বংশমর্যাদায় কম হয়েও যদি কেউ তাকে কর্মে ও আমলে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তাকেই অগ্রগণ্য ধরা হবে।

খোরাসানের জনৈক লোক বংশীয় দিক থেকে রাসুল ﷺ-এর অনেক নিকটবর্তী ছিল। তবে সে ছিল ফাসিক। প্রকাশ্যে পাপ করত। সেখানেই একজন কালো গোলাম ছিল, যে ইলম ও আমলে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে লোকজন কালো গোলামটির কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাকেই সম্মান দিতে লাগল।

একদা তিনি মসজিদের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হলেন। লোকজন তার থেকে বরকত লাভের আশায় তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল।[১৫৭] ঘটনাক্রমে বংশমর্যাদায় উচ্চ সে লোকটি মাতাল অবস্থায় কালো গোলাম ব্যক্তিটির সামনে এসে হাজির হলো। লোকজন মাতাল লোকটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে শুরু করল। কিন্তু সে-ই অন্যদের ওপর প্রবল থাকল। সে শাইখের জামার এক প্রান্ত ধরে বলল, 'হে পশুর ক্ষুর ও প্রলম্বিত নাকের ন্যায় কালো, হে কাফিরের পুত্র কাফির, আমি রাসুল ﷺ-এর দৌহিত্র হয়েও লাঞ্ছিত, আর তুমি সম্মানিত। আমি অপদস্থ হচ্ছি, আর তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত?' লোকেরা তাকে মারার জন্য তেড়ে আসছিল। কিন্তু শাইখ বললেন, 'এমনটি করো না। হতে

১৫৭. এখানে শরিয়তসম্মত পন্থায় নেককারদের কাছ থেকে বরকত নেওয়া হচ্ছে। আর সে পন্থা হচ্ছে, মানুষ তার কাছ থেকে ইলম শিখে উপকার পাচ্ছে। কেউ আবার তার উপদেশ শুনে উপকৃত হচ্ছে। আবার সে নেককার মানুষটি ইমাম হিসেবে তাদের পথ দেখিয়ে উপকৃত হচ্ছে। উপকৃত হচ্ছে তাদের মন থেকে দুআ পেয়ে। তারা সকলে জিকিরের মজলিসে এক সাথে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। এসবই বরকত পাবার পন্থা। অন্যদিকে শরিয়পরিপন্থী হবে যদি কেউ নেককারদের সত্তা থেকে বরকত নিতে চায় তবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, শাতিবি ﷺ কৃত আল-ইতিসাম : ২/৮-১০। আরও দেখতে পারেন, ড. নাসির বিন আব্দুর রহমান জাদি' কৃত আত-তাবাররুক ওয়া আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু।

পারে তার দাদার অসিলায় তাকে ক্ষমা করা হবে; যদিও সে তার দাদার আদর্শ থেকে সরে গেছে।' এবার শাইখ সে লোকটির দিকে দৃক্‌পাত করে বললেন, 'কিন্তু হে সম্মানিত বংশের লোক, আমি বাইরে কালো হলেও ভেতরটা করেছি সাদা-শুভ্র, আর তুমি নিজের ভেতরটা করেছ কালো। আমার হৃদয়ের শুভ্রতা চেহারায় উদ্ভাসিত হয়, তাই আমি সুন্দর। আর তোমার হৃদয়ের কালো রংটা তোমার চেহারায় ফুটে ওঠায় তুমি অসুন্দর, কুৎসিত। আমি তোমার দাদার পথ গ্রহণ করেছি; আর তুমি গ্রহণ করেছ আমার দাদার পথ। লোকেরা আমার মাঝে তোমার দাদার চরিত্রের কিছু প্রতিফলন দেখছে; আর তোমাকে দেখছে আমার দাদার চরিত্রে। ফলে তারা ভাবছে, আমিই তোমার দাদার দৌহিত্র। আর তোমাকে ভাবছে আমার দাদার দৌহিত্র। তাই তারা আমার পিতার সাথে যা করা হয়েছে, তা-ই তোমার সাথে করতে চাচ্ছে। আর আমার সাথে তা-ই করছে, যা তোমার দাদার সাথে করা হয়েছে।'

এ কারণেই কবি বলেন :

وَلَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ مِنْ هَاشِمٍ *** إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مِنْ بَاهِلَة

'চরিত্রে যদি বাহিলি[১৫৮] হও, তবে বংশে হাশিমি হলেও কোনো লাভ নেই।'

অর্থাৎ বংশের দিক থেকে তুমি উচ্চবংশীয় হলেও, চারিত্রিকভাবে যদি তুমি বাহিলিদের মতো হীনবল হও, পূর্ণতার গুণাবলিশূন্য হও, তবে তোমার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই; তুমি মর্যাদাহীন, সম্মানহীন।

বুহতারি বলেন :

وَلَسْتُ أَعْتَدُّ لِلْفَتَى حَسَبًا *** حَتَّى يُرَى فِيْ فَعَالِهِ حَسَبُهُ

'কাউকে আমি অভিজাত বংশীয় বলে গোনায় ধরি না, যাবৎ না তাকে উত্তম কিছু করতে দেখি। কারণ, কর্মেই বংশের পরিচয়।'

১৫৮. বাহিলি অভিধাটি এসেছে বাহিলা নামক হামদানের এক মহিলা থেকে। তার সন্তানকে তার দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো। তাদের বলা হতো, বাহিলার সন্তান। তারা নিকৃষ্ট ও হীনচরিত্র হিসেবে কুখ্যাত হয়। বলা হয়, তারা একবার আহারকৃত খাবার দ্বিতীয়বার খেত। তারা মরা পশুর হাড় ও চর্বি নিয়ে রাঁধত। তাই আরবদের কাছে তাদের খুব দুর্নাম ছড়ায়।

উচ্চ মনোবলের অধিকারী আত্মমর্যাদাশীল এবং নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত

আত্মমর্যাদা নিয়ে আরবদের অনেক বিরল কাহিনি বর্ণিত আছে। উতাবি ﷬ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা বলেন :

'ইয়ামানের বাদশাহ দশটি জবাই-উপযুক্ত উট মক্কায় পাঠালেন। তিনি আদেশ দিলেন যেন কুরাইশের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি উটগুলো জবাই করে। উটগুলো যখন মক্কায় আনা হলো, সে সময় আবু সুফইয়ান হিন্দা বিনতে উতবার বাসরে ছিলেন। হিন্দা বলল, "হে পুরুষ, তুমি এই মহান সম্মানটি ছেড়ে নিজেকে নারীর পেছনে ব্যস্ত রেখো না, হয়তো মর্যাদাকর এ সুযোগ তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।" আবু সুফইয়ান বললেন, "ওহে, তুমি নিজ স্বামীকে অবকাশ দাও, সে যা পছন্দ করছে, তা করতে দাও। আল্লাহর শপথ, আমি ছাড়া কেউ তা জবাই করতে পারবে না।" সপ্তম দিনে আবু সুফইয়ান বের হয়ে আসলেন, উটগুলো তখনো দড়িতে আবদ্ধ ছিল। তিনি সেগুলো জবাই করে দিলেন।

আত্মমর্যাদা ও উচ্চ মনোবলের আরেকটি উদাহরণ হলো হিন্দার সেই কথা। যখন ইয়াজিদ বিন আবু সুফইয়ানের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাল এবং জনৈক ব্যক্তি তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে বলল, "আমরা আশা করি মুআবিয়া ইয়াজিদের উত্তম স্থলাভিষিক্ত হবেন।" তখন হিন্দা বলল, "মুআবিয়ার মতো কেউ কি অন্য কারও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মুখাপেক্ষী?! আল্লাহর শপথ, যদি সকল প্রান্তের আরবরা একত্র হয় এবং তাদের মাঝে মুআবিয়াকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে যে সম্মানের ইচ্ছা করবে, তা নিয়ে বের হয়ে আসবে তাদের মাঝ থেকে।"'

মুআবিয়া ﷺ তার কোলেই লালিতপালিত হয়েছেন। তাকে একবার বলা হলো, "যদি মুআবিয়া ﷺ বেঁচে থাকতেন, তবে নিজ জাতির নেতৃত্ব দিতেন।" তিনি বললেন, "যদি সে নিজ জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ না করে, তবে আমি সন্তানহারা মায়ের মতো।"'

মুআবিয়া ﷺ বলতেন, 'আমি মনে করি না, জগতে এমন কোনো অজ্ঞ আছে, যার জন্য আমার সহনশীলতা যথেষ্ট হতে পারে না; এমন কোনো অপরাধ

আছে, যার দিকে আমার ক্ষমা ধাবিত হতে পারে না এবং এমন কোনো প্রয়োজন আছে, যেখানে আমার দান প্রশস্ত হতে পারে না।'

এ কারণেই আহওয়াস খুব গর্ব করে বলেছেন :

مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ نَكْـبَةٍ أُرْمَى بِـهَا *** إِلَّا تُشَرِّفُنِيْ وَتَرْفَعُ شَـأْنِيْ

وَإِذَا سَأَلْتَ عَنِ الْكِرَامِ وَجَدْتَنِيْ ** كَالشَّمْسِ لَا تَخْفَى بِكُلِّ مَكَانِ

'যত কঠিন দুর্যোগ-দুর্বিপাকেই আমি নিপতিত হয়েছি, তা কেবল আমার সম্মান ও মর্যাদাই বৃদ্ধি করেছে। (কারণ প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে আমি নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছি)। যদি তুমি মর্যাদাবানদের দিকে তাকাও, তবে আমাকে দেখবে সূর্যের মতো—যার উজ্জ্বলতা সর্বত্রই নজরে পড়ে।'

আকিল বিন আলাফা মুররি ছিলেন একজন মহান মানুষ। একজন বেদুইন। আরবের গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন তিনি। খলিফাগণ তাঁর সাথে সম্পর্ক করেছেন বৈবাহিকসূত্রে। খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান নিজের এক ছেলের জন্য তাঁর মেয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। আকিল তখন বললেন, 'আমাকে তোমার সংকর[১৫৯] ছেলে থেকে দূরে রাখো।'

উচ্চাভিলাষী নিজের আত্মমর্যাদা জানে। তবে সেখানে কোনো অহংকার বা অহমিকা থাকে না। থাকে না কোনো প্রবঞ্চনাও। মানুষ যখন নিজের মর্যাদা বুঝতে পারে, তখন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। লাঞ্ছিত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেকে সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বিষয় থেকে মুক্ত রাখে। সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু বহন না করে নিজেকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন করা থেকেও মুক্ত থাকে সে। সে এমন কোনো স্থানে যায় না, যে জায়গা তার মর্যাদার পরিপন্থী। নিজেকে সে অটল রাখে এক সুদৃঢ় দুর্গে, সম্মানের গৃহে—যেখানে হীনতা নেই, দুর্বলতা বা নীচুতায় সন্তুষ্টি নেই।

আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন, আল্লাহর নবি ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইবরাহিম ﷺ-এর আত্মমর্যাদার প্রতি। তিনি যখন তাঁর রবকে ডাকছিলেন—

....

১৫৯. যার মা অনারবি এবং পিতা আরবি।

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

'হে আমার রব, তারা আমাকে যে দিকে ডাকছে, তার চেয়ে জেলখানা আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[১৬০]

তিনি বাদশাহর প্রতিনিধিকে বলেছিলেন :

ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

'ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কী? আমার রব তাদের ছলনা সর্ম্পকে সম্যক অবগত।'[১৬১]

ইউসুফ ﷺ ছিলেন সবরের মূর্তপ্রতীক। যেখানে সবর করা আবশ্যক ছিল না, সেখানেও তিনি সবর করেছেন। তিনি চাইলে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন। তাঁর মুক্তির অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি কারাগারকে বেছে নিয়েছিলেন। সবরের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইউসুফ ﷺ যে আজিজে মিসরের স্ত্রীর পাপকর্মের আহ্বানে (সাড়া না দিয়ে) সবর করবেন—যে সবর ছিল ওয়াজিব—বলা বাহুল্য তা তো তিনি করবেনই বটে।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, 'আপনার কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রয়োজন আছে।' সম্বোধিত ব্যক্তি বলল, 'তাহলে কোনো ছোট লোকের সন্ধান করো।'

জনৈক লোককে বলা হলো, 'আমি আপনার কাছে এই পরিমাণ চাইতে এসেছি যে, আপনার সম্পদে তা ঘাটতি করবে না।' জবাবে সে বলল, 'তুমি কি এ জন্য নিম্নমানের কোনো লোক খুঁজে পেলে না?' অর্থাৎ আমার কাছে চাইলে বেশি চাও, কারণ আমি বেশি উদার। তারাই নিম্ন মানের লোক, যারা উদার হতে পারে না।[১৬২]

---

১৬০. সুরা ইউসুফ : ৩৩
১৬১. সুরা ইউসুফ : ৫০
১৬২. দুনিয়াদার অহংকারী লোকেরা যদি এমনটা বলতে পারে, তবে আখিরাত-প্রত্যাশী আখিরাতের পথিকদের কেমন উদার হওয়া উচিত?!

এক আলিমকে বলা হলো, 'আমার একটি ছোট প্রশ্ন আছে।' তিনি বললেন, 'তাহলে কোনো ছোট মানুষ খুঁজে নাও।'

উচ্চ মনোবল ও আত্মমর্যাদাবোধের এক দৃষ্টান্ত হলো দানশীলতার মিনার আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব। এক নারী অভাবের অনুযোগ করলে তিনি তাকে প্রচুর সম্পদ দান করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, 'সে তো আপনাকে চিনত না, আর অল্পতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যেত।' তিনি বললেন, 'যদিও অল্প পেয়ে সে তুষ্ট হতো, কিন্তু আমি তো বেশি দেওয়া ছাড়া সন্তুষ্ট হতে পারি না। সে যদিও আমাকে না চেনে, আমি তো নিজেকে চিনি।'

আরেকবারের ঘটনা। আব্দুল্লাহ বিন জাফর উটনীর ওপর সওয়ার হতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে তাঁর কাছে কিছু চাইল। তিনি উটনী থেকে নেমে পড়লেন এবং উটনীর পিঠে যা ছিল, তাও নামিয়ে নিলেন। উটনীর পিঠে ছিল চার হাজার দিরহাম ও আলি ﵁-এর একটি তরবারি। তিনি এগুলো তাকে দিয়ে দিলেন।

সাইদ বিন আব্দুল আজিজ থেকে বর্ণিত, হাসান বিন আলি ﵁ তাঁর পাশেই জনৈক লোককে দশ হাজার দিরহামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে শুনলেন। তিনি সেখান থেকে চলে এলেন। এসেই সে লোকের কাছে দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

আবু সাইদ ﵀ তাঁর কোনো এক শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀-কে তাঁর এক খাদিমের আঙুল কামড় দিতে দেখলাম। আমি বললাম, "আপনি নিজের খাদিমের আঙুল কামড়াচ্ছেন কেন?!" তিনি বললেন, "আমি তাকে কতবার নিষেধ করেছি যে, ভিক্ষুককে দিতে গিয়ে দিরহাম গণনা করবে না। আমি তাকে বলেছি, তাদের ওপর তা যথাসাধ্য ছড়িয়ে দাও।"'

এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন :

عَلَيَّ ثِيَابٌ لَوْ يُبَـــاعُ جَمِيْعُـهَا *** بِفَلْسٍ لَكَانَ الْفَلْسُ مِنْهُنَّ أَكْثَرَا

وَفِيْهِنَّ نَفْسٌ لَوْ تُقَاسُ بِبَعْضِهَا ** نُفُوْسُ الْوَرَى كَانَتْ أَعَزَّ وَأَكْبَرَا

وَمَا ضَرَّ نَـــصْـــلَ السَّـــيْـــفِ إِخْـــلَاقُ غِـــمْـــدِهِ
إِذَا كَانَ عَـــضْـــبًا حَـــيْـــثُ وَجَّـــهْـــتَـــهُ فَـــرَى

'আমার গায়ে যে জামা, তার মূল্য এক পয়সা পেলেও তা বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু পোশাকের ভেতরে যে ব্যক্তি রয়েছে, তার সামান্য অংশও পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের চাইতে বড় ও সম্মানিত। তরবারিতে ধার থাকলে খাপ পুরনো-জীর্ণ হলেও কোনো ক্ষতি নেই, যেখানে তুমি কোপ দেবে, সেখানটা কেটে টুকরো টুকরো হবে।'

ইমাম শাফিয়ি ﷀ আরও বলেন :

إِذَا الْمُشْكِلَاتُ تَصَدَّيْنَ لِيْ *** كَشَفْتُ حَقَائِقَهَا بِالنَّظَرْ
لِسَانٌ كَشِقْشِقَةِ الْأَرْحَبِيْ *** يِ وَكَالْحُسَامِ الْيَمَانِيِّ الذَّكَرْ
وَلَسْتُ بِإِمَّعَةٍ فِيْ الرِّجَـا *** لِ أُسَائِلُ هَذَا وَذَا مَا الْخَبَـرْ
وَلَكِنَّنِيْ مِدْرَهُ الْأَصْغَرَي *** نِ جَلَّابُ خَيْرٍ، وَفَرَّاجُ شَـرّ

'যখন আমার সামনে সমস্যা আসে, এক নজর দেখেই আমি তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝে ফেলি। চারুবাক মানুষ আমি—সুতীক্ষ্ণ জবান আমার কঠিন ধাতুতে গড়া ইয়ামানি তলোয়ার। আমার আছে কঠিন আত্মবিশ্বাস—মানুষে কথায় দোদুল্যমান কিংবা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার লোক আমি নই। বরং আমি শক্তিমান জবান ও কলবের অধিকারী। কল্যাণ সঞ্চয় আর অনিষ্ট দূরীকরণে আমি সিদ্ধহস্ত।'

হারিরি ﷀ বলেন :

وَفَضِيْلَةُ الدِّيْنَارِ يَظْهَرُ سِرُّهَا *** مِنْ حَكِّهِ لَا مِنْ مَلَاحَةِ نَقْشِهِ
وَمِنَ الْغَبَاوَةِ أَنْ تُعَظِّمَ جَاهِلًا *** لِصِقَالِ مَلْبَسِهِ وَرَوْنَقِ رَقْشِهِ
أَوْ أَنْ تُهِيْنَ مُهَـــذَّبًا فِيْ نَفْسِهِ *** لِدُرُوْسِ بِزَّتِـــهِ وَرَثَّةِ فُرْشِـــهِ

'নকশার চাকচিক্য ও লাবণ্য দেখে বোঝা যায় না মুদ্রা খাঁটি সোনার নাকি ভেজাল আছে। মুদ্রা হাতে নিয়ে ঘষে পরীক্ষা করলেই তবে বোঝা যায় আসল রহস্য। কোনো মূর্খের কারুকার্যময় পোশাকের চাকচিক্য দেখে তাকে সম্মান করা কিংবা কোনো জ্ঞানী ও মর্যাদাবান লোকের জরাজীর্ণ পোশাক দেখে তাকে অসম্মান করা বোকামি বৈ কিছু নয়।'

আবু হিলাল আল-আসকারি ﷺ বলেন :

جُلُوْسِيِ فِيْ سُوْقٍ أَبِيْعُ وَأَشْتَرِيْ *** دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْأَنَامَ قُرُوْدُ

وَلَا خَيْرَ فِيْ قَوْمٍ تَذُلُّ كِرَامُهُمْ *** وَيَعْظُمُ فِيْهِمْ نَذْلُهُمْ وَيَسُوْدُ

'বেচাকেনা করতে গিয়ে বাজারের দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে মানুষ কত নির্বোধ। সে জাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যারা তাদের জ্ঞানী ও মর্যাদাবানদের অপদস্থ করে এবং হীন ও ইতর লোকদের সম্মান করে নেতৃত্বের আসনে বসায়।'

কতিপয় আলিম নিজ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া পছন্দ করতেন না। তারা লোকজনের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখতেন, অখ্যাত হয়ে থাকতেই পছন্দ করতেন। ভিন্ন শহরে না যাওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে, তারা আশঙ্কা করতেন যে, হয়তো অন্য শহরে গেলে তাকে চেনে না—এমন কেউ এসে তার সাথে অনুপযোগী আচরণ করে ফেলবে।

সুফইয়ান সাওরি ﷺ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী[১৬৩]। তবে তাঁর বিনয়ে লাঞ্ছনা বা হীনতা ছিল না মোটেই। তিনি বলতেন, 'আমি এমন কোনো স্থানে থাকা পছন্দ

১৬৩. একবারের ঘটনা। সুফইয়ান সাওরি তখন মক্কায়। মানুষজন তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে আছে। এ দেখে তিনি বললেন, 'মানুষের মাঝে এত অধঃপতন হয়েছে যে, তাঁরা আমার মতো লোকের মুখাপেক্ষী হয়েছে।'
সুফইয়ান সাওরি প্রায় সময় বলতেন, 'যদি হাদিস শিখতে ছাত্ররা আমার কাছে না আসত, তবে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শিখিয়ে আসতাম।' তিনি আরও বলতেন, 'যদি আমি জানতে পারি, কেউ আল্লাহকে খুশি করার জন্য হাদিস শিখতে চাইছে, তবে আমি তার বাড়িতে গিয়ে তাকে হাদিস শিখিয়ে আসব।'
কখনো তিনি মজলিসের শীর্ষে বসতেন না; বরং সবার সাথে মিলেমিশে বসতেন। এমনকি এ ব্যাপারে ইবনে সাবিত মন্তব্য করেন, 'আমি কখনো সুফইয়ানকে মজলিসের পুরোভাগে বসতে দেখিনি। তিনি দুহাঁটু গেড়ে দেয়ালের এক প্রান্তে বসে যেতেন।' - দেখুন, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৬৭-৩৮২।

করি, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না আর আমি লাঞ্ছিতও হব না।' ইবনে মাহদি বলেন, 'আমি সুফইয়ান সাওরি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমার মন চায়, আমি পায়ের জুতো খুলে ফেলি, যেখানে ইচ্ছা বসে পড়ি, আর কেউ আমাকে না চিনুক।" একটু পর তিনি মাথা তুলে বললেন, "তবে না চেনার কারণে কেউ আমাকে অবজ্ঞা করবে না—এ নিশ্চয়তা পেলে সেটা করতে পারি অনায়াসে।"'

হীনতা ও অসম্মান থেকে তিনি অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাই তাদের মাঝেই বসবাস করতেন, যারা তাঁকে চেনে। তিনি বলেন, 'যদি হীনতার আশঙ্কা না থাকত, তবে আমি এমন লোকদের মাঝে বসবাস করতাম, যারা আমাকে চিনত না।'

খলিফা মাহদি মদিনায় আগমন করলে লোকজন তাঁর কাছে গিয়ে সালাম দিতে লাগল। যখন সকলে মজলিসে যার যার মতো বসে পড়ল, তখন মালিক ﷺ আগমন করলেন সেখানে। লোকেরা বলল, 'আজ আরেক বাদশাহ মানুষের শেষে বসবে।' তিনি কাছাকাছি আসলেন। দেখলেন, মানুষের উপচে পড়া ভিড়। হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি এবং বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার শাইখ মালিক কোথায় বসবে?' মাহদি তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, আমার কাছে আসুন!' লোকজন পথ করে দিলে বাদশাহর নিকট পৌঁছে গেলেন তিনি। খলিফা মাহদি ডান হাঁটু গুটিয়ে তাঁর পাশে বসে গেলেন।

নবির ওয়ারিশদের এ সম্মানের কারণেই বিদগ্ধ আলিম আবু মুআবিয়া মুহাম্মাদ বিন খাজিম ﷺ-এর হাতে পানি ঢেলে দিয়েছিলেন হারুনুর রশিদ। পরে ইবনে খাজিম বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি ইলমকে যথাযথ সম্মান দিয়েছেন।'

একদা ইমাম ইবনুদ দাকিক আল-ইদ বিচারবিভাগের দায়িত্ব ছেড়ে চলে এলেন। এরপর তাঁকে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে আবেদন করা হলো। তিনি আবেদন গ্রহণ করলেন। তাঁর আগমনের কথা শুনে সুলতান মালিক আল-মানসুর তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে এ দেখে ইবনুদ দাকিক ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। লোকজন বলল, 'আপনার অপেক্ষায় সুলতান

দাঁড়িয়ে আছেন।' অর্থাৎ দ্রুত চলুন। তিনি লোকদের বলতে থাকলেন যে, তিনি সামনে আগাচ্ছেন। কিন্তু তিনি আগের মতোই ধীরে ধীরে হেঁটে আসতে লাগলেন। একসময় যথাস্থানে পৌঁছে গেলেন। বাদশাহ ইবনুদ দাকিকের বসার জন্য একটি আসন তৈরি করে ছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে না বসে বাদশাহর আসনে গিয়ে তার পাশে বসে পড়লেন। বাদশাহ তখন তাঁর হাত নিজের হাতে নিয়ে চুম্বন করলেন। তখন ইবনু দাকিক আল-ইদ বলেন, 'তুমি এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।'

ইবনে হাজম ﷺ বলেন, 'উন্নত আদর্শের ব্যাপারে আমি এর চেয়ে চমৎকার ঘটনা দ্বিতীয়টি শুনিনি। ঘটনাটি হচ্ছে—

আবু গালিব বিন গালিব তাইয়ানি (৪৩৬ হি.) ভাষাসংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। কিতাবটির নাম 'তালকিহুল আইন'। তখন জাজায়ির অধিপতি আবুল জাইশ মুজাহিদ আমিরি প্রায় এক হাজার উন্দুলুসি দিনার পাঠালেন, আরও পাঠালেন উন্নত বাহন, উত্তম কাপড়চোপড়। উদ্দেশ্য, এসব সম্পদের বিনিময়ে আবু গালিব কিতাবের শুরুতে এ কথাটি সংযোগ করবেন যে, এ কিতাবটি আবু গালিব রচনা করেছেন আবুল জাইশ মুজাহিদের আবেদনে। অর্থাৎ আবুল জাইশ তাঁর কাছে এ বিষয়টি শিখতে চেয়েছেন, তাই তিনি এ কিতাবটি লিখেছেন, এমন একটা কথা কিতাবের শুরুতে লিখতে হবে।

আবু গালিব উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে দিনার ও অন্যান্য সব ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'আমি কিতাবটি রচনা করেছি, যাতে সকল মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। যেন এ কিতাবটি আমার প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে থাকে। আমি সে গ্রন্থের বুকে অন্যের নাম লিখে তার জন্য গর্বের সুযোগ করে দেবো কেন? আল্লাহর শপথ, যদি আমাকে বিনিময় হিসেবে পুরো দুনিয়াও দেওয়া হয়, তবুও আমি এটা করব না। আর আমি মিথ্যাকে জায়িজ মনে করি না। কেননা, আমি এটি বিশেষ করে তার জন্য রচনা করিনি; বরং প্রতিটি ছাত্রের জন্য আমার এই কিতাব।' মহান এই আলিমের প্রতিভা ছিল বড়ই বিস্ময়কর। এই ধরনের আলিমদের পবিত্রতায় সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।[১৬৪]

---

১৬৪. নাফহুত তিব : ৩/১৭২, ১৯০

আবু সাইদ বকর বিন মুনির বলেন :

'আমির খালিদ বিন আহমাদ জুহলি বুখারার গভর্নরকে মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি ﵀-এর নিকট এ মর্মে পাঠালেন যে, "আমার কাছে "আল-জামি", "আত-তারিখ" এবং এ ছাড়াও আরও কিছু কিতাব নিয়ে আসুন। আমি আপনার কাছে সেগুলো পড়ব।"

প্রত্যুত্তরে ইমাম বুখারি জানিয়ে দিলেন, "আমি ইলমের অপমান করব না। ইলমকে রাজা-বাদশাহদের দরবারে নিয়ে যেতে পারব না। যদি আমার কাছে তোমার কোনো প্রয়োজন থাকে, তবে আমার মসজিদে বা ঘরে এসে উপস্থিত হও। যদি এ পদ্ধতি তোমার পছন্দ না হয়, তবে তুমি তো বাদশাহ। আমার দরস বন্ধ করতে পারো। যাতে তা কিয়ামতের দিন আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওজর পেশ করার সুযোগ হয়, আমি ইলম গোপন করব না; কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যাকে কোনো ইলমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার পর সে তা গোপন করে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।"'[১৬৫]

তিনি বলেন, 'এটিই ছিল তাদের মধ্যকার দূরত্বের কারণ।'

আবু বকর বিন আবু আমর বলেন :

'আবু আব্দুল্লাহ আল-বুখারির বুখারা শহর ছাড়ার কারণ ছিল, আমির খালিদ বিন আহমাদ তাঁকে তার ঘরে এসে "আত-তারিখ" ও "আল-জামি" গ্রন্থদুটি তার ছেলেদের পড়াতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু বুখারি ﵀ সরাসরি না করে দিলেন। এবং তার জবাবে বললেন, "অন্যদের বাদ দিয়ে বিশেষ কারও জন্য কিতাব পাঠ করে শ্রবণ করানোর সুযোগ আমার নেই।" এদিকে খালিদ বিন আহমাদ হারিব বিন আবুল ওরাকাসহ বুখারার অনেকের কাছে এ ব্যাপারে

....

১৬৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৫৮

সাহায্য চাইল। তারা আমির খালিদের পক্ষে কথা বলল। শেষ পর্যন্ত আবু আব্দুল্লাহকে দেশান্তর করল তারা।' বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর আবু আব্দুল্লাহ তাদের জন্য বদ-দুআ করেন।'[১৬৬]

খতিব বাগদাদি ﷺ-এর জীবনীতে আছে, আলাবি সম্প্রদায়ের এক লোক তাঁর কাছে আসলো। লোকটির জামার আস্তিনে অনেকগুলো দিনার ছিল। সে খতিব ﷺ-কে বলল, 'অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, এগুলো আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করতে।' খতিব ﷺ 'আমার প্রয়োজন নেই এগুলোর' বলে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। তখন আলাবি লোকটি 'আপনি মনে হয়, এগুলোকে কম মনে করেছেন?' বলে নিজের আস্তিন ঝাড়া দিল। খতিবের জায়নামাজের ওপর দিনার ঢেলে দিয়ে বলল, 'এখানে তিনশ দিনার রয়েছে।' তখন খতিব বাগদাদির চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল। তিনি জায়নামাজটি তুলে নিয়ে দিনারগুলো মাটিতে ঢেলে দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন।

খতিব ﷺ-এর এক ছাত্র বলেন, 'খতিব ﷺ-এর আত্মমর্যাদাবোধ ও আলাবি লোকটির লাঞ্ছনা আমি ভুলতে পারি না। খতিব ﷺ বের হয়ে যাওয়ার পর সে মাটির ওপর বসে পড়ল। বসে বসে চাটাইয়ের বিভিন্ন অংশ থেকে দিনারগুলো কুড়িয়ে জমা করছিল।'[১৬৭]

একজন আলিমের আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে কাজি আবুল হাসান আলি বিন আব্দুল আজিজ জুরজানি ﷺ বলেন :

'তারা বলে, তুমি মানুষ থেকে দূরে দূরে থাকো; রাজা-বাদশাহর দরবারে, নেতাদের কাছে যাওয়া আসা করো না, মানুষের সাথে মেশো না। বস্তুত তারা নিজেদের লাঞ্ছনার জায়গা দূরে মনে করে।

কিন্তু আমি দেখছি, যারা মানুষের সাথে মেশে, তারা তাদের নিকট তুচ্ছ হয়ে যায়; তারা তাদের ওপর বিরূপ কথা বলার সাহস পায়; মানুষ তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয় না। আর যার আত্মমর্যাদা তাকে সম্মান দেওয়ায় মানুষের হাতের

....
১৬৬. হাদয়ুস সারি : ৪৯৩
১৬৭. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া : ৩/১৪

সম্পদের দিকে সে নজর দেয় না, অযথা মানুষের সাথে মেশা থেকে দূরে থাকে—মানুষ তাকেই সম্মান করে।

যত লোভনীয় হোক কোনো পদমর্যাদা বা টাকাপয়সার জন্য আমি ইলমের প্রসার করি না। আমি যদি তা-ই করতাম, তবে ইলমকে দুনিয়া অর্জনের সিঁড়ি বানানোর অপরাধে অপরাধী হতাম।

আমি আমার এ স্বভাব এখনো ধরে রেখেছি। মিশতে দিইনি নিজের চরিত্রকে লাঞ্ছনার সাথে। আমি নিজের স্বভাব-চরিত্রকে এভাবে রক্ষা করা গনিমত গণ্য করি।

পানিহীন মরুর বুকে যখন পানির ভান্ডারের সামনে বড় ভিড় জমে থাকে আর আমাকে বলা হয়, প্রথমে আপনিই পান করুন। আমি বলি তখন, আমি দেখছি। তোমরা পান করো। কারণ, পানি পান করতে গেলে আমাকে মানুষের ভিড় ঠেলে যেতে হবে, আমার আত্মমর্যাদায় ঘা লাগবে, তাই তখন আমি বলি, বীরপুরুষ তৃষ্ণা সইতে পারি।

এমন অনেক কাজে দোষ নেই, কিন্তু দোষ থেকে পুরোপুরি বাঁচতে আমি এমন স্বাভাবিক কাজ থেকেও দূরে থাকি। কারণ, নিন্দুকরা বসে আছে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলতে যে, কী কারণে বা কেন সে এমন করল?

এভাবে নিজেকে রক্ষা করে আমি সকাল করি নিন্দুকের দোষারপমুক্ত এবং সন্ধ্যা করি সম্মানিত লোকের মনে সম্মানের আসন করে।

যখন কোনো কিছু অনায়াসে অর্জন করার মতো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন না আমি রাতভর সেটা নিয়ে চিন্তা করি, আর না সেটা নিয়ে লজ্জিত হই।

কিন্তু যখন এসব কিছু না চাইতেই আমার কাছে আসে, তখন আমি সেটা গ্রহণ করি। আর যদি কোনো কিছু আমার কাছে না এসে আমার চেয়ে নিম্ন কারও ঝুলিতে পড়ে, তবে আমি না আফসোস করি, আর না বলি, কেন আমি এমন করলাম না, কেন আমি ওমন করলাম না।

যদি অনেক কিছু পেতে হলে আমাকে আমার আত্মসম্মান-আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে দিতে হয়, তবে সে অনেক কিছু পাওয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই আমি।

আমি নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখি। কেউ রাগার মতো কিছু করলে, অযথা তার সামনে দাঁত কেলাই না। আর কেউ নিন্দার পাত্র হলে, তার প্রশংসা করি না। উচিত জায়গায় উচিত আচরণটাই করি আমি।

নেতাখেতারা যদিও আমাকে কিছু দিয়ে বশ করতে চায়, কিন্তু আমি তো তাদের মতো নই, যারা এসব ভোগের সামগ্রী পেয়ে নিজেদের বেচে দেয়। আমি তাদের হাতে আসি না, তাদের থেকে দূরত্বই শ্রেয়।

কত হাদিয়া-তোহফায় যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান ভোগ করতে হয়। কত অবুঝ সম্ভ্রান্ত মানুষ লোকসানকে লাভ ভেবে বসে থাকে, ফলে পরে পস্তাতে হয় তাকে।

কষ্ট করে, পরিশ্রম করে এ ইলম অর্জন করিনি কারও খিদমত করব বলে; কারও গোলাম হব, কোনো মূর্খের প্রলাপ শুনব—এ জন্যও নয়। কষ্ট করে এ ইলম শিখেছি আমি খিদমত পাব বলে। কারণ, ইলম তার অর্জনকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

যদি ছোটবেলা থেকে সাধনা করে ইলম শিখে আমাকে অপমানিত হয়ে— নিজেকে ছোট করে অন্যের খিদমত করতে হয়, যদি এমনই হয় একজন আলিমের মর্যাদা, তবে ইলম না শিখে জাহিল থাকাই শ্রেয় নয়!?

আলিমরা যদি ইলমের মর্যাদা দেয়, অপদার্থ রাজা-বাদশাহ-নেতাদের দরবারে গিয়ে ইলমকে অপমানিত না করে ইলমের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখে, নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখে, তবে এ ইলমই তাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখবে, তারা সম্মানিত হবে।

কিন্তু ইলম দিয়ে দুনিয়ার ব্যবসাকারী আলিমরা ইলমকে অপমানিত করেছে, ইলমের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে, ইলমের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

যদি তুমি বলো, ইলমের জন্য সে চেষ্টা-সাধনা এখন আর নেই, ইলমের বাজার এখন জনমানবহীন। তবে বলব, যখন ইলমের বাজারের প্রহরী চলে গেছে, তখন ইলমের বাজার জনমানবহীন নিষ্প্রভ হয়েছে। (অর্থাৎ ইলম এখন সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হয়ে গেছে। তাই মানুষ এদিকে আগায় না। কেননা, সম্পদ অর্জনের সবচেয়ে কঠিন পথ এটাই। তাই মানুষ ভাবছে, সম্পদ যখন অর্জন করবই, তখন সহজ পথেই করি। কষ্ট করে ইলম কেন শিখতে যাব!)

যে কেউ এসেই আমাকে হাদিয়া-তোহফা দিয়ে যাবে আর ভাববে, আমি পরে তার পিছু পিছু হাদিয়ার জন্য দৌড়াব, কিন্তু আমি তেমন মানুষ নই। আমার লোভ নেই, লাঞ্ছনা নেই। আমি কেবল তার থেকেই হাদিয়া নেব, যে হবে সম্মানিত সম্ভ্রান্ত মনের অধিকারী।

যদি কখনো বিপদে পতিত হই, তবুও আমি রাতভর এ চিন্তা করব না যে, আমি কি অমুকের কাছে যাব, না যাব না? এমন চিন্তা করে সকালে আমি সাহায্য করে খোঁটা দেয় এমন কারও কাছে যাব না কখনো। বরং আমি এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করব সুস্থির হয়ে, যার কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে পরে আমিই তার ব্যাপারে বলতে পারি, অমুক আমাকে সহযোগিতা করেছেন।'[১৬৮]

ইমাম আলি বিন আবু তাইয়িব ﷺ-এর জীবনীতে ইমাম জাহাবি ﷺ উল্লেখ করেন, তাঁকে সুলতান মাহমুদ বিন সুবক্তগিনের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য সুলতান ওয়াজ শুনবেন। আলি ﷺ দরবারে প্রবেশ করে বিনা অনুমতিতে বসে পড়লেন। অনুমতি ছাড়াই একটি হাদিস বর্ণনা শুরু করে দিলেন। ফলে সুলতান রেগে গেলেন। গোলামকে আদেশ দিলে গোলাম এসে তাঁকে এমন এক ঘুষি মারল যে, ইমাম আলি বধির হয়ে গেলেন।

উপস্থিত এক লোক সুলতানের সামনে ইমামের ইলম ও দ্বীনি অবস্থানের কথা তুলে ধরল। তাঁর ব্যাপারে জানতে পেরে সুলতান তাঁর কাছে ওজরখাহি করলেন। তাঁকে কিছু সম্পদ দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু ইমাম আলি নিষেধ করে দিলেন। সুলতান বলল, 'হে শাইখ, রাষ্ট্র একটি আক্রমণের মুখে রয়েছে। রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। আমি মনে করি, আপনি বিষয়টি

....

১৬৮. শাইখ জুরজানির এ কবিতাটি القصيدة الميمية নামে খ্যাত।

সমাধান করতে পারবেন। আপনি একটি সমাধান বের করে দিন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে রয়েছেন। আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান ও হাদিস শোনানো আর বিনয়ের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। রিয়াসাতের আইন তৈরির জন্য নয়।' বাদশাহ লজ্জিত হলেন এবং শাইখের মতামত গ্রহণ করে নিলেন।

- ইবরাহিম বিন ইসহাক হারবি ﷺ বলেন, 'আতা বিন আবি রবাহ ﷺ ছিলেন কালো বর্ণের একজন ক্রীতদাস। মক্কার এক মহিলা ছিলেন তাঁর মনিব। তাঁর নাকটা ছিল শিমের মতো। একদা আমিরুল মুমিনিন সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক দুই ছেলেসহ আতা ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাঁর নিকট বসলেন। তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। সালাত শেষ হলে আতা তাদের প্রতি মনোযোগী হলেন। তারা হজের বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর তিনি পিঠ দিয়ে রাখলেন। এরপর সুলাইমান তার ছেলেদের বললেন, 'তোমরা দুজন উঠে যাও।' ছেলেরা উঠে গেল। সুলাইমান তাদের সাথে এসে যোগ দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা ইলম অর্জন করতে কার্পণ্য করবে না। আজ ইলমের অভাবে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে। এ কালো গোলামের সামনে আমাদের লাঞ্ছনা আমি ভুলতে পারব না।'

- আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি এবং হীনতা থেকে বেঁচে থাকার একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত হলো ইজ্জুদ্দিন ﷺ-এর কর্ম। যখন তাঁর সামনে পাঠক কোনো কিতাব পাঠ করত এবং পরিচ্ছেদের শেষে থেমে যেত, তিনি তখন থামতে দিতেন না। আদেশ করতেন, যেন তার পরবর্তী পরিচ্ছেদ থেকে কিছু অংশ পাঠ করে নেয়; চাই তা এক লাইনই হোক কেন। তিনি বলেন, 'আমি তাদের একজন হতে চাই না, যারা কয়েক অধ্যায় শেষ হলেই থেমে যায়।'

- এখন বলছি এমন এক আলিমের কথা—যিনি দরিদ্র হলেও মানুষের কাছে চাওয়া খুবই অপছন্দ করতেন; যদিও চাইলেই তিনি উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসন অর্জন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করতেন না। তিনি কারও কাছে হাতপাতা বা কোনো কিছু চাওয়া নিষেধ করতেন; যদিও সে চাওয়া মহৎ কিছুর প্রত্যাশাও হয়ে থাকে। একজন আলিমের জন্য কারও সামনে হাতপাতা তার জন্য লাঞ্ছনাকর এবং নিজের আত্মমর্যাদা খুইয়ে ফেলার নামান্তর। আলিম

হলেন সত্যের প্রতি আহ্বানকারী। কিন্তু কারও কাছে কিছু চেয়ে নিজেকে ছোট করার কারণে সত্যের প্রতি দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজেকে দুর্বল করে তোলা হয়। কবি বলেন :

لَا تَمُدَّنَّ لِلْعَلْيَاءَ مِنْكَ يَدًا *** حَتَّى تَقُوْلَ لَكَ الْعَلْيَاءُ: هَاتِ يَدَكْ

'উঁচু পদের জন্য কখনো হাত পাতবে না। এমনিই থাকো, যতক্ষণ না তা তোমার কাছে নত হয়ে আসে।'

বর্ণিত আছে, কোনো এক খলিফা একশ দিনারের একটি থলে তার এক ক্রীতদাসের মাধ্যমে জনৈক আলিমের নিকট পাঠালেন। আর বলে দিলেন, 'যদি সে আলিম এগুলো গ্রহণ করেন, তবে তুমি মুক্ত।' গোলাম এগুলো নিয়ে সে আলিমের নিকট চলে গেল। কিন্তু তিনি সেগুলো গ্রহণ করলেন না। গোলাম বলল, 'আপনি এগুলো গ্রহণ করুন। কারণ, এতেই আমার মুক্তি।' আলিম বললেন, 'এতে তোমার গলা থেকে দাসত্বের শৃঙ্খল নেমে গেলেও তা আমার গলে এসে পড়বে।'

শাইখ সাইদ আল-হালাবি ﵀ ছিলেন তৎকালীন শামের সবচেয়ে বড় আলিম। তিনি পাঠ দানকালে নিজের পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। এমন সময় সে যুগের প্রভাবশালী জালিম শাসক মিসরের গর্ভনর ইবরাহিম পাশা এল তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি তার উদ্দেশে সামান্যও নড়চড় হলেন না। পা-ও গুটিয়ে নিলেন না। যেমন ছিলেন তেমনই বসে রইলেন। এতে ইবরাহিম পাশা মনে বেশ কষ্ট পেলেও প্রকাশ করল না সেখানে। সে বের হয়ে গিয়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু শাইখ সেগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আর দূতকে বলে দিলেন, 'তুমি পাশাকে বলে দিয়ো, যে (বাদশাহর সামনে) তার পা প্রসারিত করে বসতে পারে, সে তার হাত প্রসারিত করে না (বাদশাহর অনুদান গ্রহণের জন্য)।'

সালাফ তাদের সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই আত্মমর্যাদার গুরুত্ব বোঝাতেন। তাদের শেখাতেন হীনতা ও তুচ্ছতায় কখনো সন্তুষ্ট না হতে। এমনই একটি ঘটনা হচ্ছে—

জিয়াদ বিন জাবইয়ান নিজের উদারতা দেখিয়ে তার ছেলে উবাইদুল্লাহকে বললেন, 'বেটা, তুমি কি চাও, তোমাকে আরও বেশি পরিমাণে অসিয়ত করি?' উবাইদুল্লাহ জবাব দিলেন, 'বাবা, যদি জীবিত কোনো মানুষের নিকট মৃতের অসিয়তই একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকে, তবে সে জীবিত মানুষটি আদতে মৃত।'

إِذَا مَا الْحَيُّ عَاشَ بِعَظْمٍ مَيِّتٍ *** فَذَاكَ الْعَظْمُ حَيٌّ وَهُوَ مَيِّتٌ

'যদি কোনো জীবিত মানুষ কবরের মৃত হাড়গোড়ের খ্যাতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তবে সে মৃত হাড় জীবিত, আর জীবিত মানুষটা আসলে মৃত।'

- আমর বিন সাইদ তখন ছোট। মুআবিয়া ﷺ তাঁকে বললেন, 'তোমার পিতা তোমার ব্যাপারে কাকে অসিয়ত করে গেছেন?'

আমর বললেন, 'আমার ব্যাপারে কাউকে অসিয়ত করেননি; বরং আমার পিতা আমাকেই অসিয়ত করে গেছেন।'

মুআবিয়া ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে তিনি কী অসিয়ত করেছেন?'

আমর বললেন, 'অসিয়ত করেছেন, আমি যেন তাঁর মতো করে তাঁর ভাই-বন্ধুদের খোঁজখবর রাখি।'

অর্থাৎ সাইদ ﷺ যেভাবে তাঁর ভাই ও বন্ধুদের খোঁজখবর রেখেছেন, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন, তেমনই আমরও যেন তাদের সুখ-দুঃখে তাদের খোঁজখবর রাখেন। ব্যাপারটা যেন এমন হয় যে, কেবল সাইদ ﷺ-এর দেহটাই পৃথিবী থেকে চলে গেছে, কিন্তু তাঁর সম্পর্ক ও অনুগ্রহ তাঁর মৃত্যুর পরও অটুট আছে আমরের মাধ্যমে।

- শাইখ আব্দুল ওয়াহাব ফারসি ﷺ একদা তাঁর বন্ধু শাইখ মুহাম্মাদ আল-জিরাহ ﷺ-এর সাথে মৃদু গতিতে হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটি গাড়ি এসে তাঁদের ধাক্কা মারল। তাঁরা দুজনই একটি গর্তে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। ড্রাইভার নেশাগ্রস্ত ছিল জানতে পেরে তাঁরা তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন। তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধ একজন নেশাগ্রস্ত লোকের কাছে দাঁড়াতে বাধা দিয়েছে।

একটি বিরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমি এই অধ্যায়ের ইতি টানতে চাচ্ছি। উসতাজ সাইয়িদ কুতুব। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন। শহিদদের মাঝে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। তিনি সে বীর, যিনি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। এ মহান মনীষী শৈশব থেকেই ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্যাদার পাঠ পেয়েছিলেন। হৃদয় দিয়ে এসব অনুভব করেছিলেন। তিনি জীবিত ছিলেন সাইয়িদ (নেতা) হয়ে। দুনিয়া থেকে বিদায়ও নিয়েছেন সাইয়িদ হয়ে, মাথা উঁচিয়ে। নিজ জীবন কাটিয়েছেন কুতুব বা আলোর মিনার হয়ে। দুনিয়া থেকে প্রস্থানও করেছেন দাওয়াত ও জিহাদের আলোর মিনার হয়ে।

আমরা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি নিয়ে আলোচনা করছি। তাগুতের কাছে ক্ষমা চাইলেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে, এ কথা তাঁর কাছে বলা হলে, তিনি বললেন, 'যে আমল আমি করেছি আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে, সে আমলের জন্য আমি ক্ষমা চাইব না কখনো।'

এরপর তাঁকে এমন কিছু লিখতে বলা হয়, যাতে আব্দুন নাসির তাঁর প্রতি কোমল হয়। তখন তিনি বললেন, 'যে শাহাদাত আঙুল সালাতে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়, সে আঙুল এমন একটি হরফ লিখতেও প্রত্যাখ্যান করে, যার মাধ্যমে তাগুতি শাসনের স্বীকৃতি মিলবে।'

তিনি আরও বলেন, 'কেন আমি তার দয়া চাইতে যাব? যদি আমি ন্যায়সংগতভাবে বন্দী হয়ে থাকি, তবে ন্যায়সংগত যে নির্দেশ আসবে, তা-ই গ্রহণ করব। আর যদি বাতিল আমাকে বন্দী করে থাকে, তবে আমি বাতিলের কাছে দয়া চাওয়ার অনেক উর্ধ্বে।'

তাঁর কোনো এক বৈঠকে একজন সামরিক অফিসার এসে 'শহিদ' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'শহিদ মানে, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর শরিয়ত তার জীবনের চেয়েও দামি।'[১৬৯]

....

১৬৯. দেখুন, সাইয়িদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিশহাদ : ৬১-৬২, ৪৬২, ৪৭৪, ৪৮১। নব্য জাহিলিয়াতের সামনে তিনি ছিলেন এক প্রবল-প্রতাপধারী ব্যক্তিত্ব। এমনকি এ বীর যখন ফাঁসির মঞ্চে, যখন তিনি কঠিন এক সময় অতিক্রান্ত করছেন, তাঁর ফাঁসি হওয়ার সময়টিতে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের এ ফাঁসির রশি যেমন নিকৃষ্ট, তেমনই তোমাদের জাহিলিয়াতও নিকৃষ্ট।' - সানাআতুল হায়াত, পৃষ্ঠা নং ৬০।

নিম্ন মানসিকতার লোকেরা হীনম্মন্যতার শিকার

মানুষ যাকে বড় মনে করে, তাকে লজ্জা করে। এ কারণেই সে আলিমকে জাহিল অপেক্ষা এবং নেককারকে বদকার অপেক্ষা বেশি লজ্জা করে। আর এ কারণেই সে কোনো প্রাণী বা শিশুকে লজ্জা করে না। বস্তুত যে নিজের সত্তাকে বড় বা উত্তম মনে করে, তার লজ্জা অন্যদের অপেক্ষায় নিজের প্রতি অনেক বেশি হবে।

কিন্তু নিম্ন মানসিকতার লোক মানুষকে লজ্জা করলেও যখন সে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন নিজেকে নিজে লজ্জা করে না। কেননা, সে নিজেকে অন্যদের অপেক্ষা অনেক তুচ্ছ মনে করে। নিজেকে সে সবার চেয়ে হীন মনে করে বলেই একাকী নিকৃষ্ট কাজ করতে লজ্জা করে না। এ কারণেই জনৈক সালাফ বলেছেন, 'প্রকাশ্যে করতে লজ্জা পায়—এমন কিছু যে গোপনে করে থাকে, আসলে এটা প্রমাণ করে, তার নিজের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বেরই কোনো মূল্য নেই।'[১৭০]

এক আবিদকে বলা হলো, 'সবচেয়ে মন্দ মানুষ কে?' তিনি বললেন, 'মানুষ যাকে মন্দ অবস্থায় দেখলে তার কিছুই যায় আসে না।'

জরুরি কিছু পার্থক্য

অনেক সময় মন্দ কাজে প্ররোচক নফসে আম্মারা বান্দার কাছে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন—এমন কাজগুলোকে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন—এমন কাজগুলোর সাথে গুলিয়ে ফেলে। উভয়ের মাঝে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য। তাই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যতীত খুব কম মানুষই এ অস্পষ্টতার কুয়াশা ভেদ করতে পারে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ ﷺ তাঁর 'আর-রুহ' নামক গ্রন্থে কিছু উপকারী পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, সেখানে তিনি এসব সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে তার কিয়দাংশ তুলে ধরছি।

....

১৭০. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৩৫৩

উন্নত সত্তা ও উদ্ধত আত্মার পার্থক্য

'উন্নত সত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নফসকে সকল নীচু ও মন্দ গুণাবলি থেকে মুক্ত রাখা এবং নিজেকে এমন সব স্থান থেকে দূরে রাখা, যেখানে মানুষ লাঞ্ছনার শিকার হয়। এমন ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে উচ্চ মনোভাব পোষণ করেন এবং এ সকল মন্দ স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

কিন্তু উদ্ধত আত্মা এর বিপরীত। এ চরিত্রটা দুটি জিনিস থেকে গঠিত হয় : আত্মমুগ্ধতায় গড়ে ওঠা অহমিকা এবং অন্যকে হেয়জ্ঞান করা। তার ভ্রান্তির সূচনা এই দুটি থেকেই। আর উন্নত আত্মা দুটি উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে গঠিত হয়—

- আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা।
- নিজেকে গোলাম, নিকৃষ্ট, হীন ও নীচ মেনে নিজের মালিক ও মনিবকে বড় মনে করা।

এ দুটি জিনিস থেকেই তৈরি হয় আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। উন্নত সত্তা গঠনের মূলভিত্তি দুটি : এক. নিজের নফসকে প্রস্তুত করা। দুই. নফসের অধিপতি থেকে আসা সাহায্য-সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া। এ প্রস্তুতি ও সাহায্য না থাকলে একজন মানুষকে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।'[১৭১]

অহংকার বনাম আত্মমর্যাদা

'আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি নতুন সাদা পোশাক পরিধানকারীর ন্যায়। সাদা-শুভ্র পোশাক, যার রয়েছে ন্যায্য মূল্য। সে এটি পরিধান করে রাজা-বাদশাহসহ অন্য সবার কাছে যায়। তাই কাপড়টিকে ধুলোবালি, ময়লা ও অন্যান্য মন্দ দাগ থেকে সব সময় স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করে। নিজেকে সে দৃঢ় রেখে চলাফেরা করে; আর এমন সব স্থান এড়িয়ে চলে, যেখানে ময়লা লাগার আশঙ্কা রয়েছে। সে কিছুতেই কাপড়ে কোনো দাগ, ময়লা বা কালির চিহ্ন লাগার সুযোগ দেয় না। এরপরেও যদি ঘটনাক্রমে তা লেগেও যায়, তবে তড়িঘড়ি করে উঠিয়ে নেয় এবং দাগটি মুছে ফেলে। নিজের হৃদয় ও দ্বীনকে সংরক্ষণকারী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন

১৭১. আর-রুহ, পৃষ্ঠা নং ৩১৩।

ব্যক্তির উদাহরণ এমনই। সে গুনাহের দাগ ও ক্ষত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ, তাঁর হৃদয়ে রয়েছে এমন সকল ছাপ ও নিদর্শন, যা কাপড়ের ওপর লাগা মন্দ ও কদর্য দাগ থেকেও বেশি শক্তিশালী। কিন্তু সকল চোখ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। তাই অনেকেই আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিকে দেখবে, কলঙ্কযুক্ত স্থান থেকে সে পালিয়ে যাচ্ছে, লোকজনকে এড়িয়ে চলছে, তাদের সাথে মিশছে না এ ভয়ে যে, তার হৃদয়ে কোনো কলঙ্ক যুক্ত হয়ে যেতে পারে; সে এসব থেকে এমনভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখে, যেমনটা দাবাগাতকারী, জবাইকারী ও বাবুর্চির সাথে সাক্ষাতের সময় অন্যরা নিজেদের কাপড়চোপড় গুটিয়ে রাখে। এ ধরনের মানুষ হলো আত্মমর্যাদাশীল।

দাম্ভিক-অহংকারী এর বিপরীত। এড়িয়ে চলার দিক থেকে যদিও ওপরের ব্যক্তির সাথে তার কিছুটা বাহ্যিক মিল রয়েছে, কিন্তু অহংকারীর লক্ষ্য হলো সকলের ঘাড়ে চড়া এবং সকলকে নিজের কদমতলে রাখা। সুতরাং বোঝা গেল, আত্মমর্যাদাশীল এক রঙের হয়, আর অহংকারী হয় ভিন্ন রঙের।'[১৭২]

অহংকার :

'অজ্ঞতা ও অন্ধকারময় অন্তর থেকে প্রকাশিত অবাধ্যতা ও অহমিকার নাম অহংকার। এমন অন্তর অজ্ঞতা ও আঁধারে ছেয়ে গেছে। এ অন্তর থেকে দাসত্ব বিদায় নিয়েছে। বিদ্বেষ ভর করেছে তার ওপর। তাই মানুষের প্রতি সে বক্রদৃষ্টিতে তাকায়। তাদের মাঝে তার চলাফেরায় দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। আচার-আচরণে সে নিজেকে প্রাধান্য দেয়; অন্যকে মোটেও প্রাধান্য দেয় না। কারও প্রতি ইনসাফও করে না। এভাবে সে নিজেকে অহংকারের দুয়ারে ঠেলে দেয়। সাক্ষাৎ হলে কাউকে সে আগে সালাম দেয় না; যদিও কারও সালামের উত্তর দেয়, কিন্তু এমনভাবে দেয় যে, যেন সে সালামের উত্তর দিয়ে সালামদাতার ওপর অনুগ্রহ করেছে। মানুষের জন্য তার চেহারায় ফুটে ওঠে না হাসির রেখা। মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে সে সুন্দর চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখায় না। তার ওপর কারও কোনো অধিকার রয়েছে, এটা সে মনে করে না। বরং মনে করে, অন্য সকলের ওপর তার অধিকার রয়েছে। নিজের ওপর কারও

১৭২. আর-রুহ, পৃষ্ঠা নং ৩১৭।

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না সে। বরং মনে করে, সে-ই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এভাবে এমন ব্যক্তি দিনদিন আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। আর মানুষের কাছে হীন বা ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়।'[১৭৩]

১৭৩. আর-রুহ, পৃষ্ঠা নং ৩১৬।

নম্রতা বনাম নীচতা

নম্রতা :

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জানা, তাঁকে ভালোবাসা ও সম্মান করার সাথে সাথে নিজের ব্যাপারে, নিজের কর্মের দুর্বলতা ও বিপদের ব্যাপারে জানার মাধ্যমে একজনের মাঝে সৃষ্টি হয় নম্রতার মতো মহৎ গুণটি।

নম্রতা হলো, আল্লাহর সামনে নিজের হৃদয়কে সঁপে দেওয়া। নিজের দয়া-অনুগ্রহের ডানা আল্লাহর বান্দাদের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া। এভাবে একজন মানুষ নম্রতা অর্জন করে। ফলে সে কারও ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে না। কারও কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার তালাশ করে না। বরং সে নিজের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে। নিজের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার দেখে। এটি এমন এক চরিত্র, যা আল্লাহ তাকেই দেন—যাকে তিনি ভালোবাসেন, যার ওপর তিনি দয়া করেন, যাকে তিনি দান করেন নৈকট্যের মতো মহা নিয়ামত।

নীচতা :

নীচতা হলো হীনতা, অপদস্থতা। নফসকে মন্দকর্ম, প্রবৃত্তি আর কামনা-বাসনা পূরণে লাগিয়ে রাখাকে বলে নীচতা। যেমন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হীন লোকদের চাটুকারিতা, কর্তার সামনে কর্মচারীর বিনয়, স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যার কাছ থেকে স্বার্থ হাসিল হবে তার সামনে মোসাহেবি করা—এসবই হলো নীচতা; এগুলো নম্রতা নয়। আল্লাহ তাআলা নম্রতাকে ভালোবাসেন। আর হীনতা ও নীচতাকে অপছন্দ করেন। সহিহাইনে এসেছে, রাসুল ﷺ বলেন :

وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

'আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহির মাধ্যমে জানিয়েছেন, তোমরা নম্রতা অবলম্বন করবে এবং কেউ কারও ওপর গর্ব করবে না এবং কেউ কারও ওপর জুলুম করবে না।'[১৭৪_১৭৫]

....

১৭৪. সহিহু মুসলিম : ২৮৬৫

১৭৫. আর-রুহ, পৃষ্ঠা নং ৩১৪।

হিংসা বনাম প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ও হিংসার মাঝে পার্থক্য হলো, প্রতিযোগিতা হলো এমন পুণ্য কোনো বিষয়ের দিকে ছুটে যাওয়া, যা ভিন্ন কেউ অর্জন করার চেষ্টা করছে একই সাথে। ফলে একই লক্ষ্য সামনে রেখে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় একজন অন্যজনের সমান হয় বা একজন অন্যজনকে ছাড়িয়ে যায়। এটি আত্মসম্মান, উচ্চ মনোবল আর মর্যাদার প্রতীক। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

'আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।'[১৭৬]

প্রতিযোগিতা হয় মূল্যবান বস্তুকে ঘিরে। এমন বস্তুকে ঘিরে মানুষের মনঃপ্রাণ আকৃষ্ট ও উদগ্রীব হয়ে ওঠে; ফলে একজন অন্যজনের সাথে প্রতিযোগিতা করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা প্রায়ই একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, প্রফুল্ল থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে। যেমন রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ কল্যাণকর বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। পরস্পর একই কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরে তাঁরা আনন্দ বোধ করতেন। বরং তাঁরা একে অন্যকে এ প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করতেন। এটি হলো কল্যাণকর কাজে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'কাজেই সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

'তোমরা পরস্পর অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত লাভের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়।

১৭৬. সুরা আল-মুতাফফিফিন : ২৬

তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ইমান এনেছে।'[১৭৭]

উমর ﷺ আবু বকর ﷺ-এর সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। কিন্তু তিনি কখনো আবু বকর ﷺ-কে পেছনে ফেলতে পারেননি। যখন উনি দেখলেন যে, আবু বকর ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই কোনো বিষয়ে আপনার অগ্রে যেতে পারব না।' তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহর শপথ, কোনো কল্যাণের ক্ষেত্রেই আমি তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে আমি আমার আগে পেয়েছি।'

প্রতিযোগীরা হলো একই মনিবের অধীনস্থ দুই গোলামের ন্যায়। যারা উভয়ে পাল্লা দিয়ে মনিবের সেবা করে। মনিবের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় প্রতিযোগিতা করে। তারা প্রতিযোগিতা করে মনিবের পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে। তাদের মনিব এ দেখে উভয়কেই পছন্দ করেন, তাদের উৎসাহিত করেন। আর প্রতিযোগীদের প্রত্যেকেই একে অন্যকে ভালোবাসে। একে অন্যকে মনিবের সন্তুষ্টি অর্জনে অনুপ্রেরণার জোগান দেয়।

পক্ষান্তরে, হিংসা হলো নিকৃষ্ট ধিকৃত অধঃপতিত আত্মার মন্দ চরিত্রের একটি অংশ। এতে কল্যাণের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকে না। নফসের দুর্বলতা ও হীনতার কারণে (হিংসুক) কল্যাণ ও প্রশংসা অর্জনকারীকে হিংসা করে। আকাঙ্ক্ষা করে যেন অর্জনকারীর অর্জন ছুটে যায়, তার থেকে তা হারিয়ে যায়। আকাঙ্ক্ষা করে অর্জনকারী যেন তারই স্তরে নেমে আসে। যেন দুজন একসমান হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

'তারা চায়, তারা যেমন কুফরি করেছে, তোমরাও তেমনই কুফরি করো, যাতে তোমরা ও তারা সব সমান হয়ে যাও।'[১৭৮]

১৭৭. সুরা আল-হাদিদ : ২১
১৭৮. সুরা আন-নিসা : ৮৯

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

'আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দহনে কামনা করে, যদি তোমাদের ইমান আনার পর কুফরিতে ফিরিয়ে নিতে পারত!'[১৭৯]

হিংসুক নিয়ামতের শত্রু। নিজে বঞ্চিত হওয়ার কারণে সে আকাঙ্ক্ষা করে অন্য সবাইও যেন বঞ্চিতই থাকে। কিন্তু প্রতিযোগীরা পরস্পরের জন্য নিয়ামতপ্রত্যাশী। পরস্পর সমানভাবে নিয়ামত পেতে চায় বা নিয়ামতের ক্ষেত্রে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। প্রতিযোগী ব্যক্তি অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাকে ছাড়িয়ে উচ্চতায় বরিত হতে। সে নিজের প্রতিযোগীর সমতা অর্জন করতে বা শ্রেষ্ঠত্বে তাকে ছাড়িয়ে যেতে ভালোবাসে। কিন্তু হিংসুক অন্যের পতন কামনা করে। সে নিজে যেহেতু লোকসানে আছে, তাই কামনা করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীও যেন লোকসানের দিক থেকে তার বরাবর হয়ে যায়। কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট প্রশান্ত হৃদয়গুলো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপকৃত হয়। যদি কেউ নিজের সামনে শ্রেষ্ঠত্বে কাউকে অগ্রে যেতে দেখে, তাহলে সে যেন তার সাথে প্রতিযোগিতা করে—তবেই সে প্রভূত কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হবে। কারণ, সে ওই ব্যক্তির সাদৃশ্য গ্রহণ করছে এবং তার সাথে মিলিত হওয়া বা তারও অগ্রে যাওয়া কামনা করে। আর এতে কোনো অসুবিধা নেই।[১৮০] অনেক সময় 'হাসাদুন' (আক্ষরিক অর্থে হিংসা) শব্দটি প্রশংসিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন :

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

....

১৭৯. সুরা আল-বাকারা : ১০৯

১৮০. সুতরাং উচ্চ মনোবলের অধিকারী দ্বীনের ক্ষেত্রে তার চেয়েও উচ্চতায় বরিত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং বলে, 'অমুক আমার থেকে উত্তম।' তাই সে ওই ব্যক্তির মতো হতে প্রতিযোগিতা করে। আর নিম্ন মানসিকতার লোক দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের চেয়েও নিম্ন মানের লোকদের প্রতি দৃষ্টি ফেরায় আর বলে, 'আমি অমুক থেকে উত্তম।'

‘কেবল দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা (ঈর্ষা) করা যায়। এক. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন দান করেছেন, আর সে রাতদিন তা তিলাওয়াত করে। দুই. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন, আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে।’[১৮১]

এটি হচ্ছে প্রতিযোগিতার হিংসা। যার অন্য নাম ঈর্ষা। যা উচ্চ মনোবল ও আত্মার স্বচ্ছতার প্রতি ইঙ্গিত করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মতো হওয়ার কামনা থেকেই মানুষের মাঝে এটি আসে।’[১৮২]

দ্বীনি নেতৃত্ব ও দুনিয়াবি নেতৃত্বের মাঝে পার্থক্য

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

‘স্মরণ করো, যখন ইবরাহিমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর সে তা পূর্ণ করে দিল। তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাব। সে বলল, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের শামিল করবে না।’[১৮৩]

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, ‘এই আয়াতে রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কথা বলা হয়নি; বরং এখানে দ্বীনি নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, ইবরাহিম ﷺ-এর বংশের কোনো জালিম এ নেতৃত্ব পাবে না। আল্লাহ বলেন, “এতে বোঝা যায়, “প্রতিশ্রুতি” দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, দুনিয়াবি নেতৃত্ব নয়।”’[১৮৪]

....

১৮১. সহিহুল বুখারি : ৭৫২৯

১৮২. আর-রুহ : ৩৩৯-৩৪০ পৃষ্ঠা।

১৮৩. সুরা আল-বাকারা : ১২৪

১৮৪. মাহাসিনুত তাবিল : ৬/২৪৬

ইবরাহিম ﷺ-এর দুআও ছিল—

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন।'

অর্থাৎ হিকমত দান করুন অথবা মানুষের মাঝে সত্য সহকারে শাসন বা নবুওয়াত দান করুন। কারণ, নবি হলেন হিকমত ও সুশাসনের অধিকারী।

وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

'আর আমাকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'[১৮৫]

অর্থাৎ আমাদের তাঁদের পথে চলার তাওফিক দিন, যাতে আমরাও সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, যাঁদের আপনি জগৎবাসীর হিদায়াত এবং সৃষ্টির পূর্ণতা বিধানের কারণ বানিয়েছেন।

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

'আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন।'[১৮৬]

অর্থাৎ আমার সুন্দর আলোচনা সুবিদিত হোক পরিবর্তীদের মধ্যে। যার মাধ্যমে আমাকে পরবর্তীকালে স্মরণ করা হবে। অনুসরণ করা হবে কল্যাণের ক্ষেত্রে।

এ দুআর ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ - سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ - كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

'আর আমি তাঁকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইবরাহিমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সৎকর্মশীলদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।'[১৮৭]

১৮৫. সুরা আশ-শুআরা : ৮৩
১৮৬. সুরা আশ-শুআরা : ৮৪
১৮৭. কুরতুবি ﷺ 'আল-জামি লি আহকামিল কুরআন'-এ বলেন, আশহাব ﷺ মালিক ﷺ থেকে

(لِسَانَ صِدْقٍ)-এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আমার বংশধর থেকে একজন সত্যবাদী নির্ধারণ করুন। যে আমার দ্বীনের ভিত্তি নবায়ন করবে। আমি যে তাওহিদের প্রতি মানুষকে আহ্বান করি, সেও তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে। আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। এ কারণেই নবিজি ﷺ বলেছিলেন :

أنا دعوة أبي إبراهيم

'আমি আমার পিতা ইবরাহিমের দুআর ফল।'[১৮৮]

সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

اللهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ

'হে আল্লাহ, আমাদের ইমানের সাজে সাজিয়ে দিন এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিন।'[১৮৯]

বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলার বানী—

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

"আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন।" (সুরা আশ-শুআরা : ৮৪)

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভই যদি কারও উদ্দেশ্য হয়, তবে নেক কাজে প্রশংসিত হওয়া বা নেক কাজে প্রদর্শিত হতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

"আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে।" (সুরা তহা : ৩৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

"যারা ইমান আনে এবং সৎ কাজ করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।' (সুরা মারইয়াম : ৯৬)

অর্থাৎ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে ভালোবাসা ও সুন্দর প্রশংসা দান করবেন তাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা (وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) আয়াতের মধ্যে যে সকল কর্মের মাধ্যমে সুখ্যাতি ও প্রশংসাময় আলোচনার পাত্র হওয়া যায়, সেগুলো অর্জনের প্রতি উজ্জীবিত করেছেন আমাদের।

১৮৮. মাহাসিনুত তাবিল : ১৩/৪৬২৪

১৮৯. সুনানুন নাসায়ি : ১৩০৫

আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, রহমানের কাছে তাঁর বান্দাদের দুআ হচ্ছে—

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'আর আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।'[১৯০]

ইমাম বুখারি ﷺ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'আমাদের এমন ইমাম বানিয়ে দিন, যারা অনুসরণ করবে পূর্ববর্তীদের, আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করবে।'

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ এমন আদর্শ বানিয়ে দিন, কল্যাণের পথে যাদের অনুসরণ করা হবে। কারণ, এটি অনেক প্রতিদান বয়ে আনে। যা প্রত্যাশার দিক থেকে অনেক সুন্দর প্রত্যাশা। আর এটি তখনই হবে, যখন একজন দায়ি হবেন মুত্তাকি ও আদর্শবান। দায়িদের লক্ষ্য এমনই হওয়া উচিত। মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, 'হে কাফেলা, তোমরা এমন ইমাম, যাদের অনুসরণ করা হবে।' তাই তো ইবনে উমর ﷺ দুআয় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'[১৯১]

মাকহুল ﷺ দুআয় বলতেন, 'আমাদের তাকওয়ার ইমাম বানিয়ে দিন, যাতে মুত্তাকিরা আমাদের অনুসরণ করে।'

ইমাম কাফফাল ও অন্যান্য মুফাসসির বলেন, 'এ আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, দ্বীনি নেতৃত্ব কামনা করা ওয়াজিব।'

ইমাম কুশাইরি ﷺ বলতেন, 'নেতৃত্ব দুআর মাধ্যমে অর্জিত হয়, দাবির মাধ্যমে নয়।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও অনুগ্রহের মাধ্যমে নেতৃত্ব অর্জিত হয়। কারও নিজস্ব দাবির ভিত্তিতে নেতৃত্ব অর্জিত হয় না।

ইমাম ইবরাহিম আন-নাখয়ি ﷺ বলেন, 'সাহাবিগণ পার্থিব নেতৃত্ব চাইতেন না; বরং দ্বীনের ক্ষেত্রে আদর্শ হতে চাইতেন তাঁরা।'

....

১৯০. সুরা আল-ফুরকান : ৭৪

১৯১. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন : ১৩/৮৩

ইবনে আব্বাস ﵄ দুআ করতেন, 'আমাদের পথপ্রদর্শনকারী ইমাম বানিয়ে দিন।' যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا 'আর আমি তাদের নেতা বানালাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ ﵀ 'আর-রুহ' গ্রন্থে 'দুনিয়াবি নেতৃত্ব ও দ্বীনি নেতৃত্ব কামনার মাঝে পার্থক্য করে একটি পরিচ্ছেদ এনেছেন। সেখানে তিনি বলেন :

'দুনিয়াবি নেতৃত্ব কামনা ও আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব কামনার মাঝে পার্থক্য হলো, দ্বীনি নেতৃত্ব কামনা হচ্ছে আল্লাহর আদেশের প্রতি সম্মান করা, আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনা করা, নিজের আত্মমর্যাদার মূল্যায়ন করা এবং মর্যাদা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। কারণ, আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনাকারী আল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করে, তাঁকে ভালোবাসে। এমন ব্যক্তি ভালোবাসে তাঁর রবের অবাধ্যতা না করে আনুগত্য করা হোক। সে পছন্দ করে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হোক, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক। সে ভালোবাসে, সকল বান্দা যেন মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্রত হয় এবং নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু পরিহার করে। সে আল্লাহর জন্য কল্যাণকামী হয় তাঁর ইবাদতে এবং বান্দার জন্য কল্যাণকামী হয় আল্লাহর দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে। এমন ব্যক্তি দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব পছন্দ করে। রবের কাছে প্রার্থনা করে—যেন তিনি তাকে মুত্তাকিদের এমন ইমাম বানিয়ে দেন, যাকে মুত্তাকিরা অনুসরণ করবে, যেমন সে পূর্ববর্তী মুত্তাকিদের অনুসরণ করে। যখন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এই বান্দা মানুষের দৃষ্টিতে মহৎ হওয়া, তাদের হৃদয়ে আসন করে নেওয়া, তাদের কাছে প্রিয় হওয়া এবং মান্য হওয়া পছন্দ করবে—যাতে তারা তাকে ইমাম মানে এবং তার মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে—তখন এটি তাঁর জন্য কোনো ক্ষতিকর নয়। বরং এতে সে প্রশংসিত হবে। কারণ, সে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। যে চায় আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর উপাসনা ও একত্ববাদ স্বীকার করা হোক। এগুলোর ব্যাপারে সে সাহায্যকারী ও মাধ্যম হওয়া পছন্দ করে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের আলোচনা করেছেন, নিজ কিতাবে তাদের প্রশংসা করেছেন, তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের জন্য

উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের সর্বোত্তম কর্ম ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'আর (তারাই আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত প্রাপ্ত বান্দা) যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে আর আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।'[১৯২]

তাই তারা প্রার্থনা করে, যেন স্ত্রী ও সন্তানরা আল্লাহর অনুগত হয়ে তাদের চক্ষু শীতল করে। যেন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে মুত্তাকিরা তাদের অনুসরণ করার মাধ্যমে তাদের হৃদয় প্রফুল্ল হয়। কারণ, ইমাম ও অনুসরণকারী রবের আনুগত্যের পথে পরস্পরের সাহায্যকারী। তারা আল্লাহর কাছে সে জিনিসটি প্রার্থনা করে, মুত্তাকিরা আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে যার সাহায্য গ্রহণ করবে। তারা দ্বীনি নেতৃত্বে আসীন হয়ে আল্লাহর বান্দাদের তাঁর প্রতি আহ্বান করার দুআ করে। যে নেতৃত্ব সবর ও ইয়াকিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

'তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।'[১৯৩]

তাদের প্রার্থনা হলো, তাদের যেন মুত্তাকিদের ইমাম বানানো হয়। এ দুআর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, আল্লাহ যেন তাদের পথ প্রদর্শন করেন, তাদের তাওফিক দেন, উপকারী ইলম দেন, তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেক আমল দান করেন—কারণ, এগুলো ব্যতীত ইমামত ও নেতৃত্ব পূর্ণতা পায় না।

১৯২. সুরা আল-ফুরকান : ৭৪
১৯৩. সুরা আস-সাজদা : ২৪

চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা কেন এই আয়াতে তাদের নিজ রহমান নামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। উত্তর হচ্ছে, যেন বান্দারা জেনে নেয় যে, তারা এ নেতৃত্ব পাবে আল্লাহ তাআলার রহমত, একান্ত অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে। আপনি চিন্তা করুন, তিনি এই সুরাটিতে তাদের জন্য কী প্রতিদানের কথা বলেছেন! তিনি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন জান্নাতের সর্বোচ্চ অবস্থান; যেহেতু দ্বীনি নেতৃত্ব হলো বিশাল এক অবস্থান। এমনকি দ্বীনি নেতৃত্ব হলো দ্বীনের ক্ষেত্রে বান্দার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা। এ কারণেই তাঁর প্রতিদান হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে।

অন্যদিকে দুনিয়াবি নেতৃত্ব কামনা এর বিপরীত। কারণ, দুনিয়াবি নেতৃত্ব-প্রত্যাশীরা নেতৃত্ব পাওয়ার চেষ্টা করে পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে—নেতৃত্ব অর্জন করলে মানুষের অন্তর তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে এবং তাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে। ফলে এসব মানুষ তাদের দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধিতে তাদের সহযোগিতা করবে। তা ছাড়া নেতৃত্ব পেলে মানুষের নেতা হয়ে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করতে পারবে।

দুনিয়াবি নেতৃত্বের নিকৃষ্ট লোভের কারণে বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, হিংসা-বিদ্বেষ, জুলুম, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরায়ণতার মতো এমন কত অনিষ্ট যে ঘটতে থাকবে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।[১৯৪] এ ছাড়াও আল্লাহর হক বিনষ্ট হবে; আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেছেন, তাকে সম্মান করা হবে; আল্লাহ যাকে সম্মান দিয়েছেন, তাকে লাঞ্ছিত করার মতো ঘোর অপরাধ সংঘটিত হবে। আর (অনেক ক্ষেত্রে) এগুলো করা ছাড়া পার্থিব নেতৃত্ব পূর্ণ অর্জিত

....

১৯৪. কুরআনে দুনিয়াবি নেতৃত্বের সাথে ফাসাদ ও অনিষ্ট সৃষ্টির কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ - فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

'যারা দেশে সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করেছিল, আর সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।' (সুরা আল-ফাজর : ১১-১২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'সেই আখিরাতের ঘর আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য। (সুরা আল-কাসাস : ৮৩)

ফিরআওন ছিল অনিষ্টকারী নেতাদের একজন। সে মুসা ও হারুন ﵉-কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল দুনিয়াবি নেতৃত্ব নিয়ে, সে ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা বলেছিল : وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ - (তোমরা কি এ জন্য এসেছ যে,) 'জমিনে তোমাদের দুজনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়?' (সুরা ইউনুস : ৭৮)

হয়ও না। এভাবে করে এবং এর চেয়ে বহুগুণ অনিষ্ট-ফাসাদ সৃষ্টি করার পরই নেতৃত্ব অর্জিত হয়।[১৯৫] কিন্তু এ সকল নেতৃত্বলোভী এসব বিষয়ে অন্ধ থাকে। একসময় যখন চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যায়, তখন নিজেদের সৃষ্ট অনাচার-অনিষ্ট দেখতে পেয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয় তাদের। বিশেষ করে তাদের পাপের ঘড়া ভরে গেলে নেতৃত্বহারা হয়ে ভুক্তভোগীদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয় যখন—আল্লাহর আদেশকে অবজ্ঞা করা, আল্লাহর বান্দাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার শাস্তিস্বরূপ নিজেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় যখন—তখন তারা দেখতে পায়, পৃথিবীতে তারা কত অত্যাচার ও অনিষ্ট ছড়িয়েছে।'[১৯৬]

---

১৯৫. এ ব্যাপারে আবু জাফর মাহুলি ﷺ বলেন, 'যার অন্তরে মানুষের দুনিয়াবি নেতৃত্বের বাসনা আবাস গেড়েছে, সে আখিরাতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত।' (সিফাতুস সাফওয়া : ২/৩৯০)

১৯৬. আর-রুহ : ৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠা।

কুরআন ও সুন্নাহতে উচ্চ মনোবলের প্রতি উৎসাহ

কুরআন ও সুন্নাহতে মুমিনদের উচ্চ ও মহৎ বিষয়গুলো অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। উৎসাহিত করা হয়েছে কল্যাণকর বিষয়ে প্রতিযোগিতা করার জন্য। পক্ষান্তরে তাদের সতর্ক করা হয়েছে হীনবলতা থেকে। কুরআনে কারিমে বিভিন্ন ঢঙে-বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফুটে উঠেছে এ বিষয়টি। সেসব হচ্ছে—

এক. হীনবল লোকদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং তাদের নিকৃষ্টরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যকার কথোপকথন বর্ণনা করে বলেন :

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

'তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তু বদল করে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও?'[১৯৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ

'আর আপনি তাদের সে লোকের অবস্থা শুনিয়ে দিন, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম। অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

....

১৯৭. সুরা আল-বাকারা : ৬১

আমি ইচ্ছে করলে আমার নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চতর মর্যাদা দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তাই তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের মতো। যদি তুমি তার ওপর বোঝা চাপাও, তাহলে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তাকে ছেড়ে দিলেও জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। এটাই হলো ওই সম্প্রদায়ের উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করে। তুমি এ কাহিনি শুনিয়ে দাও, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে।'[১৯৮–১৯৯]

দুই. যে সকল ইহুদি জেনেও আমল করত না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'যাদের তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, এরপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তারা পুস্তক বহনকারী গাধার ন্যায়। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট! আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।'[২০০]

আল্লাহ তাআলা তাদের সাদৃশ্য বর্ণনা করে বলেন :

وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ

'তোমাদের এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতে না।'[২০১]

....

১৯৮. সুরা আল-আরাফ : ১৭৫-১৭৭

১৯৯. আল-ফাওয়ায়িদ : ৮২

২০০. সুরা আল-জুমুআ : ৫

২০১. সুরা আল-আনআম : ৯১

অর্থাৎ তোমরা জানতে, কিন্তু সে মোতাবেক আমল করতে না; তাই তোমাদের এ জানাটা ইলম নয়।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব ﷺ-এর প্রশংসা করে বলেন :

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ

'আমার দেওয়া শিক্ষার বদৌলতে অবশ্যই সে ছিল জ্ঞানবান।'[২০২]

অর্থাৎ তিনি নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করেছেন।

তিন. হিম্মত হারিয়ে হীনবল হয়ে জিহাদ না করে পেছনে বসে থাকা এবং নীচতা-হীনতায় তুষ্ট হওয়া মুনাফিকদের ভর্ৎসনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

'তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে।'[২০৩]

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হিম্মতের অভাবে, হীনবলতার কারণে তারা জিহাদ না করে ঘরে বসে থেকেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

'যদি তাদের জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা থাকত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তিনি তাদের পশ্চাতে ফেলে রাখেন এবং তাদের বলে দেওয়া হলো, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।'[২০৪]

এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা এভাবেই জিহাদবিমুখ লোকদের ভর্ৎসনা করেছেন।

....

২০২. সুরা ইউসুফ : ৬৮

২০৩. সুরা আত-তাওবা : ৯৩

২০৪. সুরা আত-তাওবা : ৪৬

চার. যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং দুনিয়াকেই যারা নিজেদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও চিন্তা বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন। কারণ, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া থেকে তাদের হিম্মতের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। দুনিয়ার প্রতি এমন ঝুঁকে পড়া অধঃপতন ও নিম্নগামিতা, যা থেকে মুমিনরা মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের কী হলো যে, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী তো অতি সামান্য।'[২০৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

'যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করবে।'

যেমন : গনিমতের জন্য যুদ্ধ করা।

فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'তার জেনে রাখা প্রয়োজন, দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান আল্লাহরই নিকট রয়েছে।'[২০৬] অর্থাৎ তাহলে সে কেন নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস কামনা করবে? বরং সে উভয়টিই কামনা করবে অথবা শ্রেষ্ঠটি কামনা করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

....

২০৫. সুরা আত-তাওবা : ৩৮
২০৬. সুরা আন-নিসা : ১৩৪

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ- وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'লোকদের কেউ কেউ বলে, আমাদের রব, আমাদের দুনিয়াতেই দান করুন। বস্তুত তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। আবার কেউ কেউ বলে, হে রব, আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর দোজখের আজাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এরাই সেসব লোক, যাদের কৃতআমলে তাদের প্রাপ্য অংশ রয়েছে। বস্তুত, আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[২০৭]

পাঁচ. ইহুদিরা জীবনের প্রতি আসক্তির কারণে নিন্দিত হয়েছে; যদিও তাদের জীবন ছিল লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

'আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন।'[২০৮]

যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করে, কুরআন তাদের এ শিরকের পেছনে তাদের নফসের নোংরামি ও নিকৃষ্টতাকে দায়ী করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

'আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। এরপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।'[২০৯]

....

২০৭. সুরা আল-বাকারা : ২০০-২০২
২০৮. সুরা আল-বাকারা : ৯৬
২০৯. সুরা আল-হাজ : ৩১

ইসা ﷺ-এর ইবাদতকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

'মারইয়াম পুত্র ইসা রাসুল ছাড়া কিছুই ছিল না। তাঁর পূর্বে আরও রাসুল অতীত হয়ে গেছে, তাঁর মা ছিল সত্যপন্থী মহিলা, তাঁরা উভয়েই খাবার খেত। লক্ষ করো, তাদের কাছে (সত্যের) নিদর্শনসমূহ কেমন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি আর এটাও লক্ষ করো যে, কীভাবে তারা (সত্য হতে) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।'[২১০]

এরপরও কীভাবে এদের ইবাদত করা হয়? আর যারা তাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তারা কতই না নিকৃষ্ট।

ছয়. আল্লাহ তাআলা হীনবল লোকদের যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনই উচ্চ মনোবলের অধিকারী লোকদের প্রশংসা করেছেন। উচ্চ মনোবলের অধিকারীদের সর্বাগ্রে ছিলেন নবি-রাসুলগণ। আবার তাঁদের মধ্যে সবার আগে প্রথম সারিতে ছিলেন দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসুলগণ। যাদের সর্দার হলেন সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

'অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী রাসুলগণ সবর করেছেন।'[২১১]

আল্লাহর পথে অবিচলতা, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ, আল্লাহর পথে দাওয়াতের ময়দানে তাঁদের উচ্চ মনোবল ও উন্নত হিম্মত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ইসা ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘটনাসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন।

....

২১০. সুরা আল-মায়িদা : ৭৫

২১১. সুরা আল-আহকাফ : ৩৫

সাত. আল্লাহ তাআলা নবিদের অনুসারী উচ্চ মনোবলের অধিকারী মুমিনদের অবস্থানও তুলে ধরেছেন। যেমন মুসা ﷺ-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ

'আল্লাহর অনুগ্রহে সিক্ত আল্লাহভীরু দুব্যক্তি বলল, "তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে নগরের দরজায় হানা দাও। তোমরা যখনই দরজায় প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা বিজয়ী হবে।"'[২১২]

একইভাবে ফিরআওনের সম্প্রদায়ের ইমান গোপনকারী মুমিনের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে তাঁর উচ্চ মনোবলের কথা। একইভাবে সুরা ইয়াসিনে বর্ণিত হয়েছে হাবিব আন-নাজ্জারের উন্নত হিম্মতের ঘটনা। দাউদ ও জালুতের ঘটনাও অনুরূপ উচ্চ মনোবল সঞ্চারকারী ঘটনা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ۗ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বলল, "আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! বস্তুত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"'[২১৩]

অবশেষে হীনবল মানুষেরা পশ্চাদপসরণ করেছে, আর উন্নত মনোবলের অধিকারীগণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ

'তারপর ইমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করল।'[২১৪]

....

২১২. সুরা আল-মায়িদা : ২৩
২১৩. সুরা আল-বাকারা : ২৪৯
২১৪. সুরা আল-বাকারা : ২৫০

আট. আল্লাহর যে সকল বন্ধু উচ্চ মনোবলের অধিকারী, আল্লাহ তাদের 'আর-রিজাল' বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন যুদ্ধক্ষেত্র, ধৈর্যের ময়দান ও দৃঢ় সংকল্পের ক্ষেত্রে। আল্লাহর আনুগত্যে অবিচলতা ও তাঁর দ্বীনের জন্য শক্তি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

'সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।'[২১৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ -رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

'আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে—সেসব লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদের আল্লাহর স্মরণ, নামাজ কায়িম করা ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না।'[২১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'[২১৭]

২১৫. সুরা আত-তাওবা : ১০৮
২১৬. সুরা আন-নুর : ৩৫-৩৬
২১৭. সুরা আল-আহজাব : ২৩

নয়. আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ করেছেন উচ্চ মনোবলের অধিকারী হতে এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও।'[২১৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান। যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।'[২১৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'কাজেই সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও।'[২২০]

তিনি আরও বলেন :

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

'অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।'[২২১]

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

'এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।'[২২২]

....

২১৮. সুরা আল-হাদিদ : ২১
২১৯. সুরা আলি ইমরান : ১৩৩
২২০. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮
২২১. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫০
২২২. সুরা আস-সাফফাত : ৬১

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

'আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা[২২৩] করা উচিত।'[২২৪]

আল্লাহ তাআলা নিজ বন্ধুদের প্রশংসা করে বলেন :

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

'এরাই কল্যাণকাজে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আর তাতে তারা অগ্রগামী।'[২২৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

'অক্ষম নয় এমন বসে থাকা মুমিনরা আর জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়। নিজেদের ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদের আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন বসে থাকা লোকদের ওপর। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ মহাপুরস্কার দিয়ে বসে থাকা লোকেদের ওপর মুজাহিদদের মর্যাদা দান করেছেন।'[২২৬]

হাদিস শরিফে সাহাবিদের উচ্চ মনোবল এবং ভালো কাজে তাঁদের প্রতিযোগিতার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর এমনটা হবেই না বা কেন? তাঁদের তো এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন স্বয়ং রাসুল ﷺ। তিনি বলেন :

---

২২৩. এ আয়াতে আদিষ্ট প্রতিযোগিতা হচ্ছে প্রশংসিত। অন্যদিকে রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমরা প্রতিযোগিতা কোরো না।' হাদিসে যে প্রতিযোগিতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা হচ্ছে দুনিয়া ও ভোগসামগ্রীর পেছনে প্রতিযোগিতা।

২২৪. সুরা আল-মুতাফফিফিন : ২৬

২২৫. সুরা আল-মুমিনুন : ৬১

২২৬. সুরা আন-নিসা : ৯৫

اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ

'তোমার জন্য যা উপকারী, তার প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর অক্ষম ও অলস হয়ে পোড়ো না।'[২২৭]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

'যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায় আর তোমাদের কারও হাতে (গাছের) চারা থাকে এবং সে যদি তা বপন করে ওঠারও সুযোগ না পায়, তবুও যেন সে তা বপন করে নেয়।'[২২৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ দুআ করতেন—

وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ

'আর আমি সত্য পথে দৃঢ় থাকার শক্তি কামনা করি।'[২২৯]

রাসুল ﷺ 'দুর্বলতা ও অলসতা' থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন।[২৩০] তিনি সাহাবিদের বলতেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহৎ কাজকে পছন্দ করেন এবং নিম্ন মানের কাজকে অপছন্দ করেন।'[২৩১]

....

২২৭. সহিহু মুসলিম : ২৬৬৪

২২৮. মুসনাদু আহমাদ : ১২৯৮১; হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ।

২২৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪০৭

২৩০. সহিহুল বুখারি : ২৮২৩, সহিহু মুসলিম : ২৭০৬। হাদিস বর্ণিত দুআটি হলো : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আনাস ﷺ।

২৩১. আল-মুজামুল কাবির : ২৮৯৪। তাবারানি ﷺ হুসাইন বিন আলি ﷺ-এর সূত্রে হাদিসটি এনেছেন। আর হাদিসটি সহিহ। আর আল্লামা মুনাবি ﷺ মহৎ কাজের অর্থ বলেন, 'সেটা হচ্ছে, শরয়ি চরিত্রগত উন্নতি এবং দ্বীনি বৈশিষ্ট্যগত উন্নতি; দুনিয়াবি কাজের উন্নতি নয়, কারণ দুনিয়াবি দিকের

উচ্চ মনোবলের অধিকারীর মন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও প্রশান্ত থাকে যে, তার হিম্মতের উচ্চতা অনুযায়ী আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللهِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ

'বান্দার খোরাক অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে।'[২৩২]

রাসুল ﷺ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাই একজন মুমিনের সর্বোত্তম অবস্থা। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ

'যার চিন্তারাজ্য জুড়ে হবে আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন, তার বিক্ষিপ্ত কাজ একত্র করে দেবেন। দুনিয়া তার নিকট তখন তুচ্ছ-নগণ্য হয়ে যাবে। আর যার চিন্তারাজ্য দুনিয়া অর্জনের লোভে ছেয়ে যাবে, আল্লাহ তার দুচোখের সামনে অভাব-অনটন লাগিয়ে রাখবেন। তার কাজগুলো এলোমেলো ও বিছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করে দেবেন আর দুনিয়াতে সে কেবল নির্ধারিত রিজিকটাই পাবে, এর বেশি নয়।'[২৩৩]

রাসুল ﷺ এক সম্প্রদায়ের উচ্চ হিম্মতের প্রশংসা করে বলেন :

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

'যদি ইমান সুরাইয়া তারকার কাছেও থাকত, তবুও পারস্যের কিছু লোক তা অর্জন করে নিত।'[২৩৪]

উন্নত হওয়া আদতে উন্নতি নয়; বরং অবনতি।' - ফাইজুল কাদির : ২/২৯৫।

২৩২. মুসনাদুল বাজ্জার : ৮৮৭৮। আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত । হাদিসটি হাসান পর্যায়ের। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আস-সহিহা, হাদিস নং ১৬৬৫।

২৩৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৬৫। এ হাদিসের ব্যাপারে তিরমিজি ؒ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাদিসটি হাসান।

২৩৪. সহিহুল বুখারি : ৪৮৯৭, সহিহু মুসলিম : ২৫৪৬

কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক আলোচনা একজন মুমিনের হৃদয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি করে, এ শক্তিবলে মুমিনের হৃদয় নড়েচড়ে ওঠে। তাকে ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে সে শক্তি। তাকে মুক্ত রাখে পাপ ও অবাধ্যতা থেকে। কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাগুলো হিম্মতকে জাগিয়ে তোলে, হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কল্যাণকর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতার প্রতি উৎসাহিত করে। এর ওপর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

'যদি মানুষ জানত, আজানে ও প্রথম কাতারে (নামাজ আদায়ে) কী প্রতিদান রয়েছে, আর তা যদি লটারি করা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না হতো, তবে মানুষ এর জন্য লটারি করত। যদি মানুষ জানত, জোহরের নামাজ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী ফজিলত রয়েছে, তবে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতায় লেগে যেত। যদি মানুষ জানত, ইশা ও ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করার মাঝে কী ফজিলত রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে শরিক হতো।'[২৩৫]

তিনি আরও বলেন :

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْقَ ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

'কুরআনবাহককে বলা হবে, কুরআন পাঠ করো আর (জান্নাতের মর্যাদার সিঁড়ি মাড়িয়ে) ওপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীর-স্থিরতার সাথে তিলাওয়াত করতে সেভাবে তিলাওয়াত করো।

২৩৫. সহিহুল বুখারি : ৬১০, সহিহু মুসলিম : ৪৩৭

কেননা, (জান্নাতে) তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হয়।'[২৩৬]

রাসুল ﷺ ইবাদতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে ধীরতা অবলম্বন না করতে সতর্ক করেছেন আমাদের। তিনি বলেন :

احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا

'তোমরা খুতবার সময় উপস্থিত হও, ইমামের যথাসম্ভব নিকটবর্তী হও। কারণ, কেউ কেউ সব সময় দূরে দূরে থাকে, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করলেও সে সবার পেছনেই থাকবে।'[২৩৭]

রাসুল ﷺ আমাদের দুআতেও উচ্চ মনোবলের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আদেশ করেছেন আমরা যেন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ কামনা করি এবং আল্লাহ তাআলার দান ও কুদরতে যেন কোনো বিষয়কেই কঠিন মনে না করি। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ

'যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর কাছে চায়, তখন সে যেন বেশি করে চায়। কারণ, সে তার পালনকর্তার কাছে চাইছে।'[২৩৮]

অন্য বর্ণনায় আছে—

إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكْثِرْ؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ

'যখন তোমাদের কেউ আল্লাহর কাছে কোনো কিছুর আশা প্রকাশ

২৩৬. মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৯৯, সুনানু আবি দাউদ : ১৪৬৪; হাদিসটি হাসান সহিহ।
২৩৭. সুনানু আবি দাউদ : ১১০৮। এ ছাড়াও হাকিম, বাইহাকি, আহমাদ ﷺ নিজ নিজ কিতাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম ﷺ বলেন, 'হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ।' জাহাবি ﷺ এতে একমত পোষণ করেছেন।
২৩৮. সহিহু ইবনি হিব্বান : ২৪০৩। হাদিসটি শাইখাইনের শর্তে সহিহ।

করে, তখন যেন সে বেশি (পাওয়ার) আশা প্রকাশ করে। কারণ, সে তার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে।'[২৩৯]

ইরবাজ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ سِرُّ الْجَنَّةِ

'যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাওস প্রার্থনা করবে। কারণ, এটি হলো জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।'[২৪০]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ

'যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাওস প্রার্থনা করবে। কারণ, এটি হলো জান্নাতের মধ্যমণি এবং সর্বোচ্চ স্থান। এর ওপরে রয়েছে রহমানের আরশ এবং এর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় জান্নাতের নহরসমূহ।'[২৪১]

যে ব্যক্তি রাসুলের এ দিক-নির্দেশনার বিপরীতে চলেছে, নিজের হিম্মতকে নিম্নতায় ঠেকিয়েছে, আশার ক্ষেত্রে নীচতা দেখিয়েছে—রাসুল ﷺ তাকে নিন্দা জানিয়েছেন। হাদিসে এসেছে—

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ এক অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে গেলেন, যে (অসুস্থতায় কাতর হয়ে) খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এমনকি সে পাখির ছানার মতো হয়ে পড়েছিল। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি (আল্লাহর কাছে) কোনো বিষয় প্রার্থনা করছিলে অথবা তাঁর

....

২৩৯. আবদ বিন হুমাইদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ১৪৯৪। হাদিসটি শাইখাইনের শর্তে সহিহ।

২৪০. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৬৩৫। হাদিসের মান : সহিহ।

২৪১. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০

কাছে বিশেষ কিছু চাইতে?” সে বলল, “হ্যাঁ, আমি বলতাম, হে আল্লাহ, আখিরাতে আমার যে শাস্তি হবে, সে শাস্তি দুনিয়াতে দিয়ে দিন।” রাসুল ﷺ বললেন, “সুবহানাল্লাহ, তুমি সে শাস্তি সহ্য করার মতো শক্তি রাখো না অথবা তা সহ্য করতে সক্ষম নয় তুমি। তুমি বলতে পারলে না যে, হে আল্লাহ, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন?” বর্ণনাকারী বলেন, “এরপর রাসুল ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য দুআ করলে তিনি তাকে সুস্থতা দান করলেন।”’[২৪২]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল ﷺ বললেন, “তোমার সঙ্গীরা আমার কাছে যে গনিমত চাচ্ছে, তুমি কি তা থেকে কিছু চাইবে না।” আমি বললাম, “আমি চাই আল্লাহ আপনাকে যে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমাকে শিক্ষা দেবেন।”’ আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, ‘এরপর আমি পিঠের চাদরটি খুলে দুজনের মধ্যখানে বিছিয়ে দিলাম এবং যেন দেখতে পেলাম, চাদরের ওপর উকুন হেঁটে যাচ্ছে। আল্লাহর রাসুল আমাকে শেখাতে থাকলেন। এমনকি যখন কথার পূর্ণতা এল, তিনি আমাকে বললেন, “এগুলো একত্র করো এবং সংরক্ষণ করো।” আমি সে হাদিসগুলোর প্রতিটি হরফ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছি।’[২৪৩]

বর্ণিত আছে, জনৈক লোক জাইদ বিন সাবিত ﷺ-এর নিকট আসলেন। লোকটি জাইদ ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞেস করলে জাইদ ﷺ বললেন, ‘তুমি আবু হুরাইরা ﷺ-এর নিকট যাও। কারণ, একদা আমি, আবু হুরাইরা ও আরেকজন মসজিদে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছিলাম এবং তাঁকে স্মরণ করছিলাম। এমন সময় আমাদের নিকট রাসুল ﷺ আগমন করলেন। তিনি এসে আমাদের সাথেই বসলেন। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, “তোমরা যা করছিলে, তা আবার করো।”’ জাইদ ﷺ বলেন, ‘তখন আমরা দুজন আবু হুরাইরার আগে দুআ করলাম আর রাসুল ﷺ আমাদের দুআয় আমিন বলতে থাকলেন। এরপর আবু হুরাইরা ﷺ দুআ করলেন এবং বললেন :

....

২৪২. সহিহু মুসলিম : ২৬৮৮

২৪৩. আবু নুআইম ﷺ কৃত হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৩৮১

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ هَذَانِ، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আমার এ দুই সাথি যা চেয়েছে, তা চাচ্ছি এবং এমন ইলম প্রার্থনা করছি, যা বিস্মৃত হওয়ার নয়।"

তখন রাসুল ﷺ বললেন, "আমিন।" এরপর আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরাও এমন ইলম প্রার্থনা করছি, যা বিস্মৃত হওয়ার নয়।" তখন তিনি বললেন, "এ ক্ষেত্রে দাওসি[২৪৪] তোমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে।"'[২৪৫]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'একদিন রাসুল ﷺ বের হয়ে এসে বললেন :

"আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হলে আমি দেখলাম, কোনো নবি চলে যাচ্ছেন সাথে মাত্র একজন সাথি। আবার কোনো নবি হেঁটে যাচ্ছেন সাথে তাঁর দুজন সাথি। আবার কোনো নবির সাথে একদল অনুসারী। আবার কোনো নবির সাথে একজনও অনুসারী নেই। এরপর আমি দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট একটি দল দেখলাম। আশা করলাম, এরা হয়তো আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো, "এ দলটি মুসা ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায়ের।"

এরপর আমাকে বলা হলো, "দেখুন।" আমি দেখলাম, আদিগন্ত বিরাট একটি দল। আমাকে বলা হলো, "এখানে দেখুন, ওখানে দেখুন।" আমি সেদিকে লক্ষ করলাম। দেখলাম, বিরাট একটি দল দিগন্তজুড়ে। আমাকে বলা হলো, এরা হচ্ছে আপনার উম্মত। এর সাথে আরও রয়েছে সত্তর হাজার, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো সেসব লোক, যারা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, (শিরকি পন্থায় ও শিরকি জাদু-মন্ত্রে) ঝাড়ফুঁক করে না, আগুনে পোড়ানো কোনো বস্তুর দাগ লাগায় না এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ওপর তাওয়াক্কুল করে।" রাসুল ﷺ-এর বলা শেষে উক্কাশা বিন

....

২৪৪. আবু হুরাইরা ﷺ। - অনুবাদক

২৪৫. নাসায়ি ﷺ কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৫৮৩৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৬১৫৮। হাকিম ﷺ বলেন, 'হাদিসের সনদ সহিহ।' তবে তিনি তাখরিজ করেননি। কিন্তু জাহাবি ﷺ বলেন, 'সনদের মধ্যে হাম্মাদ নামক বর্ণনাকারী জইফ।' তিনি হচ্ছেন হাম্মাদ বিন শুআইব। হাফিজ ﷺ ইমাম নাসায়ির দিকে সম্বন্ধ করেছেন এটি। দেখুন, তাহিজুবত তাহজিব : ১২/২৬৬।

মিহসান দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, “আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।” রাসুল ﷺ দুআ করলেন, “হে আল্লাহ তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।” এরপর আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, “আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।” রাসুল ﷺ এবার বললেন, “উক্কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।”’[২৪৬]

রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ এমনই ছিলেন। পরকালীন কোনো মর্যাদা ও দ্বীনি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখলে তা অর্জন করতে চাইতেন তাঁরা। এ জন্য তাঁরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন।

সহিহ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

‘রাসুল ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন বললেন, “আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে পতাকা ন্যস্ত করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে এবং তাঁকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালোবাসেন। সে পলায়নকারী নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতেই বিজয় দান করবেন।”

সাহাবিগণ সারা রাত এই চিন্তায় কাটিয়ে দিলেন যে, “কাকে পতাকা ন্যস্ত করা হবে!” এমনকি উমর ﷺ বললেন, “আমি শুধু সেদিনের নেতৃত্বটাই পছন্দ করেছিলাম।” সকালে আলি ﷺ-এর হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতেই বিজয় দান করলেন।’

রবিআ বিন কাব ﷺ বলেন, ‘আমি দিনের বেলায় রাসুল ﷺ-এর খিদমত করতাম। রাত হয়ে গেলে তাঁর দুয়ারেই আশ্রয় গ্রহণ করতাম। আমি তাঁর কাছে রাত কাটাতাম, আর তাঁকে সর্বদা এটা পাঠ করতে শুনতাম, “সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানা রাব্বি।” যতক্ষণ না আমি ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়তাম বা আমার ওপর ঘুম চেপে বসত, আমি এটাই শুনতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, “হে রবিআ, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করব।” আমি বললাম, “আমাকে একটু ভাবার সুযোগ দিন।” আমি চিন্তা করলাম, দুনিয়া হলো ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী। তাই আমি বললাম,

....

২৪৬. সহিহুল বুখারি : ৫৭৫২, সহিহু মুসলিম : ২০০

“হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে আমার চাওয়া হচ্ছে, আপনি আমার জন্য দুআ করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।” রাসুল ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “এ ব্যাপারে তোমাকে কে আদেশ করেছে?” আমি বললাম, “কেউ আদেশ করেনি; আমি ভাবলাম, দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল। আর আপনিও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাই আমি পছন্দ করলাম, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে এ বিশেষ প্রার্থনা করবেন।” তিনি বললেন, “আমি এ দুআ করব। তবে তুমি আমাকে অত্যধিক সিজদার মাধ্যমে সাহায্য করবে।””[২৪৭]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে রাত যাপন করতাম। তাঁর অজুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন, “তুমি আমার কাছে চাও।” আমি বললাম, “জান্নাতে আপনার সাথি হতে চাই।” তিনি বললেন, “আর কিছু?” আমি বললাম, “সেটিই।” তখন তিনি বললেন, “তাহলে তুমি আমাকে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে সাহায্য করবে।””[২৪৮]

আতা বিন রবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

‘আমাকে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, “আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি রমণীকে দেখিয়ে দেবো?” আমি বললাম, “অবশ্যই।” তিনি বললেন, “এই কালো মহিলাটি। সে রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, “আমি মৃগিরোগে আক্রান্ত হই এবং আমার কাপড় উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।” রাসুল ﷺ বললেন, “যদি চাও তুমি সবর করে জান্নাত লাভ করতে পারো, আর যদি চাও তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করব।” মহিলাটি বলল, “আমি সবর করব।” এরপর মহিলাটি বলল, “আমার কাপড় উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তা উন্মোচিত না হয়।” রাসুল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন।’[২৪৯]

ইবাদত ও আনুগত্যে তাঁদের প্রতিযোগিতা অনেক সময় উচ্চ মনোবলের মাত্রাকেও হার মানিয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত—

....

২৪৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৫৭৯

২৪৮. সহিহু মুসলিম : ৪৮৯

২৪৯. সহিহুল বুখারি : ৫৬৫২

'এক লোক রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, মুয়াজ্জিনরা আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফেলছে।" রাসুল ﷺ বললেন, "মুয়াজ্জিনগণ যা বলে, তুমিও তা-ই বলো। যখন আজানের উত্তর দেওয়া শেষ হবে, তুমি যা প্রার্থনা করবে, তোমাকে তা দেওয়া হবে।"'[২৫০]

আরেকটি ঘটনা। আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসুল ﷺ-এর নিকট আগমন করল। বলল, "সম্পদশালীরা অনেক উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতও পেয়ে যাচ্ছে।" রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কীভাবে?" তাঁরা বলল, "তাঁরা আমাদের মতোই সালাত আদায় করে। আমাদের মতোই রোজা রাখে। কিন্তু তাঁরা দান করতে পারে আর আমরা দান করতে পারি না। তাঁরা গোলাম মুক্তি করতে পারে, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না।" তখন রাসুল ﷺ বললেন :

"আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দেবো না, যার মাধ্যমে তোমাদের ছাড়িয়ে যাওয়া লোকদের নাগাল পেয়ে যাবে এবং যার মাধ্যমে তোমাদের পরবর্তীদের অগ্রে থাকতে পারবে এবং তোমাদের ওপর কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না, তবে যাঁরা তোমাদের মতো কর্ম সম্পাদন করবে তাঁরা ব্যতীত?"

তাঁরা বলল, "অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল!" রাসুল ﷺ এবার বললেন, "প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল-হামদুলিল্লাহ বলবে।"

আবু সালিহ বলেন, কিছুক্ষণ পর দরিদ্র মুহাজিরগণ আবার রাসুল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বলল, "আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা আমাদের বিষয়টি জেনে গেছে, তারাও আমাদের মতো আমল করা শুরু করেছে।" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "এটি হলো আল্লাহর অনুগ্রহ; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন।"'[২৫১]

সুলাইমান বিন বিলাল رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ যখন বদর যুদ্ধে বের হচ্ছিলেন, তখন সাদ ও তাঁর পিতা খাইসামা রাসুল ﷺ-এর সাথে

....

২৫০. সুনানু আবি দাউদ : ৫২৪। হাদিসের মান : হাসান সহিহ।

২৫১. সহিহু মুসলিম : ৫৯৫

বের হতে চাইলেন। রাসুল ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করা হলো বিষয়টি। তিনি তাদের দুজনের একজনকে বের হওয়ার অনুমতি দিলেন। তখন খাইসামা নিজের ছেলে সাদকে বললেন, "আমাদের একজন বাড়িতে থাকা আবশ্যক। তাই তুমি মহিলাদের কাছে থাকো।" সাদ বললেন, "জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার হলে আমি আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম। কিন্তু আমি আমার শাহাদাতের আশা রাখি।" এরপর তারা লটারি করলেন। লটারিতে সাদের নাম উঠল। তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। আমর বিন আব্দু ওয়াদ্দ তাকে শহিদ করে।'[২৫২]

ইসলামি স্বভাব হলো সর্বোচ্চ হিম্মতের অধিকারী হওয়া

আল্লাহর ইচ্ছায় উচ্চ মনোবল আপনার জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। আপনার দেহে প্রবাহিত করবে ইলম ও আমলের ময়দানে সফল ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দুঃসাহসিক অনুপ্রেরণা। আপনি নিজেকে পাবেন শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিহিত। পাবেন উত্তম অর্জনের সাথে আলিঙ্গনরত।

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহৎ কাজকে পছন্দ করেন এবং নিম্ন মানের কাজকে অপছন্দ করেন।'[২৫৩]

উচ্চ মনোবলের গুণে গুণান্বিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তুচ্ছ আশা ও নিকৃষ্ট কাজ দূর হয়ে যাবে নিমিষে। অপমান, লাঞ্ছনা, হীনতা, চাটুকারিতা ও তোষামোদের মতো দোষগুলো সুদূরে পালাবে। তাই এ পথে আপনার যাত্রা শুরু করুন। দূরে সরে যাবেন না। আপনার জীবনের সাথে মিশে থাকা ফিকহি অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে শরিয়ত এদিকে ইশারা করেছে। যেন আপনি সব সময় উচ্চ মনোবল ও উন্নত হিম্মতকে মূল্যায়নের ব্যাপারে সজাগ থাকেন। যেমন :

....

২৫২. হাকিম ﷺ হাদিসটি এনেছেন তাঁর কিতাবে। ইমাম জাহাবি ﷺ হাদিসটি জইফ বলেছেন।

২৫৩. আল-মুজামুল কাবির : ২৮৯৪। তাবারানি ﷺ হুসাইন বিন আলি ﷺ-এর সূত্রে হাদিসটি এনেছেন। আর হাদিসটি সহিহ। আর আল্লামা মুনাবি ﷺ মহৎ কাজের অর্থ বলেন, 'সেটা হচ্ছে, শরয়ি চরিত্রগত উন্নতি এবং দ্বীনি বৈশিষ্ট্যগত উন্নতি; দুনিয়াবি কাজের উন্নতি নয়, কারণ দুনিয়াবি দিকের উন্নত হওয়া আদতে উন্নতি নয়; বরং অবনতি।' - ফাইজুল কাদির : ২/২৯৫।

- পানি না থাকলে মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। এ অবস্থায় যদি অন্য কেউ অজুর পানির মূল্য দিতে চায়, তাহলে এটা গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না। কারণ, এখানে অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হচ্ছে।[২৫৪]

- অন্যের দানে কারও জন্য হজ আবশ্যক হয়ে যায় না। আর এভাবে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি সচ্ছলদের কাতারভুক্তও হবে না; চাই এ দানকারী তার নিকটাত্মীয় হোক বা অপরিচিত কেউ। কারণ, এতে আরেক জনের অনুগ্রহ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।[২৫৫]

এখানে কিছু বিষয় আলোকপাত করা হলো। কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হলো। অন্যান্য বিষয় এগুলোর ওপর অনুমান করা যেতে পারে।

সাহাবিগণ ছিলেন উম্মাহর মাঝে সর্বোচ্চ হিম্মতের অধিকারী

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, সাহাবিগণ ছিলেন অলিদের শিরোমণি, মুত্তাকিদের মধ্যমণি, মুমিনদের অনুকরণীয়, মুসলিমদের আদর্শ এবং নবি-রাসুলগণের পর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা। তাঁরা রাসুল ﷺ যে ইলম নিয়ে এসেছেন, তা অর্জন করেছেন এবং তাঁরই হাতে লাভ করেছেন জিহাদের দীক্ষা। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ধন্য করেছেন শেষ নবি ﷺ-এর দর্শনে। সুখে-দুঃখে তাঁর সংশ্রব পাওয়ার সৌভাগ্যে সিক্ত করেছেন তাঁদের। তাঁরা নিজেদের জানমাল আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করেছেন। অবশেষে তাঁরা শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম যুগে নিষ্পাপ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিদারে ধন্য। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতের মাঝে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ।

তাঁরা নিজেদের তরবারির সাহায্যে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। নিজেদের বর্শার সাহায্যে দ্বীনের মজবুত ইমারাত গড়ে তুলেছেন। দখল করেছেন কিসরার

....

২৫৪. শাইখ বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ ﷺ কৃত হিলইয়াতু তালিবিল ইলম : ১৩৫; ঈষৎ পরিমার্জিত। মানসুর বিন মুতামির ﷺ বলেন, 'কেউ যদি আমাকে অনুগ্রহ করে একটু পানিও খাওয়ায়, তবে সে যেন আমার পাঁজরের হাড়গুলোর একটি হাড় ভেঙে দিল।' - ইবনে মুফলিহ ﷺ কৃত আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ : ১/২১৯।

২৫৫. আল-মুগনি লি ইবনি কুদামা : ৩/২২০। দেখুন, তাবাকাতুল হানাবিলাহ : ১/১৫৯।

সাম্রাজ্য। নিভিয়ে দিয়েছেন অগ্নিপূজাকে। দমিয়ে দিয়েছেন খ্রিষ্টবাদকে। আরব-অনারব থেকে শিরকি বন্ধন কেটে দিয়েছেন তাঁরা। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ—সর্বত্র দ্বীন ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা। ফলে ইসলামি ভূমি সম্প্রসারিত হয়েছে, জমিনে শরয়ি বিধান কার্যকর হয়েছে। ইমানের আলোয় পৃথিবী চলেছে কল্যাণের পথে। কুফরি সীমারেখা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, কুফরের রজ্জু টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে, কুফরের শক্তি অস্তমিত হয়েছে তাঁদের মাধ্যমে। আর সাদা-কালো, মূর্তিপূজারি, ভিন্নধর্মী সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।

কবি বলেন :

سَلَام مِنَ الرَّحْمَنِ نَحْوَ جَنَابِهِمْ *** فَإِنَّ سَلَامِيْ لَا يَلِيْقُ بِبَابِهِمْ

'তাদের ওপর দয়াময়ের পক্ষ থেকে সালাম। আমার সালাম যেন তাদের দরবারের যোগ্যই নয়।'

অন্য এক কবি বলেন :

أُوْلَئِكَ قَوْمٌ شَيَّدَ اللهُ فَخْرَهُمْ *** فَمَا فَوْقَهُ فَخْرٌ وَإِنْ عَظُمَ الْفَخْرُ

'তারা এমন এক জামাআত, যাদের মর্যাদাকে আল্লাহ এতটা সমুন্নত করেছেন—মর্যাদা যত উচুঁই হোক এদের মর্যাদাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।'

আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেছেন :

'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি তাকালেন। মুহাম্মাদ ﷺ-কে বাছাই করলেন। রাসুল বানিয়ে তাঁকে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ নিজ ইলম দিয়ে তাঁকে মনোনীত করলেন। তারপর আবার বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি তাকালেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য কিছু সাথি বাছাই করলেন। তাঁদের তিনি নিজ দ্বীনের সাহায্যকারী বানালেন এবং আপন নবি ﷺ-এর পরামর্শদাতা নির্ধারণ করলেন।

সুতরাং মুমিনগণ যা ভালো মনে করেন, আল্লাহ তাআলার নিকটও তা ভালো; আর মুমিনগণ যা মন্দ মনে করেন, আল্লাহ তাআলার নিকটও তা মন্দ।'[২৫৬]

ইমাম আহমাদের বর্ণনার শব্দগুলো এমন :

'আল্লাহ তাআলা বান্দাদের হৃদয়ের মাঝে তাকালেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর হৃদয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয় হিসেবে পেলেন তিনি। তাই তাঁকে নিজের জন্য নির্বাচিত করলেন এবং রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর আল্লাহ তাআলা অন্যান্য বান্দার প্রতি তাকালেন এবং সাহাবিদের হৃদয়কে বান্দাদের মাঝে সর্বোত্তম হৃদয় হিসেবে পেলেন। তাই তাঁদের নবির পরামর্শদাতা বানালেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করবে শত্রুদের বিরুদ্ধে। সুতরাং মুসলিমরা যা ভালো মনে করবে, আল্লাহ তাআলার কাছেও তা ভালো আর তারা যা মন্দ মনে করবে, আল্লাহ তাআলার কাছেও তা মন্দ।'

২৫৬. মুসনাদু আহমাদ, বাগাবি ﵀ কৃত শারহুস সুন্নাহ। সনদ হাসান।

চতুর্থ অধ্যায়

উচ্চ মনোবলের ক্ষেত্রসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইলম অর্জনে সালাফে সালিহিনের উচ্চ মনোবল

ইলম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর একটি। একজন চেষ্টাকারীর জন্য সর্বোত্তম কামনার বস্তু ইলম। একজন অর্জনকারীর জন্য সর্বোচ্চ উপকারী অর্জন ইলম। আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবু তালিব ﷺ কুমাইলকে বলেন, 'আমি যা বলছি, তা সংরক্ষণ করে রাখো। মানুষ তিন প্রকার : এক. আলিমে রব্বানি। দুই. নাজাতের পথ শিক্ষাকারী আলিম। তিন. সাধারণ মানুষ, যারা প্রত্যেক ডাকের পেছনে ছুটে যায় সেদিকে, প্রতি ঝড়েই ধসে পড়ে। সাধারণ মানুষ ইলমের আলোয় আলোকিত হতে চায় না। দৃঢ় কোনো উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না তারা। ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। তোমাকে সম্পদের পাহারাদারি করতে হবে চোর-ডাকাত থেকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু ইলম নিজেই তোমার পাহারাদারি করবে তোমাকে ভুল ও ভয়ানক বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য। ইলম আমলের কারণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সম্পদ ব্যয়ের কারণে কমে যায়। আলিমের ভালোবাসার মাধ্যমে আনুগত্যের মতো উত্তম সম্পদ অর্জিত হয় দুনিয়ায়। এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বয়ে আনে সুন্দর জীবন। ইহকাল ও পরকালে এ কারণে উপকৃত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় সম্পদের কার্যক্ষমতা। সম্পদশালীরা জীবিত থেকেও মৃত। অন্যদিকে যতদিন জগৎ থাকবে, ততদিন আলিমরা অমর হয়ে থাকবেন। তাদের সত্তাটাই অনুপস্থিত কেবল, কিন্তু তাদের প্রভাব প্রতিটি হৃদয়ে অঙ্কিত।'

ইলমের ফজিলত এবং ইলম অর্জনকারীর সম্মান ও মর্যাদার কথা কারও নিকটই অস্পষ্ট নয়। আর তা নতুনভাবে শ্রবণেরও প্রয়োজন নেই তেমন।

আমরা এখানে ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দৃষ্টিপাত করব আমলি শক্তির প্রতি। আমল হচ্ছে সে সিঁড়ি, যে সিঁড়ি ভেঙে আমাদের আলিমগণ সম্মানের মিনারে চড়েছেন, দ্বীনের খিদমত করেছেন এবং ইলমকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন :

'আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, প্রতিটি মূল্যবান জিনিস অর্জনের পথ দীর্ঘ হয়। সহ্য করতে হয় সীমাহীন কষ্ট ও ক্লান্তি। আর ইলম যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস, সেহেতু ক্লান্তি, অনিদ্রা, পুনরাবৃত্তি, স্বাদ-সুখ পরিত্যাগ করা ছাড়া কীভাবে অর্জিত হবে?! এক ফকিহ বলেন, "আমি কয়েক বছর যাবৎ হারিস[২৫৭] খেতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। কেননা, যখন দরস শোনার সময়, তখন সেটা বেচাকেনা হতো।"'

এ জন্যই ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'তুমি তখনই এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে, যখন সর্বশক্তি ব্যয় করবে, একনিষ্ঠ অন্বেষণ বজায় রাখবে এবং নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেবে।'

কবি চমৎকার কথা বলেছেন এ বিষয়ে—

فَقُلْ لِمُرَجِّيْ مَعَالِيَ الْأُمُوْرِ *** بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ: رَجَوْتَ الْمُحَالَا

'কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া যে বড় কিছু চায়, তাকে বলে দাও—এ তোমার আকাশ কুসুম কল্পনা।'

অপর এক কবি বলেন :

لَوْلَا الْمَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ *** الْجُوْدُ يُفْقِرُ، وَالْإِقْدَامُ قَتَّالُ

'যদি আত্মত্যাগ ও পরিশ্রম করার দরকার না হতো, তবে সবাই নেতা বনে যেত। (নেতৃত্বের পরিপন্থী জিনিস দুটি : কৃপণতা ও কাপুরুষতা। দানশীলতা ও সাহসিকতা ছাড়া মানুষ নেতা হতে পারে

২৫৭. চূর্ণ গম ও মাংস দিয়ে তৈরি এক ধরনের খাদ্য।

না।) বদান্যতা মানুষকে দরিদ্র করে আর যুদ্ধে বাহাদুরি মানুষের জীবন কেড়ে নেয়।'

কেউ বড় কিছু করার হিম্মত জোটাতে পারলে তার ওপর দ্বীনের পথই আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। কারণ, এ পথেই মিলবে সফলতা। যদিও এ পথে সূচনাটা কষ্ট-ক্লেশ-কাঠিন্য থেকে মুক্ত নয়, তবুও নফসকে এ পথে চলতে বাধ্য করতে হবে, নফসের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পথচলা অব্যাহত রাখতে হবে, মুসিবত ও কঠোরতার ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। এভাবে একসময় একজন মানুষ ধাবিত হবে মনোমুগ্ধকর বাগিচা, সত্যবাদীদের বাসস্থান ও সম্মানিত আবাসে প্রবেশের পথে। যে আবাসের আনন্দ-সুখ ও স্বাদের সামনে অন্য সব ফিকে। (এ প্রাপ্তি) অনুপম, অতুলনীয়। চড়ুই পাখি নিয়ে খেলা করার আনন্দ একটি রাজ্য পরিচালনার আনন্দের সামনে যেমন তুচ্ছ, ঠিক তেমনই দুনিয়ার এ ক্ষণিকের আনন্দ। এ সুখ-আনন্দের অধিকারী মানুষটির ব্যাপারে কবি বলেন :

وَكُنْتُ أَرَى قَدْ تَنَاهَى بِيَ الْهَوَى *** إِلَى غَايَةٍ مَا بَعْدَهَا لِيْ مَذْهَبُ

فَلَمَّا تَلَاقَيْنَا وَعَايَنْتُ حُسْنَهَا *** تَيَقَّنْتُ أَنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ

'মনে হয়েছিল, মনের সব চাহিদা ও খায়েশ আমি মিটিয়ে ফেলেছি। এর পরে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। কিন্তু প্রেয়সীর সঙ্গে যখন দেখা হলো, আর তার অপরূপ সৌন্দর্য যখন দেখলাম—বুঝলাম এতদিনের সব সুখ এর সামনে ফিকে।'

এমনই দুনিয়া ও দ্বীনের তুলনা; বরং (দ্বীনের মর্যাদা) এর চেয়ে অনেক উচ্চ। দুনিয়াবি সমৃদ্ধি অর্জন করে যে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়, দ্বীনি সমৃদ্ধিতে পাওয়া যায় এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি সুখ ও আনন্দ। এ আনন্দ কেবল কয়েক দিনের নয়। বরং সে আনন্দ অসীম সময়ের জন্য।

মহৎ অর্জন কষ্টের কাঁটায় ঘেরা থাকে। কষ্ট-পরিশ্রমের সাঁকো পাড়ি দেওয়া ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয় এ সৌভাগ্য। তাই চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর কঠিন পরিশ্রমের নৌকাতে চড়ে পাড়ি দিতে হবে এ দূরত্ব।

ইমাম মুসলিম ﷺ তাঁর সহিহ মুসলিমে বলেন, 'ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির ﷺ বলেন, "শারীরিক সুখ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া ইলম অর্জন করা যায় না।" বলা হয়, "যে আরামের পেছনে লেগেছে, সে আসল সুখ খুইয়েছে।"'

فَيَا وَاصِلَ الْحَبِيْبِ أَمَا إِلَيْهِ *** بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ أَبَدًا طَرِيْقُ؟!

'প্রিয়ের মিলনপ্রত্যাশী হে প্রেমিক, মিলনের পথ কি কখনো কষ্টহীন হয়?'

অধিকাংশ মানুষ ইলমের স্বাদ ও মর্যাদার ব্যাপারে অজ্ঞ। যদি তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ না হতো, তবে এ স্বাদ ও মর্যাদা লাভের জন্য তারা তরবারি নিয়ে যুদ্ধে নেমে যেত। কিন্তু এটি কষ্টকর জিনিসে ঘেরা হয়ে আছে। বস্তুত মানুষের অজ্ঞতার পর্দা তাদের এ থেকে বঞ্চিত করছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে এ বৈশিষ্ট্যে সম্মানিত করেন।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন :

'ইলম-অন্বেষীদের কর্তব্য হচ্ছে, ইলমের সমৃদ্ধি অর্জনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, এই পথে যত যা-ই প্রতিবন্ধকতা আসবে—তাতে সবর করা, দলিল ও গবেষণামূলক ইলম হাসিলের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইলম অর্জনে সাহায্য চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।'

لَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ

لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

'মনে করো না, সাফল্য গাছের ডালে ঝুলন্ত কোনো ফল—পেড়েই তা খেয়ে ফেলবে। সাধনার তিক্ততা ব্যতীত সাফল্যের মিষ্টতার আশা করো না।'

পূর্ববর্তী আলিমগণ ইলম অর্জনের পথে নানান কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। 'আল-কাতর' ও 'আল-মুগনি'সহ আরও বহু কিতাব রচনাকারী ইমাম ইবনে হিশাম আন-নাহবি ﷺ ইলম-অন্বেষীদের ইলম অর্জনের পথের কষ্ট ও

মুসিবতে সবর করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, যেকোনো মহৎ ও উন্নত লক্ষ্য সাধনে শর্ত হচ্ছে, কষ্ট ও ক্লান্তিতে সবর করে এগিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন :

وَمَنْ يَّصْطَبِرْ لِلْعِـلْمِ يَظْفَرْ بِـنَيْـلِهِ

وَمَنْ يَّخْطُبُ الْحَسْنَاءَ يَصْبِرُ عَلَى الْبَذْلِ

وَمَنْ لَمْ يُذِلِّ النَّفْسَ فِيْ طَلَبِ الْـعُـلَى

يَسِيْرًا يَعِـشْ دَهْرًا طَـوِيْلًا أَخَـا ذُلِّ

'ইলম অর্জনের পথে যে ধৈর্যের সঙ্গে সাধনা করে, সে-ই ইলম অর্জন করে কামিয়াব হয়। যে সুন্দরী নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাকে বড় অঙ্কের খরচ বহনের কষ্ট সইতে হয়। যে ব্যক্তি সাফল্য অর্জনের জন্য নিজেকে সামান্য ছোট করতে পারে না, তাকে যুগের পর যুগ লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে হয়।'

মুসাফির তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রধান সড়ক ধরে চলতে হয়, চলতে হয় দিবানিশি অবিরাম। যদি কোনো মুসাফির রাস্তা ছেড়ে পুরো রাত ঘুমে ঘুমে কাটিয়ে দেয়, তাহলে সে নিজ গন্তব্যে কখন পৌঁছাবে?

اَلْجُدُّ بِالْجِـدِّ وَالْحِرْمَـانُ فِيْ الْكَـسَلِ

فَانْصَبْ تُصِبْ عَنْ قَرِيْبٍ غَايَةَ الْأَمَلِ

'সাধনায় সাফল্য আর অলসতায় ব্যর্থতা। পরিশ্রমে মনোযোগ দাও—অচিরেই পৌঁছে যাবে সাফল্যের স্বপ্নচূড়ায়।'

তাই, হে ইলমের পথের পথিক, ইলম অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করো। কারণ, বিষয়টি হলো ইবনে জুনাইদ ﷺ-এর কথার মতো। তিনি বলেন, 'বাস্তবিক অর্থে যে ব্যক্তি মন থেকে কোনো কিছু চেয়েছে এবং সেটা অর্জনের চেষ্টা করেছে, সে তা পেয়েছে। যদি পুরোটা নাও পায়, আংশিক তো পেয়েছে।'

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে উচ্চ মনোবল হলো—

– অযথা সময় বিনষ্ট না করে সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

– এমন দৃঢ় সংকল্প রাখা, যে সংকল্প দিনরাতকে এক করে দেয়। আর সংকল্প হলো মসৃণ তরবারির মতো।

– এমন তৃষ্ণা, যা নিবারণ হয় শুধু ইলমের পূর্ণ পেয়ালা পানের মাধ্যমেই।

– অন্বেষণের জন্য মানসিকতা থাকা। যার ফলে নিজের ও উচ্চতর ইলমের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক তৈরি হয় না। পথের দূরত্ব বা অর্জনের ক্লান্তি যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

– এমন সভ্য জবান, যা অনর্থক কথা ও ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না। আর হবেই-বা কী করে! যে জবান সত্য নিয়ে ব্যস্ত, সে জবান অনর্থক ও বাতিল বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় কী করে!

ইলম অর্জন, ইলমের প্রচার-প্রসার এবং রচনা-প্রণয়নের ক্ষেত্রে উম্মাহর সালাফের অবস্থা ছিল বড় বিস্ময়কর। তাঁরা এ কাজে নিজেদের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন। এ পথে নিজেদের যৌবন নিঃশেষ করেছেন। ফলে তাঁরা এমন সাফল্য অর্জন করেছেন, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে হতবুদ্ধি করে দেয়। তাঁদের সাফল্যের সে কারনামা হৃদয়ে হিম্মতের সঞ্চার করে। এসো, আমরা তাঁদের জীবনী পাঠ করি, তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণ করি, তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁদের পথে চলি।

وَحَدَّثْتَنِيْ عَنْهُمْ يَا سَعْدُ فَزِدْتَنِيْ

بِهِمْ غَرَامًا، فَزِدْنِيْ مِنْ حَدِيْثِكَ يَا سَعْدُ!

‘মহান মানুষদের কথা তুলে তুমি আমার অনুরাগের সাগরে ঝড় তুলে দিলে। এখন তোমায় ছাড়ছি না আমি। আরও চাই, আরও চাই।’

كَرِّرْ عَلَيَّ حَدِيْثَهُمْ يَا حَادِيْ * فَحَدِيْثُهُمْ يُجْلِيْ الْفُؤَادَ الصَّادِيْ

‘তৃষ্ণাতুর হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিলে। তাদের কথা আরও বলো। আরও আমি শুনতে চাই।’

ইলম অর্জনে সালাফের আগ্রহ

ইলম হলো হৃদয়ের পেশা। যতক্ষণ না এর জন্য অন্য সবকিছু থেকে অবসর নেওয়া হবে, ততক্ষণ এটি অর্জিত হবে না। অভীষ্ট লক্ষ্য শুধু একটি, আর তা হলো ইলম। যদি তা থেকে বিমুখ হয়ে পার্থিব স্বাদ আর প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলে কেউ, তাহলে ইলমের পথ থেকে ছিটকে পড়বে সে। যার ক্ষেত্রে ইলমের স্বাদ ও কামনা জৈবিক স্বাদ ও কামনার ওপর প্রবল না হবে, সে কখনো ইলমের মর্যাদা হাসিল করতে পারবে না। যখন কারও কামনা হবে শুধু ইলম এবং ইলমের মাঝে সে স্বাদ ও মজা খুঁজে পাবে, আশা করা যায় সে কিছু ইলমের অধিকারী হতে পারবে। এ কারণেই আমাদের আলিমগণ ইলম অর্জনে ছিলেন সীমাহীন আগ্রহী। ইলম শেখা ও তা সংরক্ষণ করার প্রতি তাদের সে আগ্রহের দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই মানব-ইতিহাসে। এখানে এমন কিছু ঘটনা উদ্ধৃত করার প্রয়াস পাচ্ছি—

* আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেন :

'আমি ও আমার এক প্রতিবেশী আওস বিন খাওয়ালি আনসারি বনু উমাইয়ার অঞ্চলে বাস করতাম। মদিনার উচ্চ অংশে অবস্থিত ছিল সে এলাকাটি। আমরা পালাক্রমে রাসুল ﷺ-এর নিকট আসতাম। একদিন সে আসত, অন্যদিন আমি। যেদিন আমি আসতাম, সেদিনের ওহি ইত্যাদির ব্যাপারে তাকে জানাতাম; আর যেদিন সে আসত, সেও একই রকম করত।'

* ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের পর আমি এক আনসারিকে বললাম, "চলো, রাসুল ﷺ-এর সাথিদের কাছে যাই এবং তাঁদের কাছ থেকে ইলম শিখি। কারণ, এখনো তাঁরা সংখ্যায় অনেক।" সে বলল, "হে ইবনে আব্বাস, আশ্চর্য! মানুষের মাঝে রাসুল ﷺ-এর এত সাহাবি থাকতে মানুষ তোমার নিকট তাদের প্রয়োজনে আসবে বলে মনে করো তুমি?"'

ইবনে আব্বাস ﵄ ঘটনা বলতে থাকলেন, 'এরপর আমি তাকে তার অবস্থায় রেখে চলে এলাম। রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের কাছে জিজ্ঞেস করে ফিরছিলাম। যদি আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছাত যে, অমুক সাহাবির কাছে একটি হাদিস

আছে, আমি তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। কখনো-বা দুপুরবেলা তাঁর কাছে গিয়ে দেখতাম, তিনি ঘুমাচ্ছেন। তখন তাঁর দরজায় আমার চাদরটা বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়তাম। বাতাস পথের ধুলো উড়িয়ে এনে আমার মুখের ওপর ফেলত। যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, আমাকে দরজায় শায়িত দেখে অবাক হয়ে বলতেন :

يا ابن عم رسول الله! ما جاء بك؟ هلا أرسلتَ إليَّ فآتيك؟

"আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই! আপনি কেন আসলেন? কাউকে পাঠিয়ে দিতেন আমি চলে আসতাম।"

আমি বলতাম, "না, আমারই আপনার কাছে আসার কথা। আমি জানতে পেরেছি, আপনি রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন।" ওদিকে সে আনসারি লোকটি জীবিত থাকায় দেখতে পেল, মানুষ আমার কাছে এসে ভিড় করে; আমার কাছে জানতে চায়। তখন সে বলল :

هذا الفتى كان أعقل مني

"এই যুবক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল।"'[২৫৮]

যখন বিভিন্ন রাজ্য বিজিত হলো, তখন সে এলাকাগুলোতে গিয়ে বসবাস করার সুযোগ ছিল। কিন্তু ইবনে আব্বাস ﵄ শুধু ইলমের জন্য সিরিয়ার সবুজশ্যামল বাগিচা, ইরাকের গ্রামাঞ্চল, নীল-নদ ও দজলা-ফুরাতের নদীর সুবিমল তীরের ওপর মদিনার অলিগলিতে দ্বিপ্রহরের তীব্র পিপাসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যখন বিভিন্ন শহর বিজয় হলো, মানুষ দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু আমি উপস্থিত হলাম উমর ﵁-এর দরবারে।'

لِكُلِّ بَنِيْ الدُّنْـيَا مُرَادٌ وَمَقْـصَدُ *** وَإِنَّ مُرَادِيْ صِـحَّةٌ وَّفَـرَاغُ

لِأَبْلُغَ فِيْ عِلْـمِ الشَّرِيْعَةِ مَبْلَغًا *** يَكُـوْنُ بِهِ لِيْ لِلْجَنَانِ بَلَاغُ

وَفِيْ مِثْلِ هَذَا فَلْيُنَافِسْ أُوْلُوْ النُّهَى * وَحَسْبِيْ مِنَ الدُّنْيَا الْغَرُوْرِ بَلَاغُ

....

২৫৮. সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা

فَمَا الْفَـوْزُ إِلَّا فِيْ نَعِيْمٍ مُؤَبَّدٍ *** بِهِ الْعَيْشُ رَغْدٌ وَالشَّرَابُ يُسَـاغُ

'দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের একটি প্রত্যাশা আছে—একটি লক্ষ্য আছে। আমার প্রত্যাশা হচ্ছে সুস্থতা ও অবসর। যেন আমি শরিয়তের ইলমে ডুব দিতে পারি। সেটি হবে আমার জান্নাতে যাওয়ার সিঁড়ি। বুদ্ধিমানদের উচিত কেবল এ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করা। প্রবঞ্চক এ দুনিয়ার আমার কেবল অতটুকু দরকার যতটুকু না হলে নয়। কারণ, সাফল্য শুধু চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাতেই—যেখানে আছে প্রাচুর্যভরা জীবন আর সুপেয় শরাব।'

ইলমের দিকপাল এ সাহাবির মুখে শুনে নাও, ইলমের জন্য তাঁর আত্মনিবেদনের কথা। তিনি বলেন :

'আমি উবাই বিন কাব ﵁-এর কাছে এসে দেখতাম, উনি ঘুমাচ্ছেন। তাই আমিও তাঁর দরজার সামনে ঘুমিয়ে পড়তাম। যদি তিনি আমার অবস্থান টের পেতেন, তবে রাসুল ﷺ-এর সাথে আমার সম্পর্কের কারণে তিনি জেগে থাকাই পছন্দ করতেন, কিন্তু আমি তাঁকে বিরক্ত করা অপছন্দ করতাম।'

তিনি বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-এর বড় বড় আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের সাথে সব সময় লেগে থাকতাম। তাঁদের জিজ্ঞেস করতাম রাসুল ﷺ-এর যুদ্ধ ও এ সংক্রান্ত যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, সেসব ব্যাপারে। আর আমি যাঁর কাছেই যেতাম, তিনি আমার আগমনে বেশ খুশি হতেন। কারণ, আমি ছিলাম রাসুল ﷺ-এর নিকটাত্মীয়। একদিন আমি উবাই বিন কাব ﵁-কে মদিনায় অবতীর্ণ সুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি ছিলেন গভীর ইলমের অধিকারীদের একজন। তিনি বললেন, "এখানে সাতাশটি সুরা নাজিল হয়েছে, বাকি সব মক্কায় নাজিল হয়েছে।"'

* ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন, 'আমি সাত বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেছি। মুয়াত্তা হিফজ করেছি দশ বছর বয়সে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার কুরআন খতম হয়ে গেল। আমি মসজিদে প্রবেশ করতে লাগলাম। আলিমদের বৈঠকে বসতে লাগলাম। তাদের থেকে হাদিস-

মাসআলা শুনে মুখস্থ করে নিতাম। তখন আমার মায়ের কাছে কাগজ কিনে দেওয়ার মতো টাকা ছিল না! তাই আমি যখন চকচকে কোনো হাড় দেখতাম, তা তুলে তাতেই লেখা শুরু করে দিতাম। লেখা পূর্ণ হয়ে গেলে পুরোনো একটি পাত্রে রেখে দিতাম।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার হাতে তেমন কোনো অর্থকড়ি ছিল না। জীবনের শুরু থেকেই ইলম অর্জন করতে শুরু করি আমি। (তখন তাঁর বয়স তেরোরও কম ছিল) আমি বিভিন্ন দফতরে গিয়ে লিখিত কাগজের টুকরা চেয়ে আনতাম এবং তার পিঠে লিখতাম।'

ইবনে আবু হাতিম ﵀ বলেন, 'আমি মুজানি ﵀-কে বলতে শুনেছি, ইমাম শাফিয়ি ﵀-কে বলা হলো, "ইলমের প্রতি আপনার আগ্রহ কেমন?" তিনি বললেন, "আমি শুনিনি—এমন প্রতিটি অশ্রুত শব্দ শ্রবণ করতে চাই। আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ কামনা করে, তাদেরও কান থাকুক, তাহলে তারাও সে সুখ অনুধাবন করতে পারবে—যে সুখ আমার দুই কান পায় ইলমের কথা শুনে।"'

আরেকবার তাঁকে বলা হলো, 'ইলমের ব্যাপারে আপনার লোভ ও আগ্রহ কেমন?' তিনি বললেন, 'সম্পদের স্বাদে বিভোর কৃপণ সঞ্চয়ীর মতো।' বলা হলো, 'ইলম অর্জনে আপনার অন্বেষণস্পৃহা কেমন?' তিনি বললেন, 'একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফেলা সন্তানহারা মায়ের মতো।'

* শোনো ইমাম বুখারি ﵀-এর উসতাজ মুহাম্মাদ বিন সালামের কথা। ছাত্রজীবনে একদিন তিনি হাদিস লেখার কোনো এক মজলিসে ছিলেন। মজলিসে শাইখ হাদিস বর্ণনা করে লিখিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কলম ভেঙে গেলে তিনি এই বলে ডাক দিলেন যে, 'এক দিনারে একটি কলম চাই।' তখন চারদিক থেকে কলম এসে উড়ে উড়ে পড়তে থাকে তাঁর সামনে।

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ বলেন, 'আমি প্রথম হাদিস লিখেছি আবু ইউসুফ ﵀ থেকে।' বাগদাদে তিনি হাদিস শেখা চালিয়ে গেলেন। ১৭৯ থেকে ১৮৬ হিজরি পর্যন্ত। চার বছর যাবৎ বাগদাদের একজন উচ্চপর্যায়ের আলিমের সান্নিধ্যে লেগে থাকলেন। তিনি হলেন হাশিম বিন বাশির বিন আবু হাজিম ওয়াসিতি ﵀ (১৮৩ হি.)। ইমাম আহমাদ ﵀ আব্দুর রহমান বিন মাহদি ও

আবু বকর বিন আইয়াশ ﵀ থেকেও হাদিস শ্রবণ করেছেন। ইলম অর্জনে তাঁর চেষ্টা-সাধনা, আগ্রহ-উদ্দীপনা ও পরিশ্রম-তৎপরতা ছিল অতুলনীয়। স্বয়ং ইমাম আহমাদ নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি অনেক সময় সকাল সকাল হাদিস শেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চাইতাম। ফজরের আগে আগে বের হতে চাইতাম। কিন্তু আমার মা এসে আমাকে বাধা দিতেন। যতক্ষণ না আজান হতো বা সকাল হতো আমাকে সেভাবেই কাটাতে হতো।'[২৫৯] ইমাম আহমাদ আরও বলেন, 'যদি আমার কাছে পঞ্চাশ দিরহাম থাকত, তবে আমি জারির বিন আব্দুল হামিদের নিকট ইলম শিখতে চলে যেতাম।'

* সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'আমি যখন ইলম শেখার ইচ্ছা করলাম। মহান প্রতিপালকের দরবারে ফরিয়াদ করলাম, "হে আমার প্রতিপালক, ইলম আমার জন্য আমার জীবিকার চেয়েও জরুরি।" আমি দেখলাম, ইলমের দরস প্রদান করা হয়। তাই আমি নিজেকে বললাম, "আমি নিজেকে ইলম অর্জনে নিবিষ্ট রাখব।"' তিনি বলেন, 'এরপর আমি মহান প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন অন্য সব বিষয়ে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।'

সুফইয়ান সাওরি ইলম অর্জনের দৃঢ় সংকল্প করলেন। অবশেষে তাঁর মা তাঁর খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর মা বললেন, 'ছেলে আমার, ইলম অর্জন করো, আমার সুতা কাটার চরকা তোমার জন্য যথেষ্ট।' সুফইয়ান সাওরি বিভিন্ন শাইখের কাছে ইলম শিখতে শুরু করলেন। এমন প্রত্যেকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করলেন, যিনি কোনো ইলম বা হাদিসের ধারকবাহক।

তিনি ইলমের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। আবু নুআইম ﵀ উল্লেখ করেন, 'যখন কোনো বৃদ্ধ লোকের সাথে তাঁর দেখা হতো, তাকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "আপনার নিকট কি কোনো বিষয়ের ইলম আছে?" যদি উত্তর আসত "না", তাহলে সুফইয়ান ﵀ বলতেন, "আপনার জন্য ইসলামের পক্ষ থেকে কোনো উত্তম প্রতিদান নেই।"'

....

২৫৯. সকালবেলা বরকতের সময়। রাসুল ﷺ দুআ করেছিলেন : اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا ('হে আল্লাহ, আমার উম্মতের সকালবেলায় বরকত ঢেলে দিন।' -সুনানু আবি দাউদ : ২৬০৬) তাই ইমাম আহমাদ ﵀ ফজর হওয়ার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইতেন, যেন ফজরের পরের বরকতের সময়টাতে ইলম শেখা যায়। সুবহানাল্লাহ!

ইলমের ব্যাপারে গুরুত্বের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় তাঁর এ কথায়, 'মানুষের উচিত নিজ সন্তানকে হাদিস শিখতে বাধ্য করা। কারণ, প্রত্যেক অভিভাবক এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'

তিনি শুধু ইলম অর্জনকেই গুরুত্ব দিতেন না; বরং ইলম অনুযায়ী আমলেও ছিলেন বেশ তৎপর। ইলমের প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতের প্রতিও ছিলেন প্রবল আগ্রহী।

আবু নুআইম ﵀ বর্ণনা করেন, সুফইয়ান ﵀ বলতেন, 'ফরজ বিধিবিধান আদায়ের পর ইলম অর্জনের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই।' তিনি আরও বলতেন, 'যতদিন কোনো শিক্ষাদানকারী পাব, ততদিন আমি ইলম অর্জন করতে থাকব।'

সালাবা ﵀ বলেন, 'আমি ইবরাহিম আল-হারবিকে ভাষা ও ব্যাকরণের মজলিস থেকে পঞ্চাশ বছরে কখনো অনুপস্থিত পাইনি।'

* হাফিজ জাহাবি ﵀ আবু হাতিম আর-রাজি ﵀ —মুহাম্মাদ বিন ইদরিস—২৭৭ হি.)-এর জীবনীতে উল্লেখ করেন, 'আবু হাতিম বলেছেন, আমাকে আবু জুরআ অর্থাৎ রাজি বললেন, "আমি হাদিসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে আগ্রহী কাউকে দেখিনি।" আমি বললাম, "আমার ছেলে আব্দুর রহমানও অনেক আগ্রহী।" তিনি বললেন, "যে তাঁর পিতার সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে, সে অন্যায় করেনি।"'

রম্মাম—মূল নাম আহমাদ বিন আলি, হাদিসের রাবি—বলেন, 'আমি আব্দুর রহমানকে তাঁর পিতার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণের আধিক্য এবং পিতা থেকে তাঁর ইলম অর্জনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম।' তিনি উত্তর দিলেন, 'কখনো তিনি আহার করতেন, আর আমি তাঁর কাছে হাদিস পাঠ করতাম; তিনি হাঁটতেন, আর আমি পাঠ করতাম; তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন, আর আমি পাঠ করতাম এবং কোনো কিছু খোঁজার জন্য তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন, আর আমি পাঠ করতাম।'

অনবরত এমন মেহনত-মুজাহাদা এবং ইলমের প্রতি এ তলব তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে রূপান্তরিত করল। তিনিই নয় খণ্ডের 'আল-জারহু ওয়াত তাদিল' কিতাবটি রচনা করেছেন। কিতাবটি ইলমের এ শাখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কিতাব হিসেবে বরিত হয়েছে। তিনি আরও রচনা করেছেন কয়েক খণ্ডের 'আত-তাফসির' ও এক হাজার খণ্ডের 'আল-মুসনাদ'।

* ইমাম জাহাবি ﷺ বলেন, 'আলি বিন আহমাদ খুওয়ারিজমি ﷺ বলেন, ইবনে আবু হাতিম ﷺ বলেছেন, "আমি মিশরে সাত মাস অবস্থান করেছি, কিন্তু কোনো দিন সেখানে ঝোলের তরকারি খাইনি। আমাদের দিন কাটত বিভিন্ন শাইখের কাছে যাতায়াত করে, আর রাতের বেলা আমরা অনুলিপি করতাম এবং মূলের সঙ্গে মিলাতাম। একদিন আমি ও আমার এক সাথি এক শাইখের কাছে আসলাম। আমাদের জানানো হলো, শাইখ অসুস্থ। ফেরার পথে সুন্দর একটি মাছ দেখে পছন্দ হলো আমাদের। সেটা কিনে আনলাম। ঘরে ফিরতেই অন্য এক শাইখের দরসের সময় হয়ে গেল। সেখানে চলে গেলাম চটজলদি। মাছটি যেভাবে এনে রেখে ছিলাম, সেভাবেই তিন দিন কেটে গেল। দরসের লেখা ও কপি সম্পাদনার নিশ্ছিদ্র রুটিনে এতটুকু ফাঁকও পেলাম না। এদিকে মাছটি পচে যাওয়ার উপক্রম হলো। রান্না করার মতো সে সময়ও আমাদের হাতে ছিল না। অবশেষে ভাজা ছাড়াই মাছটি খেয়ে ফেলি।" এতটুকু বলার পর তিনি মন্তব্য করলেন, "শরীরকে আরাম দিয়ে ইলম অর্জন করা আকাশ কুসুম কল্পনা!"'

কবি বলেন :

لَوْلَا ثَلَاثٌ قَدْ شُغِفْتُ بِحُبِّهَا *** مَا عِبْتُ فِيْ حَوْضِ الْمَنِيَّةِ مَوْرِدِيْ

وَهِيَ الرِّوَايَةُ لِلْحَدِيْثِ وَكَتْبُهُ *** وَالْفِقْهُ فِيْهِ وَذَاكَ حُبُّ الْمُهْتَدِيْ

'তিনটি বস্তুর ভালোবাসা যদি আমাকে ঘিরে না ধরত, তবে মৃত্যুর শরাব পান করতে আমার আপত্তি থাকত না। সেগুলো হলো : হাদিস বর্ণনা, হাদিস লেখা ও হাদিসের ফিকহ। বস্তুত এগুলোই তো একজন আলোকিত মানুষের ভালোবাসা।'

* ইমাম সুলাইম বিন আইয়ুব রাজি ﷺ (৪৪৭ হি.)। শাফিয়ি মাজহাবের একজন বিখ্যাত ইমাম। উপকারী কোনো কাজ করা বা কারও থেকে উপকারী কিছু শেখা ব্যতীত নষ্ট হওয়া প্রতিটি সময়ের ব্যাপারে হিসাব করতেন তিনি, আত্মসমালোচনা করতেন। আবুল ফারাজ গাইস বিন আলি তানুখি সুরি ﷺ বলেন, 'আমার কাছে তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রতিটি সময়ের হিসাব করে চলতেন। একটি মুহূর্তও অনর্থক কাটতে দিতেন না। হয়তো অনুলিপি করতেন বা দরস প্রদান করতেন অথবা পাঠ করতেন। তিনি অনেক বেশি অনুলিপি করতেন। তাঁর ব্যাপারে তাঁরই এক ছাত্র আমাদের শাইখ আবুল ফারাজ ইসফারাইনি ﷺ বলেন, 'একদিন শাইখ তাঁর ঘরে গিয়ে ফিরে আসলেন। বললেন, "ঘর থেকে আসার পথে এক খণ্ড পড়ে নিয়েছি।"'

তানুখি ﷺ আরও বলেন, 'মুয়াম্মাল বিন হাসান আমার কাছে বর্ণনা করেন, "আমি দেখলাম, সুলাইমের কলম নষ্ট হয়ে লেখার অনুপযোগী হয়ে গেছে। তিনি কলম ঠিক করছেন, আর এদিকে তার ঠোঁট নড়ছে। বুঝলাম, কলম ঠিক করার সময়টাতে তিনি কিছু পাঠ করছেন। যেন একটি মুহূর্তও অনর্থক কেটে না যায়।"'

* হাফিজ আবু তাহির সালাফি ﷺ সম্পর্কে ইবনে নাসির বলেন, 'ইলম অর্জনে তিনি ছিলেন প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।'

* খলিল বিন আহমাদ ফারাহিদি ﷺ বলতেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর সময় হলো আহারের সময়।'

* উসমান বাকিল্লাবি ﷺ সব সময় আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বলেন, 'ইফতারের সময়টাতে আমার মনে হয়, জিকির ছেড়ে আহার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কেমন যেন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছে।'

* আম্মার বিন রজা বলেন, আমি উবাইদ বিন ইয়া'য়িশাকে বলতে শুনেছি, 'ত্রিশটি বছর আমি এভাবে কাটিয়েছি যে, রাতের বেলা নিজ হাতে আহার করতাম না। আমার বোন আমাকে লুকমা তুলে খাইয়ে দিত, আর আমি হাদিস লিখে যেতাম।'

* দাউদ আত-তায়ি ﵀ ছাতু খেতেন আর বলতেন, 'ছাতু না খেয়ে রুটি খেলে যে সময় অতিবাহিত হয়, সে সময়ে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করা যায়।'

* মহান ইমাম ইবনে আকিল ﵀ নিজের ব্যাপারে বলেন, 'আমি আহারের সময় সর্বাত্মকভাবে কম সময় ব্যয় করার চেষ্টা করি। রুটি চিবিয়ে খেতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় বলে কেক খাওয়াই আমার কাছে পছন্দনীয় ছিল, আর রুটি খেলে পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। আর বেঁচে থাকা সময়টাতে মুতালাআ বা এমন কোনো কিছু জানতে পারতাম, যা আগে জানতাম না।'

সালাফের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন কোনো ইলমি বিষয় ছুটে যেত, তাঁরা পেরেশান হয়ে যেতেন; এমনকি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। শুবা ﵀-এর নিকট একটি হাদিসের আলোচনা করা হলো, যা তিনি আগে শুনেননি। তিনি বলতে লাগলেন, 'হায়, দুঃখ!' তিনি বলতেন, 'একবার একটি হাদিস মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাদিসটি আমার স্মরণে আসেনি, তখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

একদা ইমাম শাবি ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এত ইলম কোত্থেকে পেলেন?' তিনি বললেন, '(মানুষের) কারও ওপর ভরসা না করা, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো, গাধার মতো ধৈর্য ও কাকের মতো প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগের মাধ্যমে।'

ইলম ও ইলমের পাঠচক্রের প্রতি তাঁদের আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, অনেক সময় তাঁরা রাস্তা দিয়ে দৌড়াতেন। কেমন যেন পাগল কেউ। এ জন্যই ইমাম শুবা ﵀ বলতেন, 'যখনই আমি কাউকে দৌড়াতে দেখতাম, আমি বলতাম, হয় সে পাগল না হয় হাদিসের ছাত্র।'[২৬০]

* আব্দুর রহমান বিন তাইমিয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'দাদা যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন, তখন আমাকে বলতেন, "তুমি এই কিতাবটি পাঠ করো; উচ্চস্বরে পাঠ করবে, যাতে আমি আওয়াজ শুনতে পাই।"'

....

২৬০. হাফিজ আবু ইসমাইল আল-হারাবি আল-আনসারি ﵀ বলেন, 'তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে একজন মুহাদ্দিসকে। দ্রুত হাঁটন, দ্রুত লিখন, দ্রুত পঠন।' এর সাথে আরও একটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা যায়, 'দ্রুত আহার গ্রহণ।' সুহনুন ﵀ বলেন, 'যে পেটপুরে পরিতৃপ্ত হয়ে খায়, সে ইলম গ্রহণের যোগ্য নয়।'

হাফিজ সুয়ুতি ﵀ বলেন, 'আমাদের শাইখ কিনানি বলেছেন, "তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইলম-অন্বেষী তিনটি কাজে দ্রুত হও—খাওয়া, হাঁটা ও লেখা।"'

* মহান আলিম আবুল মাআলি মাহমুদ শুকরি আলুসি বাগদাদি। খুবই পরিশ্রমী একজন মানুষ ছিলেন। ছিলেন সময়ের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। গ্রীষ্মের দাবদাহ তাঁকে দরস থেকে বিরত রাখতে পারত না। শীতের তীব্রতায়ও কখনো বিলম্ব হতো না তাঁর দরস। অধিকাংশ সময়ই তাঁর ছাত্ররা নির্দিষ্ট সময়ে দরসে না আসার কারণে জবাবদিহির সম্মুখীন হতো। তাদের ধমক-তিরস্কার শুনতে হতো উসতাজের মুখ থেকে। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র শাইখ বাহজাত আসারি ﷺ তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'একদা প্রচণ্ড ঝড়-তুফান, প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মুখে পড়ে দরসে যেতে পারিনি আমি। আমি ভেবেছিলাম, শাইখও আজ দরসে আসতে পারবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দরসে গিয়ে বসলে রাগতস্বরে তিনি আবৃত্তি করছিলেন—

ولا خير فيمن عاقه الحر والبردُ

"ঠান্ডা-গরম যার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।"'

* যুগশ্রেষ্ঠ আলিম মুহাম্মাদ আল-আমিন শানকিতি ﷺ। যাঁর উপাধি ছিল কুরআনি আল্লামা। তাঁকে নিয়ে কিছু ভাইয়ের উক্তি, 'শানকিতি ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোর দিকে নিক্ষিপ্ত একটি বোমা, যে বোমা চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে অবস্থান নিয়েছে পৃথিবীতে।' এ উক্তি আদতে যথার্থ। কারণ, মুহাম্মাদ আল-আমিন শানকিতি যেন এ যুগে সালাফে সালিহিনের উপমা। সালাফের অবস্থা, ইলম ও যোগ্যতার সাথে তাঁর বেশ মিল ছিল।

শানকিত। মৌরতানিয়ার একটি শহর। এখানে ইলম শেখা-শেখানোর এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত ছিল। শাইখ মরুভূমির কোনো জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বসতেন। এরপর ছাত্ররাও এসে শাইখের পাশে মরুতে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করতেন। শাইখের তাঁবুকে ঘিরে থাকত ছাত্রদের তাঁবু। সকলে পুরোপুরি অবসর হয়ে ইলম শেখা-শেখানোয় মনোযোগী হতেন। এক শাইখের কাছে পড়া শেষে অন্য শাইখের কাছে চলে যেতেন ছাত্ররা। একই মরুতে অন্য শাইখের চারপাশে তাঁবু করে নিতেন তারা।

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিনও এমনই করে পড়তে এলেন এক শাইখের কাছে। বয়সে তিনি ছিলেন ছোট। উদ্দেশ্য ছিল 'লামিয়াতুল আফআল' কিতাবটি অধ্যয়ন করা। এ কিতাবের শুরু «الحمد لله لا أبغي له بدلا» বাক্যটা দিয়ে।

শাইখ শানকিতি নিজেই বলেন, 'একদিন আমি এক শাইখের কাছে গেলাম পড়ার জন্য। তিনি আমাকে আগ থেকে চিনতেন না, তাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?" তখন আমি উপস্থিত কবিতা রচনা করে বললাম :

"আরবি ভাষার অনুরাগ জাকান বংশের এক যুবককে নিয়ে এসেছে এখানে। উচ্চ মনোবল, প্রগাঢ় সাহস তাকে ছুড়েছে আপনাদের পানে। কারণ, এখানে এ মরুতে প্রভূত ইলমের বিদ্যুৎ খেলা করে, তার জ্যোতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে চলে যায় আকাশ পানে। তাই এ যুবক এসেছে আশা নিয়ে, ইলম-মেঘ থেকে সেও রাশি রাশি ইলম নেবে। যুবক তার ভাষাকে শুদ্ধ করবে, মিষ্ট করবে। কারণ, নাহুর জ্ঞান না থাকার কারণে এ ভাষার ক্ষেত্রটি তার জন্য সংকীর্ণ। কারণ, সে যে فعل-তে নিহিত নিয়মকানুনও জানে না। তাই আজ আশা নিয়ে, অনুরক্ত হয়ে, প্রবল আকর্ষণে সে এসেছে সিক্ত হতে «الحمد لله لا أبغي له بدلا» এর দরসে।"'

তিনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন। কোনো কোনো শাইখ তাঁকে দুটি বিষয়ের শিক্ষা দিতে লাগলেন একত্রে। কারণ, তিনি ছিলেন ইলম অর্জনে অনেক আগ্রহী। ইলম আয়ত্ত করায় বেশ শক্তিশালী। নিজ উচ্চ হিম্মতকে দরস ও ইলম অর্জনে কাজে লাগালেন তিনি।

'রিহলাতুল হাজ' গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যায়, যৌবনে ইলমের প্রতি শাইখ প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেন, 'ইলম অর্জনের ব্যাপারে আমি বলি, আমি আমার ছাত্র জীবনের শেষ দিকে ইলম অর্জনে পরিপূর্ণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং বিয়ে থেকেও মুখ ফিরিয়ে রাখি। কারণ, অনেক সময় এটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় আমার জন্য উপযোগী একটি মেয়ে ছিল, যে আমার সাথে বিয়েতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু যখন ইলমের ব্যাপারে আমার এত ব্যস্ততা দেখল, তখন সে নিরাশ হয়ে গেল। পরে এক ধনীকে বিয়ে করে নেয়। তখন আমার এক বন্ধু বলল, 'যদি এখন বিয়ে না করো, তবে পরে তোমার

উপযোগী মেয়ে পাবে কোথায়? তুমি হয় এখন উপযুক্ত মেয়ে দেখে বিয়ে করো, অন্যথায় বংশধারী ও সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে পরে তোমার উপযোগী মেয়ে পাবে না।' সে ইলম শিক্ষা থেকে আমাকে রাতারাতি ফারিগ হওয়ার জন্য বলছিল। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, 'নসিহতকারীগণ এ প্রত্যুষেই আমাকে বলল, সুন্দরী রমণীকুলের শ্রেষ্ঠজনের বিয়ে হয়ে গেল। তারা বলল আমায়, যেভাবে বলি, সেভাবে বিয়ে করে নাও টানা টানা চোখের, মসৃণ কাপড় পরিহিতা কোনো সুন্দরীকে। যেন তার দৃষ্টি অগ্নিবাণ, যার আঘাতে হৃদয়ের গভীরেও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য হয়ো না, যদি তার নেকাবের মধ্যবর্তী সে চাহনি বর্শার মতোও হয়। কারণ, এমন অনেক নরম বর্ম পরিহিত ব্যক্তি কেবল এ চাহনিতেই ধরাশায়ী হয়েছে, কোনো তির-কামান লাগেনি। এমন কাউকে বিয়ে করো তুমি। আমি তাদের বললাম, আমাকে ছাড়ো, আমার এ অন্তর স্পষ্ট অজ্ঞতায় রয়েছে, যে আজ এখনই চায়, তার অন্তরকে পরিষ্কার করতে। আমার ব্যস্ততা আছে এক কুমারীকে ঘিরে।[২৬১] যার চেহারার সামনে সকালের উজ্জ্বলতা কিছুই নয়। আমি তাকে দেখি, কাগজের মসৃণ পিঠে কালো বোরকা লেপ্টে সে বসে রয়েছে, ধারণ করে আছে কত মর্ম। আমি তাকে নিয়ে চিন্তা করে রাত কাটিয়ে সকাল করি, সকাল থেকে দুপুর হয় সে মর্ম বুঝতে, এত গভীর চোখাচোখি এত সময়ের পরে সে আমার সামনে ধরা দেয় অবশেষে। আমি তার ভেতর ডুব দিই, মিশে যাই তার মধ্যে।'

অল্প দিনে হাদিসের কিতাব পড়ে শেষ করা

'আল-কামুস' গ্রন্থ-প্রণেতা আল-মাজদ ফিরুজাবাদি ﷺ-এর জীবনীতে এসেছে, তিনি দামেস্কে মাত্র তিন দিনে 'সহিহু মুসলিম' পাঠ সম্পন্ন করেছেন। এরপর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন :

قَرَأْتُ بِحَمْدِ اللهِ جَامِعَ مُسْلِمٍ *** بِجَوْفِ دِمَشْقَ الشَّامِ جَوْفًا لِلْإِسْلَامِ

عَلَى نَاصِرِ الدِّيْنِ الْإِمَامِ بْنِ جَهْبَلٍ *** بِحَضْرَةِ حُفَّاظٍ مَشَاهِيْرَ أَعْلَامِ

وَتَمَّ بِتَوْفِيْقِ الْإِلَهِ وَفَضْلِهِ *** قِرَاءَةَ ضَبْطٍ فِيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ

....

২৬১. এখানে তিনি কিতাব ও মাসআলা-মাসায়িলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি "জামিউ মুসলিম" পড়া শেষ করেছি ইসলামের শামের উদর দামেস্কে—যেটি ইসলামের গর্ভ হিসেবেও পরিচিত। পড়েছি ইমাম ইবনে জাহবালের কাছে, যার উপাধি ছিল নাসিরুদ্দিন। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা হাফিজুল হাদিসগণ। রবের তাওফিক ও অনুগ্রহে আমার এই পাঠ উপস্থাপন সমাপ্ত হয়েছে মাত্র তিন দিনে।'

হাফিজ আবুল ফজল ইরাকি ﷺ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল খাব্বাজ ﷺ-এর নিকট দামেস্কে লাগাতার ছয়টি মজলিসে পড়ে শেষ করেন 'সহিহু মুসলিম'। আর ছয়টির শেষ মজলিসে কিতাবের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি পাঠ করেন। এ মজলিসগুলো হয়েছিল হাফিজ জাইনুদ্দিন বিন রজব ﷺ-এর উপস্থিতিতে। তিনি নিজ পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে তা যাচাই করছিলেন।

'তারিখুজ জাহাবি'তে ইসমাইল বিন আহমাদ হিরি নিশাপুরী ﷺ-এর জীবনীতে আছে যে, কুশমিহানি ﷺ-এর কাছে তিনি 'সহিহুল বুখারি' পড়েন। খতিবে বাগদাদি ﷺ তাঁর থেকে মক্কায় তিনটি মজলিসে 'সহিহুল বুখারি' শ্রবণ করেন। দুটি মজলিস হয়েছে দুই রাতে। মাগরিবের পর দরস শুরু হয়ে ফজরের সময় বন্ধ হতো। আর তৃতীয় মজলিসটি ছিল পূর্বাহ্ন থেকে ফজর অবধি। ইমাম জাহাবি ﷺ বলেন, 'এমনটি আমাদের সময়ের কেউ পারবে বলে মনে হয় না।'

হাফিজ সাখাবি ﷺ বলেন, 'আমাদের শাইখ হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ-এর শাইখ আল-মাজদ লুগাবি ﷺ-এর ক্ষেত্রে যে রকম ঘটনা ঘটেছে, তার চেয়ে উত্তম ঘটনা ঘটেছে আমাদের শাইখের ক্ষেত্রে। তিনি "সহিহুল বুখারি" পাঠ করেছেন চল্লিশ ঘণ্টায়, আর "সহিহু মুসলিম" পাঠ করেছেন চার মজলিসে। তবে খতমের মজলিসটি ছিল ভিন্ন দুদিনের মজলিশ থেকে কিছু বেশি সময়ের। "সুনানু ইবনি মাজাহ" পাঠ করেছেন চার মজলিসে। নাসায়ির "আল-কাবির" পাঠ করেছেন দশ মজলিসে; এর প্রতিটি মজলিস ছিল চার ঘণ্টার সমান। তিনি 'সহিহুল বুখারি" পাঠ করেছেন দশ মজলিসে; এর প্রতিটি মজলিস ছিল চার ঘণ্টার মতো।' এতটুকু বলার পর সাখাবি ﷺ বলেন, 'ইবনে হাজার ﷺ-এর সবচেয়ে দ্রুত পঠিত কিতাব হলো "আল-মুজামুস সগির"। এ কিতাব তিনি সিরিয়ায় সফরকালীন জোহর থেকে আসরের সময়টাতে এক মজলিসে

শেষ করেছেন। তিনি বলেন, এই কিতাবটি ছিল এক খণ্ডের। ১৫শ হাদিসের অন্তর্ভুক্তি ছিল তাতে।'

ইলম অর্জনে দূর-দূরান্ত সফর করা

ইমাম বুখারি ﷺ বলেন, 'জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ এক মাসের পথ পাড়ি দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলেন মাত্র একটি হাদিসের জন্য।'

আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ মদিনা থেকে মিশরে উকবা বিন নাফি ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলেন তাঁর থেকে একটি হাদিস জানার জন্য। তিনি মিশরে এসে অবতরণ করলেন। নিজের বাহনও বাঁধলেন না। উকবা ﷺ-এর কাছ থেকে হাদিসটি শ্রবণ করলেন। এরপর বাহনে চড়ে বসলেন এবং মদিনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

মালিক ﷺ ইয়াহইয়া বিন সাইদ থেকে বর্ণনা করেন, সাইদ বিন মুসাইয়িব ﷺ বলেন, 'আমি দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত শুধু একটি হাদিসের উদ্দেশ্যে সফর করতাম।'

আবুল আলিয়া রুফাই বিন মিহরান রিয়াহি বসরি ﷺ বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের সূত্রে বসরায় হাদিস শুনতাম। কিন্তু এতে তৃপ্ত হতে না পেরে মদিনায় গিয়ে সরাসরি তাঁদের জবান থেকে শুনতে গেলাম।'

হাফিজ ইবনে কাসির ﷺ ইমাম বুখারি ﷺ-এর জীবনীতে লেখেন—

বুখারি ﷺ হাদিসের সকল শাইখের কাছে ভ্রমণ করেন যেখানে যেখানে ভ্রমণ সম্ভব ছিল। তিনি এক হাজারেরও অধিক শাইখ থেকে হাদিস লিখেছেন। ইমাম ফিরাবরি ﷺ বলেন, 'আমার সাথে ইমাম বুখারি থেকে "সহিহুল বুখারি" শ্রবণ করেছে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ। আর আমি ব্যতীত তাদের কেউ এখন জীবিত নেই।'

ইলমের সফরে ইমাম রাজি ﷺ-এর উচ্চ হিম্মতের বর্ণনায় মানুষের বিবেক নাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আমার প্রথম সফর হয়েছে সাত বছর বয়সে। আমি পায়ে হেঁটে প্রায় এক হাজার ফারসাখ অতিক্রম করেছি। এরপর গণনা

ছেড়ে দিয়েছি এবং বাহরাইন থেকে মিশরে পদব্রজে রওয়ানা করেছি। এরপর হেঁটেই রামাল্লায় পৌঁছেছি। তারপর তারতুসে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স বিশ বছর।

سَأَضْرِبُ فِيْ طُوْلِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا *** أَنَالُ مُرَادِيْ أَوْ أَمُوْتُ غَرِيْبًا

فَإِنْ تَلِفَتْ نَفْسِيْ فَلِلَّه دَرُّهَا *** وَإِنْ سَلِمَتْ كَانَ الرُّجُوْعُ قَرِيْبًا

'আমি চষে ফিরব গোটা পৃথিবী। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুব কিংবা সফরেই স্বাগত জানাব মৃত্যুকে। যদি মারা যাই পথের পরে, তাহলে কত সৌভাগ্যবান আমি! আর যদি বেঁচে থাকি, তবে দ্রুতই ফিরে আসব সাফল্যের পয়গাম হাতে।'

স্পেন ও পশ্চিমে ইলমের প্রচার হয়েছে—এমন কতক মহামনীষীর মাধ্যমে, যাঁরা প্রাচ্য পর্যন্ত সফর করেছেন ইলমের পিপাসা মেটানোর আশায়। এ সফরে তাঁরা অনেক কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন যেমন : আসাদ বিন ফুরাত, আবুল ওয়ালিদ বাজি ও আবু বকর বিন আরাবি।

ইলমের পথে দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন

সাহিত্য, জীবনী, ইতিহাস ও চরিত্র নিয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহে আলিমদের দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা, শ্বাসরুদ্ধকর বিপদাপদের কথা উঠে এসেছে। তারা বিপদের সামনে আত্মসমর্পণ করেননি কখনো। বরং এসব বাধাবিপত্তি ও বিপদাপদের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি তারা। সবরের পথ আঁকড়ে ধরে ডিঙিয়ে গিয়েছেন সব প্রতিকূলতাকে। এভাবে অটল-অবিচল থেকে তাঁরা সবরের সাওয়াব ও তার প্রতিদানের আশা করতেন। বস্তুত তাঁরা সফলও হয়েছেন এ পথে।

এসব বিপদ ডিঙিয়ে আসা এক আলিমের সাথে দারিদ্র্যের কথোপকথনটি শোনো। এ ফকিহ দারিদ্র্যকে তার অবস্থান ও বাসস্থানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, যাতে তার থেকে দূরে থাকা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য বলল, দারিদ্র্য তাঁর সহপাঠী; তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহচর ও প্রিয়জন। কখনো তাঁকে সে ছেড়ে যাবে না। তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না সে।'

কবিতার ভাষায় কথোপকথনটি—

قُلْتُ لِلْفَقْرِ: أَيْنَ أَنْتَ مُقِيْمُ؟ *** قَالَ لِيْ: فِيْ عَمَائِمِ الْفُقَهَاءِ!

إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَإِخَاءً *** وَعَزِيْزٌ عَلَيَّ تَرْكُ الْإِخَاءِ!

'দারিদ্র্যকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় বসবাস করো? সে বলল, ফকিহদের পাগড়িতে আমার আবাস। আমার ও তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা আমার জন্য অসম্ভব।'

কেউ কেউ الفِقْه-কে الفَقْر-এর মধ্যে নিহিত বলেছেন। তারা বলেন, الفَقْر শব্দের শেষের রা-বর্ণ ধীরে ধীরে গোলাকার হয়ে হা-বর্ণে রূপ নেয়। এরপরই একজন মানুষ ফকিহ হয়। الفِقْه ও الفَقْر শব্দদ্বয়ের মাঝে মিল থাকার কারণেই বলা হয় :

إِنَّ الْفَقِيْهَ هُوَ الْفَقِيْرُ وَإِنَّمَا *** رَاءُ الْفَقِيْرِ تَجَمَّعَتْ أَطْرَافُهَا

'ফকিহ মানে ফকিরই। ফকির শব্দের (ر) 'রা' বর্ণটা দুদিক মিলে (ه) 'হা' বর্ণ হয়ে গেছে এই যা।'

ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর কথা শোনো। তিনি অভাব-অনটনকে উপেক্ষা করেছেন, দারিদ্র্যের নিপীড়নকে সবরের মাধ্যমে দমন করেছেন। তিনি নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেন :

أَمْطِرِيْ لُؤْلُؤًا سَمَاءَ سَرَنْدِيْـ *** ـبَ وَأَخْرِجِيْ آبَارَ تُكْرُورَ تِبْرَا

أَنَا إِنْ عِشْتُ لَسْتُ أَعْدَمُ قُوْتًا *** وَلَئِنْ مُتُّ لَسْتُ أَعْدَمُ قَبْرَا

هِمَّتِيْ هِمَّةُ الْمُلُوْكِ وَنَفْسِيْ *** نَفْسُ حُرٍّ تَرَى الْمَذَلَّةَ كُفْرًا

'হে শ্রীলঙ্কার আসমান, তুমি মুক্তোবৃষ্টি বর্ষণ করো। হে টুকলোরের[২৬২] কূপসমূহ, তোমরা পানির সাথে উগরে দাও স্বর্ণরেণু। (তোমাদের এই সম্পদের দুপয়সা মূল্যও আমার কাছে নেই) আমি যদি বেঁচে

....

২৬২. আফ্রিকার একটি শহরের নাম। (Toucouleur)

থাকি, তবে আমার রিজিকের অভাব হবে না। আর যদি মারা যাই তো কবরের জন্য স্থানসংকট হবে না। আমার মনোবল তো রাজা-বাদশাহদের মনোবল। আর আমার অন্তর স্বাধীন শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর, যেটি লাঞ্ছনাকে কুফুরির মতো এড়িয়ে চলে।'

উমর বিন হাফস আল-আশকার ﷺ বলেন, 'বসরায় আমরা কয়েক দিন বুখারিকে হাদিস লেখার দরসে দেখিনি। তাই তাঁর সন্ধানে তাঁর বাড়িতে যাই। সেখানে তাঁর সন্ধান পাই। দেখি, তিনি বিবস্ত্র অবস্থায় ঘরের ভেতর বসে আছেন। তাঁর কাছে অর্থকড়ি যা ছিল, সব ফুরিয়ে গেছে। কিছুই আর বাকি নেই। আমরা কয়েকজন মিলে তাঁর জন্য কিছু দিরহাম জমা করি এবং তাঁকে জামাকাপড় কিনে দিই। এরপর তিনি আবারও আমাদের সাথে হাদিস লেখায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।'

ইমাম মালিক ﷺ বলেন :

'ইলমের এ দৌলত দারিদ্র্যের স্বাদ আস্বাদন ছাড়া অর্জিত হয় না।' ইবনে কাসিম ﷺ বলেন, 'হাদিসের অন্বেষণ মালিক ﷺ-কে এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে ছাড়ল যে, তাঁকে নিজ বাড়ির ছাদ ভেঙে সে কাঠ বেচতে হয়েছে।' ইমাম মালিক নিজের সব অর্থকড়ি উৎসর্গ করলেন ইলম শেখার পথে।

ইয়াহইয়া বিন মুইন ﷺ-এর কথা শোনো। তাঁর পিতা তাঁর জন্য দশ লক্ষ দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন। তিনি এ সবগুলো অর্থ ব্যয় করেছেন হাদিস শেখার পেছনে। এমনকি অবস্থা এতটুকু পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, পরার মতো জুতোও ছিল না তাঁর কাছে। নিজের সব সম্পদ তিনি নিঃশেষ করেছেন ইলমের পথে।

আবু হাতিম ﷺ বলেন, 'ইলম অর্জনের দিনগুলোতে আমার অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি খাওয়ার জন্য সামান্য দানাপানি কেনারও সামর্থ্য ছিল না আমার। অবস্থা এতটাই বেগতিক হয়ে পড়েছিল—যে এলাকায় থাকতাম, রাতের বেলায় সেখানকার রাস্তায় বেরিয়ে পাহারাদারের বাতির সাহায্য নিতাম লেখার জন্য। পাহারাদার কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ায় আমাকেই তার পক্ষ হয়ে তার কাজ করতে হতো।'

আবু হাতিম ﷺ-এর কাছে সামান্য খাবার কেনার মতো অর্থের জোগান থাকত না, এ অবস্থায় চেরাগের তেল কেনা তো দুঃসাধ্য ব্যাপার। আলিমগণ এভাবেই কষ্ট করে পড়ে আলিম হয়েছেন।

ইলমের পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ ও জীবননাশের ঝুঁকিসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করা

ইলম অর্জনের পথে নিজের কিছু দুঃখ-কষ্টের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ইমাম আবু হাতিম ﷺ বলেন :

'আমরা মদিনা হতে দাউদ আল-জাফরি ﷺ-এর কাছ থেকে বেরোলাম। রওয়ানা করলাম জার নামক ছোট্ট এক শহরের উদ্দেশে। শহরটি ছিল সাগর-উপকূলে। সাগরপথে যেতে হতো। আমরা ছিলাম তিনজন—বৃদ্ধ আবু জুহাইর আল-মারুজি, নিশাপুরী ও আমি। আমরা সমুদ্রযাত্রা শুরু করলাম। সাগরের প্রবল বাতাস এসে আমাদের চেহারায় লাগত। একাধারে তিন মাস আমরা সাগরে আটকে পড়েছিলাম। ততদিনে আমাদের হৃদয়গুলো সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। খাবারদাবার যা সাথে ছিল, সবই প্রায় শেষ হয়ে এল। এরপর আমরা তীরে নেমে এলাম। স্থলভাগে হাঁটতে থাকলাম কয়েক দিন। কিন্তু আমাদের সাথে যে পাথেয় ও পানীয় ছিল, তাও ফুরিয়ে গেল। পানাহার ছাড়া একদিন-একরাত হাঁটতে থাকলাম। এভাবেই কাটল প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। প্রতিদিন আমরা রাত পর্যন্ত চলতাম। সন্ধ্যা হলে সালাত আদায় করে যেখানে পারতাম সেখানেই শুয়ে পড়তাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল আমাদের পুরো শরীর। তৃতীয় দিন যখন প্রভাতে উপনীত হলাম, শরীরের সব শক্তি দিয়ে আমরা হাঁটতে থাকলাম। একপর্যায়ে বৃদ্ধ লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমরা তাকে নাড়া দিলাম। কিন্তু তার কোনো জ্ঞান ছিল না। তাই তাকে ছেড়ে আমি আর আমার সাথি নিশাপুরী সামনে চলতে থাকলাম। দুই-এক ফারসাখ অতিক্রম করতেই আমিও অত্যধিক দুর্বলতায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। তাই আমার সাথি আমাকে রেখেই সামনে চলতে লাগল। চলতে চলতে একপর্যায়ে সে দূরে কোথাও গিয়ে সহসা একটি নৌকা তীরে ভিড়তে দেখল। নৌকাটি মুসা ﷺ-এর কূপের কাছে নোঙর করল।

আমার সাথি তাদের দেখে কাপড় নাড়িয়ে ইশারা করল। তারা নিজেদের সাথে থাকা একটি পাত্রতে পানি নিয়ে আসলো এবং তাকে পান করালো। তারা তাঁর হাত ধরল। সে তাদের জানাল, "আমার দুজন সাথি পেছনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।" আমি উপলব্ধি করলাম, কেউ আমার চেহারায় পানি ছিটাচ্ছে। আমি চোখ খুলে বললাম, "আমাকে পানি পান করাও।" একজন একটি ছোট পাত্রে সামান্য পানি ঢেলে দিল এবং আমার হাত ধরে রাখল। আমি বললাম, "আমার পেছনে একজন বৃদ্ধ লোক পড়ে আছে।" সে বলল, "তার কাছে কয়েকজন গেছে।" সে আমাকে ধরে দাঁড় করালো এবং আমি আমার পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগলাম। আর সে একটু পরপর আমাকে অল্প অল্প করে পানি পান করাচ্ছিল। অবশেষে তাদের নৌকায় এসে পৌঁছালাম। তারা আমাদের তৃতীয় বন্ধুকেও নিয়ে আসলো। নৌকার লোকগুলো আমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করল। আমরা কিছু দিন তাদের সাথে নৌকায় অবস্থান করলাম। এরপর নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওয়ানা করলাম। তারা আমাদের "রায়া" নামক এলাকার তাদের গভর্নরের নামে একটি চিঠি লিখে দিল। আর আমাদের সাথে পানি, ছাতু, কেকসহ বিভিন্ন পাথেয় দিয়ে দিল।

আমরা চলতে থাকলাম। একপর্যায়ে আমাদের ছাতু, পানি ও কেক সবই শেষ হয়ে গেল। আমরা সাগর-তীর ধরে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হাঁটতে থাকলাম। হঠাৎ আমরা ঢালের মতো একটি কচ্ছপের সম্মুখীন হলাম। সমুদ্র এটিকে ওপরে এনে রেখেছে। আমরা একটি বড় পাথর খুঁজে নিয়ে কচ্ছপের পিঠে আঘাত করলাম। তার পিঠ ফেটে গেল। ডিমের কুসুমের মতো হলুদ কিছু দেখলাম। সমুদ্র উপকূলে পড়ে থাকা শামুকের খোলস কুড়িয়ে নিয়ে চামচের মতো ব্যবহার করে কচ্ছপের পিঠের সে তরল পান করতে লাগলাম। আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হলো। এরপর আমরা চলতে চলতে একপর্যায়ে "রায়া" শহরে পৌঁছালাম। আমরা সেখানের কর্মকর্তার কাছে আমাদের চিঠিটি পাঠিয়ে দিলাম। তিনি আমাদের থাকার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের প্রতিদিন সবজি খাওয়াতে লাগলেন। আর খাদিমকে বলে দিলেন, এদের জন্য কুমড়োর ব্যবস্থা করবে। ফলে কিছু দিন যাবৎ আমাদের জন্য রুটি আর কুমড়ো আসতে থাকে। একদিন আমাদের একজন ফারসিতে বলল, "মন্দ গোশতও কি কিসমতে জুটবে না?" গৃহকর্তা খুব ভালোভাবেই ফারসি

বুঝতেন। তিনি বললেন, "আমি ফারসি খুব ভালো করেই বুঝি। কারণ, আমার দাদা ছিলেন হারারিয়া অঞ্চলের।" এরপর আমাদের জন্য গোশত পাঠানো হতো। কিছুদিন পর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে গেলাম। তারা আমাদের মিশর পৌঁছার মতো সকল সামান ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।'

বকর বিন হামাদান আল-মারুজি ﵀ বলেন, 'আমি ইবনে খাররাশকে বলতে শুনেছি, "আমি হাদিস শেখার সফরে পানীয়ের অভাবে পাঁচবার পেশাব পান করেছি।"'

এর কারণ ছিল, তিনি হাদিস শেখা ও যথাযথ ব্যক্তি থেকে তা সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন বনাঞ্চল ও মরু-অঞ্চল পাড়ি দিতেন। পথিমধ্যে তীব্র পিপাসায় আক্রান্ত হতেন। পানি না পেয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজের পেশাব পান করতে বাধ্য হতেন।

ওয়াখশি আবু আলি হাসান ﵀ বলেন :

'আমি আসকালানে ছিলাম। ইবনে মুসাহ্হা ও অন্যদের থেকে হাদিস শ্রবণ করছিলাম। কিন্তু আমার খরচার ঘাটতি দেখা দিল। কিছু দিন না খেয়ে থাকলাম। একপর্যায়ে আমি লেখার শক্তিও হারিয়ে ফেললাম। আমি রুটির দোকানে গিয়ে একপাশে বসে থাকতাম, যাতে রুটির ঘ্রাণে সামান্য শক্তির জোগান হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা আমার জন্য অনুগ্রহের দ্বার উন্মোচন করলেন।'

আর শোনো ইবনুল জাওজি ﵀-এর ঘটনা। তিনি বলেন :

'ইলম অর্জনের পথে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা আমার কাছে মধুর চেয়েও বেশি মিষ্ট। কারণ, আমি যে মহান কিছু অন্বেষণ করছি এবং আশা করছি মহান কিছুর!

শৈশবে আমি কিছু শুকনো রুটি নিয়ে হাদিস অর্জনে বের হয়ে পড়তাম। পথিমধ্যে ইসা নদীর তীরে বসে রুটিগুলো খাওয়ার চেষ্টা করতাম আমি, কিন্তু পানি ছাড়া তা খাওয়া যে সম্ভব ছিল না।

যখনই আমি এক লুকমা খেতাম, সাথে সাথে পানি পান করতাম। আমার হিম্মতের দৃষ্টি শুধু ইলম অর্জনের মিষ্টতাই অনুভব করছিল। আমার এ কষ্ট ফল বয়ে আনল, যখন দেখলাম, রাসুল ﷺ-এর বাণী, অবস্থা, আদব এবং সাহাবিদের অবস্থা ও আদব সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি।'

বারুদি ﵀ বলেন :

وَمَنْ تَكُنِ الْعَلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ *** فَكُلُّ الَّذِيْ يَلْقَاهُ فِيْهَا مُحَبَّبُ

'শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংকল্প যে করে, পথের সকল বিপর্যয় তার কাছে প্রিয় মনে হয়।'

ইলমের পথে বিনিদ্র রজনী

এক সালাফকে বলা হলো, 'আপনি কীসের বিনিময়ে ইলম পেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'বাতি নিয়ে প্রভাত পর্যন্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে।'

আরেক সালাফকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'সফর, অনিদ্রা ও প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠা।'

খতিবে বাগদাদি ﵀ বলেন, 'সর্বোত্তম আলোচনা হলো রাতের আলোচনা। সালাফের এক জামাআত এমনটা করতেন। তাঁরা ইশা থেকে দরস শুরু করতেন। প্রায় সময় তাঁরা ফজরের আজান শুনেই তবে বসা থেকে উঠতেন।'

وَبَادِرِ اللَّيْلَ بِمَا تَشْتَهِيْ *** فَإِنَّمَا اللَّيْلُ نَهَارُ الْأَرِيْبِ

'যা কিছু তুমি করতে চাও, রাতের সময়টাকে কাজে লাগাও। কারণ, রাতই হলো বিচক্ষণ কর্মবীরের দিবস।'

শাইখ আবু আলি ﵀ শীতকালীন সময়ে রাতের বেলা ঘুম তাড়ানোর জন্য পিঠের কাপড় খুলে রাখতেন।

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀ রাতের বেলা ঘুমাতেন না। ঘুম তাড়ানোর জন্য সাথে পানি রাখতেন তিনি। বলতেন, 'উষ্ণতা থেকেই নিদ্রার জন্ম। আর তা দূর করার উপায় হলো ঠান্ডা পানি।'

ইবনুল লুবাদ উল্লেখ করেন, 'মুহাম্মাদ বিন আবদুস রাতের প্রথম তৃতীয়াংশের অজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন ত্রিশ বছর। পনেরো বছর তিনি অধ্যয়ন করে কাটিয়েছেন। পনেরো বছর কাটিয়েছেন ইবাদতে।'

রবি ﷺ বর্ণনা করেন, ফাতিমা বিনতে শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'আমি আমার পিতার জন্য এক রাতে সত্তরবার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

হাফিজ ইবনে কাসির ﷺ বলেন :

'ইমাম বুখারি ﷺ রাতে ঘুম থেকে উঠে প্রদীপ জ্বালাতেন এবং হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া কোনো ফায়দা লিখে রাখতেন। এরপর প্রদীপ নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। তারপর আবার উঠতেন এবং একই কাজ করতেন। এভাবে একই রাতে বিশবারের মতো হয়ে যেত।'

আসাদ ইবনুল ফুরাত ছিলেন কিরওয়ানের কাজি এবং মালিক ﷺ-এর ছাত্র ও মালিকি মাজহাবের সংকলক। তিনি ছিলেন একজন বিজয়ী নেতা। তিনি সিকিলিয়্যাহ বিজয় করেন। ২১৩ হিজরিতে সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি কিরওয়ান থেকে হিজরি ১৭২ সনে প্রাচ্যের দিকে রওয়ানা করেন। এরপর মদিনায় এসে ইমাম মালিক ﷺ-এর নিকট 'মুয়াত্তা' পাঠ করেন। তারপর ইরাকে যান। আবু হানিফা ﷺ-এর শাগরেদদের কাছ থেকে ইলম শেখেন এবং ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর বেশিরভাগ যাতায়াত ছিল মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﷺ-এর কাছে। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি একজন মুসাফির। পাথেয় স্বল্প। আপনার থেকে হাদিস শ্রবণ হয়েছে খুব কমই। আপনার তো ছাত্র অনেক। এখন আমার কী হবে?'

মুহাম্মাদ বিন হাসান ﷺ বললেন, 'তুমি ইরাকিদের সাথে দিনের বেলা শ্রবণ করবে। রাতটি শুধু তোমার জন্য থাকবে। তুমি আমার কাছেই রাতের বেলা থাকবে এবং আমি তোমাকে ইলম শেখাব।' আসাদ ﷺ বলেন, 'আমি রাতের বেলা তাঁর কাছে গেলে তিনি বের হয়ে আসতেন। তিনি নিজের সামনে একটি পানির পেয়ালা রাখতেন। এরপর পড়া শুরু করতেন। যখন রাত গভীর হয়ে যেত আর আমি ঝিমুতে শুরু করতাম, তখন তিনি পানি নিয়ে আমার চেহারায় ছিটিয়ে দিতেন। আমি সজাগ হয়ে যেতাম। এটিই ছিল আমার এবং তাঁর

অভ্যাস। অবশেষে আমি তাঁর থেকে যা শ্রবণ করতে চেয়েছিলাম, তা পূর্ণ হলো।'

মুহাম্মাদ বিন হাসান ﵀ যখন তার খরচা ফুরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন নিজেই তার খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যখন তিনি দেখলেন, আসাদ ﵀ রাস্তার পানি পান করছেন, তখন তাকে তিনি আশি দিনার দিয়েছিলেন। যখন আসাদ ﵀ ইরাক থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখনও তাকে খরচা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

আব্দুর রহমান বিন কাসিম আল-উতাকা আল-মিসরি ﵀ ছিলেন মালিক, লাইস ও অন্যান্য অনেক আলিমের ছাত্র। তিনি বলেন :

'আমি মালিক ﵀-এর নিকট রাতের অন্ধকারে আসতাম এবং তাঁকে দুটি, তিনটি বা চারটি করে মাসআলা জিজ্ঞেস করতাম। আমি তখন তাঁকে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী পেতাম। তাই আমি প্রত্যহ শেষ রাতে আসতাম। একবার আমি তাঁর ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে আমার চোখ লেগে আসে এবং আমি ঘুমিয়ে পড়ি। মালিক ﵀ মসজিদে বের হয়ে যান, কিন্তু আমি টের পাইনি। তখন তাঁর এক কালো বাঁদি এসে আমাকে পা দিয়ে ঠেলা মেরে বলল, "তোমার মনিব বেরিয়ে গেছেন, তিনি তোমার মতো গাফিল নন। তাঁর বয়স এখন ৪৯ বছর। তিনি রাতের প্রথমাংশের অজু দিয়েই প্রায় সব সময় ফজর সালাত আদায় করেন।"' আব্দুর রহমান ﵀ ইমাম মালিকের কাছে খুব বেশি যাতায়াতের কারণে কালো বাঁদিটি ভেবেছিল, মালিক ﵀ তার মনিব।

ইবনে কাসিম ﵀ বলেন :

'আমি সতেরো বছর মালিক ﵀-এর দরজায় অবস্থান করেছি। কিন্তু এ সময় আমি না কোনো কিছু বিক্রি করেছি আর না ক্রয় করেছি। একদিনের কথা। আমি মালিক ﵀-এর সামনেই ছিলাম। এমন সময় মিশরের এক হাজি আসলো। মুখঢাকা এক যুবক। কাছে এসে মালিক ﵀-কে সালাম দিল। বলল, "আপনাদের মধ্যে ইবনে কাসিম আছে?" তখন আমার দিকে ইশারা করা হলো। সে এসে আমার চক্ষুদ্বয় চুম্বন করল। আর আমি তাঁর থেকে পবিত্র একটি ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, এটি আমার ছেলের ঘ্রাণ। এরপর দেখলাম, বাস্তবেই সে ছিল আমার ছেলে।"'

ইবনে কাসিম যখন ইলমের সফরে বের হন, তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় ছিল। এবং তাঁর স্ত্রী ছিল তাঁর চাচাতো বোন। সফর দীর্ঘ হবে বলে স্ত্রীকে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন—ইচ্ছা করলে সে বিদায় নিয়ে চলে যেতে পারে অথবা থাকতে পারে। তাঁর স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষাকেই বেছে নিয়েছিলেন।'

আবুল ইয়ালা আল-মুসলি ﷺ বলেন :

اِصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الْإِدْلَاجِ بِالسَّحَرِ * وَبِالرَّوَاحِ عَلَى الْحَاجَاتِ وَالْبُكَرِ

لَا تَعْجِزَنَّ وَلَا يُضْجِرْكَ مَطْلَبُهَا * فَالنُّجْحُ يَتْلَفُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالضَّجَرِ

إِنِّيْ رَأَيْتُ وَفِيْ الْأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ *** لِلصَّبْرِ عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةُ الْأَثَرِ

وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِيْ أَمْرٍ يُطَالِبُهُ *** وَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ

'সকাল-সন্ধ্যায় সফরের কষ্টে সবর করো। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে না পারলেও সবর করো। মনোবৃত্তি যেন তোমাকে বিরক্ত না করে এবং অক্ষম করে না দেয়। কেননা, অক্ষমতা ও বিরক্তিই সাফল্যের প্রতিবন্ধক। আমি বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সবরের পরিণাম খুবই মিষ্ট হয়। এমন ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে, কেউ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে আর সে ব্যর্থ হয়েছে।'

শাইখুল ইসলাম নববি ﷺ তাঁর শাইখ মহান ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন ইসা আল-মুরাদি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি বলেন, আমি শাইখ আব্দুল আজিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আমি আমার হাতে নব্বই ভলিয়ম আর সাতশ খণ্ড কিতাব লিখেছি।' এ সবই ছিল উলুমুল হাদিসবিষয়ক রচনা।

নববি ﷺ বলেন, 'আমাদের শাইখ বলেন, "আমি তাঁর মতো এত অধিক পরিশ্রমী কোনো লোককে না কখনো দেখেছি, আর না এমন কারও কথা শুনেছি। তিনি দিনরাত সব সময় ইলমের পেছনে লেগে থাকতেন।"' তিনি বলেন, 'আমি কায়রোতে মাদরাসায় তাঁর পাশেই অবস্থান করেছিলাম। আমার

বাসা ছিল তাঁর বাসার ওপরে। প্রায় বারো বছর যাবৎ আমি রাতের বেলা যখনই জেগেছি, তাঁর বাসার বাতি প্রজ্জ্বলিত দেখেছি। দেখেছি, তিনি ইলম অন্বেষণে মশগুল। এমনকি আহারের সময়ও তাঁর কাছে কিতাব থাকত—তিনি তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।'

সীমাহীন মেহনত ও ইলমের জন্য রাতজাগরণের ফলে আল্লাহ তাদের মাঝে নুর ঢেলে দিয়েছিলেন। যেমন হাফিজ জিয়া আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি ﷺ বলেন, 'কেমন যেন তাঁর চেহারায় নুর চমকাচ্ছিল। অত্যধিক লেখালেখি ও ক্রন্দনের ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।'

ইমাম জমখশারি রাত জেগে আলিমরা কী স্বাদ পেতেন, তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'ইলম অন্বেষণে আমার রাতজাগরণ আমার কাছে রূপসী নারী ও তার উষ্ণ আলিঙ্গনের চাইতেও বেশি আনন্দদায়ক। ইলমের ছোট্ট একটি জট সমাধান করতে পেরে আনন্দে দুলে ওঠা আমার কাছে শরাবপান থেকেও বেশি প্রিয় ও কাম্য। কাগজের ওপর কলমের খচখচ শব্দ সুগন্ধি চূর্ণ করার পাথর ও প্রেয়সীর টানা টানা চোখ থেকেও বেশি সুখের। সুন্দরী যুবতির দফের ওপর টোকা দেওয়ার চাইতে আমার খাতার কাগজের ওপর পড়ে থাকা ধুলোর আস্তরণে টোকা দেওয়া অধিক সুখকর। আমি রাত জেগে কষ্ট করি, আর তুমি ঘুমিয়ে কাটাও রাত, আবার আমার মিলনও কামনা করো?!'

ইমাম নববি ﷺ নিজের জীবনের ইলম শেখার প্রারম্ভ-অবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'আমি দুবছর কাটিয়েছি জমিনে পিঠ লাগানো ব্যতীত।' বদর বিন জামাআহ ﷺ ইমাম নববি ﷺ-কে ঘুমের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন, 'যখন ঘুম প্রবল হয়ে যেত, আমি কিতাবের সাথে কিছুক্ষণ হেলান দিয়ে থাকতাম এবং পরে সজাগ হয়ে যেতাম।' বদর ﷺ বলেন, 'যখন আমি তাঁর নিকট আসতাম, তখন এক কিতাব আরেক কিতাবের ওপর রেখে আমার জন্য বসার জায়গা করে দিতেন তিনি।'

এই তো শামের হাফিজ ঐতিহাসিক ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমর বিন কাসির ﷺ। তিনি ইমাম আহমাদ রহ-এর কিতাবটি বিন্যাস-কাজে হাত দিলেন। এর সাথে সংযুক্ত করলেন হাদিসের ছয় কিতাবের হাদিস,

তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির, মুসনাদুল বাজ্জার ও মুসনাদু আবি ইয়ালা। এ ক্ষেত্রে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। অত্যধিক ক্লান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। দুনিয়ার বুকে রেখে গেলেন অভূতপূর্ব নজির। এটিকে তিনি পূর্ণতা দান করেছিলেন। তবে মুসনাদু আবু হুরাইরা-এর কিছু অংশ ব্যতীত। কেননা, এর পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেছেন। তা ছাড়া তাঁর দৃষ্টিশক্তিও দ্রুত চলে যায়। তিনি ইমাম জাহাবিকে বলেন, 'আমি সব সময় রাতের বেলা লিখতাম। সামনে রাখা চেরাগ একবার ক্ষীণ হয়ে মুহূর্তে আবার জোর তালে জ্বলে উঠত। এভাবে একসময় আমার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। হয়তো আল্লাহ তাআলা এর পূর্ণতা বিধানে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন।'

এখানে মহান ইমাম ইবনে দাকিক আল-ইদ ﷺ-এর ইলম অর্জনে বিনিদ্র রজনী এবং উচ্চ মনোবলের কিছু দিক আলোচনা করছি—

তিনি ফুসতাত, কায়রো, ইসকানদারিয়া, দামেস্ক ও হিজাজের প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করেছেন—কেবল ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে। ইলম অর্জন করেছেন তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ বড় বড় আলিমদের থেকে। এরপর তিনি ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর মাজহাব দুটিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। যেমনিভাবে তিনি উলুমুল হাদিস, তাফসির, ইলমুল কালাম, নাহু ও আদবে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, সেভাবে উভয় মাজহাবের ব্যাপারে পূর্ণ দৃঢ়তা অর্জন করলেন এবং উভয় মাজহাব মতেই ফতওয়া দেওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করলেন।

ইসনাবি ﷺ বলেন, 'তিনি একই সাথে দুটি মাজহাবের ওপর শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ইলম অর্জন করেছেন। এ কারণেই শাইখ রুকনুদ্দিন বিন কুওয়াই আল-মালিকি ﷺ একটি কাসিদায় তাঁর প্রশংসা করেছেন। সে কাসিদার একটি বাক্য এমন—

صَبَا لِلْعِلْمِ صَبًّا فِيْ صِبَاهُ *** فَأَعْلَى بِهِمَّةِ الصَّبِّ الصَّبِيِّ

وَأَتْقَنَ وَالشَّبَابُ لَهُ لِبَاسٌ *** أَدِلَّةَ مَـــالِكٍ وَالشَّـــافِعِيِّ

'ইলমের প্রতি এমনভাবে এ তরুণ আকৃষ্ট হলো যে, এক তারুণ্যময় অনুরাগে হিম্মতের উচ্চতা ছুঁয়ে গেল। শাফিয়ি ও মালিকি মাজহাবে সে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করল।'

শাইখ তাকি উদ্দিন বিন দাকিক আল-ইদ ﷺ ছিলেন ইলম ও ইবাদতের নিরবচ্ছিন্ন সাধক। রাতের খুব কম সময়ই ঘুমাতেন। জীবনের সময়গুলো দরস, মুতালাআ ও ইলম অর্জনে আবাদ করে রাখতেন তিনি। জীবনকে ব্যয় করেছেন লেখালেখি ও হাদিস বর্ণনার কাজে। যদি এ সময়ের মধ্যে নিজেকে আরামে রাখতে চাইতেন, তবে মসজিদের মিহরাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, অথবা কোথাও বসে আল্লাহ তাআলার কালাম তিলাওয়াত করতেন বা হেঁটে হেঁটে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে ফিকির করতেন, চিন্তা করতেন আল্লাহ তাআলার শৈল্পিক নিপুণতা নিয়ে, এগুলো থেকে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও একত্ববাদের প্রমাণ সংগ্রহ করতেন। সব সময় নিজের দেহ ও চিন্তাকে রাতের আঁধার কিংবা দিনের আলোতে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণে ব্যস্ত করে রাখতেন। অথবা দাঁড়িয়ে থাকতেন সালাত ও কিয়ামে; রত থাকতেন আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনায়। তাঁর জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হলো কবিতার এ পঙ্‌ক্তিগুলো—

اَلْجِسْمُ يُذِيْبُهُ حُقُوْقُ الْخِدْمَةِ *** اَلْقَلْبُ عَذَابُهُ عُلُوُّ الْهِمَّةْ

وَالْعُمْرُ بِذَاكَ يَنْقَضِيْ فِيْ تَعَبٍ *** وَالرَّاحَةُ مَاتَتْ فَعَلَيْهَا الرَّحْمَةْ

'নানান ইবাদতে শরীর ব্যস্তসমস্ত। আর অন্তর উচ্চ মনোবলের নির্যাতনে ক্লিষ্ট। আর জীবন? এক দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত। আরামের কথা বোলো না আর। সে তো কবেই মারা গেছে। তার ওপর রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহর।'

লক্ষ্য অর্জন ও উচ্চ মর্যাদা হাসিলের উচ্চ মনোবল ও উচ্চাভিলাষ তাঁর হৃদয়কে ব্যস্ত ও কাহিল করে দিয়েছিল যেন। চিন্তাশক্তিকে তিনি শরিয়ার আহকাম উদ্ভাবনের পেছনে ব্যস্ত রাখতেন সব সময়। দ্বীন ও উম্মাহর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সারা জীবন। গ্রহণ করেছিলেন তাকওয়ার পাথেয়।

ইমাম সুবকি ﷺ বলেন, 'রাতের বেলা ইলম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিরল একজন মানুষ। অনেক সময় পুরো রাতে তিনি মুতালাআয় কাটাতেন। এ সময়ে একটি ভলিয়ম বা দুটি ভলিয়ম পড়ে শেষ করে ফেলতেন। আবার কখনো একটি আয়াত পাঠ করতে থাকতেন ফজর পর্যন্ত। একই আয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন পুরোটা সময়।'

উদফুবি ﷺ বলেন, 'শাইখ জাইনুদ্দিন উমর আদ-দিমাস্কি ﷺ—যিনি ইবনুল কিনানি নামে পরিচিত—বর্ণনা করেন, "ইবনে দাকিক আল-ইদের সাথে একদিন সকালবেলা সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে একটি ভলিয়ম দিয়ে বললেন, "আমি গত রাতে এ কিতাবটি মুতালাআ করেছি।"'

উদফুবি ﷺ আরও বলেন :

'ইবনে দাকিক বেশ লম্বা সময় মুতালাআ করতে পারতেন। কুস শহরের মাদরাসাতু নাজিবাহর লাইব্রেরি আমি দেখেছি। সেখানকার কিতাবগুলোর পুরোভাগে একটি কিতাব ছিল। ইবনুল কাসসার ﷺ রচিত ত্রিশ ভলিয়মের 'উয়ুনুল আদিল্লাহ'। এ কিতাবে শাইখের পঠনচিহ্ন পেয়েছি আমি। এমনিভাবে মাদরাসাতুস সাবিকিয়ার কিতাবগুলোও আমি দেখেছি। ইমাম বাইহাকি ﷺ রচিত 'আস-সুনানুল কুবরা'-র প্রতিটি খণ্ডে আমি ইবনে দাকিকের পঠনচিহ্ন পেয়েছি। তাঁর পঠনচিহ্ন পেয়েছি 'তারিখু বাগদাদ', তাবারানি ﷺ-এর 'আল-মুজামুল কাবির' ও 'আল-মুজামুল আওসাত' ইত্যাদি গ্রন্থের মাঝেও।'

উদফুবি বলেন, 'আমাদের শাইখ ফকিহ সিরাজুদ্দিন আদ-দুনুরি আমাকে জানিয়েছেন, "যখন রাফিয়ি ﷺ-এর "আশ-শারহুল কাবির" কিতাবটি প্রকাশিত হলো, ইবনে দাকিক এক হাজার দিরহাম দিয়ে তা ক্রয় করে নেন। তখন তিনি শুধু ফরজ সালাত আদায় করতেন আর কিতাবটি শেষ হওয়া পর্যন্ত মুতালাআয় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি সব কিতাবই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুতালাআ করতেন। তিনি বলেন, "আমি ফিকহের প্রতিটি অধ্যায় এমনভাবে অধ্যয়ন করেছি, যা পুনরায় দেখার প্রয়োজন হবে না।"'

* এ যুগের আলিমদের জীবনীতেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আমরা। যেমন কুরআনি আল্লামা খ্যাত শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি ﷺ। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমার বাবা আমাকে বলেছেন, "তিনি "মুখতাসারু খলিল"-এর বিয়ের অধ্যায় পড়ছিলেন তখন। কিতাবের "في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان فلس" উক্তি পর্যন্ত পৌঁছালেন তিনি। আমাকে বললেন, "আমার শাইখ আসরের পর আমাকে এ মাসআলা পড়ান। তাঁর দরস ছিল শুষ্ক। তিনি একটি অধ্যায়ে যা ছিল, তার সবই পড়তেন। আমি এ মাসআলার

ব্যাপারে "মুখতাসারু খলিল"-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং এ মাসআলার ওপর যে হাশিয়া আছে, তা পাঠ করতে শুরু করলাম। একসময় রাত হয়ে গেল। বাতি জ্বালিয়ে নিলাম। বাতির আলোয় ফজর পর্যন্ত মুতালাআ অব্যাহত রাখলাম। সারা রাতে বিছানায় একটুও পিঠ লাগাইনি। ফরজ ছাড়া অন্য কোনো সালাতও আদায় করিনি। অবশেষে আমি খলিলের কথার দুটি ব্যাখ্যা পেলাম ব্যাখ্যাগ্রন্থে। যদি আমি কিতাব ও সুন্নাহ নিয়ে এ রাতটায় গবেষণা করতাম, তবে উম্মাহর জন্য বিরল কোনো জিনিস উদ্ধার করতে পারতাম।'"

শাইখ আতিয়্যাহ সালিম এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, তিনি রাত কাটাতেন ইলম অর্জনে চিন্তা ও গবেষণা করে। কঠিন জিনিস সহজে বোঝা পর্যন্ত অবিরত ব্যস্ত থাকতেন তাতে। তাঁর চরিত্রের একটি দিক হলো, কথা যেমন কাজও তেমন। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেন—

"আমি আমার এক শাইখের কাছে পড়তে গেলাম। তিনি নিজের মতো আমাকে ব্যাখ্যা করে দিলেন। আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি সে ব্যাখ্যায়। তৃপ্তিও আসেনি অন্তরে। তাই তার কাছ থেকে চলে এলাম। এ অস্পষ্টতা দূর করা এবং এ মাসআলা সমাধান করার প্রতি ধীরে ধীরে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বেড়ে গেল আমার।

তখন ছিল জোহরের সময়। আমি কিতাবপত্র ও বিভিন্ন তথ্যসূত্র নিয়ে মুতালাআ শুরু করলাম। আসর পর্যন্ত চলল মুতালাআ। কিন্তু আমার প্রয়োজন পুরো হয়নি। তাই পুনরায় মুতালাআ শুরু করি। মাগরিব পর্যন্ত চলল তা। কিন্তু তখনও সমাধানে পৌঁছতে পারিনি। তারপর আমার খাদিম প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল, আমি ছাত্রদের অভ্যাস মতো সে আলোতে পড়তাম। আমার মুতালাআ চলতে থাকে। যখনই ঢলে পড়তাম বা ক্লান্ত হয়ে যেতাম, সবুজ চা খেয়ে নিতাম কিছুটা। আর আমার খাদিম পাশে বসে আগুন জ্বালিয়ে রাখত। অবশেষে ফজরের সময় এল। আমি সেভাবেই বসে আছি মুতালাআয় ধ্যানমগ্ন হয়ে। পুরো রাতে কেবল ফরজ নামাজ ও খাবার খাওয়ার জন্য উঠেছি, এই যা। যখন সূর্য পূর্ণ উদিত হলো, তখন আমি মুতালাআ থেকে অবসর হলাম। আমার অস্পষ্টতাও দূর হলো। এবারের অধ্যয়নে আমি অন্য সময়ের মতো বুঝ ও স্পষ্টতা অনুভব করলাম। মুতালাআ শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। খাদিমকে

বলে দিলাম, সেদিন যেন আমাকে দরসের জন্য না জাগায়। কেননা, সেদিনের জন্য যা অর্জন করেছি, তা-ই যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া রাতের অনিদ্রার ক্লান্তিও দূর করার প্রয়োজন ছিল।" মাসআলা সমাধান করতে তিনি পুরো রাত জেগে মুতালাআয় কাটালেন। অস্পষ্টতার রেশ কেটে গেল কিতাবের জটিল শব্দ তাঁর সামনে তার ডানা মেলে আত্মসমর্পণ করল।'

* আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি বাগদাদি ﵀। বয়স যখন বিশ বছরও পূর্ণ হয়নি, তখন 'তাফসিরুল কুরআনিল আজিম' অধ্যয়নে মগ্ন হন তিনি। সে সময়ের কথা উদ্ধৃত করে তিনি বলেন :

'সকল অনুগ্রহ আল্লাহ তাআলার জন্য, যখন থেকে আমার তাবিজ-কবজ খুলে নিয়ে আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো, তখন থেকে আমি সব সময় এই কিতাবের রহস্য উন্মোচনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আগ্রহী হয়ে উঠি তার মোহরকৃত অমৃত সুধা পানে। অনেক সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যে, এ কিতাবের অমূল্য রতন সংগ্রহে নিজের ঘুম পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছি। কিতাবের মণিমুক্তো সংগ্রহে বিসর্জন দিয়েছি নিজ কওমকে। তুমি যদি আমাকে সে সময় দেখতে, যখন আমি রাতজাগরণে ঘুমের কারণে নিজের কপাল কিতাবের ওপর ফেলে কিতাবের সাথে মুসাফাহা কীভাবে করেছিলাম! কোনো দিন মোমবাতি নিভে গেলে, জ্বালানোর মতো মোমবাতি না থাকলে রাতের আকাশের চাঁদের আলোয় মুতালাআ করতে থাকতাম। মাসের অনেক রাতেই এমনটা হতো।

সে সময় আমার বয়সী ছেলেদের অনর্থক কথা ও কাজে লিপ্ত দেখতাম। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে দম্ভভরে চলত তারা। মিথ্যা গর্ব-অহংকারে তারা বুক ফুলিয়ে চলত। রুহের খোরাকের বদলে দেহের আনন্দ ও প্রফুল্লতাকে প্রাধান্য দিত। ডুবে থাকত আনন্দ-ফূর্তিতে। ঘৃণ্য-নীচ প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পেছনে জলাঞ্জলি দিত নিজেদের মূল্যবান সময়গুলোকে। আর আমি নবীন এক ছেলে। রক্ত টগবগে এক তরুণ। যার সবরে সংকীর্ণতা থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড, ঘোরাফেরা, খেলাধুলা, আড্ডা ও গল্পের আসর আমার মনে ঈর্ষা জাগায়নি। তাদের এ অবস্থা আমায় ধোঁকা দিতে পারেনি।'

আলিমদের মজলিসে অংশগ্রহণ

এই উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত যে, তিনি নেককার সালাফের হৃদয়ে ইলমের প্রতি আকর্ষণ এবং ইলমের মজলিসে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন। যাতে তাদের মাধ্যমে দ্বীন হিফাজতে থাকে। যেন তারা পরবর্তী উম্মাহর জন্য আদর্শ হতে পারেন। আর এভাবেই তারা দ্বীনের নেতৃত্বের আসনে নিজেদের সমাসীন করেছিলেন।

তারা ইলমের মজলিসে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। জাফর বিন দারাসতুওয়াহি ﵀ বলেন, 'আমরা আলি বিন মাদিনি ﵀-এর মজলিসে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে একদিন আগে আসরের সময় আসন গ্রহণ করতাম। সে প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম সারা রাত। কারণ, আশঙ্কা ছিল, পরের দিন এমন যুৎসই স্থান পাব না, যেখান থেকে হাদিস শোনা যাবে। আমি সে মজলিসে একজন বৃদ্ধ লোককেও দেখলাম, তিনি চাদরে পেশাব করে তা লুকিয়ে রেখেছেন। এ আশঙ্কায় যে, পেশাব করার জন্য উঠে গেলে নিজের বসার স্থানটুকু ছুটে যাবে।'

ইয়াহইয়া বিন হাসসান ﵀ বলেন, 'আমরা সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﵀-নিকট ছিলাম। তিনি হাদিস বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় একদল মানুষ এক দুর্বল বৃদ্ধের দোকানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যেন তারা তার দোকান লুট করে নিচ্ছিল। এ ভিড়ের মধ্যে বৃদ্ধের হাতে আঘাত লাগল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "সুফইয়ান, তারা আমার সাথে যা করেছে, তার দায় তোমাকে দিতে হবে।" কিন্তু সুফইয়ান ﵀ তার কথা শুনতে পাননি বিধায় যারা বৃদ্ধ লোকটির সাথে এমন করেছে, তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটি কী বলল?" জবাব এল, তিনি বলেছেন, "হাদিস শ্রবণে আমাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।"'

ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে পড়েই হুশাইম ﵀ মৃত্যুবরণ করেন। খাত্তাবি ﵀ বলেন, 'হুশাইম হাদিসের ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে গাধার পিঠ থেকে নিচে পড়ে যান। আর এটিই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

আবু বকর বিন খাইয়াত নাহবি ﵀ দিনের পুরোটা সময় পড়তেন। এমনকি রাস্তাঘাটেও তার পড়া অব্যাহত থাকত। পড়ার সময় অন্য কোনো দিকে খেয়াল

থাকত না বিধায় অনেক সময় তিনি গর্তে পড়ে যেতেন অথবা কোনো বাহনের সাথে ধাক্কা খেতেন নিজের অজান্তে।

সালাবাহ ﷺ বলেন, 'কিতাব থেকে কখনোই তিনি পৃথক হতেন না। কেউ তাকে দাওয়াত দিলে তিনি শর্ত করতেন, হেলান দেওয়ার তাকিয়াটা বড় থাকতে হবে, যাতে কিতাব রেখে পড়তে পারেন তিনি।'

কী ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ? একদা তিনি জুমআর মসজিদ থেকে বের হলেন। আসরের পরের সময়। এমনিতে এর কয়েক দিন আগ থেকেই বধিরতায় আক্রান্ত তিনি। বহু কষ্টে কিছুটা হয়তো শুনতে পেতেন। মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তখনও তাঁর হাতে একটি কিতাব ছিল। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কিতাবটি দেখছিলেন তিনি। এমনই সময় একটি ঘোড়া এসে তাঁকে আঘাত করে। তিনি গর্তে পড়ে যান। তাঁকে গর্ত থেকে বের করা হয়। তাঁর শরীরে গর্তের ময়লা লেপ্টে ছিল। সে অবস্থায় তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হয়। তিনি আর্তনাদ করতে থাকেন মাথার যন্ত্রণায়। এর পরের দিন তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ইমাম বাকি বিন মাখলাদ আন্দালুসি ﷺ। সুদূর স্পেন থেকে বাগদাদে এসেছেন পায়ে হেঁটে। উদ্দেশ্য—ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর থেকে ইলম অর্জন করবেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'যখন আমি বাগদাদের নিকটবর্তী হলাম, আমার কাছে ইমাম আহমাদ ﷺ-এর বিপদের খবর পৌঁছাল। আমি জানতে পারলাম, তাঁর কাছে ছাত্রদের একত্র হওয়া এবং তাঁর থেকে হাদিস শ্রবণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এতে আমি খুবই চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়লাম। একটি হোটেলে ভাড়া থাকতে লাগলাম। সেখানে নিজের জিনিসপত্র রাখার পর শুধু স্থানীয় জুমআর বড় মসজিদে যাতায়াত করতাম। ভিন্ন কোনো জিনিসের দিকে কখনো মনোযোগ দিতাম না। একদিন মানুষের সাথে বসে তাদের আলোচনা শোনার মনস্থ করলাম। আমি অত্যন্ত চমৎকার একটি পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, রিজাল শাস্ত্র নিয়ে খুব সুন্দর আলোচনা করছেন। তিনি দুর্বল ও শক্তিশালী রাবির বর্ণনা দিচ্ছেন। আমি আমার পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে উনি?" সে বলল, "ইনি হলেন ইয়াহইয়া বিন মুইন।"

আমি দেখলাম, তাঁর পাশে কিছু জায়গা খালি হয়েছে। তাই আমি উঠে তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, "হে আবু জাকারিয়া, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আমি একজন দূরের মানুষ, মুসাফির। আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি গোপন করবেন না!" তিনি বললেন, "বলো।" আমি মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছি, সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি তার কিছু পরিষ্কার করে দিলেন এবং কিছুর ব্যাপারে জারহ করলেন।

আমি সর্বশেষ তাঁকে হিশাম বিন আম্মারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। কারণ, আমি তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তিনি বলেন, "আবুল ওয়ালিদ হিশাম বিন আম্মার অধিক পরিমাণ সালাত আদায়কারী এবং সিকাহ পর্যায়ের সর্বোচ্চ রাবি। যদি তাঁর চাদরের নিচে অহংকার থেকে থাকে বা সে অহমিকাকে মালা বানিয়ে নিয়ে থাকে, তবে তাঁর কল্যাণ ও মর্যাদায় তা কোনো আঘাত করতে পারবে না।" পাঠচক্র চিৎকার করে উঠে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। অন্যদেরও প্রশ্ন আছে, তাদের জায়গা করে দাও।"

আমি সেখান থেকে না নড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "একজন লোকের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কামনা করছি। তিনি হলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল।" এ কথা শুনে ইয়াহইয়া বিন মুইন আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, "আমাদের মতো লোকেরা আহমাদ বিন হাম্বল সম্পর্কে মন্তব্য করবে! তিনি হলেন মুসলিমদের ইমাম। মুসলিমদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষ।"

এরপর আমি মানুষের কাছে আহমাদ ﷺ-এর ঘরের সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। লোকজন আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। আমি গিয়ে তাঁর দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন, আমি অপরিচিত এক লোক। আমি বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আমি ভিনদেশি এক লোক। এ শহরে আমি প্রথমবার এসেছি। আমি হাদিসের ছাত্র। "জামিউস সুন্নাহ" কিতাবটি আয়ত্ত করতে চাচ্ছি। শুধু আপনাকে উদ্দেশ্য করেই আমার এ সফর।" তিনি বললেন, "স্তম্ভের আড়ালে চলে এসো। কোনো গোয়েন্দা যাতে দেখতে না পায়।"

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দেশ কোথায়?"

: পশ্চিমের সর্বশেষ।

: আফ্রিকা?

: আরও দূরে, আমি নিজ দেশ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আফ্রিকায় আসি। আমার দেশ স্পেন।

: তোমার দেশ অনেক দূরে। আর তোমার মতো অন্বেষীদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা অনেক প্রিয় আমার নিকট। তবে আমি এখন যে বিপদে রয়েছি, তা সম্ভবত তুমি অবহিত রয়েছ।

: জি, আমার কাছে সে সংবাদ পৌঁছেছে। আমি আপনার শহরের পাশেই আপনার অপেক্ষায় আছি।

আমি আবার বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, এ শহরে আমার প্রথম আসা। আমি আপনাদের কাছে পরিচিত কেউ নই। যদি আপনি আমাকে অনুমতি দেন, তবে আমি ভিক্ষুকের বেশে আসব। ভিক্ষুকরা যেভাবে ভিক্ষা চায়, আমিও সেভাবে আপনার দরজায় এসে বলব। আপনি তখন বেরিয়ে আসবেন। প্রতিদিন একটি করে হাদিস শেখা হলেও আমার জন্য যথেষ্ট হবে।" তিনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তবে একটি শর্ত আছে। বিষয়টি কাউকে জানাতে পারবে না। হাদিসের ছাত্ররাও যেন জানতে না পারে।" আমি বললাম, "আপনার শর্ত মোতাবেকই কাজ হবে।"

প্রতিদিন আমি হাতে একটি লাঠি নিয়ে মাথায় কাপড় প্যাঁচিয়ে নিতাম। খাতা-কলম লুকিয়ে নিতাম জামার আস্তিনে। এরপর তাঁর দরজায় এসে চিৎকার করে বলতাম, "আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। আমাকে কিছু দিন।" সে শহরে এভাবেই ভিক্ষা চাওয়া হতো। আমার আওয়াজ শুনে আহমাদ ﵀ বের হয়ে আসতেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। দুটি, তিনটি বা কখনো এর চেয়েও বেশি হাদিস বর্ণনা করতেন।

যতদিন না ইমাম আহমাদ ﵀-এর ওপর কঠোরতা আরোপকারী সে শাসক মারা গেল, এভাবেই চলতে থাকল। আহলুস সুন্নাহর নতুন শাসক নিযুক্ত হলো। আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ জনসম্মুখে আসলেন। তাঁর আলোচনা ছড়িয়ে

পড়ল মানুষের মুখে মুখে। সবার চোখে তিনি হয়ে গেলেন মহান ব্যক্তি। তাঁর ইমামতও উন্নত হলো। তাঁকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হতো উটের বাহুর সাথে। তিনি আমার সবরের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

যখন আমি তাঁর পাঠচক্রে আসতাম, তিনি আমার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিতেন; আমাকে নিজের পাশেই বসাতেন। অন্যান্য হাদিস শিক্ষাকারীকে বলতেন, "এ লোকটিকে উপাধি দেওয়া যায়—তালিবুল ইলম।" এরপর তিনি বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি আমাকে হাদিস শেখাতে থাকেন এবং আমার সামনে হাদিস পাঠ করতে থাকেন। আমিও তাঁকে পাঠ করে শোনাতে থাকি। আমি প্রশ্ন তুলতাম আর তিনি উত্তর দিতেন। একদিন তিনি আমাকে কোনো এক পাঠচক্রে অনুপস্থিত দেখলেন। তখন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আমার অসুস্থতার ব্যাপারটি জানতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের সাথিদের নিয়ে আমাকে দেখতে চলে এলেন। আমি তখন আমার ভাড়া করা ঘরে শায়িত ছিলাম। আমার গদি ছিল পায়ের নিচে—কাপড় ছিল গায়ে। আর মাথার কাছেই ছিল আমার কিতাবগুলো। হঠাৎ হোটেলের অধিবাসীদের শোরগোল শুনতে পেলাম। তারা বলছিল, "ইনিই তিনি, তোমরা তাকিয়ে দেখো। মুসলিমদের ইমাম আসছেন।" হোটেলমালিক দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল, "আবু আব্দুর রহমান, মুসলিমদের ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ তোমায় দেখতে আসছেন।"

তিনি এসে আমার মাথার কাছে বসলেন। পুরো ঘরটি তখন তাঁর ছাত্রদের দ্বারা ভরে গেল। ঘরে স্থানসংকুলান হচ্ছিল না। তাই তাদের অনেককে দরজায়, অনেককে দরজার বাইরে দাঁড়াতে হলো। সবাই কলম হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শুধু এ কথাগুলো বললেন, "হে আবু আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাআলার দেওয়া প্রতিদানের ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ করো। সুস্থতার সময় অসুস্থতা থাকে না। অসুস্থতার সময় সুস্থতা থাকে না। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুস্থতার নিয়ামত দান করুন। শিফার হাতে তোমাকে স্পর্শ করুন।" আমি দেখলাম, ছাত্রদের কলম ততক্ষণে তাঁর কথাগুলো টুকে নিয়েছে।

এরপর তিনি বের হয়ে গেলেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ আমার কাছে ছুটে আসলো। কোমলতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল। নিজেদের তারা খুব ছোট ও

তুচ্ছ জ্ঞান করে আমার সেবা করতে শুরু করল। তাদের কেউ বিছানা নিয়ে এল। কেউ এল লেপ নিয়ে। কেউ আবার হরেক রকমের ভালো ভালো খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের মাঝে আমার অসুস্থ হয়ে পড়া নিজ পরিবারের অসুস্থতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ, তারা নেককার লোকের সেবা-শুশ্রূষা করতে চাচ্ছিল।'

বাকি বিন মাখলাদ স্পেনে ২৭৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

* অনেক হাফিজে হাদিস শাইখদের সাথে সাক্ষাৎ করতে ও ইলম অর্জন করতে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন। এমনকি শাইখ আবু সাদ আব্দুল কারিম সামআনি মারুজি ﷺ-এর উসতাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত হাজার। বহু দেশ সফর করেছেন তিনি। রচনা করেছেন 'মুজামুল বুলদান' নামক অমূল্য গ্রন্থটি। এসব শহরে তিনি হাদিস শিখতে গিয়েছিলেন। তিনি নিজ শাইখদের নিয়ে দশ ভলিয়মে তৈরি করেছেন 'মুজামুশ শুয়ুখ'।

কাসিম বিন দাউদ আল-বাগদাদি ﷺ বলেন, 'আমি ছয় হাজার শাইখ থেকে হাদিস লিখেছি।' হাফিজ ইবনে আসাকির ﷺ-এর উসতাজের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশ। তাঁর মহিলা উসতাজ ছিলেন আশিরও অধিক।

জাইদ বিন সাবিত ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখন ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন :

'হে লোকসকল, যে জানতে চায় যে, কীভাবে ইলম উঠে যাবে, সে যেন জেনে নেয়, এভাবেই ইলম উঠে যায়। আল্লাহর শপথ, আজ অনেক ইলম উঠে গেছে। এমন মানুষ চলে গেলেন, যিনি এমন অনেক কিছু জানেন—যা অন্যরা জানে না। তাঁর সাথে যা ছিল, তাও চলে গেছে।'

তিনি জাইদ ﷺ-এর কবরের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আজ অনেক ইলম কবরে দাফন হয়ে গেছে।'

ইয়াহইয়া বিন কাসিম ﷺ বলেন, 'ইবনে সুকাইনা ﷺ ছিলেন ইলম অনুযায়ী আমলকারী একজন আলিম। এতটুকু সময়ও তিনি নষ্ট হতে দিতেন না। যখন

আমরা তার কাছে প্রবেশ করতাম, তিনি বলতেন, “তোমরা আমাকে বেশি বেশি সালাম দিয়ো না।” কেননা, তিনি খুব গবেষণা ও বিধিবিধান আলোচনা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। আর প্রত্যেকে সালাম দিতে থাকলে তাঁর আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটত।

ইলম অর্জনে সময়ের মূল্যায়ন

শুবা বিন হাজ্জাজ ﵀ খালিদ আল-হিজা ﵀-এর নিকট এসে বললেন :

‘হে মর্যাদাশীল ব্যক্তি, আপনার কাছে কি এমন কোনো হাদিস আছে, যা আমার কাছে বর্ণনা করবেন?’ খালিদ ﵀ তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি বললেন, ‘আমি তো অসুস্থ।’ শুবা ﵀ বললেন, ‘শুধু একটি বলুন।’ খালিদ ﵀ তার অনুরোধে একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। হাদিসটি শোনা শেষ হলে শুবা ﵀ বললেন, ‘ইচ্ছা করলে এবার মারা যেতে পারেন।’

ইয়াহইয়া বিন মুইন ﵀ শাইখদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের কাছ থেকে ইলম অর্জন ও শ্রবণের ব্যাপারে ছিলেন প্রবল আগ্রহী। কারণ, তিনি আশঙ্কা করতেন যে, ইলমের এসব মহিরুহ পরপারে চলে গেলে ইলম অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আবদ বিন হুমাইদ ﵀ বলেন, ‘ইয়াহইয়া বিন মুইন আমার কাছে বসে প্রথমে একটি হাদিস নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, “আমার কাছে হাদিসটি হাম্মাদ বিন সালামা বর্ণনা করেছেন।” ইয়াহইয়া বললেন, “যদি আপনার কিতাব থেকে হতো?” আমি কিতাব আনতে উঠে গেলাম। তিনি আমার কাপড় টেনে ধরে বললেন, “আপনি আমাকে হাদিসটি লিখিয়ে দিন। কারণ, আমার ভয় হচ্ছে, যদি কিতাব আনতে আনতেই আপনার মৃত্যু হয়ে যায়!” আমি তাকে হাদিসটি লিখিয়ে দিলাম। এরপর কিতাব বের করে এনে পাঠ করতে লাগলাম।’

ইবনে ইসহাক ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি মাকহুলকে বলতে শুনেছি, “ইলম অর্জনে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি।”’

আবু ওয়াহাব বর্ণনা করেন, ‘মাকহুল ﵀ বলেন, “আমি মিশরে আজাদ হয়েছি। আমার দেখামতে সেখানে যে ইলমই ছিল, তা আয়ত্ত করেছি। এরপর ইরাকে

আসলাম। তারপর মদিনায়। এ দুই স্থানেও আমার দেখা সব ইলম আমি আয়ত্ত করেছি। তারপর শামে গেলাম। শামের ইলমগুলো ছেঁকে নিলাম।" এটি ছিল তাঁর বিচক্ষণতা এবং সময়ের ব্যাপারে যত্নশীলতা। দরস শুরুর আগেই দৌড়ে গিয়ে শাইখ ও উসতাজের কাছে চলে যেতে চাইতেন তিনি। কারণ, তাঁর ভয় ছিল, রাবিকে নাও পেতে পারেন, তার যাওয়ার আগেই যদি শাইখ মারা যান!'[২৬৩]

ইলমি আলোচনায় উচ্চ মনোবলের পরিচয়

ইবরাহিম নাখয়ি ﵀ বলেন, 'যে হাদিস মুখস্থ করতে আনন্দ পায়, সে যেন অন্যের কাছে বর্ণনা করে। যদিও এমন ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করতে হয়, যে শ্রবণে আগ্রহী নয়। কেননা, পুনঃপুন বর্ণনা করলে তার হৃদয়ে হাদিসটি লিখিত হয়ে যাবে।'

ইবনে শিহাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, 'তিনি উরওয়াহ ﵀ ও অন্য শাইখদের কাছ থেকে ইলম শিখতেন। এরপর বাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত বাঁদিকে জাগিয়ে তুলতেন এবং বলতেন, "শোনো, আমার কাছে অমুক এমন বর্ণনা করেছেন এবং অমুক এমন বর্ণনা করেছেন।" তখন বাঁদি বলত, "আমার সাথে এই হাদিসের সম্পর্ক কী?" তিনি বলতেন, "আমি জানি, তুমি এ থেকে উপকৃত হতে পারবে না। কিন্তু আমি এইমাত্র তা শ্রবণ করেছি। স্মৃতিপটে অঙ্কিত করার জন্যই তোমাকে শোনাচ্ছি।"'

জিয়াদ বিন সাদ ﵀ বলেন, 'আমরা জুহরির সাথে তাঁর উপত্যকা অঞ্চলে গেলাম। তিনি সেখানে বেদুইনদের একত্র করে তাদের হাদিস শোনাতেন, যাতে নিজের মুখস্থ হয়ে যায়।'

সালাফের কেউ কেউ নিজে নিজের সাথে ইলমের মুজাকারা করতেন। তাদের আশপাশে থাকলে তুমি দেখতে পেতে, তারা একা একা বসে উচ্চ আওয়াজে পাঠ মুখস্থ করছেন। জাফর বিন মুরাগি ﵀ বলেন, 'আমি তুসতারে একটি

....

২৬৩. ইলম অর্জনের পথে এটি ছিল সুভাষিত নিয়মকানুনের একটি। যা পরবর্তী সময়ে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাইন ﵀ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'যখন তুমি লিখবে, তখন পুরোটা লিখবে, কিছু যেন না ছুটে। আর যখন হাদিস বলবে, তখন অনুসন্ধান করে বলবে।'

কবরস্থানে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ সেখানে একটি উচ্চ আওয়াজ শুনতে পেলাম, "আর আমাশ আবি সালিহ থেকে, তিনি আবি হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেন। আর আমাশ আবি সালিহ থেকে, তিনি আবি হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেন।" কেউ একজন এ বাক্যগুলো আওড়াচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ যাবৎ। আমি আওয়াজের অনুসন্ধান করতে থাকলাম। সামনে গিয়ে দেখি ইবনে জুহাইর। আমাশ ﷺ-এর সূত্রের হাদিসটি মুখস্থ রাখার জন্য নিজে নিজে পাঠ করছিলেন তিনি।'

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'সুফইয়ান সাওরি ﷺ আমাদের নিকট এক রাত অবস্থান করলেন। রাতে ঘুমের ঘোরে কুরআন পাঠ করতে শুনলাম তাঁকে। এরপর তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন। কিছুক্ষণ সালাত আদায় করে এরপর বসে বসে বলতে লাগলেন, "আল-আমাশ, আল-আমাশ, আল-আমাশ, ওয়া মানসুর, ওয়া মানসুর, ওয়া মানসুর, ওয়াল মুগিরা, ওয়াল মুগিরা, ওয়াল মুগিরা।" আমি তাঁকে বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, এটি কী?" তিনি বললেন, "প্রথমটি ছিল আমার সালাতের কিছু অংশ এবং দ্বিতীয়টি ছিল আমার হাদিসের কিছু অংশ।"'

কুতুব আল-ইউনিনি ﷺ ইমাম নববি ﷺ সম্পর্কে বলেন, 'দিনরাত এমন কোনো সময় ছিল না, যখন তিনি ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। এমনকি রাস্তায় আসা-যাওয়ার সময়ও তিনি আগের মুখস্থ কোনো ইলম পুনঃপুন পড়া অথবা মুতালাআ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে তিনি ছয় বছর অতিবাহিত করেছেন।'

ইমাম নববি ﷺ-এর ছাত্র জীবনের শুরুর সময়ের কথা। দৈনিক বিভিন্ন শাইখের কাছে বারোটি দরস পড়তেন শুদ্ধভাবে ও ব্যাখ্যা সহকারে। দুটি দরস ছিল "ওয়াসিত" কিতাবের। তৃতীয়টি "মুহাজ্জাব", চতুর্থটি "আল-জামউ বাইনাস সহিহাইন", পঞ্চমটি "সহিহু মুসলিম" ষষ্ঠটি নাহুবিষয়ক ইবনে জানা রচিত "আল-লামা"। এরপর ভাষাবিষয়ক ইবনুস সিক্কিত রচিত "ইসলাহুল মানতিক"। সরফ বিষয়ে একটি দরস পাঠ করতেন। উসুলে ফিকহ নিয়ে একটি দরস পাঠ করতেন। কখনো কখনো আবু ইসহাকের "আল-লামা" কিতাবটি পাঠ করতেন। আবার কখনো ফখরুদ্দিন রাজির "আল-মুনতাখাব" পাঠ করতেন। আসমাউর রিজাল নিয়েও একটি দরস পড়তেন। আরেকটি দরস ছিল উসুলুদ্দিন তথা তাওহিদ বিষয়ে। ইমাম নববি ﷺ বলেন, "আমি

এসব পাঠের সকল কঠিন স্থানের ব্যাখ্যা, ইবারত স্পষ্ট করা, ভাষা আয়ত্ত করার জন্য টীকা সংযুক্ত করেছি। আল্লাহ তাআলা আমার সময় ও কর্মে বরকত দান করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন।'"

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর হাম্বলি ﷺ ইবনে কুদামার 'আল-মুগনি' কিতাবটি তেইশবার মুতালাআ করেছেন। ফলে পূর্ণ কিতাবটি যেন তাঁর মস্তিষ্কে ছেপে গিয়েছিল।

ইলম মুখস্থকরণে উচ্চ মনোবলের বহিঃপ্রকাশ

আবু জুরআ বলেন, 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর দশ লক্ষ হাদিস মুখস্থ ছিল।'[২৬৪] তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীভাবে পারলেন আপনি?' তিনি বললেন, 'আমি সেগুলো মুখস্থ করেছি এবং সেগুলো অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।'

সুলাইমান বিন শুবা ﷺ বলেন, 'হাদিসের ছাত্ররা ইমাম আবু দাউদ ﷺ-থেকে চল্লিশ হাজার হাদিস লিখে নিয়েছে। অথচ তাঁর কাছে কোনো কিতাব ছিল না। তিনি মুখস্থ সব বলেছিলেন।'

আবু জুরআ আর-রাজি ﷺ বলেন, 'আমি দুই লক্ষ হাদিস মুখস্থ করেছি, এমনভাবে মুখস্থ আমার, যেমন মানুষের সুরা ইখলাস মুখস্থ। আমার স্মৃতিতে রয়েছে তিন লক্ষ হাদিস।'

হিশাম আল-কালবি ﷺ বলেন, 'আমি এমনভাবে মুখস্থ করেছি, যেভাবে অন্য কেউ করেনি। আমি এমন কিছু ভুলে গিয়েছিলাম, যা কেউ ভুলে না। আমার এক চাচা আমার কুরআন হিফজ নিয়ে আমাকে তিরস্কার করেন। আমি একটি ঘরে ঢুকে শপথ করলাম, কুরআন হিফজ শেষ না করা পর্যন্ত সে ঘর থেকে বের হব না। অবশেষে তিন দিনে কুরআন হিফজ সম্পন্ন করলাম আমি।'

আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ বিন আদি হাফিজ ﷺ বলেন, 'আমি অনেক শাইখকে বর্ণনা করতে শুনেছি, "মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি ﷺ বাগদাদে আগমন করলেন। মুহাদ্দিসগণ তা জানতে পেরে সবাই তাঁর কাছে জড়ো

....

২৬৪. সনদ ও মতনের ভিন্নতায়।

হলেন। তারা একশটি হাদিস দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তাই তারা হাদিসগুলোর মতন ও সনদের মাঝে গরমিল করে দিলেন—এক মতনের সনদ অন্য মতনের সাথে এবং এক সনদের মতনকে অন্য সনদের সাথে লাগিয়ে দিলেন। প্রত্যেকে দশটি করে হাদিস ভাগ করে নিলেন। যেন সবাই ইমাম বুখারি ﷺ-কে প্রশ্ন করতে পারেন। লোকজন জড়ো হলো। তখন মুহাদ্দিসদের একজন উঠে দাঁড়ালেন। তার দশটি হাদিসের একটির ব্যাপারে ইমাম বুখারি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমি এই হাদিস জানি না।" পরে অন্য একটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলেও তিনি বললেন, "আমি এটি জানি না।" এভাবে একজন নিজের দশটি শেষ করল।

উপস্থিত আলিমগণ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। বললেন, "লোকটি আসল ব্যাপার টের পেয়ে গেছে।" কিন্তু যারা বিষয়টি বুঝতে পারেননি, তারা মনে করেছেন, ইমাম বুখারি দুর্বল। এরপর আরেকজন উঠে দাঁড়ালেন এবং সেও প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ করলেন। ইমাম বুখারি ﷺ বললেন, "আমি এটি জানি না।" এভাবে দশজনের সবাই তাদের প্রশ্ন করলেন। আর বুখারি ﷺ উত্তরে শুধু বলে গেছেন, "আমি এটি জানি না।"

যখন তিনি বুঝতে পারলেন, তাদের প্রশ্নের ঝুলি খালি হয়ে গেছে। তখন তিনি প্রথম জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার প্রথম হাদিসটি এ রকম, দ্বিতীয়টি এ রকম আর তৃতীয়টি এ রকম।" এভাবে দশটির দশটিরই উত্তর দিয়ে দিলেন। প্রতিটি মতনকে আসল সনদের সাথে যুক্ত করে দিলেন। এভাবে অন্যদেরও একইভাবে উত্তর দিলেন। মানুষ তাঁর মুখস্থের স্বীকৃতি দিলেন অকপটে। এ জন্যই ইবনে সাইদ তাঁর কথা আলোচনাকালে বলতেন, "জেদি মেষ।" অর্থাৎ যে লোকটি তর্ক-বিতর্ক আলোচনায় বিজয়ী হয়।'

ইবনুন নাজ্জার ﷺ বলেন, 'আমাদের শাইখ আব্দুল ওয়াহাব বিন আমিন-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "একদা আমি, হাফিজ ইবনে আসাকির ও আবু সাআদ বিন সামআনি একত্রে ছিলাম। আমরা হাদিসের অনুসন্ধানে শাইখদের সাথে সাক্ষাৎ প্রত্যাশা নিয়ে ঘুরছিলাম। আমরা এক শাইখের দেখা পেলাম। ইবনে সামআনি তাঁকে দাঁড়াতে বললেন, যেন তাঁর কাছে তাঁর সনদে নিজের এলাকায় যে হাদিস শুনেছিলেন, তা পাঠ করতে পারেন। কিন্তু সে শাইখের

সময় না পেয়ে ইবনে সামআনি ব্যথিত হলেন। তখন ইবনে আসাকির ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তাঁর মাধ্যমে শ্রুত অংশটি কী ছিল?” তিনি বললেন, “ইবনে আবু দাউদের “আল-বাসু ওয়ান নুশুর” অংশটি।” তিনি তা আবু নসর আজ-জাইনাবি থেকে শ্রবণ করেছিলেন। ইবনে আসাকির বললেন, “আপনি চিন্তা করবেন না।” এরপর তিনি নিজ মুখস্থ থেকে তা পূর্ণ পাঠ করে দিলেন বা কিছু অংশ পাঠ করে দিলেন। ইবনে নাজ্জার বলেন, “সন্দেহটা ছিল আমাদের শাইখ থেকে।”'

ইবনে আমিদ বলেন, 'দুনিয়াতে আমার নেতৃত্বের আসনই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। একদিন আমি তাবারানি ও আবু বকর জাআবি ﷺ-এর পারস্পরিক আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম। ইমাম তাবারানি অধিক হাদিস মুখস্থের কারণে আবু বকরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবু বকর তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। একসময় তাঁদের পারস্পরিক কথাবার্তায় উভয়ের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। একপর্যায়ে জাআবি ﷺ বলেন, “আমার কাছে এমন একটি হাদিস আছে, যা দুনিয়ার কারও কাছে নেই।” তখন তাবারানি বললেন, “সেটি বলো।” তিনি বললেন, “আবু খলিফা বর্ণনা করেন, সুলাইমান বিন আইয়ুব বর্ণনা করেছেন।...” জাআবি হাদিসটি বললেন। তখন তাবারানি বললেন, “সুলাইমান বিন আইয়ুব আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আর আবু খলিফা আমার কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং আমার কাছ থেকে আরও শক্তিশালী সূত্রে এ হাদিস শুনে নাও।” এ কথায় জাআবি লজ্জিত এবং পরাজিত হলেন। এতদিন আমার কাছে আমার নেতৃত্বের আসনটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল। কিন্তু তখন আমি মনে মনে আশা করতে থাকলাম, নেতৃত্ব নয়; বরং আমি যদি তাবারানি হতাম! তবে তাঁর মতো আনন্দ পেতে পারতাম, যা এ নেতৃত্বের আসনে নেই।'

* মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-ওয়ায়িজ বলেন, 'আবু বকর বিন বাগিন্দি সালাতের ইমামতিতে দাঁড়ালেন। তাকবির দিয়ে কিরাতের জায়গায় বলতে লাগলেন, “আমার কাছে মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান লাইয়ুন বর্ণনা করেছেন।...” তখন আমরা সুবহানাল্লাহ বলে লোকমা দিলাম। এরপর তিনি কিরাত পড়তে লাগলেন :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...)'

তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমার কাছে হাদিসকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নযোগে রাসুল ﷺ-কে দেখলাম। কিন্তু আমি তাঁকে বলিনি, "আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।" বরং আমি বলেছি, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, হাদিসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী কে? মানসুর নাকি আমাশ?" তিনি আমাকে বললেন, "মানসুর, মানসুর।"' ইবনে কাসির ؒ বলেন, 'তিনি অনেক সময় সালাতে নিজের অজান্তেই সনদসহ হাদিস পাঠ করে বসতেন আবার ঘুমের ঘোরেও পাঠ করতে থাকতেন।'

* ইয়াহইয়া বিন হিলাল বিন মাতার ؒ প্রত্যহ জোহর থেকে রাত পর্যন্ত 'আল-মুদাওয়ানাহ' শোনানোর জন্য বসতেন। তাঁর এ পাঠদান প্রতিমাসে চলত।

'আল-মুহাজ্জাব' কিতাবের লেখক ইমাম আবু ইসহাক আস-সিরাজি ؒ বলেন, 'আমি প্রতিটি পাঠ একশ বার পুনরাবৃত্তি করতাম। যখন কোথাও দলিল হিসেবে কোনো কবিতার আংশিক উল্লেখ করা হতো, তখন আমি তা মূল থেকে বোঝার জন্য পুরো কবিতাটি মুখস্থ করে নিতাম।'

* ইমাম জাহাবি ؒ বলেন, 'আমি শাইখ তাকি উদ্দিন আবুল আব্বাসকে বলতে শুনেছি, শাইখ ইবনে মালিক ؒ বলতেন, "শাইখ আল-মাজদের জন্য ফিকহকে কোমল করে দেওয়া হয়েছে, যেমন দাউদ ؑ-এর জন্য লোহাকে কোমল করে দেওয়া হয়েছিল।" শাইখ বলেন, "আমার দাদার মাঝে ছিল খুব প্রখরতা। একদিন এক শাইখের কাছে গেলে তার সামনে একটি মাসআলা উত্থাপন করা হলো। তখন তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে আমার কাছে ষাট রকমের উত্তর রয়েছে। প্রথমটি এমন, দ্বিতীয়টি এমন।" এভাবে তিনি সব বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "সবগুলো উত্তর আপনাকে বলতে পেরে সন্তুষ্টি অনুভব করছি।" তখন সে শাইখ তাঁর প্রতি বিনয়ী হলেন এবং তাঁর ইলম দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন।'

শাইখ তাকি উদ্দিন ؒ বলেন, 'আমরা তাঁকে হাদিসের মতন ও মাজহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর মানুষ হিসেবে পেয়েছি। তেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের খিদমত করতে তাঁর সাথে ইরাক সফর করেন। রাতের

বেলা তাঁর সাথেই থাকতেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাইকে ইখতিলাফের মাসআলাসমূহ বারবার পড়তে দেখতেন। সেগুলো শুনে তিনিও মুখস্থ করে নিতেন।'

শাইখ আহমাদ বিন হাসান বিন আনু শিরওয়ান রুমি হানাফি ﵀ (৬৫২-৭৪৫ হি.) প্রত্যেক দিনের দরস থেকে তিনশ লাইন মুখস্থ করতেন। তিনি সত্তরের অধিক বয়স পর্যন্ত দামেস্কে দরস প্রদান করেছেন।

* আবু সালিহ আইয়ুব বিন সুলাইমান 'আল-আরুজ' কিতাবটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। এমনকি কিতাবটি মুখস্থ করে ফেললেন। এক লোক এত বৃদ্ধ বয়সে এই ইলমের মাঠে পদচারণার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আমি কতক লোকের কাছে উপস্থিত হলে শুনলাম, তারা এই বিষয়ে কথা বলছিল। কিন্তু আমার আত্মসম্মানে লাগল যে, আমি ইলমের একটি বিষয়ে কথা বলতে পারব না। তাই এটি মুখস্থ করে নিলাম।'

কিতাবের প্রতি অনন্য ভালোবাসা

কিতাবের প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন আলিমগণ। কিতাবের সাথে ছিল তাদের মজবুত সম্পর্ক। তাই সব সময় কিতাব মুতালাআয় নিমগ্ন থাকতেন তারা।

মুবাররিদ ﵀ বলেন, 'ইলমের প্রতি তিন ব্যক্তির মতো অধিক আসক্ত আমি আর কাউকে দেখিনি—জাহিজ, ফাতহ বিন খাকান এবং ইসমাইল বিন ইসহাক আল-কাজি।

জাহিজ ﵀-এর হাতে কোনো কিতাব আসলেই তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে তবেই ক্ষান্ত হতেন; চাই সে কিতাব যে বিষয়েই হোক না কেন।

আর ফাতহ তো নিজ মোজার ভেতর কিতাব রাখতেন। পেশাব বা সালাতের জন্য যখন তিনি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সভা থেকে বেরোতেন, সাথে সাথে কিতাবটি বের করে তাতে দৃষ্টি বুলাতেন আর হাঁটতে থাকতেন। এভাবে পড়তে থাকতেন গন্তব্যে আসা পর্যন্ত। এরপর ফিরে যাওয়ার পথেও মজলিসে বসা পর্যন্ত অনুরূপ পাঠ করতেন।

ইসমাইল বিন ইসহাক ﷺ-এর নিকট আমি যখনই গিয়েছি, তাঁর হাতে কোনো না কোনো কিতাব দেখেছি। হয়তো তিনি কিতাবটি পড়ছেন বা পড়ার জন্য কিতাবের স্তূপ থেকে কিতাব খুঁজছেন অথবা কিতাব পরিষ্কার করছেন।'

আবু বকর আল-খাইয়াত আন-নাহবি ﷺ নিজের পুরো সময়টা অধ্যয়নে ব্যয় করতেন। এমনকি রাস্তায়ও পড়তে থাকতেন। যে কারণে কখনো তিনি গর্তে পড়ে যেতেন, আবার কখনো বাহন-জন্তুর আঘাত লাগত তাঁর গায়ে।

জনৈক মন্ত্রী তার দাসকে বলল, 'হে গোলাম, আমার নির্জনের সঙ্গী এবং বিনোদনের উপকরণ নিয়ে এসো।' উপবিষ্ট লোকেরা ধারণা করল, মন্ত্রী হয়তো শরাবের পেয়ালা আনতে বলেছেন। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো, যখন দেখা গেল গোলাম এক ঝুড়ি কিতাব এনে রাখল তার মনিবের সামনে।

আহমাদ বিন ইমরান বলেন, 'আমি আবু আইয়ুব আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন শুজার কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর ঘরে বসা ছিলেন। তিনি নিজের এক গোলামকে আবু আব্দুল্লাহ আল-আরাবি ﷺ-এর নিকট তাকে আসতে বলে পাঠালেন। গোলাম ফিরে এসে জানাল, আমি তাকে আসতে বললে তিনি বললেন, "আমার কাছে বেদুইনদের একটি দল আছে, তাদের সাথে আমার প্রয়োজনের কাজ শেষ হলেই চলে আসব।" গোলাম বলল, "আমি তাঁর কাছে কাউকেই দেখলাম না। বরং দেখলাম, তাঁর সামনে কিছু কিতাব পড়ে আছে। তিনি একবার একটায় তাকাচ্ছেন তো একটুর পর আরেকটাতে দেখছেন।"

একটু পর তিনি চলে এলেন। আমরা তাঁর আসার আওয়াজ পাইনি। আবু আইয়ুব তখন বললেন :

"হে আবু আব্দুল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আজিম! তুমি আমাদের থেকে দূরে সরে আছ? আমরা তো তোমার সংশ্রব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আর আমার গোলাম বলল, তোমার কাছে কাউকে দেখেনি। আর তুমি বলেছ, "আমার সাথে কিছু বেদুইন রয়েছে। যখন এদের সাথে কাজ শেষ হবে চলে আসব।" তখন ইবনুল আরাবি বললেন :

لَنَا جُلَسَاءُ مَا نَمَلُّ حَــدِيْثَهُــمْ *** أَلِبَّاءُ مَأْمُوْنُوْنَ غَيْبًا وَمَشْــهَدَا

يُفِيْدُوْنَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ عِلْمَ مَا مَضَى *** وَعَقْلًا وَتَأْدِيْبًا وَرَأْيًا مُسَدَّدَا

بِلَا فِتْنَةٍ تُخْشَى وَلَا سُوْءِ عِشْرَةٍ *** وَلَا نَتَّقِيْ مِنْهُمْ لِسَانًا وَلَا يَـدًا

فَإِنْ قُلْتَ أَمْوَاتٌ فَمَا أَنْتَ كَاذِبًا *** وَإِنْ قُلْتَ أَحْيَاءُ فَلَسْتُ مُفَنَّدَا

> 'আমার কিছু বন্ধু আছে, যাদের কথায় আমরা কখনো বিরক্ত হই না। এমন সুহৃদ যাদের সান্নিধ্যে যেমন আমরা নিরাপদ, তেমন তাদের অনুপস্থিতিতেও আমরা নিরাপদ। তাদের কাছ থেকে আমরা পাই অতীতের জ্ঞান—পাই বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার আর সঠিক পরামর্শ। তাদের দ্বারা ফিতনার কোনো আশঙ্কা নেই। তাদের সাহচর্যেও অনিষ্ট নেই। তাদের হাত ও মুখ থেকে কেবল কল্যাণই আমরা পাই। যদি বলো, তারা মৃত, তবে তোমার কথা মিথ্যা নয়। আর যদি বলো, তারা জীবিত তবুও তুমি ভুল নও।'

মজার ব্যাপার হলো, জাহিজ ﷺ ওররাকদের দোকান ভাড়া নিতেন। রাতের বেলা সেখানে বই পড়ে কাটিয়ে দিতেন।

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'ইলম অন্বেষণে পূর্ণতার পথ হলো, যে সকল কিতাবের লেখকরা বিদায় হয়ে গেছেন, তাদের কিতাবের ব্যাপারে অবহিত হওয়া এবং সেগুলো অধিক পরিমাণে মুতালাআ করা। কারণ, একজন ছাত্র পূর্বসূরিদের বই পড়ে তাদের জ্ঞানের প্রসারতা ও হিম্মতের উচ্চতা জানতে পারবে, সেসব গুণের কথা জেনে নিজের মাঝেও ধারণ করার সংকল্প হবে তার ভেতরে। সংকল্প তাকে চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রতি উৎসাহিত করবে। আর কোনো কিতাবই উপকার থেকে শূন্য নয়। জেনে রেখো, তোমাদের জন্য সালাফের জীবনচরিতে গভীর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আবশ্যক তাদের রচনাবলি মুতালাআ করা, আর তাদের ব্যাপারে জ্ঞান রাখা। তাদের কিতাব বেশি বেশি পাঠ করা, যেন তাদের সঙ্গ লাভ করা যায়।

আমি নিজের ব্যাপারে বলছি, আমি কখনোই কিতাব মুতালাআর প্রতি বিতৃষ্ণ হই না। যখনই কোনো কিতাব দেখি, তখনই মনে হয় আমি যেন বিরাট এক গুপ্তধনের দেখা পেয়েছি।

আমি আল-মাদরাসাতুন নিজামিয়্যাহ-এর পাঠাগারের কিতাবসমূহের সূচিপত্র দেখলাম। সেখানে দেখলাম, ছয় হাজার ভলিয়মের লিস্ট। আর সে লিস্টে ছিল ইমাম আবু হানিফা, হুমাইদি, আমাদের শাইখ আব্দুল ওয়াহাব বিন নাসির এবং আবু মুহাম্মাদ বিন আল-খাশশাবের কিতাবসমূহ। সেখানে আরও অনেক অনেক কিতাব ছিল।

আমি বিশ হাজার খণ্ডেরও বেশি কিতাব মুতালাআ করেছি। আর এখনো আমি মুতালাআর জন্য কিতাব খুঁজে বেড়াই।

যাহোক, সেখানে মহামনীষীদের জীবনী, তাদের অভিলাষ, তাদের উচ্চ মনোবলের কথা, তাদের মুখস্থ শক্তি ও স্পৃহা, তাদের ইবাদত ও ইলমের আশ্চর্যজনক কারনামা দেখে এলাম আমি। এমন সব বিষয় জেনেছি, যারা মুতালাআ করেনি, তারা সেসব জানতে পায়নি।

সে থেকে আমি মানুষের মন্দপ্রবণতা এবং ছাত্রদের নিম্ন মানসিকতাকে ঘৃণা করতে শুরু করি। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।'

কিতাব ব্যাপক উপকারী ও গৌরবময় হওয়ার সাথে সাথে সর্বোত্তম সম্পদ, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বটে। কিতাব একাকিত্বের নিরাপদ সঙ্গী, প্রিয় বন্ধু, লাঞ্ছনামুক্ত এবং জ্ঞানে পূর্ণ।

এ কারণেই সালাফ কিতাব সংরক্ষণ ও অধ্যয়নে এতটা আগ্রহী ছিলেন।

- ইবনে হাজার ﵀ তাঁর রচিত কিতাব 'আদ-দুরারুল কামিনা'-তে ইবনুল কাইয়িমের ব্যাপারে বলেন, 'তিনি কিতাব সংগ্রহে বেশ আগ্রহী ছিলেন। অগণিত কিতাব সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সন্তানরা তাঁর মৃত্যুর পর নিজেদের জন্য কিছু কিতাব বেছে রেখে অন্য কিতাবগুলো বিক্রি করতে থাকে দীর্ঘ দিন।'

ইয়াহইয়া বিন মাইন ﵀ ১১৪ কিমতর[২৬৫] কিতাব ও ৪টি বিশালাকার লোহার আধার কিতাব রেখে দুনিয়া ত্যাগ করেন।

....

২৬৫. যেখানে কিতাব হিফাজতের সাথে রাখায় হয়, তাকে কিমতর বলে। এটি বাঁশ ও চামড়ার তৈরি হয়ে থাকে। জমিনের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ থেকে বাঁচাতে জমিন থেকে কিছুটা উঁচুতে স্থাপন করা হয় এটি। আবার কখনো কখনো দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করে রাখা হয়। - অনুবাদক।

ইবনে হাজার ﷺ ইবনে মুলকিন থেকে বর্ণনা করেন, 'কিতাব সংগ্রহে আমার ছিল প্রবল আগ্রহ। মহামারি ছড়িয়ে পড়ার বছর আমার কাছে সংবাদ আসলো, জনৈক মুহাদ্দিসের কিতাবগুলো বিক্রি হচ্ছে। তার অসিয়ত ছিল, নগদ টাকা ছাড়া কিতাব বিক্রি করবে না। এ সংবাদ শুনে আমি আমার ঘরে এসে দিরহামের একটি থলে নিয়ে রওয়ানা করলাম। যথাস্থানে এসে সেখানে সকলের সামনে ঢেলে দিলাম দিরহামগুলো। আমি কিতাবের ব্যাপারে কিছুই বললাম না। বিক্রেতা কেবল বলে গেলেন, এ কিতাব তাকে দাও। এ কিতাব তাকে দাও। সেদিন আমার ক্রয় করা কিতাবের মাঝে ছিল "মুসনাদুল ইমাম আহমাদ।" কিনেছিলাম ৩০ দিরহামে।'

কাজি আব্দুর রহিম বিন আলি আল-লাখমি ﷺ-এর ব্যাপারে ইমাম জাহাবি ﷺ তাঁর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে, তাঁর মালিকানাধীন কিতাবের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ভলিয়ম। যা তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করেছেন।'

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুলামি আল-মুরসি আল-আন্দালুসি ﷺ কিতাব লিখেছেন, পড়েছেন এবং অনেক মূল্যবান কিতাব সংগ্রহ করেছেন। যখনই কোনো কিতাবের আলোচনা তোলা হতো বা কোনো কিতাব তাঁর সামনে রাখা হতো, তিনি দাম জানতে চাইতেন, দাম দিয়ে কিতাবটি নিয়ে নিতেন।

উদফুবি ﷺ বলেন, 'আমাদের শাইখ কাজিউল কুজাত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন জামাআহ আমার কাছে বর্ণনা করেন, তাঁর কাছে কায়রোর জেলা প্রশাসক ছিল। তিনি এতিমদের সম্পদ হাত করার জন্য অনেক চেষ্টা করছিলেন। আমাদের শাইখ বলেন, তিনি একবার আমার কাছে শাইখ তাকি উদ্দিন বিন দাকিক আল-ইদকে উপস্থিত করলেন। প্রশাসক দাবি করছিল, শাইখের কাছে এতিমদের কিছু ঋণ আছে। তখন আমি তাদের উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতা করলাম। শাইখের সাথে সিদ্ধান্ত করলাম, তিনি ঋণের পরিবর্তে এতিমদের পড়িয়ে দেবেন, এভাবে তার ঋণ শোধ হবে। এরপর কাজিউল কুজাত আবু আব্দুল্লাহ ইবনে দাকিককে বললেন, "আমি আপনার ঋণ নেওয়ার কারণ সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করছি।" তখন ইবনে দাকিক ﷺ বললেন, "আসলে কিতাবের ভালোবাসাই আমাকে এমন করতে বাধ্য করেছে।"'

ইমাম জুহরি ﷺ-এর স্ত্রী বলেন, 'আল্লাহর শপথ, এ কিতাবগুলো আমার কাছে তিন সতিনের চেয়েও বেশি কষ্টকর ঠেকে।'

সুলাইমান আল-আমিরি ﷺ বলেন :

وَقَائِلَةٍ أَنْفَقْتَ فِيْ الْكُتُبِ مَا حَوَتْ * يَمِيْنُكَ مِنْ مَالٍ فَقُلْتُ: دَعِيْنِيْ

لَعَلِّيْ أَرَى فِيْهَا كِتَابًا يَـــدُلُّـنِيْ *** لِأَخْذِ كِـتَـــابِيْ آمِنًا بِيَـــمِيْـــنِيْ

'ওরা বলে, যত সম্পদ কামালে তার সবই তো কিতাব কেনার পেছনে খরচা করলে! আমি বললাম, আমাকে আমার কাজ করতে দাও। হয়তো এসব কিতাবের মাঝেই এমন কোনো কিতাব পেয়ে যাব, যা আমাকে নিরাপদে ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার দিকে পথনির্দেশ করবে।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ ﷺ বলেন :

'আমি এমন একজনকে চিনি, যিনি মাথাব্যথা বা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। ওদিকে তার শিয়রের পাশে কিতাব। যখনই কিছুটা সুস্থতা অনুভব করতেন, কিতাব পাঠ শুরু করতেন। যখন অসুস্থতা বেড়ে যেত, তখন রেখে দিতেন। একদিন ডাক্তার এসে তাকে সে অবস্থায় দেখে বলল, "আপনার জন্য এটা সমাধান নয়। আপনি আগে নিজেকে সাহায্য করতে হবে, অন্যথায় ওষুধ আপনার কোনো কাজে আসবে না। হতে পারে এখন যদিও পড়তে পারছেন, পরে আর পারবেন না।"'

আবু বকর আল-আনবারি ﷺ মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কাছে ডাক্তার আসলো। ডাক্তার তাঁর পেশাবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি এমন কিছু করতেন, যা অন্য কেউ করে না।' এ কথা বলে ডাক্তার বের হয়ে গেল। বলল, 'তার ব্যাপারে সুস্থতার আশা করা যায় না।' তাঁকে বলা হলো, 'আপনি কী করতেন?' আম্বারি ﷺ বললেন, 'আমি প্রতি সপ্তাহে ১০ হাজার পৃষ্ঠা পড়তাম।'

শাইখ রাগিব আত-তাব্বাখ ﷺ বলেন, 'হালাবের আলিম শাইখ আহমাদ আল-হাজ্জার ﷺ কিতাব সংগ্রহ করতে পছন্দ করতেন। এমনকি আমরা শুনেছি,

একবার তিনি দেখলেন, একটি কিতাব বিক্রি করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর সাথে কোনো দিরহাম ছিল না তখন। তবে পরনে জামা ছিল। তিনি কাপড়ের একটি অংশ খুলে বিক্রি করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিতাবটি সংগ্রহ করলেন।'

শাইখ আলাউদ্দিন ইবনুন নাফিস ﷺ একবার জাহুমা শহরের গোসলখানায় প্রবেশ করলেন। তিনি গোসল কিছুটা সেরে কাপড় পরিবর্তনের জায়গায় চলে এলেন। এরপর একজনকে খাতা-কলম ও দোয়াত নিয়ে আসতে বললেন। তারপর একটি রচনা লিখতে শুরু করলেন নাড়ি বিষয়ে। পুরো রচনা শেষ হলে এরপর পুনরায় গোসলখানায় প্রবেশ করে বাকি গোসল পূর্ণ করলেন।

ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদানে সালাফের উচ্চ মনোবল

আমর বিন সাওয়াদ বলেন, 'আমাকে শাফিয়ি ﷺ বলেছেন, "আমি জন্মগ্রহণ করেছি আসকালানে। যখন আমার বয়স দুবছর হলো, আমার মা আমাকে মক্কায় নিয়ে আসলেন। সে সময় আমার দুটি জিনিসে খুব আগ্রহ ছিল : তির নিক্ষেপণ ও ইলম অর্জন। তিরন্দাজে আমি এতটা দক্ষতা অর্জন করেছিলাম যে, দশে দশ সঠিক হতো।" এতটুকু বলার পর ইলমের আগ্রহের বর্ণনা নিয়ে কিছু না বলে চুপ হয়ে গেলেন। আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, আপনি ইলমে তিরন্দাজির চেয়ে বেশি অগ্রসর।"'

ইমাম শাফিয়ি ﷺ ভাষা, কবিতা এবং আরবদের ইতিহাসের ব্যাপারে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। কাজি ইবনে খাল্লিকান ﷺ বর্ণনা করেন, 'ইমাম শাফিয়ি ﷺ এসব ইলমের ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার কারণে আসমায়ি ﷺ (১২২-২১৬ হি.) তাঁর কাছে হুজালির কবিতাগুলোর পাঠ নেন। বর্ণিত আছে, এক বংশধারা-বিশেষজ্ঞ ইরাকে ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর সাথে কথা বলেন এ ইলমের ব্যাপারে। সে বিশেষজ্ঞ দেখলেন, শাফিয়ি ﷺ এ ব্যাপারে অনেক জ্ঞানের অধিকারী। যখন পারস্পরিক কথাবার্তা দীর্ঘ হয়ে গেল, ইমাম শাফিয়ি ﷺ বললেন, "তোমার ও আমার জন্য শুধু পুরুষদের দিক থেকে বংশধারা নিয়ে আলোচনা করা শোভনীয় নয়; বরং এসো আমরা মায়েদের দিক থেকে বংশধারা আলোচনা করি।"

ফুসতাতে ইমাম শাফিয়ির সাথে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সাক্ষাৎ করল। তারা দেখল শাফিয়ি ﷺ চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান রাখেন। তাই তারা শাফিয়ি ﷺ-এর নিকট চিকিৎসাবিষয়ক একটি দরসের আবেদন করল। যাতে তারা তাঁর কাছে এ বিষয়ে পড়তে পারে। তখন তিনি আমর বিন আস জামে মসজিদের পাশে দেয়ালের ছায়ায় অপেক্ষারত ফকিহদের দিকে ইশারা করে বললেন, "এরা কি আমার জন্য এমন কোনো সময় অবশিষ্ট রেখেছে, যে সময় আমি তোমাদের নিয়ে বসতে পারি?'"

রবি বিন সুলাইমান আল-মুরাদি (১৭৪-২৭০ হি.)। ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর কিতাবাদির রাবি তিনি। তাঁর বিশেষ ছাত্রও ছিলেন। 'জামিউ ইবনি তুলুন'-এ প্রথম হাদিস লিখিয়ে তিনি। তিনি বলেন, 'যখন শাফিয়ি ﷺ ফুসতাতে আগমন করেন, তখন তাঁর পাশে বসতেন বিশিষ্ট লোকজন। যেমন : আব্দুল্লাহ বিন হাকাম এবং তাঁর মতো আলিমগণ। তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল বেশ সুন্দর। ফলে মিসরের ফকিহ, জ্ঞানী-গুণী ও বরেণ্য লোকদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি ফজরের পর 'জামে আমর' মসজিদে পাঠচক্রে বসতেন। তখন তাফসির বিভাগের ছাত্ররা তাঁর কাছে আসত এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করত। যখন সূর্য উদিত হতো, এরা চলে যেত এবং হাদিস বিভাগের ছাত্ররা আগমন করত। তারা শাফিয়ি ﷺ-কে হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করত। যখন সূর্য পূর্ণ উঠে যেত, এরা চলে যেত এবং পাঠচক্রটি বিভিন্ন মুনাজারা ও মুজাকারার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যেত তখন; আর যখন দিনের আলো প্রখর হয়ে যেত, তখন সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত। এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একের পর এক আরবি ভাষাবিদ, ছন্দশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, কবি ও ব্যাকরণবিদের আগমন ঘটত। এরপর তিনি নিজ ঘরে চলে যেতেন।'

রবি ﷺ বলেন, 'ইমাম শাফিয়ি ﷺ ফুসতাতে চার বছর অবস্থান করেন। এ চার বছরে তিনি এক হাজার পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখিয়েছেন। তাঁর কিতাব "আল-উম্ম" বের হয়েছে দুই হাজার পৃষ্ঠায়। আর "আস-সুনান"সহ আরও অনেক কিছুই তিনি এই চার বছরে সম্পন্ন করেছেন। যদিও এ সময়ে তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন। অনেক সময় বাহনে চড়া অবস্থায় তাঁর শরীর থেকে রক্ত বের হতো। এমনকি তাঁর সেলোয়ার ও মোজা রক্তে ভেসে যেত। তিনি তখন অর্শ রোগে আক্রান্ত ছিলেন।' মারাত্মক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি কিতাব লিখে গেছেন এবং

ছাত্রদের পড়িয়ে গেছেন। এমনটা উচ্চ মনোবলের অধিকারী হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল।'

সুফইয়ান সাওরি ﷺ ইলমের প্রচার-প্রসার ও ইলম শেখানোর প্রতি ছিলেন প্রবল আগ্রহী ও উদ্যোগী। এমনকি তিনি বলতেন, 'যদি হাদিস পাঠকারীগণ আমার কাছে না আসতেন, তবে আমিই তাদের গৃহে চলে যেতাম।' আরও বলতেন, 'যদি আমি জানতে পারি, কেউ সঠিক নিয়তে হাদিস অনুসন্ধান করছে, তবে আমি তার ঘরে গিয়ে হাদিস বর্ণনা করে আসব।'

ইবনে কাসিম ইসা বিন দিনার ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'তুমি স্পেনের সর্ববৃহৎ শহরে যাবে। এমন কোনো স্থানে যেয়ো না, যেখানে তোমার ইলমের সংকুলান হবে না।'

মহান ইমাম ইবনে হাজম আল-আন্দালুসি ﷺ-এর হিম্মতের উচ্চতা দেখো। তাঁর হিম্মতের কারনামা প্রচার-প্রসার পেয়েছে। তাঁর হিম্মত ছাড়িয়ে গিয়েছে অনেক ওপরে। ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্‌দিগন্তে। তিনি বলেন :

مُنَايَ مِنَ الدُّنْيَا عُلُـــومٌ أَبُثُّهَا *** وَأَنْشُرُهَا فِي كُلِّ بَادٍ وَحَـــاضِرِ

دُعَاءٌ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ الَّتِي * تَنَاسَى رِجَالٌ ذِكْرَهَا فِي الْمَحَاضِرِ

وَأَلْزَمُ أَطْرَافَ الثُّغُورِ مُجَــاهِدًا *** إِذَا هَيْعَةٌ ثَارَتْ فَأَوَّلُ نَــافِرِ

لِأَلْقَى حِمَامِي مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ *** بِسُمْرِ الْعَوَالِي وَالدِّقَاقِ الْبَوَاتِرِ

كِفَاحًا مَعَ الْكُفَّارِ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى * وَأَكْرَمُ مَوْتٍ لِلْفَتَى قَتْلُ كَافِرِ

فَيَا رَبِّ لَا تَجْعَلْ حِمَامِي بِغَيْرِهَا *** وَلَا تَجْعَلَنِّي مِنْ قَطِينِ الْمَقَابِرِ

'আমার লক্ষ্য এ দুনিয়ার গ্রাম-শহরের প্রতি প্রান্তে পৌঁছে দেবো ইলমের আলো, ছড়িয়ে দেবো ইলম। কুরআনের দিকে ডাকা এবং সুন্নাহর দিকে আহ্বানের কথা অনেকেই ভুলে গেছে। যখন ভীতি ছড়িয়ে পড়বে নগরে, আমিই প্রথম বের হবো। মুজাহিদ হয়ে পাহারা দেবো সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি। পিছিয়ে গিয়ে নয়; বরং সম্মুখপানে

এগিয়ে গিয়ে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব। মজবুত ঢাল হাতে, হাতে নিয়ে ধারালো তলোয়ার লড়ে যাব কাফিরদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড লড়াই। একজন যুবকের জন্য জিহাদের ময়দানে শহিদ হওয়াই সবচেয়ে সম্মানের মৃত্যু। হে আমার রব, আমার মৃত্যু যেন রণাঙ্গনেই হয়। আমাকে তুমি কবরের বাসিন্দা বানিয়ো না, হে প্রভু।'

লিখন-প্রণয়নে সালাফের উচ্চ মনোবল[২৬৬]

- ইমাম তাবারি ﵀

খতিব আল-বাগদাদি ﵀ বলেন, 'আমি আলি বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল গাফফার আল-লুগাবি ﵀-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি ﵀ (তিরাশি বছর বয়সে ৩১০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন) চল্লিশ বছর একাধারে প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখতেন।' অর্থাৎ তিনি প্রায় ৫,৮৪,০০০ পৃষ্ঠা লিখেছেন!

হঠাৎ কেউ এই সংখ্যা শুনলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। মানব ইতিহাসে আর কোনো মনীষীর ব্যাপারে জানা যায়নি এমনটা। কিন্তু তাঁর উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প এবং জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত প্রতিটি সময়ের মূল্যায়নের কথা জানতে পারলে এবং যে ইলম তিনি বহন করেছেন, তার গভীরতা—সাথে সাথে তাঁর ইখলাস ও সততার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর জীবনে প্রশস্ততা ও বরকত দান করার মতো প্রভৃতি বিষয় জানতে পারলে সে হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থাকবে না আর। বরং এসব দিক জানতে পেরে হতবুদ্ধিতার বদলে এমন বিস্তৃত ইলমি পরিবেশনার প্রকৃতরূপ বোঝার নিকটবর্তী হতে পারবে যে কেউ।

উসতাজ মুহাম্মাদ কুরদ আলি ﵀ ইবনে জারির ﵀-এর জীবনীতে উল্লেখ করেন, 'তাবারি ﵀-এর ব্যাপারে এমন কোনো বর্ণনা নেই যে, তিনি জীবনে কখনো বিনা উপকারে, বিনা সদ্ব্যবহারে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করেছেন।'

২৬৬. এ পরিচ্ছেদটি 'সাওয়ানিহু ওয়া তাআম্মুলাতু ফি কিমাতিজ জামান' কিতাবের ২৬-৩৪ পৃষ্ঠার সারাংশ।

ইমাম তাবারির রচনাবলি ইলমি প্রশস্ততা, গভীরতা, ফলপ্রসূতা, বিন্যাস ও শ্রেষ্ঠত্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। বিভিন্ন শাস্ত্রের বহু কিতাব রচনাকারী তিনি। এমনকি তিনি মুফাসসির ও ঐতিহাসিকদের ইমাম হিসেবে বরিত হয়েছেন। এ ছাড়াও তাকে বিশেষ একটি ফিকহি মাজহাব-প্রণেতা বলেও পরিগণিত করা হয়।

তাঁর লেখার স্তর বোঝার জন্য আমি আবু হামিদ আহমাদ বিন আবু তাহির ইসফারাইনির একটি উক্তি উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, '"তাফসিরে মুহাম্মাদ বিন জারির" সংগ্রহ করতে যদি কাউকে চীনও সফর করতে হয়, তবুও এটা বেশি (দূরের পথ সফর করা) হবে না।'

যে তাফসিরের কথা বলা হয়েছে এ উক্তিতে, সেটি ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিশাল কলেবর। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সমন্বিত বর্ণনা। যে তাফসির আমাদের জন্য এক বিস্ময়, সেটি প্রণয়নে এত বেশি দীর্ঘ করেননি তিনি; বরং তাঁর মতে এটা তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রণয়ন। তাঁর তো বরং ইচ্ছে ছিল, এ তাফসিরটি প্রণীত হবে আরও বড় আকারে।

খতিব আল-বাগদাদি ﵀ বর্ণনা করেন, 'আবু জাফর তাবারি তাঁর সাথিদের বললেন, "তোমরা কুরআনের তাফসির করতে উদ্যমী হবে?" তারা বলল, "কত বড়?" তিনি বললেন, "ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা?" তারা বলল, "এটি শেষ হওয়ার আগেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে।" অগত্যা তিনি তাফসিরটিকে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত করলেন।

এরপর সাথিদের আবার বললেন, "তোমরা কি আদম ﵇ থেকে শুরু করে আমাদের সময় পর্যন্ত একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করতে প্রস্তুত?" তারা বলল, "কত বড়?" তিনি আগের সংখ্যাটা বললেন। এবারও তারা একই উত্তর দিল। তিনি বললেন, "ইন্নালিল্লাহ, হিম্মত মরে গেছে!" এরপর তিনি তাফসিরের সমপরিমাণ পৃষ্ঠায় একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করলেন।

- ইমাম বাইহাকি ﵀

ইমাম বাইহাকি ﵀ এক হাজার খণ্ড রচনা করলেন। প্রতিটি খণ্ডই ছিল ভিন্ন ভিন্ন বিরল বিষয়ে। প্রত্যেকটিই অনেক উপকারী। তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ রোজা রেখেছিলেন।

- ইমাম আবুল ওয়াফা হাম্বলি ﷺ

ইমাম আবুল ওয়াফা আলি বিন আকিল হাম্বলি বাগদাদি ﷺ (৫১৩ হি.)-এর ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'তিনি ছিলেন মেধাবী আলিমদের একজন।' সময়ের সদ্ব্যবহারে তিনি রচনা করলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কিতাব আটশ খণ্ডের "আল-ফুনুন"।'

হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেন, তাঁর প্রণীত সবচেয়ে বড় কিতাব 'আল-ফুনুন'। এটিতে উপদেশ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাফসির, ফিকহ, দুই মূলনীতি, নাহু, অভিধান, কবিতা, ইতিহাস, ঘটনাবর্ণন, নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বিতর্ক ও বৈঠকসমূহ, মনের চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনার ফলাফলসহ অনেক কিছুই এ কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন তিনি।

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'তিনি ছিলেন সুশোভিত অন্তরের অধিকারী। তাঁর আলোচনা-গবেষণা রহস্যময় এবং সূক্ষ্ম-জটিল বিষয়ে পরিপূর্ণ। তাঁর কিতাব "আল-ফুনুন"-কে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা ও ঘটিত ঘটনার সন্নিবেশনের কাজে লাগিয়েছেন। যে তাঁর সেসব ঘটনায় দৃষ্টি দেবে, সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করবে, সে জানতে পারবে—কত গভীরতাময় ছিল এ ব্যক্তিত্ব।'

ইবনুল জাওজি ﷺ-এর পৌত্র বলেন, 'আমার দাদা ইবনুল জাওজি "আল-ফুনুন"-এর দশ খণ্ডের সংক্ষিপ্তরূপ প্রণয়ন করেন। এগুলো তাঁর প্রণীত কিতাবাদিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাগদাদে মামুনি শাসনামলে আমি সেগুলো প্রায় ৭০ বার মুতালাআ করেছি। এতে রয়েছে ঘটনাবর্ণন থেকে শুরু করে বিতর্কের আলোচনা, দুর্লভ বর্ণনা, আশ্চর্যকর বিবৃতি ও কবিতা।'

আব্দুর রাজ্জাক রাসআনি ﷺ তাঁর তাফসিরগ্রন্থে বলেন, 'আবুল বাকা লুগাবি আমাকে বলেছেন, "আমি শাইখ আবু হাকিম নাহরাওয়ানিকে বলতে শুনেছি, "আল-ফুনুন" ৩০৪ খণ্ডে লিখিত একটি সুবিশাল কিতাব বলে আমি জানি।"'

হাফিজ জাহাবি ﷺ বলেন, '"আল-ফুনুন" চারশরও বেশি খণ্ডে সমাপ্ত একটি সুবিশাল কিতাব। লেখক এ কিতাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া জ্ঞানী-গুণীদের

কথা, নিজের ছাত্রদের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন সেসব রহস্য ও সূক্ষ্ম কথার বয়ান, যা তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়েছে। তিনি যেসব বিরল ও আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনেছেন, সেসবও লিপিবদ্ধ করেছেন এ গ্রন্থে।'

হাফিজ জাহাবি ﵀ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে লেখেন, 'দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় কলেবরের কোনো কিতাব লেখা হয়নি। এ কিতাব স্বচক্ষে দেখা এক লোক আমাকে জানান, এটি চারশ খণ্ডেরও বেশি বিস্তৃত।'

হাফিজ ইবনে রজব ﵀ বলেন, 'আবু হাফস উমর বিন আলি কাজিউনি আমাকে বাগদাদে বলেন, "আমাদের এক শাইখ বলেন, "আল-ফুনুন" আটশ খণ্ডে সমাপ্ত একটি কিতাব।"'

হাফিজ ইবনে আসাকির ﵀ ৮০ খণ্ডে 'তারিখু দিমাশক' কিতাবটি প্রণয়ন করেন। খণ্ডগুলো আকারে বড়।

ইমাম আবু হাতিম আর-রাজি ﵀ এক হাজার খণ্ডে রচনা করেন 'আল-মুসনাদ'।

- ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀

ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি বিন মুহাম্মাদ জাওজি ﵀। ইবনে আকিল ﵀-এর ছাত্র। মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি। ইবনুল জাওজি ছিলেন সেসব বিশেষ ইমামের অন্যতম, মানুষ যাদের অনুসরণ করেন সময়ের সদ্ব্যবহার এবং সময় বিনষ্ট থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে। যার ফলে তাঁরই নাতি আবুল মুজাফফার ﵀ বলেন :

'দাদা তাঁর শেষ জীবনে মিম্বারে বসে বলেন, "আমার এ আঙুল দিয়ে আমি দুই হাজার খণ্ড রচনা করেছি। আমার হাতে লাখো মানুষ তাওবা করেছে। আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে বিশ হাজার ইহুদি-খ্রিষ্টান।"'

ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, 'যদি আমি বলি, আমি বিশ হাজার খণ্ডেরও বেশি কিতাব মুতালাআ করেছি, তবুও কম হয়ে যাবে। আর এখনো আমি মুতালাআর জন্য কিতাব খুঁজে বেড়াই।

আমি মহামনীষীদের জীবনী, তাদের অভিলাষ, তাদের উচ্চ মনোবলের কথা, তাদের মুখস্থশক্তি ও স্পৃহা, তাদের ইবাদত ও ইলমের আশ্চর্যজনক কারনামা

জানলাম। এমন সব বিষয় জেনেছি, যারা মুতালাআ করেনি, তারা সেসব জানতে পায়নি।

ফলে আমি মানুষের মন্দপ্রবণতা এবং ছাত্রদের নিম্ন মানসিকতাকে ঘৃণা করতে শুরু করি। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।'

ইবনুল জাওজি ছাত্র অবস্থায় বিশ হাজার খণ্ড পড়েছেন। যদি আমরা প্রতি খণ্ড মাঝারি আকারের কিতাবের পৃষ্ঠার পরিমাণ ধরি ৩০০। তবে তাঁর মোট পঠিত পৃষ্ঠা হবে ৬ মিলিয়ন (অর্থাৎ ৬০ লাখ) পৃষ্ঠা।

তিনি দুই হাজার খণ্ড লিখেছেন তাঁর হাতে। পৃষ্ঠায় দাঁড়ায় ৬ লক্ষ।

এটা হচ্ছে তাঁর পঠিত এবং অনুলিপি করা পৃষ্ঠার সংখ্যা। তাহলে এ বিশাল সংখ্যার ওপর চিন্তা করলে তাঁর রচিত ও প্রণীত কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যাও বিশাল হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ 'আজুবাতুল মিসরিয়্যা'-তে বলেন, 'শাইখ আবুল ফারাজ ছিলেন একজন মুফতি। বহু গ্রন্থ রচয়িতা ও প্রণয়নকারী। অনেক বিষয়েই তাঁর প্রচুর রচনা রয়েছে। আমি সেসব গুনেছি। হিসেব করে দেখেছি, মোট সংখ্যায় তা এক হাজার মুসান্নাফেরও বেশি। এ গণনার পর তাঁর প্রণীত আরও কিতাব দেখেছি, যা এর আগে দেখিনি।'

হাফিজ জাহাবি ﷺ বলেন, 'এ মানুষটির মতো এত অধিক পরিমাণে প্রণয়নকারী আমি আর কারও কথা জানি না।'

ইবনুল জাওজি প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি শাস্ত্রের ওপর লিখেছেন। কোনো বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব বিশ খণ্ডের। আবার কোনো বিষয়ে লিখেছেন একটি ছোট রিসালা।

কীভাবে? কীভাবে এত অধিক রচনা ও প্রণয়ন সম্ভব হলো তাঁর পক্ষে!

আল-মুয়াফফিক আব্দুল লতিফ ﷺ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তিনি এতটুকু সময়ও নষ্ট হতে দিতেন না।'

স্বয়ং ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'আমি অনেককে দেখলাম, তারা আমার সাথেও একই আচরণ করতে চায়, যেমন আচরণ তারা অন্যান্য মানুষের সাথে করে করে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে—বেশি বেশি সাক্ষাৎ করা। তারা এ বারবার আসা-যাওয়াকে খিদমত নাম দিয়েছে। তারা এসে বসে। এরপর শুরু করে দেয় মানুষের নানান বিষয় নিয়ে অনর্থক-অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা। এমনকি অপরের গিবতে লিপ্ত হয়।

আমাদের এ যুগের অনেকেই এমনটা করছে। এমনকি যার কাছে সাক্ষাৎ করতে আসে, সেও এমনটাই চায়, এমনটা কামনা করে। কারণ, সে কাজে ব্যস্ত না থাকায় একাকিত্ব অনুভব করে। এ ব্যাপারটি ইদ ও অভিবাদন জানানোর দিনগুলোতে ঘটে থাকে। তুমি তাদের দেখবে, তারা একে অপরের কাছে যায়। এরপর সালাম ও অভিবাদন ছাড়াও আরও বহু কথায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমি একটু আগে সময় নষ্ট করার যে মাধ্যমগুলোর কথা বলেছি, সেগুলোর একটা মিশ্রিত রূপ ঘটিয়ে থাকে তারা।

কিন্তু আমি দেখলাম, সময় অত্যন্ত মূল্যবান। তাই কল্যাণকর কাজেই সময় ব্যয় করা আবশ্যক। সময় অপচয় করা আমার খুবই অপছন্দনীয়। কিন্তু কখনো অকর্মণ্য লোকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে দুটি অবস্থা হয় তখন। এক. যদি আমি তাদের প্রতি রূঢ় হই, তবে প্রিয় মানুষদের বিচ্ছেদে আমাকে একাকী জীবন কাটাতে হবে। দুই. যদি আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি, তবে সময় নষ্ট হবে।

তাই আমি সাক্ষাৎ না করার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এরপর যদি আমি হেরে যাই—যদি কারও সাথে দেখা করতেই হয়, তবে সাক্ষাৎ করি। অবশ্য তখন কথা সংক্ষিপ্ত করি। যাতে তাড়াতাড়িই আবার কাজে মগ্ন হতে পারি। সাথে সাথে দ্বিতীয় একটি পদক্ষেপও নিই। এমন কিছু কাজ আগে থেকেই প্রস্তুত রাখি, যেগুলো কথা বলার সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কোনোভাবেই যেন সময় খালি না যায়, সে চেষ্টাই থাকে আমার। সে জন্য আমি সেসব মানুষের সাক্ষাতের সময় আগে থেকেই প্রস্তুত থাকি। কখনো কাগজ কাটা, কখনো কলমের নিব সরু করা, কখনো-বা খাতা বাঁধাই করা। এসব কাজ তো সব সময় করতেই হয়। আবার এগুলো করার সময়

আলাদা চিন্তা করারও প্রয়োজন পড়ে না। মনোযোগ দিয়েও করতে হয় না। তাই সাক্ষাতের সময়টার জন্য এগুলো তৈরি রাখি, যাতে আমার একটু সময়ও নষ্ট না হয়।'

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ ইলমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবিস্তারে চারশরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'জীবনাচার, কথাবার্তা, উদ্যোগগ্রহণ, রচনা-প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মাঝে এক বিশেষ শক্তি লক্ষ করেছি। আশ্চর্য হয়েছি। একজন প্রতিলিপিকার এক সপ্তাহে যতটুকু লেখে, তিনি সে পরিমাণ আবার কখনো তার চেয়ে বেশি রচনা ও প্রণয়নের কাজ করতেন একদিনে।'

- ইবনুন নাফিস ﷺ

পূর্বসূরিদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করেছেন নিজ সময়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী শাইখুত তিব্ব ইবনুন নাফিস ﷺ। ইমাম তাজ সুবকি তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর মতো দ্বিতীয়জন এ পৃথিবীতে ছিল না। ইবনে সিনার পর তাঁর মতো আর কেউ আসেনি। মানুষজন বলেন, চিকিৎসায় ইবনে সিনার থেকেও উত্তম ছিলেন ইবনুন নাফিস।'

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ অগ্রদূত একটি কিতাব লেখেন। আশ-শামিল। এ কিতাব সম্পর্কে তাজ সুবকি ﷺ বলেন, 'বলা হয়, এ কিতাব যদি পূর্ণ হতো, তবে তা তিনশ খণ্ডের বিশাল এক কিতাবে পরিণত হতো। ইবনুন নাফিস কিতাবটি আশি খণ্ডে সমাপ্ত করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এর পুরোটাই তিনি নিজ মস্তিষ্ক থেকে লিখেছেন।'

এ কিতাবটি সম্পন্ন করতে কীভাবে সক্ষম হলেন তিনি?

ইবনুন নাফিস যখন লেখার ইচ্ছে করতেন, তখন তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত অনেকগুলো কলম রাখা হতো। তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

লেখা শুরু করতেন অন্তর থেকে। ঢল যেমন দ্রুত গতিতে নেমে আসে, তেমনই দ্রুত গতিতে তরতর করে লিখে যেতেন তিনি। একটা কলম অকেজো হয়ে গেলে সেটা ফেলে আরেকটা তুলে নিতেন দ্রুত। কলম সরু করার কাজে যেন সময় নষ্ট না হয়, তাই আগেই কেউ প্রস্তুত করে রাখত।

- ইমাম সুয়ুতি ﵀

ইমাম সুয়ুতির একটি উপাধি ছিল 'ইবনুল কুতুব' তথা কিতাবের সন্তান। ইমাম সুয়ুতির মা তখন গর্ভবতী। তাঁর বাবা তাঁর মাকে একটি কিতাব আনতে বাড়ির লাইব্রেরিতে পাঠালেন। লাইব্রেরিতে যাওয়ার পর তার প্রসব বেদনা শুরু হয়। সেখানেই অসংখ্য কিতাবের মাঝে জন্ম হয় সুয়ুতির। তাই তাঁর উপাধি পড়ে যায় ইবনুল কুতুব। তাঁর ক্ষেত্রে এ উপাধিটি যথার্থ প্রমাণিত হয়। তিনি সত্যিই কিতাবের সাথে তাঁর সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। হয়েছেন আবুল কুতুব তথা বহু কিতাবের পিতা। তাঁর প্রণীত মুসান্নাফের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ছয়শতে। এ সংখ্যা সেসব কিতাবকে ছেড়ে যেগুলো তিনি পরিত্যাগ করেছেন বা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন।

হিম্মত জানে না বার্ধক্য কাকে বলে

ইমাম বুখারি ﵀ তাঁর সহিহ বুখারিতে বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর সাথিগণ বুড়ো বয়সেও ইলম শিখেছেন।'

নুআইম বিন হাম্মাদ ﵀ বলেন, ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কতদিন যাবৎ ইলম অর্জন করবেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ইনশাআল্লাহ, মৃত্যু পর্যন্ত।'

- ইবনে মুআজ বলেন, 'আমি আমর বিন আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কারও জন্য কতদিন পর্যন্ত ইলম শিক্ষা করা উত্তম?" তিনি বললেন, "যতদিন জীবন তার প্রতি অনুগ্রহ করে।"'

- ইমাম ইবনে আকিল ﵀-এর বয়স যখন আশি, তখন নিজ হিম্মতের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আমি জীবনের একটি মুহূর্তও বিনষ্ট করা বৈধ মনে করি না। এমনকি যখন আমার জিহ্বা আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে এবং দৃষ্টি মুতালাআ

থেকে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন বিশ্রাম অবস্থায় নিজের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাই আমি। এরপর যখন আমি উঠে বসি, তখন লেখার মতো কিছু না কিছু পেয়ে যাই। আর বিশ বছর বয়সে ইলমের প্রতি আমার যে আগ্রহ ছিল, এখন আশি বছর বয়সে তার চেয়ে বেশি আগ্রহ উপলব্ধি করছি।'

مَا شَابَ عَزْمِيْ وَلَا حَزْمِيْ وَلَا خُلُقِيْ

وَلَا وَفَـائِيْ وَلَا دِيْـنِيْ وَلَا كَـرَمِيْ

وَإِنَّمَا اعْتَاضَ رَأْسِيْ غَيْرَ صَـبْغَـتِهِ

وَالشَّيْبُ فِيْ الرَّأْسِ غَيْرُ الشَّيْبِ فِيْ الْهِمَمِ

'আমার প্রত্যয়ে, আমার প্রত্যাশায়, আমার চরিত্রে বার্ধক্যের ছোঁয়া লাগেনি। ভাটা পড়েনি আমার দ্বীন, আমার মহত্ত্ব কিংবা আমার কর্তব্যপরায়ণতায়। বার্ধক্য কেবল আমার চুলের রংটা বিগড়ে দিয়েছে। আমার হিম্মত ও মনোবলে তার কোনো প্রভাব পড়েনি।'

জারনুজি ﷺ বলেন, 'হাসান বিন জিয়াদ ইলমে ফিকহ শেখা শুরু করেন আশি বছর বয়সে। তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ শয্যা গ্রহণ করেননি।'

- ইবনুল জাওজি ﷺ

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ-এর জীবনী আলোচনায় ইমাম জাহাবি ﷺ উল্লেখ করেন, 'তিনি আশি বছর বয়সে ইবনুল বাকিল্লানির নিকট কুরআনের দশ কিরাতের ইলম শেখেন। তাঁর সাথে তাঁর ছেলে ইউসুফও শেখেন তখন। ইবনুন নুকতাহ এটি কাজি মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন হাসান থেকে বর্ণনা করেন।'

ইমাম ইবনুল জাওজি ﷺ তাঁর হিম্মতের উচ্চতা, তাঁর উচ্চ মনোবলের কথা বর্ণনায় বলেন :

اَللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُـطَوِّلَ مُـدَّتِيْ *** وَأَنَالَ بِالْإِنْعَامِ مَا فِيْ نِـيَّـتِيْ

لِيْ هِمَّةٌ فِيْ الْعِلْمِ مَا مِنْ مِثْلِهَا * وَهِيَ الَّتِيْ جَنَتِ النُّحُوْلَ هِيَ الَتِيْ

كَمْ كَانَ لِيْ مِنْ مَجْلِسٍ لَوْ شُبِّهتْ *** حَالَاتُهُ لَتَشَبَّهَتْ بِالْجَنَّةِ

'আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি বাড়িয়ে দেন আমার পরমায়ু। আল্লাহর রহমতে যেন আমি আমার হৃদয়ের সব প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি। ইলম অর্জনে আমার যে মনোবল তার কোনো তুলনা হয় না। এই উচ্চ মনোবলই তো আমাকে কৃশকায় করে তুলেছে। হিম্মতেই আমি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আশা করি। ইলমের কত অসংখ্য মজলিসে বসেছি আমি। সেই দৃশ্যগুলো যদি তুলনা করি, তবে কেবল জান্নাতই হয় তার উপমা।'

- ইমাম আল-কাফফাল ﷺ

ইমাম আল-কাফফাল ﷺ চল্লিশ বছর বয়সে ইলম শেখার সফর শুরু করেন। তখন তিনি মনে মনে বলেন, 'আমি কীভাবে ইলম অর্জন করব? কখন তা মুখস্থ করব? কখনই-বা বুঝতে পারব? কখন আর মানুষকে শিক্ষা দেবো?' এসব চিন্তা করে তিনি ফিরে এলেন। এরপর তিনি গাভিকে পানি পান করাচ্ছে—এমন এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, অনেক দিন থেকে লোকটির দুধের বালতির রশির ঘর্ষণে একটি পাথরে দাগ পড়ে গেছে। এটি দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি ইলম শিখব। এ ক্ষেত্রে কখনো বিরক্ত হব না।' অতঃপর তিনি এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন—

اُطْلُبْ وَلَا تَضْجَرْ مِنْ مَطْلَبٍ *** فَآفَةُ الطَّالِبِ أَنْ يَضْجَرَا

أَمَا تَرَى الْحَبْلَ لِطُوْلِ الْمَدَى *** عَلَى صَلِيْبِ الصَّخْرِ قَدْ أَثَّرَا

'ইলম অর্জন করো এবং কখনো বিরক্ত হয়ো না। কেননা, ছাত্রের জন্য বিপদ হলো বিরক্ত হয়ে পড়া। তুমি কি দেখো না যে, দীর্ঘ সময়ের ফলে রশি শক্ত পাথরে দাগ কেটেছে?'

তিনি ইলম অর্জনে লেগে রইলেন। একসময় বিশ্বখ্যাত উচ্চতায় বরিত ইমামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

- ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন হাজম ﵀

বর্ণিত আছে, ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন হাজম ﵀ ছাব্বিশ বছর বয়সে ইলম অর্জন শুরু করেন। আবু মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবি বলেন, 'আবু মুহাম্মাদ বিন হাজম বালিগ হওয়ার পর থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি বলেন, "এ বয়সে উপনীত হয়েও আমি জানতাম না, কীভাবে সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে নামাজ পড়তে হয়।"'

আবু মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবি অন্য বর্ণনায় বলেন, 'শাইখ আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমাদ বিন সাইদ বিন হাজম ﵀ আমাকে বলেন, "তাঁর ফিকহ অর্জনের কারণ ছিল এই যে, একদা তিনি তাঁর কোনো এক চাচার জানাজায় অংশগ্রহণ করলেন। তিনি আসরের সালাতের আগে মসজিদে প্রবেশ করলেন। মসজিদটি ছিল লোকে লোকারণ্য। তিনি গিয়ে সোজা বসে পড়লেন। তখন তাঁর উসতাজ ইশারায় বললেন, দাঁড়িয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকআত সালাত আদায় করো। কিন্তু তিনি এ কথাটি বুঝলেন না। তখন তাঁর পাশের জনৈক লোক বলল, "তুমি এত বড় হয়েছ, অথচ এখনো এটা জানো না যে, তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব?"[২৬৭] তখন তাঁর বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তিনি বলেন, "তখন আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাত আদায় করলাম। আর তখন আমার উসতাজের ইশারা বুঝতে পারলাম।" তিনি বলেন, "যখন জানাজা শেষ হলো, তখন আমি মসজিদে ফিরে এলাম। কারণ, সেখানে মাইয়িতের নিকটাত্মীয়রা ছিল। আমি তাদের সাথে শরিক হতে চাইলাম। আমি মসজিদে প্রবেশ করেই সালাত আদায় করতে শুরু করলাম। তখন ছিল আসর নামাজের পরের সময়। আমাকে বলা হলো, "বসো, বসো! এখন সালাতের সময় নয়।" আমি খুব লজ্জা পেলাম। মনে খুব সংকোচ অনুভব করলাম। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে আমার উসতাজকে বললাম, ফকিহ আবু আব্দুল্লাহ বিন দাহুনের ঠিকানা দিন আমাকে। এ ফকিহ সভার পরামর্শদাতা ছিলেন। উসতাজ আমাকে ঠিকানা দিলেন।

আমি সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলাম ইবনে দাহুনের কাছে। তাঁকে নিজের ঘটনার বিবরণ দিলাম। আমি তাঁর কাছে ইলমের প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু

....

২৬৭. জুমহুর ফকিহদের নিকট সুন্নাত এবং জাহিরিদের নিকট ওয়াজিব।

করতে আবেদন করলাম। দিকনির্দেশনা চাইলাম। তিনি আমাকে "মুয়াত্তা" পাঠ করতে বললেন। আমি পরবর্তী দিন থেকে তার কাছে পড়া শুরু করলাম। তিন বছর পর্যন্ত তাঁর নিকট ও অন্যদের নিকট পড়াশোনা অব্যাহত রাখি। এরপর মুনাজারা শুরু করি।'"

আমর বিন ওয়াজিব বলেন, 'আমরা তখন আমার বাবার নিকট ছিলাম স্পেনের বালানসিয়া শহরে। তিনি নিজ মাজহাবের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে আবু মুহাম্মাদ বিন হাজমও ছিলেন। তিনি আমাদের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন। উপস্থিত লোকদের ফিকহের একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে উত্তর প্রদান করা হলো। কিন্তু তিনি তাতে আপত্তি করে বসেন। তখন উপস্থিত এক লোক বলল, "এই ইলম তোমার সাধ্যের বাইরে।" তিনি উঠে গেলেন। ঘরে ফিরে বসে পড়লেন মুতালাআয়। তার ঘাম ঝরতে থাকল। কিন্তু তিনি বিরত হলেন না। আমরা অল্প কয়েক মাস পরেই আবার সেখানে গেলাম। তখন তিনিই সবচেয়ে সুন্দর বিতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ইজতিহাদ করি, সত্যের অনুসরণ করি, কোনো মাজহাবের শিকলে আবদ্ধ হই না।'

- ইয়াহইয়া আন-নাহবি ﵀

তিনি ছিলেন একজন মাঝি। নৌকা দিয়ে যাত্রীদের পারাপার করতেন। ইলমকে ভালোবাসতেন খুব। ইসকানদারিয়া উপদ্বীপের আলিম ও ছাত্ররা তার নৌকা দিয়ে পার হতো। তারা নিজেদের গবেষণার ব্যাপারে পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা করত। তখন তার হৃদয়ে স্পন্দন তৈরি হতো। ইলমের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠত তার অন্তর। যখন ইলম অর্জনের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত দৃঢ় হলো, তখন নিজে নিজে চিন্তা করলেন যে, আমার বয়স এখন চল্লিশের অধিক। আমি কিছুতেই তুষ্ট হইনি। নৌকা চালানোর এই পেশা ছাড়া আর কিছুই জানি না। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমি নিজেকে ইলমের জন্য সঁপে দেবো?' তিনি এসব ভাবছিলেন, এমন সময় দেখলেন, একটি পিপীলিকা খেজুরের শাঁস তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বারবার তা পড়ে যাচ্ছে। যখনই পড়ে যাচ্ছে, সে পুনরায় তুলে নিচ্ছে। সে অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এভাবে কয়েকবার চেষ্টা করার পর নিজের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে পিপীলিকাটি। এবার ইয়াহইয়া মনে মনে বললেন, 'যখন দুর্বল এই প্রাণীটি নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমে

লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে, তাহলে তো আমি চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে আরও উত্তমরূপে নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।' তিনি নৌকাটা বিক্রি করে সাথে সাথে বের হয়ে গেলেন। ইলমি অঙ্গনকে আঁকড়ে ধরলেন। নাহু (আরবি ব্যাকরণ), লুগাত (ভাষাবিজ্ঞান) ও মানতিক (তর্কশাস্ত্র) দিয়ে তার শিক্ষা শুরু হলো। এসবে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। যেহেতু তিনি প্রথমে এসব বিষয় পড়া শুরু করেন, তাই তাকে এসবের সাথেই নিসবত করে 'আন-নাহবি' বলা হয়। আর এ উপাধিতেই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। রচনা করেন বহু গ্রন্থ। আমর বিন আস ﷺ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে আমর ﷺ খুব বিস্ময় প্রকাশ করলেন।[২৬৮]

- শাইখ ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম ﷺ। ইলম ও আত্মসম্মানের প্রতীক হয়ে আছেন পৃথিবীতে। জীবনের শুরুতে ছিলেন হতদরিদ্র। ইলমে মনোনিবেশ করেছেন বুড়ো বয়সে।

- শাইখ আহমাদ বিন ইবরাহিম বিন হাসান কিনায়ি ইলম অর্জন শুরু করেন ত্রিশ বছর বয়সে। পাণ্ডিত্য অর্জন করেন নাহু, ফিকহসহ অন্যান্য বিষয়ে। দক্ষ হয়ে ওঠেন। লোকজন তার শহরের দিকে ছুটে আসেন তাঁর কাছে ইলম শিখতে। দৈনিক চারশ লাইন মুখস্থ করতেন তিনি। আল্লাহর আনুগত্যে মনোনিবেশ করেন। অবশেষে ৭২৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

- ইউসুফ বিন রিজকুল্লাহ। বেশ বুড়িয়ে গেলেন। বয়স ঠেকে গেল নব্বইতে। কান ভারী হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় শক্তি ছিল নিরাপদ। হিম্মত ছিল ত্রিশ বছরের যুবকের মতো। ৭৪৫ হিজরির সফর মাসে নিজের লিখিত কিতাবে স্বাক্ষর দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

- শাইখ আহমাদ বিন আব্দুল কাদির আল-কিসি আল-হানাফি আন-নাহবি অনেক বিষয়ে ইলম অর্জন করলেন। সেসব ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। জীবনের শেষ বয়সে এসে হাদিস শেখা শুরু করেন। তখন কতক লোক এটি অপছন্দ করল। তিনি এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করে তাদের প্রত্যুত্তর করেছিলেন :

....

২৬৮. ইখবারুল উলামা : ২৩৪

وَعَابَ سَمَاعِيْ لِلْأَحَادِيْثِ بَعْدَمَا * كَبُرْتُ أُنَاسٌ هُمْ إِلَى الْعَيْبِ أَقْرَبُ

وَقَالُوْا: إِمَامٌ فِيْ عُلُوْمٍ كَثِيْرَةٍ *** يَرُوْحُ وَيَغْدُوْ سَامِعًا يَتَطَلَّبُ

فَقُلْتُ مُجِيْبًا عَنْ مَقَالَتِهِمْ وَقَدْ *** غَدَوْتُ لِجَهْلٍ مِّنْهُمْ أَتَعَجَّبُ

إِذَا اسْتَدْرَكَ الْإِنْسَانُ مَا فَاتَ مِنْ عُلًا

لِلْحَزْمِ يُعْزَى لَا إِلَى الْجَهْلِ يُنْسَبُ

'আমি বৃদ্ধ হওয়ার পর হাদিস শিখছি বলে কিছু লোক আমাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করছে। অথচ তারা নিজেরাই ভ্রান্তির অধিক নিকটে অবস্থান করছে। তারা বলছে, নাহব, ফিকহ ও লুগাতের মতো একাধিক ইলমের ইমাম সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করছেন হাদিস শ্রবণ ও অনুসন্ধান করে! আমি তাদের উত্তরে বললাম, আমি তোমাদের অজ্ঞতায় খুবই আশ্চর্য হচ্ছি। মানুষ যখন বুঝতে পারে অমুক মর্যাদাটি তার অর্জিত হয়নি, (আর সে ওই মর্যাদা অর্জনের জন্য মেহনত শুরু করে) তাকে তো বুদ্ধিমান বলেই ধরা হয়। তাকে কীভাবে অজ্ঞ বলা যায়!'

শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ইলম শেখা ও শেখানো

- মুআফা বিন জাকারিয়া এক বিশ্বস্ত রাবি থেকে বর্ণনা করেন, আবু জাফর তাবারি ﵀-এর মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন তিনি। এ ঘটনার এক ঘণ্টা বা তার চেয়েও কম সময়ের মাঝেই ইনতিকাল করেন তাবারি ﵀। তাঁর কাছে জাফর বিন মুহাম্মাদের সূত্রে একটি দুআর কথা বলা হলে তিনি ডেকে কালি ও কলম আনালেন এবং দুআটি লিখে রাখলেন। তাকে বলা হলো, 'এই অবস্থায়ও?' বললেন, 'মানুষের জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইলম অর্জন পরিত্যাগ করা উচিত নয়।'

- বসরার মসজিদের ইমাম উপাধি-খ্যাত ফারকাদ ﵀ বলেন, তারা সুফইয়ান ﵀-এর মৃত্যুশয্যায় তাঁর নিকট গেলেন। তখন এক লোক একটি হাদিস বর্ণনা করল। এতে সুফইয়ান ﵀ আশ্চর্যান্বিত হলেন। বিছানার নিচে হাত দিয়ে

ফলক বা স্লেটজাতীয় কিছু একটা বের করে আনলেন। তাতে লিখে রাখলেন হাদিসটি। লোকজন বলল, 'এই অবস্থায়ও লিখছেন আপনি?!' তিনি বললেন, 'এটি নেক কাজ। যদি আমি বেঁচে যাই, তাহলে একটি নেক জিনিস শুনলাম। আর যদি মরে যাই, তাহলে একটি নেক জিনিস লিখে মরলাম।'

- ফকিহ আবুল হাসান আলি বিন ইসা আল-ওয়ালওয়ালিজি বলেন, 'আমরা আবু রাইহান আল-বাইরুনির নিকট গেলাম। তখন তিনি শেষ নিশ্বাস নিচ্ছেন। গলায় মৃত্যুকালীন ঘড়ঘড় শব্দ। কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। এ অবস্থায় আমাকে বললেন, "তুমি একদিন আমাকে জাদ্দাতে ফাসিদাহ[২৬৯]-এর হিসাব দিয়েছিলে—সেটা যেন কেমন ছিল?" আমি তাঁর প্রতি করুণার দৃষ্টি দিয়ে বললাম, "এই অবস্থায়ও?" তিনি বললেন, "ওহে, এই মাসআলা সম্পর্কে জেনে মৃত্যুবরণ করা কি আমার জন্য না জেনে মৃত্যুবরণ করা থেকে উত্তম হবে না?!" আমি তাঁকে সেই হিসাবটি করে দিলাম। তিনি মুখস্থ করে নিলেন। এরপর তিনি আমাকে যা শেখানোর ওয়াদা করেছিলেন, তা শেখালেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসতেই মানুষের বিলাপ শুনতে পেলাম।'

- কাজি ইবরাহিম বিন জাররাহ আল-কুফি ﵀ ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ (১৮২ হি.)-এর ছাত্র। যাকে বলা হতো, 'দুনিয়াশ্রেষ্ঠ কাজি।'

ইবরাহিম বিন জাররাহ বলেন, 'আবু ইউসুফ ﵀ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি বেহুঁশ অবস্থায়। হুঁশ ফিরে পেলে আমাকে বললেন, "হে ইবরাহিম, অমুক মাসআলায় তোমার অভিমত কী?" আমি বললাম, "এই অবস্থায় মাসআলা?!" তিনি বললেন, "কোনো অসুবিধা নেই। আমরা অধ্যয়ন করতে থাকব। হয়তো কোনো মুক্তিকামী এর মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে যাবে।" এরপর তিনি বললেন, "হে ইবরাহিম, হজে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম? হেঁটে না আরোহী অবস্থায়?"

: আরোহী অবস্থায়।

: তুমি ভুল বলেছ।

....

২৬৯. ইলমুল ফারায়িজের পরিভাষা। এর দ্বারা মায়ের ঊর্ধ্বতন সূত্র বোঝায়।

: তবে হেঁটে।

: তাও ভুল করছ।

: আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আপনিই বলুন।

: যদি দুআর উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়ায়, তাহলে হেঁটে পাথর নিক্ষেপ উত্তম। আর যদি না দাঁড়ায়, তাহলে আরোহী অবস্থায় উত্তম।'

এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে এলাম। বের হয়ে দরজার কাছে পৌঁছতেই মানুষের বিলাপ শুনতে পেলাম। তিনি ইনতিকাল করলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

- হাদিস শেখার কোনো এক সফরে ইমাম আহমাদ ﷺ-কে তাঁর এক পরিচিত লোক দেখতে পেলেন। লোকটি ইমাম আহমাদের বেশি বেশি হাদিস মুখস্থ, লেখা ও বর্ণনা করতে চাওয়ার ওপর আপত্তি তুলে বলল, 'একবার কুফায়, একবার বসরায়! এভাবে কতদিন?' জবাবে ইমাম আহমাদ বললেন, 'দোয়াতের সাথে কবর পর্যন্ত।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদত ও অবিচলতায় সালাফের উচ্চ মনোবলের পরিচয়

সালাফে সালিহিন আল্লাহ তাআলার বিধানকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তারা দুনিয়ার স্বরূপ ও আখিরাতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। বুঝতে পেরেছেন এ দুনিয়া থাকার জায়গা নয়; বরং সবাইকে আখিরাতে নিশ্চিত পাড়ি জমাতে হবে। তাই তারা ফিতনা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন। দেহকে শয্যা থেকে পৃথক রেখে ডুব দিয়েছেন মহান প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগিতে। দুনিয়ার লোভনীয় বস্তু থেকে তাদের হৃদয় মুক্ত ছিল। তাদের হিম্মত ছিল নিম্ন জিনিসের উর্ধ্বে। তাই তো তাদের দেখা যেত সাওম পালনে, সালাতে দণ্ডায়মান, ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়। তাদের জীবনীগুলো ভরপুর তাওবা ও দৃঢ়তার গল্পে এবং ইবাদত-বন্দেগিতে তাদের অনুপম শক্তিমত্তার বিবরণে।

এখানে তোমাদের সামনে তাদের ইবাদত-বন্দেগির কিছু দিক তুলে ধরছি।

হাসান ﷺ বলেন, 'যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমার সাথে কেউ প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাহলে তুমি তার সাথে প্রতিযোগিতা করো। আর যদি দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার সাথে কেউ প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাহলে দুনিয়াকে তার ঘাড়ে ছুড়ে মারো।'

ওয়াহাইব বিন ওয়ারদ বলেন, 'যদি আল্লাহর দিকে ধাবমানতার ক্ষেত্রে তুমি সবার অগ্রবর্তী হওয়ার সামর্থ্য রাখো, তবে তা-ই কোরো।'

শাইখ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন উসমান তুরকিস্তানি বলেন, 'আমার কাছে যারই ইবাদতের সংবাদ পৌঁছেছে, আমি সে ইবাদত তার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি করেছি।'

জনৈক আবিদ বলেন, 'যদি কেউ আরেকজনের ব্যাপারে জানতে পারে যে, সে তার চেয়েও বেশি আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতকারী, এটা জানতে পেরে যদি সে দুঃখে ইনতিকাল করে, তবে এ মৃত্যু বেশি কিছু হবে না।'

নাফি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইবনে উমর ﷺ ঘরে কী করতেন?' নাফি জবাব দিলেন, 'প্রত্যেক সালাতের জন্য অজু করতেন। আর এর মাঝের সময়টাতে কুরআন নিয়ে মগ্ন থাকতেন।'

ইবনে উমর ﷺ-এর এক ওয়াক্ত সালাতের জামাআত ছুটে গেলে তিনি একদিন রোজা রাখতেন, একরাত জেগে আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং একটি গোলাম মুক্ত করে দিতেন।

আবু মুসা আশআরি ﷺ মৃত্যুর কিছু দিন আগে বেশ উদ্যমের সাথে ইবাদত করা শুরু করলেন। তাঁকে বলা হলো, 'যদি একটু ক্ষান্ত হতেন বা নিজের প্রতি সামান্য দয়া করতেন?' তিনি বললেন, 'ঘোড়া যখন তার গন্তব্যের কাছাকাছি চলে আসে, তখন নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে। আর আমার মৃত্যুর যে সময় বাকি আছে, তা তো আরও নিকটবর্তী।' তিনি মৃত্যু অবধি এভাবেই ইবাদত করতে থাকলেন।

কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুওয়াররিক আল-ইজলি বলেন, "দুনিয়াতে মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো সমুদ্রের মাঝে কাঠ ধরে থাকা ব্যক্তির মতো—যে "হে আমার রব, হে আমার রব!" বলে প্রার্থনা করছে। আর আশা করছে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।"'

উসামা ﷺ বলেন, 'যে সুফইয়ান সাওরি ﷺ-কে দেখত, তার কাছে তাঁকে সে নৌকায় আরোহী ব্যক্তির মতো মনে হতো, যে আরোহী নৌকাডুবির ভয় করছে আর অধিক পরিমাণে বলছে, "হে আমার রব, রক্ষা করো, রক্ষা করো।"'

জাফর ﷺ বলেন, 'আমরা আবু তাইয়াহ ﷺ-এর অসুস্থতার সময়ে তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, মানুষ আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অনেক শিথিলতা করছে, মুসলিমদের উচিত আল্লাহর বিধান পালনে আরও বেশি চেষ্টা-সাধনা করা।" এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।'

উমর বিন আব্দুল আজিজের স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক বলেন, 'আমি উমর বিন আব্দুল আজিজের চেয়ে অধিক সালাত ও সাওম পালনকারী, তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহভীরু দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। তিনি ইশার সালাত আদায়

করে বসে কাঁদতে থাকতেন, যতক্ষণ না চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসত। এরপর আবার সজাগ হয়ে কাঁদতে থাকতেন, যতক্ষণ না ঘুম চেপে বসত। তিনি আমার পাশেই ঘুমাতেন। যখন আখিরাতের কোনো কথা স্মরণ হতো, সাথে সাথে শরীর ঝেড়ে উঠে যেতেন—যেমন চড়ুই পাখি পানি ঝেড়ে ওঠে। এরপর বসে কাঁদতে শুরু করতেন। তখন আমি তাঁর গায়ে লেপ ছড়িয়ে দিতাম।'

মুগিরা বিন হাকিম বলেন, 'আমাকে ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক বলেছেন, "হে মুগিরা, সালাত ও সাওমের দিক থেকে কেউ কেউ উমর বিন আব্দুল আজিজের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে। কিন্তু আমি কাউকে তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে দেখিনি। ঘরে এসে নিজের সালাত আদায়ের স্থানে চলে যেতেন তিনি। দুআ করতেন আর কাঁদতে থাকতেন যতক্ষণ না দুচোখে ঘুম চেপে আসে। এরপর আবার জেগে উঠতেন। তিনি এভাবে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন।"'

আবু উবাইদা বিন উকবা বিন নাফি ﵀ ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিকের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে উমর বিন আব্দুল আজিজ সম্পর্কে কিছু বলুন।' ফাতিমা উত্তর দিলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কোনো দিন সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে গোসল করেছেন বলে আমার জানা নেই।'

আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ খুব ইবাদত করতেন। গ্রীষ্মকালের প্রখর রোদের সময়েও রোজা রাখতেন। ফলে তাঁর দেহ হলুদ ও সবুজ বর্ণ ধারণ করত। একবার আলকামা বিন কাইস ﵀ তাঁকে বললেন, 'কেন নিজের নফসকে এত কষ্ট দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আমি নফসের সম্মান প্রত্যাশা করি।' রোজা রাখার কারণে তাঁর দেহ সবুজ বর্ণ ধারণ করত। তিনি সালাত আদায় করতে থাকতেন পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। আনাস বিন মালিক ও হাসান ﵄ তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে এত কিছুর আদেশ করেননি।' তিনি তাঁদের জবাব দিলেন, 'আমি অধীনস্থ এক গোলাম। আনুগত্য ও ইবাদতে কোনো ছাড় দেবো না।'

আমির বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কীভাবে ইবাদত করে রাতের অনিদ্রা আর সাওম রেখে গরমের তৃষ্ণা সহ্য করেন?' তিনি বললেন, 'আমি কেবল দিনের আহারকে রাতে ও রাতের ঘুমকে দিনে নিয়ে যাই? এটি তো কঠিন কোনো বিষয় নয়।' রাত হয়ে গেলে তিনি বলতেন, 'জাহান্নামের আগুন রাতের আরাম নিয়ে গেছে।' এ বলে সকাল পর্যন্ত আর ঘুমাতেন না। সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

হাসান ﵀ বলেন, 'দুনিয়া নিয়ে আলোচনারত একদল লোককে আমির বিন কাইস ﵀ বললেন, "তোমরা দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করছ? আল্লাহর শপথ, যদি আমি পারতাম, তবে দুনিয়া ও আখিরাতের দুশ্চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করতাম।" আল্লাহর শপথ, তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত এটাই করে গেছেন।' অর্থাৎ তিনি দুনিয়া-আখিরাতের দুশ্চিন্তাকে একত্র করে আখিরাতের চিন্তায় রূপান্তরিত করেছেন।

আহমাদ বিন হারব বলেন, 'এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বড় বিস্ময় হয়, যে জানে, জান্নাত সজ্জিত করা হচ্ছে তার ওপরে এবং জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হচ্ছে তার নিচে। কিন্তু মাঝখানে সে কীভাবে ঘুমায়?' এমন যার অবস্থা, তার তো নিচের জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এবং ওপরের সুসজ্জিত জান্নাত লাভ করার জন্য ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত।

আবু মুসলিম আল-খাওলানি ﵀ তাঁর ঘরে নামাজের স্থানে চাবুক ঝুলিয়ে রাখতেন নিজেকে ভয় দেখানোর জন্য। তিনি বলতেন, 'হে নফস, সালাতে দাঁড়িয়ে যাও! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ততক্ষণ পর্যন্ত চলব, যতক্ষণ আমার থেকে নয়; বরং তোমার থেকে ক্লান্তি ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়।' যখন তাঁর অলসতা আসত, চাবুক হাতে নিয়ে তিনি নিজের পায়ের নলিতে আঘাত করতেন আর বলতেন, 'আমার বাহনের ঘোড়া-উটের চেয়েও তুমিই বেশি মার খাওয়ার উপযোগী।' তিনি বলতেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথিরা কি ধারণা করেছে যে, আমাদের পেছনে রেখে তাঁরা একচেটিয়া মর্যাদা অর্জন করবে? কখনো নয়, আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁদের সাথে এমনভাবে প্রতিযোগিতা করব, তাঁরা বুঝবেন যে, বাস্তবেই তাঁরা উত্তরসূরি রেখে গেছেন।'"

মানসুর বিন মুতামিরকে দেখলে মনে হতো, তিনি বিপদগ্রস্ত কোনো লোক। অবনত দৃষ্টি। ভাঙা কণ্ঠ। আদ্র দুচোখ। যদি তুমি তাকে নাড়া দাও, তবে দুচোখের চার কোনা থেকেই পানি বের হয়ে আসবে। তাঁর মা একবার তাঁকে বললেন, 'তুমি নিজের প্রতি এ কেমন আচরণ করছ? পুরো রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিচ্ছ, ক্ষান্ত হচ্ছ না একটুও! বেটা আমার, মনে হচ্ছে তুমি নিজেকে কঠিন কোনো বিপদে ফেলেছ। মনে হয় তুমি কাউকে হত্যা করেছ!' তিনি তখন বললেন, 'মা আমার, আমি জানি, আমার নফস কী করেছে।'

মানসুর বিন জাজান ﷺ-এর ছাত্র হুশাইম ﷺ বলেন, 'মানসুর এমন মানুষ ছিলেন যে, যদি বলা হতো মৃত্যুর ফেরেশতা দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছেন, তবুও তখন তাঁর আমলে বাড়ানোর মতো কিছু থাকত না।' কেননা, তাঁর দিনরাত আমলে পূর্ণ ছিল।

সাফওয়ান বিন সুলাইম নিজের পা-দুটিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সালাত আদায়ের সাথে বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি ইবাদতে এমন অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন যে, যদি তাঁকে বলাও হতো 'আগামীকাল কিয়ামত', তবুও অতিরিক্ত করার মতো কিছু পেতেন না।... তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার সাক্ষাৎ পছন্দ করি, সুতরাং আপনিও আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করুন।"'

আনাস বিন ইয়াজ বলেন, 'আমি সাফওয়ান বিন সুলাইমকে দেখেছি। যদি তাঁকে বলা হতো "আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে", তবুও তাঁর ইবাদতে বৃদ্ধি করার মতো কিছুই থাকত না।'

আব্দুর রহমান বিন মাহদি বলেন, 'যদি হাম্মাদ বিন সালামাকে বলা হতো, "আপনি আগামীকাল মারা যাবেন", তবুও ইবাদতের মাত্রা সামান্যও বাড়াতে পারতেন না তিনি।" কেননা, তাঁর দিনরাত পুরোটাই ইবাদতে ভরপুর ছিল।

মুসা বিন ইসমাইল বলেন, 'যদি আমি তোমাদের বলি, "আমি কখনো হাম্মাদ বিন সালামাকে হাসতে দেখিনি"—তবে আমি সত্যিই বলেছি। তিনি সব সময় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। হয়তো হাদিস বর্ণনা করতেন, না হয় নিজে নিজে অধ্যয়ন করতেন অথবা তাসবিহ পাঠ করতেন কিংবা সালাত আদায়ে

রত থাকতেন। দিনরাতের পুরো সময়টা তিনি এ কাজগুলোতেই ভাগ করে নিয়েছিলেন।'

রবি বিন খুসাইমের মেয়ে তাঁকে বলত, 'বাবা, আমাকে বলো, মানুষজন যখন ঘুমে বিভোর থাকে, তখন তুমি জেগে থাকো কেন?' রবি ﷺ জবাব দিলেন, 'কন্যা আমার, তোমার পিতা নৈশ আক্রমণের ভয়ে তটস্থ থাকে।'

ইবরাহিম ﷺ বলেন, 'অমুক বলেছেন, "আমি বিশ বছর যাবৎ রবি বিন খুসাইমকে শুধু এমন কথাই বলতে শুনেছি, যার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।" আবার জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আমি বিশ বছর রবি ﷺ-এর সংশ্রবে ছিলাম। আমি কখনো তাঁর থেকে দোষের কোনো কথা শুনিনি।"'

মালিক ﷺ বলেন, 'আমি আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি ﷺ-কে মক্কায় দুবার হজ করতে দেখলাম, কিন্তু তাঁর থেকে কোনো হাদিস লিখলাম না। তৃতীয়বার তাঁকে জমজম প্রাঙ্গণে বসা দেখলাম। তাঁর অবস্থা খুব নাজুক ছিল। যখন তাঁর কাছে নবিজি ﷺ-এর আলোচনা করলাম, তিনি কাঁদতে থাকলেন। একসময় তাঁর প্রতি আমার দয়া হলো। যখন আমি তাঁর মাঝে এটা দেখলাম, তখন তাঁর থেকে হাদিস লিখা শুরু করলাম।'

সালামা বিন আলকামা ﷺ বলেন, 'আমি ইউনুস বিন উবাইদের সাথে ওঠাবসা করেছি। তাঁকে দেখেছি কাছ থেকে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আবু হারুন মুসা বলেন, 'আওন ﷺ আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতেন আর তখন অত্যধিক কান্নার কারণে তাঁর দাড়ি চোখের পানিতে সিক্ত থাকত।'

আবু আলি বিন শিহাব বলেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহ বিন বাত্তাকে বলতে শুনেছি, "ঘুমের সময় আমি চল্লিশটি হাদিসের ওপর আমল করি, যা আমি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি।"'

কাসিম বিন রশিদ আশ-শাইবানি ﷺ বলেন, 'জামআহ ﷺ মিহসাবে এলে আমাদের মেহমান হতেন। তাঁর পরিবার ছিল। কয়েকটি মেয়েও ছিল। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন তিনি। সাহরির সময় হলে তিনি উচ্চ

আওয়াজে ডেকে ডেকে বলতেন, "হে বিবাহের যাত্রীরা, তোমরা কি পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটাবে? তোমরা কি জাগবে না। তোমরা কি সফর শুরু করবে না?" তাঁর ডাক শুনে পরিবারের সকলে লাফিয়ে উঠত। পুরো ঘর তখন ইবাদত ও আমলে ভরে যেত। ঘরের এক কোণে কাঁদার আওয়াজ তো অন্য কোথাও আবার দুআর আওয়াজ। কেউ কুরআন পাঠ করছে তো দেখা যাচ্ছে, অন্য কেউ অজু করছে। যখন ফজর হয়ে যেত, তখন উচ্চ আওয়াজে তিনি বলতেন, 'রাতভর যে গন্তব্যপানে ছুটে চলে, তার সকালটা সুমিষ্ট হয়।'

ওয়াকি ﵀ বলেন, 'আমাশ ﵀-এর প্রায় সত্তর বছরে কখনো জামাআতে তাকবিরে উলা ছোটেনি। আমি তাঁর কাছে প্রায় ষাট বছর যাতায়াত করেছি। কিন্তু কখনো তাঁকে কোনো এক রাতও সালাত কাজা করতে দেখিনি।'

আবু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, 'রবি বিন খুসাইম ﵀ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলেও তাঁকে ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হতো। একবার তাঁকে বলা হলো, "আল্লাহ তো আপনাকে অবকাশ দিয়েছেন!" তিনি বললেন, "হাইয়া আলাস সালাহ (এসো সালাতের দিকে) শুনেও কি আমি বসে থাকব! যদি তোমরা এর কল্যাণ জানতে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে সালাত আদায় করতে।"'

হাম্মাদ বিন সালামা বলেন, 'আল্লাহর ইবাদত করা যায়—এমন যেকোনো সময়ে আমরা সুলাইমান আত-তাইমির নিকট আসলে তাঁকে ইবাদতে মগ্ন দেখতাম। যদি সালাতের সময় হতো, তাহলে তাঁকে সালাতরত দেখতাম। আর সালাতের সময় না হলে অজুরত বা কোনো রোগীর সেবা অথবা জানাজায় অংশ নিতে দেখতাম কিংবা মসজিদে বসা দেখতাম। তিনি ইবাদতহীন থাকা এতটুকুও পছন্দ করতেন না।'

ইসা বিন উমর বলেন, 'আমর বিন উতবা বিন ফারকাদ রাতের বেলা ঘোড়ায় চেপে বের হতেন। কবরস্থানে গিয়ে থামতেন আর বলতেন, "হে কবরবাসী, আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আমলসমূহ তুলে নেওয়া হয়েছে।" এরপর কাঁদতে থাকতেন। এরপর ফজর পর্যন্ত সালাতে রত থাকতেন। সুবহে সাদিকের সময় ফিরে এসে ফজরের জামাআতে শরিক হতেন।'

ইমাম আবুল কাসিম বিন আসাকির ﵀-এর ব্যাপারে আবুল মাওয়াহিব বিন সাসরা ﵀ বলেন, 'আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে অবিচল চলেছে—এমন দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। তিনি বিনা ওজরে কখনো প্রথম কাতারের সালাত পরিত্যাগ করেননি। রমাজান ও জিলহজের ইতিকাফ করতেন সব সময়। সম্পদ অর্জন বা ঘরবাড়ি তৈরির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করতেন না তিনি। নিজের নফসকে এগুলো থেকে মুক্ত রেখেছেন। ইমামত ও খিতাবাতের পদসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন সর্বদা। তাঁর সামনে এসবের আবেদন আসলেও তিনি গ্রহণে অস্বীকার করেছেন। নিজেকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করতেন না কখনো।'

বিশ্বস্ত হাদিসবিশারদ বাশার বিন হাসান ﵀-কে বলা হতো, 'আস-সাফি'। যার অর্থ সফ বা কাতারে দাঁড়ানো ব্যক্তি। তাঁর এ উপাধির কারণ হচ্ছে, তিনি পঞ্চাশ বছর যাবৎ বসরার মসজিদে সালাত আদায় করেছিলেন প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে।

ইবরাহিম বিন মাইমুন আল-মারুজি ছিলেন একজন দায়ি ও সিকাহ মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন আতা বিন আবি রবাহ ﵀-এর সাথিদের একজন। পেশায় স্বর্ণকার। সোনা-রুপা পিটিয়ে অলংকার তৈরি করতেন তিনি। আলিমগণ বলেন, 'তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ। সৎ কাজের আদেশকারী।' ইবনে মাইন বলেন, 'কাজ করার সময় হাতুড়ি তুলে আজান শুনতে পেলে তিনি সে ওঠানো থেকেই হাতুড়ি রেখে দিতেন। আজান শোনামাত্রই সব ব্যস্ততাকে পেছনে ফেলে মসজিদ পানে চলে যেতেন।'

আহনাফ বিন কাইস ﵀-কে বলা হলো, 'আপনি খুব ধীর গতির!' তিনি বললেন, 'আমি নিজের নফসকে দেখলাম, সালাতের সময় উপস্থিত হলেই খুব তাড়াহুড়া করে; যতক্ষণ না সালাত আদায় করে নিই, ততক্ষণ তাড়াহুড়া করতে থাকে, তাই আমি ধীরস্থিরতা অবলম্বন করি।'

কাসির বিন উবাইদ আল-হিমসি ﵀ হিমসে ষাট বছর ইমামতি করেছেন। কিন্তু কখনো সালাতে ভুল হয়নি তাঁর। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি

বলেন, 'আমি এমন অবস্থায় কখনো মসজিদে প্রবেশ করিনি, যখন আমার হৃদয়ে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু ছিল।'

'আল-মুগনি' গ্রন্থ-প্রণেতা ইমাম ইবনে কুদামা ﷺ-এর বংশধর শামের প্রধান বিচারপতি সুলাইমান বিন হামজা আল-মাকদিসি ﷺ বলেন, 'আমি জীবনে শুধু দুবার একাকী ফরজ সালাত আদায় করেছি। কিন্তু মনে হয়েছে যেন এই দুই ওয়াক্ত সালাত আদায়ই করিনি।' অথচ তখন তাঁর বয়স প্রায় নব্বই বছর। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

শরফুদ্দিন বিন মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, 'ইবনে দাকিক আল-ইদ অধিকাংশ সময় মিশরে আমাদের ঘরে অবস্থান করতেন। আমরা রাতের বেলা তাঁকে হয়তো সালাতরত দেখতাম, না হয় ঘরের বিভিন্ন দিকে চিন্তিত অবস্থায় হাঁটতে দেখতাম ফজর পর্যন্ত। যখন ফজরের সময় হতো, ফজর সালাত আদায় করে নিজের শয্যা গ্রহণ করতেন তিনি।'

শরফুদ্দিন ﷺ বলেন, 'আমি শাইখ শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন ইদরিস আল-কিরাফি আল-মালিকি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "শাইখ তাকি উদ্দিন চল্লিশ বছর যাবৎ রাতে শয্যা গ্রহণ করেননি। তিনি ফজরের সালাত আদায় করে দিনের আলো স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত ঘুমাতেন।"'

ইবনে ইমাদ আল-হাম্বলি ﷺ 'শাজারাতুজ জাহাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, 'আমি এমন কোনো কথা বলিনি, এমন কোনো কাজ করিনি—আল্লাহর কাছে জবাবদিহির জন্য যার উত্তর প্রস্তুত করিনি।' যেমনটি ইমাম আস-সুবুকি ﷺও বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ কুতুবুদ্দিন আল-হালাবি শাইখ তাকি উদ্দিন ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন, 'রাতের খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন তিনি। রাত কাটাতেন অধ্যয়ন, তিলাওয়াত, জিকির ও তাহাজ্জুদে। এমনকি রাত জেগে থাকা তাঁর অভ্যাস হয়ে যায়। তাঁর দিনরাতের পুরো সময়টিই কর্মবহুল থাকত। তাঁর যুগে তাঁর মতো কাউকে দেখা যায়নি।'

দান, বদান্যতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের হিম্মত ছিল উচ্চপর্যায়ের। আব্দুল্লাহ বিন তালিবের কাছে এক লোক এল। তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতির মতো কিছু নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করল। ইবনে তালিবের একটি মেয়ে ছিল, যে ইদের সময় তাঁর কাছে আসত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'আমি চাই মেয়েকে সাজিয়ে এবং তার অলংকারাদি ও জামাকাপড় পরিধান করিয়ে আমার কাছে পাঠাও।' স্ত্রী তা-ই করল। মেয়ে যখন তাঁর কাছে আসলো, তিনি অভিবাদন জানালেন এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর মা ও মেয়েকে বললেন, "অমুকে আমার কাছে এমন দুঃখ প্রকাশ করেছে। আমি চাই, আমার মেয়ের সকল অলংকার ও কাপড়চোপড় তাকে দিয়ে দেবো। এগুলো দিয়ে সে তার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করবে। আর আমি আমার মেয়ের জন্য এর চেয়েও অধিক জিনিসের জিম্মাদার।""

هُمُ الرِّجَالُ وَعَيْبٌ أَنْ يُقَا *** ـــلَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُمْ: رَجُلُ

'তারাই ছিল প্রকৃত মানুষ। যারা গুণে-মানে তাদের মতো হতে পারেনি, তাদেরকে মানুষ বলা আপত্তিকর।'

وَاحَسْرَتَاهُ تَقْضِيْ الْعُمُرُ وَانْصَرَمَتْ

سَاعَاتُهُ بَيْنَ ذُلِّ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَالْقَوْمُ قَدْ أَخَذُوْا دَرْبَ النَّجَاةِ وَقَدْ

سَارُوْا إِلَى الْمَطْلَبِ الْأَعْلَى عَلَى مَهَلِ

'হায় আফসোস, জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সময়গুলো অতিবাহিত হয়েছে অলসতা ও অক্ষমতার মাঝে! এদিকে জাতি মুক্তির পথ ধরেছে, ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে মহান লক্ষ্যপানে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যানুসন্ধানে উচ্চ মনোবলের পরিচয়

ইসলামের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি দিয়ে পূর্ণ হয়ে আছে। পূর্ণ হয়ে আছে তাদের অনুপম ঘটনায়—সত্য দ্বীনের সন্ধানে যাদের হিম্মত ও মনোবল ছিল সর্বোচ্চ; সত্যানুসন্ধানে যারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ফলে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের নাম লিখিত রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। তারা বান্দাদের সামনে আল্লাহর প্রমাণ, যে একনিষ্ঠ মনে সত্যের অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে সঠিক পথপ্রদর্শন করবেন, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ামত ইসলামের মাধ্যমে ধন্য করবেন। অতীত ও বর্তমানের এমনই কিছু চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা এ পরিচ্ছেদের ইতি টানব। আলোচনা করব তাদের নিয়ে, যারা সত্যানুসন্ধানে দেখিয়েছেন উচ্চ মনোবলের পরিচয়।

সালমান আল-ফারসি ﵁ : সত্যান্বেষণে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মাদায়িন শহর। ঘন গাছগাছালি-ভরা আর ছায়াপূর্ণ একটি বাড়ি। গাছের ছায়ায় বসে আছেন এক মহান ব্যক্তি। মর্যাদা যাঁকে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। গাম্ভীর্য যাঁকে সজ্জিত করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীরা তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছেন। সকলেই নীরব নিশ্চল বসে আছেন। সবাই শুনছেন গভীর আগ্রহে। শুনছেন সে মহান ব্যক্তির সত্যানুসন্ধানের কাহিনি।

একে একে বলে যাচ্ছেন, কীভাবে নিজ জাতি পারস্যের ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্মে এরপর ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছেন। বর্ণনা করছেন, শাশ্বত সত্য সন্ধানের পথে কীভাবে নিজের বিলাসী বাবার সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি। বলে যাচ্ছেন, আত্মা ও বিবেকের মুক্তির জন্য কীভাবে নিজেকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন দারিদ্র্যের কোলে।

তিনি বর্ণনা করছেন, কীভাবে তাকে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি করা হয়েছে, অথচ তিনি সত্যের সন্ধানে ছিলেন। বর্ণনা করছেন কীভাবে তাঁর সাক্ষাৎ হলো রাসুল ﷺ-এর সাথে? কীভাবে ইমান আনলেন তাঁর প্রতি?

তিনি সালমান আল-ফারসি। রাসুল ﷺ-এর সাহাবি সালমানুল খাইর। সত্য হৃদয়ে একনিষ্ঠ মনে যারা সত্যান্বেষণ করেন, তাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আসুন, তাঁর কল্যাণময় মজলিসে আমরাও কিছুক্ষণ বসি।

সালমান আল-ফারসি رضي الله عنه বলেন :

আমি ছিলাম ইস্পাহানের একজন বাসিন্দা। 'জি' নামক গ্রামে ছিল আমার বসবাস। আমার বাবা ছিলেন সে অঞ্চলের আমির। আল্লাহর বান্দাদের মাঝে বাবার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলাম আমি। অগ্নিপূজায় খুব সাধনা করেছিলাম। এমনকি অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারীতে পরিণত হলাম আমি। কখনোই আগুন নিষ্প্রভ হতে দিতাম না। আমার বাবার একটি ফসলি জমি ছিল। একদিন আমাকে সেখানে পাঠান তিনি। সেদিকে রওয়ানা শুরু করলাম। পথিমধ্যে খ্রিষ্টানদের একটি গির্জা ছিল। শুনলাম তারা সালাত আদায় করছে। দেখার জন্য গির্জায় গেলাম। সালাতের দৃশ্য দেখে ভালো লাগল আমার। মনে মনে বললাম, 'এদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম।' দিনটা সেখানে কাটালাম। সূর্য ডুবে গেল। বাবার জমির ধারে-কাছেও যাইনি সেদিন। বাড়িতেও ফিরে যাইনি। আমার খোঁজে বাবা লোক পাঠালেন। আমি খ্রিষ্টানদের সালাতে মুগ্ধ হয়ে তাদের ধর্মের মূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, 'সিরিয়ায়।' ফিরে এসে বাবাকে বললাম, 'আমি একটি গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে কিছু লোকের সালাত আদায় দেখে মুগ্ধ হলাম। দেখলাম, তাদের দ্বীন আমাদের দ্বীন থেকে উত্তম।'... আমাদের মাঝে কিছুক্ষণ বিতর্ক চলে।... আমাকে মানাতে না পেরে তিনি আমার পায়ে শিকল লাগিয়ে দিলেন। বন্দী করে রাখলেন আমাকে।...

আমি খ্রিষ্টানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠালাম, আমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তাদের আবেদন করলাম, সিরিয়া থেকে কাফেলা আসলে তাদের ফিরে যাওয়ার আগে যেন আমাকে সংবাদ দেয়। যাতে তাদের সাথে আমি সিরিয়ায় চলে যেতে পারি। তারা তা-ই করল। আমার কাছে তারা সংবাদ জানাল। আমি লোহার শিকল ভেঙে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। তাদের সাথে সিরিয়ায় চলে গেলাম। সেখানে তাদের আলিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমাকে গির্জা-অধিপতি আসকাফের কথা বলা হলো। আমি তার কাছে গিয়ে নিজের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করলাম। সেখানে থেকেই গির্জার খিদমত করতে

লাগলাম। সালাত আদায় ও ইলম শিখতে লাগলাম। আসকাফ নামের এই লোকটি দ্বীনদ্বারিতায় ছিল প্রতারক। সে সদাকা গ্রহণ করত মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা বিলিয়ে না দিয়ে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখত। একসময় সে মারা গেল। লোকেরা তার স্থানে অন্য একজনকে বসাল। দ্বীনদারিতে এই ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আখিরাত-প্রত্যাশী, দুনিয়াবিমুখ এবং ইবাদতে অভ্যস্ত অন্য কাউকে দেখিনি এর আগে। আমার কাছে সে এতটাই প্রিয় হয়ে উঠল যে, এর আগে কেউ এত প্রিয় ছিল না আমার। তারপর যখন তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এলো, আমি তাকে বললাম, 'নিশ্চয় আপনার কাছে আদেশ চলে এসেছে, যা আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। আপনি আমাকে কী করতে আদেশ করেন? কার কাছে যেতে অসিয়ত করেন?'

তিনি বললেন, 'হে বৎস, মোসলের এক আলিম ব্যতীত আমি এমন কাউকে চিনি না, যে আমার মতো দ্বীনের ওপর রয়েছে।' তিনি ইনতিকাল করলেন। আমি মোসলের সে ব্যক্তির কাছে এলাম। তাকে বিস্তারিত বললাম। আল্লাহ যতদিন চাইলেন, তার কাছে অবস্থান করলাম। এরপর তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আগের মতো তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে নাসিবাইন এলাকার এক আবিদের ঠিকানা দিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে আমার বর্ণনা দিলাম এবং তার কাছে অবস্থান করলাম আল্লাহ যতদিন চাইলেন। যখন তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, আমি তাকে আগের মতো জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে রোমের আমুরিয়ায় গিয়ে এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে বললেন। আমি তার কাছে গেলাম এবং তার কাছে অবস্থান করলাম। আমি সেখানে গরু ও ভেড়ার পালের দেখাশোনা করতাম জীবিকার জন্য। এরপর তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তাকে বললাম, 'আপনি আমাকে কার কাছে যেতে আদেশ করবেন?' তখন তিনি বললেন :

'হে বৎস, আমরা যে দ্বীনের ওপর ছিলাম, সে দ্বীনের ওপর আছে—এমন কাউকে আমি চিনি না, যার কাছে তোমাকে যেতে বলব। তবে একজন নবি ইবরাহিমের একনিষ্ঠ দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হওয়ার সময় অতি নিকটে।... তিনি খেজুর গাছে পূর্ণ এক ভূমিতে দুপাথরের মাঝের জায়গা দিয়ে হিজরত করবেন। যদি তুমি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারো, তাহলে তা-ই কোরো। তাঁর কিছু স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে : তিনি সদাকার সম্পদ খাবেন না... তবে হাদিয়া গ্রহণ

করবেন। তাঁর দুকাঁধের মাঝে থাকবে নবুওয়াতি মোহর। তুমি তাঁকে দেখলেই চিনতে পারবে।'

সে মানুষটির মৃত্যুর পরের কথা। একদিন আমার পাশ দিয়ে একটি কাফেলা যাচ্ছিল। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম, তারা কোন দেশের। জানতে পারলাম, তারা আরব উপদ্বীপের মানুষ। আমি তাদের বললাম, 'আমি আমার এই গাভি ও ভেড়াগুলো তোমাদের দিয়ে দেবো এই শর্তে যে, তোমরা আমাকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে।" তারা হ্যাঁ বলে রাজি হলো।

তারা আমাকে সাথে করে নিয়ে এল। কিন্তু 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানে এসে আমাকে অনেক মারধর করল তারা। এরপর আমাকে এক ইহুদির কাছে বিক্রি করে দিল।...ইহুদির সাথে চলে এলাম আমি। আমাকে সে বিস্তীর্ণ খেজুর গাছঘেরা এক স্থানে নিয়ে এল। খেজুর গাছ দেখে আশা করলাম, এটিই সে শহর! এখানেই অচিরে সে প্রতীক্ষিত নবি হিজরত করবেন। কিন্তু বাস্তবে সেটি সে শহর ছিল না। আমাকে যে কিনে এনেছিল, আমি সেখানে তার কাছে অবস্থান করতে থাকি।

একদিন বনু কুরাইজার এক ইহুদি আগমন করল সেখানে। আমাকে তার কাছে বিক্রি করে দিল আগের ইহুদিটি। সে আমাকে নিয়ে চলে এল মদিনায়! আল্লাহর শপথ, আমি তা দেখার সাথে সাথে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, এটিই সেই শহর।... আমি তার কাছে অবস্থান করতে থাকি। কাজ করতে থাকি বনু কুরাইজায় তার খেজুর বাগানে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে প্রেরণ করলেন। একসময় মদিনায় এলেন তিনি। কুবায় বনু আমর বিন আওফের নিকট অবস্থান করলেন।

একদিন আমি খেজুর গাছের মাথায় কাজ করছিলাম। আমার সাথি গাছের নিচে বসা ছিল। তখন তার চাচার বংশীয় এক ইহুদি এসে তাকে বলল, 'আল্লাহ বনু কাইলাকে ধ্বংস করুন। তারা মক্কা থেকে আগত—কুবায় অবস্থানরত এক লোকের কাছে জড়ো হয়েছে। তারা ভাবছে, সে লোকটি নবি।'

আল্লাহর শপথ, তার কথা শেষ হওয়া মাত্রই আমার শরীরের কাঁপন শুরু হলো। এমনকি খেজুর গাছটিও কেঁপে উঠল। অবস্থা এমন ঠেকল যে, আমি

নিচে বসে থাকা আমার সাথির দেহের ওপর পড়ার উপক্রম হলাম! এরপর খুব দ্রুত নেমে পড়লাম আমি। বললাম, 'তুমি কী বললে?... কী হয়েছে?'

আমার মনিব শুনে হাত তুলে আমাকে জোরে এক চড় মেরে বললেন, 'তোমার সাথে এর কী সম্পর্ক? যাও, নিজের কাজ করো।' আমি কাজে লেগে গেলাম।

সেদিনের সন্ধ্যাবেলা। নিজের কাছে থাকা সম্পদগুলো জমা করলাম আমি। এরপর রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলাম কুবায়। তাঁর কাছে এসে দেখলাম, তাঁর সাথে তাঁর কিছু সাহাবি। আমি বললাম, 'আপনারা গরিব ও অভাবী মানুষ। আর আমার কাছে কিছু খাবার আছে। সদাকা করার মান্নত করেছিলাম। আমার কাছে আপনাদের কথা আলোচনা করা হলে আপনাদেরই সদাকার সবচেয়ে বেশি উপযোগী মনে হলো, তাই আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম।'

এরপর আমি তাদের সামনে রাখলাম। তখন রাসুল ﷺ তাঁর সাথিদের বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নাও।' কিন্তু তিনি নিজে খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। সেদিকে হাত প্রসারিত করলেন না একবারও। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'আল্লাহর শপথ, একটি নিদর্শন মিলে গেল!... তিনি সদাকার মাল খাবেন না।' এরপর আমি ফিরে গেলাম। পরের দিন সকালবেলা আমি পুনরায় রাসুল ﷺ-এর কাছে কিছু খাবার নিয়ে এলাম। তাঁকে বললাম, 'আমি দেখেছি, আপনি সদাকার মাল খান না, তাই আমি নিজের কিছু জিনিস আপনাকে হাদিয়া হিসেবে দিতে চাচ্ছি।' আমি হাদিয়ার জিনিসগুলো তাঁর সামনে রাখলাম। তখন তিনি নিজ সাথিদের বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে খাও।' তিনিও তাঁদের সাথে খেলেন। আমি মনে মনে বললাম, 'আল্লাহর শপথ, এটি দ্বিতীয় নিদর্শন।... তিনি হাদিয়ার সম্পদ খাবেন।' এরপর আমি ফিরে এলাম। আল্লাহ যতদিন চাইলেন আমি অবস্থান করলাম। এরপর পুনরায় আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলাম। আমি তাঁকে এক স্থানে জানাজায় অংশ নিতে দেখলাম। তাঁর পাশে তাঁর সাহাবিগণ। তাঁর গায়ে দুজোড়া কাপড়। একটি লুঙ্গির মতো পরেছেন। অন্যটি গায়ে জড়িয়েছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। এরপর আমি তাঁর পিঠের অংশ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। কাঁধ থেকে চাদরটি সরিয়ে নিলেন। তখন আমি তাঁর দুকাঁধের মাঝে নবুওয়াতের মোহর দেখলাম। যেমনটি আমার কাছে বর্ণনা করেছিল আমার সে

সাথি। আমি রাসুল ﷺ-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। এরপর তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। আমি গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। আমার পূর্ণ কাহিনি বললাম—যেমন এখন তোমাদের বলছি।

এরপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। গোলাম হওয়ার কারণে আমি বদর ও উহুদ যুদ্ধে শামিল হতে পারিনি। একদিন রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, 'তোমার মনিবের সাথে মুকাতাবা[২৭০] করে নাও, যাতে তুমি আজাদ হতে পারো।' আমি মুকাতাবা চুক্তি করলাম। রাসুল ﷺ আমাকে সহযোগিতা করার আদেশ করলেন সাহাবিদের। আল্লাহ তাআলা আমাকে গোলামি থেকে মুক্তি দান করলেন। আমি স্বাধীনভাবে বসবাস করতে লাগলাম। রাসুল ﷺ-এর সাথে খন্দকসহ বাকি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।[২৭১]

এমন চমকপ্রদ বাক্যাবলি ব্যবহার করেই সালমান আল-ফারসি رضي الله عنه সত্যের সন্ধানে নিজের কষ্টকর সফরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন। যে সফর তাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। জীবনে পথচলার নকশা এঁকে দিয়েছিল। এ মানুষটি কেমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল? কোন সে মহান গুণ তাঁর আত্মা ধারণ করেছিল? যে গুণ গঠন করেছিল তাঁর মাঝে এক প্রবল ইচ্ছা! যা তাঁকে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিকেও সামাল দিতে শক্তি জুগিয়েছিল—এক অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তর করেছিল?

সত্যের কোন সে ক্ষমতা, যা মানুষকে অনুগত করে নেয়? কোন সে কর্তৃত্ব, যা সত্যান্বেষীকে স্বেচ্ছায় নিজ পিতার ভূমি ও সম্পত্তি এবং বিলাসিতা থেকে বের করে অজানা কষ্টকর পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়? তাকে এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক শহর থেকে অন্য শহরে কষ্ট সত্ত্বেও ভ্রমণ করতে বাধ্য করে? কোন শক্তিবলে সত্যান্বেষীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি সকল মানুষ, সকল ধর্ম ও জীবনব্যবস্থার ব্যাপারে যাচাই করতে থাকে। সত্যের পথে তাঁর অবিচলতা ও কুরবানি এতটাই ছিল যে, তাঁকে গোলাম হিসেবেও বিক্রি করা হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা

২৭০. গোলাম ও মনিবের মধ্যকার সম্পদ বিনিময় চুক্তি। যদি গোলাম চুক্তি মোতাবেক সম্পদ মনিবকে দিতে পারে, তবে সে আজাদ হয়ে যায়। এখানে মনিব হয় মুকাতিব। আর গোলাম হয় মুকাতাব।

২৭১. সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিমার্জিত। এটি বর্ণনা করেছেন, তাবারানি رحمه الله। হাইসামি رحمه الله বলেন, 'সনদের রাবিগণ সহিহের রাবি, তবে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ব্যতীত। তাই এ হাদিসটি হাসান পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে।'

তাঁকে পূর্ণ প্রতিদান দান করেন। সত্যের সাথে তাঁকে একীভূত করেন। রাসুল ﷺ-এর সাক্ষাতে ধন্য করেন তাঁকে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেন দীর্ঘ জীবন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলার বহু অলৌকিক নিদর্শন। অবলোকন করলেন আল্লাহর মুসলিম বান্দাদের, যাঁরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হিদায়াত, রহমত ও ইনসাফে পূর্ণ করে দিলেন।

সত্যানুসন্ধানে আবু জার গিফারি ﵁

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'যখন আবু জার ﵁-এর নিকট নবিজি ﷺ-এর মক্কায় প্রেরিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছাল, তিনি নিজ ভাই উনাইসকে বললেন, "এই উপত্যকার দিকে যাও। আমার জন্য এ লোকটির তথ্য জেনে এসো—যে দাবি করে, তাঁর নিকট আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কিছু কথা শুনে আমাকে খবর দাও।"

উনাইস চলতে চলতে মক্কায় পৌঁছালেন। রাসুল ﷺ-এর কথা শুনলেন। তারপর ফিরে গিয়ে আবু জারকে বললেন, "আমি তাঁকে উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে আদেশ করতে দেখেছি এবং এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা মূলত কবিতা নয়।" আবু জার বললেন, "তুমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলে না!" এরপর আবু জার সফরের পাথেয় প্রস্তুত করলেন। সাথে একটি পানির পাত্র নিলেন। অবশেষে মক্কায় এসে পৌঁছালেন। মসজিদুল হারামে এলেন। নবিজি ﷺ-এর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে তো আবু জার চিনেন না। আবার কাউকে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলেন না তিনি। রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। আলি বিন আবু তালিবের চোখ এড়াল না। আবু জারকে দেখতে পেলেন তিনি। মনে করলেন, ভিনদেশি কোনো লোক। তাই তাঁকে দাওয়াত দিলেন নিজের ঘরে। সকাল পর্যন্ত তাঁরা কেউ কাউকে কোনো বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এরপর আবু জার ﵁ নিজের মশক ও পাথেয় নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। সেদিনটিও কেটে গেল। নবিজি ﷺ-এর দেখা পেলেন না। অগত্যা গত রাতের শয্যাস্থানে চলে গেলেন। সেদিনও আলি ﵁ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "লোকটির কি বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় হয়নি?" তিনি তাঁকে

উঠিয়ে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। সেদিনও তারা একে অপরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এমনকি তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটল। আলি ﷺ তাঁকে নিজের সাথে আসতে বললেন এবং বললেন, "তুমি কি তোমার আগমনের কারণ বলবে না?" আবু জার বললেন, "যদি তুমি আমাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দাও যে, তুমি আমাকে ঠিক ঠিক পথ দেখাবে, তাহলে বলতে পারি!" আলি ﷺ প্রতিশ্রুতি দিলেন। আবু জার ﷺ নিজের আসার কারণ বললেন। আলি ﷺ বললেন, "তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন। তিনি আল্লাহর রাসুল। সকালে তুমি আমার অনুসরণ করবে। যখন তোমার ওপর আশঙ্কাজনক কিছু দেখব, তখন আমি দাঁড়িয়ে যাব; কেমন যেন আমি পানি ঢালছি। তখন তুমি চলতে থাকবে। আবার যখন আমি চলব, তুমি আমার অনুসরণ করবে—যতক্ষণ না আমি যেখানে প্রবেশ করি, তুমিও সেখানে প্রবেশ কোরো।" আবু জার তা-ই করলেন। তিনি আলি ﷺ-এর অনুসরণ করে নবিজি ﷺ-এর নিকট আসলেন। তাঁর কথা শুনলেন। এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন।'...[২৭২]

আবু জার ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে। এ বর্ণনাটি তাঁর ভাতিজা আব্দুল্লাহ বিন সামিত আল-গিফারি ﷺ-এর। ইমাম মুসলিম ﷺ আব্দুল্লাহ বিন সামিত ﷺ-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হলো :

আবু জার ﷺ বলেন, 'আমি আমাদের গোত্র গিফার থেকে বের হলাম। তারা হারাম মাসকে হালাল মনে করত। তাই আমি, আমার ভাই উনাইস ও আমার মা বের হয়ে গেলাম। আমরা চলতে চলতে মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছালাম। আমার ভাই বলল, "মক্কায় আমার একটি প্রয়োজন আছে। একটু থামুন।" উনাইস মক্কায় চলে গেল। সে খুব বিলম্বে ফিরল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী করলে?" সে বলল, "আমি মক্কায় একজন লোকের সাথে দেখা করেছি, যে দাবি করে, আল্লাহ তাঁকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন।" আমি বললাম, "লোকজন তাঁর ব্যাপারে কী বলে?" সে বলল, "লোকজন বলে, তিনি নাকি কবি, গণক, জাদুকর।" উনাইস ছিল একজন কবি। সে বলল, "আমি গণকদের কথা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথা গণকদের কথার মতো নয়। আর

....

২৭২. সহিহুল বুখারি, সহিহু মুসলিম। শব্দউৎস : সহিহু মুসলিম।

আমি কবিতার ওজনে তাঁর কথাগুলো মেপে দেখেছি। কারও মুখে এগুলোকে কবিতা বলা শোভা পায় না। আল্লাহর শপথ, তিনি সত্যবাদী, আর লোকেরাই মিথ্যাবাদী।'"

আবু জার ﷺ বলেন, 'তখন আমি আমার ভাই আর মাকে বললাম, "আমি গিয়ে তাঁকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা এখানেই অবস্থান কোরো।" এরপর আমি মক্কায় গেলাম। আমি সেখানের সবচেয়ে দুর্বল লোকটিকে লক্ষ করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম। কারণ, দুর্বল সাধারণত বিপদ হয়ে দাঁড়ায় না। আমি তাকে বললাম, "নতুন ধর্মের দাবিদার সে লোকটি কোথায়?" সে আমার প্রতি লোকদের ইশারা করে বলল, "এ নতুন ধর্মগ্রহণকারী।" ফলে সে উপত্যকার লোকেরা আমার ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম আমি। যখন জ্ঞান ফেরার আমার জ্ঞান ফিরল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে তখন একটি লাল পাথরের মতো দেখাচ্ছিল।'[২৭৩]

তিনি বলেন, 'এরপর আমি জমজমের কাছে এলাম। শরীরের রক্ত ধুয়ে নিলাম। জমজমের পানি পান করলাম। ভাতিজা, এভাবে আমি ত্রিশটি রাত ও দিন কাটিয়ে দিই। তখন জমজমের পানিই ছিল আমার একমাত্র খাদ্য। আমি মোটা হয়ে গেলাম। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। আমি অন্তরে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিনি।

এক চন্দ্রালোকিত রাতে—যখন মক্কাবাসীর চোখে ঘুমের রাজ্য চেপে বসল—কাবা চত্বর তখন খালি। কেউ তাওয়াফ করছে না আর। এমন সময় রাসুল ﷺ ও আবু বকর তাওয়াফ করতে এলেন। তাঁরা হাজারে আসওয়াদকেও চুমু খেলেন। তাঁরা উভয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে সালাত আদায় করলেন। যখন রাসুল ﷺ সালাত শেষ করলেন, আমি গিয়ে বললাম, "আস-সালামু আলাইকুম ইয়া রাসুলাল্লাহ!" তিনি বললেন, "ওয়া আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

এরপর বললেন, "তুমি কে?" আমি বললাম, "আমি গিফার গোত্রের লোক।" রাসুল ﷺ কপালে হাত রাখলেন। আমি মনে মনে বললাম, গিফার গোত্রের

---

২৭৩. জাহিলি যুগের লোকেরা একটি পাথরের কাছে জবাই করত। ফলে তা রক্তে লাল হয়ে যেত। আবু জার ﷺ প্রহরিত হলে অত্যধিক রক্ত ঝরার ফলে তার শরীর সে পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল।

সাথে আমার সম্পর্ক তিনি পছন্দ করছেন না। আমি তাঁর হাত ধরতে গেলাম। কিন্তু তাঁর সাথি আমাকে বাধা দিলেন। তিনি রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে বেশি অবহিত ছিলেন আমার থেকে। তিনি এটি করেছিলেন আমার ও রাসুল ﷺ থেকে কষ্ট দূর করার জন্য।

এরপর রাসুল ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন, "তুমি কত দিন যাবৎ এখানে আছ?" আমি বললাম, "ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত।" তিনি বললেন, "তোমাকে কে আহার করাতো?" বললাম, "আমার খাদ্য ছিল শুধু জমজমের পানি। ফলে আমি মোটা হয়ে গেছি এখন। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজও পড়ে গেছে। আমি অন্তরে ক্ষুধার কোনো যাতনাও পাই না।" তিনি বললেন, "জমজম বরকতময়। এটি পানকারীকে খাদ্যের মতো তৃপ্তি দেয়।"

আবু বকর ؓ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে তাঁর রাতের খাবারের ব্যাপারে অনুমতি দিন।" এরপর রাসুল ﷺ ও আবু বকর রওয়ানা করলেন। সাথে আমিও। আবু বকর ؓ একটি দরজা খুললেন। তিনি আমাদের জন্য তায়িফের কিশমিশ দিয়ে খাদ্য তৈরি করলেন। এটিই ছিল মক্কায় খাওয়া আমার প্রথম খাবার।'...[২৭৪]

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আত-তারজুমান আল-মাইয়ুরকি ؒ-এর উচ্চ মনোবল

৭৫৬-৮৩২ হিজরি। হিজরি অষ্টম শতাব্দীর সবচেয়ে বড় খ্রিষ্টান পাদরি ছিলেন তিনি। একসময় তিনি খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

স্পেন থেকে মুসলিমদের উচ্ছেদ করার পরের সময়টা—খ্রিষ্টানরা বিকৃত খ্রিষ্টবাদ প্রচারে পুরো স্পেন জুড়ে নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করছিল। ঠিক এ সময়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরই সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মোচন করে দিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার সামনে আত্মসমর্পণ করলেন। আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল রইলেন। নিজের হাত, জবান ও কলমের মাধ্যমে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলেন। তিনি হলেন মহান শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

২৭৪. সহিহু মুসলিম : ২৪৭৩

বিন আব্দুল্লাহ আত-তারজুমান আল-মাইয়ুরকি। পূর্বজীবনে ছিলেন একজন খ্রিষ্টান পাদরি। নাম ছিল আন্সলেম টোরমাডা। ইসলাম গ্রহণের পরবর্তীকালে আত-তারজুমান বা ইসলামের মুখপাত্র উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পাঁচ মাস পর সুলতান তাঁকে সামুদ্রিক বিভাগে নিযুক্তি দেন। এ দায়িত্ব দেওয়ার পেছনে সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যেন আরবি শিখতে পারেন। এবং সেখানে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে দোভাষীর কাজটি দৃঢ়ভাবে করতে পারেন। এক বছরেই আরবি ভাষা খুব মজবুতভাবে আয়ত্ত করে নিলেন তিনি। এরপর আমির তাঁকে অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর উপাধি ছিল 'সাইয়িদি তুহফাহ' (আমার নেতা তুহফাহ)। এই উপাধি ছিল তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তুহফাতুল আরিব ফির রদ্দি আলা আহলিস সলিব'[২৭৫]-এর দিকে সম্পৃক্ত করে। এটি সেই কিতাব, যা খ্রিষ্টবাদের মূলভিত্তিতে শক্তিশালী আঘাত হেনেছিল। এটি লিখলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন তৎকালীন যুগে খ্রিষ্টানদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সবচেয়ে বড় খ্রিষ্টান জ্ঞানী। তিনি কিতাবটি শুরু করেছেন তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনার মাধ্যমে। যার সারসংক্ষেপ আমি সামনে তুলে ধরছি। আমরা এখন সেদিকেই মনোনিবেশ করব। তিনি বর্ণনা করবেন আমাদের কাছে তাঁর সঠিক পথপ্রাপ্তির শুরুর গল্প। কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয়কে কুফর ও শিরকের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ইসলামের জন্য তাঁর হৃদয় উন্মোচন করেছেন—সে কাহিনিই আমাদের বলবেন তিনি। এটি ছিল তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নুর।

'আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন! আপনাদের জানার জন্য বলছি। আমি মাইয়ুরকা এলাকার অধিবাসী। আল্লাহ তাআলা সে অঞ্চলটিতে পুনরায় ইসলামকে ফিরিয়ে দিন। এটি দুপাহাড়ের মাঝখানে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বিশাল এক শহর। শহরটিকে ছোট একটি উপত্যকা দুভাগে ভাগ করেছে। দুটি চমৎকার সমুদ্র বন্দর রয়েছে এখানে। এটি একটি বাণিজ্যিক শহর। বড় বড় বাণিজ্যতরি বিভিন্ন মালপত্র নিয়ে বন্দরে নোঙর করে। শহরটি যে উপদ্বীপে অবস্থিত, তার নামও মাইয়ুরকা। এর অধিকাংশ ভূমিই ডুমুর ও জাইতুন গাছে ভরা। ...

২৭৫. খ্রিষ্টবাদ প্রতিরোধে বুদ্ধিমানদের জন্য উপহার।

আমার পিতা ছিলেন মাইয়ুরকা এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমি ছাড়া তার আর কোনো সন্তান ছিল না। যখন আমার বয়স ছয় বছর, তখন বাবা আমাকে একজন শিক্ষকের কাছে দিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন একজন পাদরি। তার কাছে আমি ইনজিল শিক্ষা করেছি। দুবছরের মাঝেই আমি ইনজিলের অধিকাংশ মুখস্থ করে ফেলি। এরপর ছয় বছরে ইনজিলের ভাষা ও যুক্তিবিদ্যা শিখি।

তারপর আমি নিজ শহর মাইয়ুরকা থেকে কাসটালিওনের[২৭৬] লার্ডা নগরে চলে গেলাম। এ অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের নিকট জ্ঞানের শহর হিসেবে খ্যাত ছিল এটি। ছাত্ররা এখানে সমবেত হতো। যাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল এক হাজার থেকে দেড় হাজার। সবাই যাজকদের শাসনে থাকত। তারাই শিক্ষা দিতেন। আমি সেখানে ছয় বছর যাবৎ জ্যোতিষশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি। আমি আরও চার বছর ইনজিল ও ভাষা শিক্ষা করে সর্বোচ্চ অবস্থান পেলাম। এরপর "আনবারদিয়া"র বালুনিয়াতে চলে গেলাম। এটি অনেক বড় একটি শহর। সে অঞ্চলের মানুষের নিকট এটি ছিল ইলমের নগরী। সেখানে প্রতি বছর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুই হাজারেরও বেশি ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসত। তারা মোটা খসখসে কাপড় পরত। এটাকে তারা "প্রভুর রং" বলত। যদি সেখানে কোনো ছাত্র রাজা বা রাজপুত্র থাকত, তবে সে কেবল সে পোশাকই পরিধান করত; যাতে অন্যদের থেকে তাদের পৃথকভাবে চেনা যায়। শুধু যাজকরাই সেখানে নিয়ন্ত্রণ করত।

আমি তাদের সবচেয়ে সম্মানিত ও সবচেয়ে বেশি বয়স্ক এক পাদরির কাছে অবস্থান করতাম। তার নাম ছিল নিকলাও মারটিল। ইলম, দ্বীনদারি ও দুনিয়াবিমুখতায় তাদের মাঝে এ পাদরির অবস্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। এসবের মাধ্যমে সে তার যুগের অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বতন্ত্রতা লাভ করেছিল। আর এ কারণেই বিভিন্ন রাজা ও অন্যান্য লোকজন দ্বীনি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তার কাছে পাঠাত। সাথে থাকত নানান ধরনের হাদিয়া-উপঢৌকন। মূলত হাদিয়া পাঠানোই ছিল মানুষের মূল লক্ষ্য। লোকজন এর মাধ্যমে বরকত লাভের ইচ্ছা করত। তাদের উপঢৌকন গৃহীত হলে তারা এটাকে বিশেষ সৌভাগ্য মনে করত।

....

২৭৬. স্পেনের একটি শহর।

আমি এই পাদরির কাছে খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলাম। তার সেবা ও তার দেওয়া দায়িত্বগুলো আদায়ের মাধ্যমে দিনদিন তার আরও নিকটবর্তী হতে থাকলাম। এমনকি তিনি আমাকে নিজের বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। একপর্যায়ে এতটা নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে, তিনি আমাকে নিজের ঘর ও খাদ্যভান্ডারের চাবি পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। সবকিছুর ভার ন্যস্ত করলেন আমার হাতে—তবে তার ঘরের ভেতরের ছোট একটি কামরা ব্যতীত। সেখানে তিনি নির্জনতা গ্রহণ করতেন। বোঝা যাচ্ছিল, সেটি ছিল তার কাছে উপঢৌকনস্বরূপ আসা সম্পদের ভান্ডারের কামরা। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমি এভাবে তার কাছে শিক্ষা ও সেবায় দশটি বছর লেগে থাকি। একসময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিনের ঘটনা। তিনি তার সাথিদের মজলিস থেকে অনুপস্থিত রইলেন। উপস্থিত লোকেরা তার অপেক্ষা করতে থাকল। নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। তাদের আলোচনা একপর্যায়ে ইনজিলে বর্ণিত ইসা ﷺ-এর একটি কথায় গিয়ে পৌঁছাল, "নিশ্চয় তার পরে আগমন করবেন একজন নবি। যার নাম আল-বারকিলিত[২৭৭]।" তারা সকলে মিলে এই নবিকে খুঁজতে লাগল। নবিদের মধ্যে কে ছিল এ বারকিলিত। প্রত্যেকেই নিজের ইলম ও বুদ্ধি অনুযায়ী উত্তর দিতে লাগল। এ ব্যাপারে তাদের কথাবার্তা উচ্চ আওয়াজ ধারণ করল। পরস্পর তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা ছাড়াই তারা সেদিন ফিরে গেল।

....

২৭৭. ইনজিলে শব্দটি 'المعزي' এসেছে, অন্য শব্দে 'بارقليط' রূপে এসেছে। 'بارقليط' শব্দটি Paracletos-এর আরবিকৃত রূপ। উসতাজ আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার ও ড. কার্লো নাল্লিনোর মাঝে একবার এ বিষয়ে বিতর্ক হয়। নাজ্জার বলেন, 'আমি জানতাম, ড. কার্লো পুরোনো ইউনানি ভাষার সাহিত্যে ডক্টরেট করেছেন। তাই তাকে বললাম, "Paracletos শব্দের অর্থ কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "পাদরিরা বলেন, "এ শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'المعزي' (সান্ত্বনাদাতা)।" এবার আমি তাকে বললাম, "আমি ড. কার্লো নাল্লিনোকে জিজ্ঞেস করেছি প্রশ্নটা, যিনি পুরোনো ইউনানি ভাষার সাহিত্যে ডক্টরেট করেছেন। আমি কোনো পাদরিকে প্রশ্নটা করিনি। ড. কার্লোই জবাবটা দেবেন।" এবার তিনি বললেন, "এ শব্দের অর্থ হচ্ছে, যিনি অনেক প্রশংসিত।" এবার আমি বললাম, "এটা তাহলে حمد শব্দের আফআলুত তাফজিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?" ড. কার্লো বললেন, "হ্যাঁ।" এবার আমি বললাম, "রাসুল ﷺ-এর নামগুলোর একটি হচ্ছে احمد। যার অর্থ অধিক প্রশংসিত।" এবার ড. কার্লো বললেন, "ভাই আপনি অনেক জানেন।..."

দেখুন, আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার রচিত কাসাসুল আম্বিয়া : ৩৯৭-৩৯৮।

এরপর আমি শাইখের কাছে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, "আজকে আমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে আলোচনা হলো?" আমি "আল-বারকিলিত"-এর অর্থ নির্ধারণ নিয়ে তাদের মতানৈক্যের ঘটনা বললাম। জানালাম, অমুকে এই উত্তর দিয়েছেন, আর অমুকে এমন উত্তর দিয়েছেন। এভাবে তাদের উত্তরগুলো বর্ণনা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কী উত্তর দিলে?" আমি বললাম, "অমুক বিচারকের ইনজিলের ব্যাখ্যাগ্রন্থের উত্তরটি দিয়েছিলাম।" তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ভুল করোনি। কাছাকাছি পৌঁছেছ। অমুকে ভুল করেছে আর অমুকে কাছাকাছি পৌঁছেছে। কিন্তু সত্যটা এসব কিছুর উর্ধ্বে। কারণ, এই পবিত্র নামের ব্যাখ্যা ইলমে দৃঢ়তার অধিকারী আলিমগণ ব্যতীত আর কেউ জানেন না। আর তোমরা খুব কম ইলমই অর্জন করেছ।" আমি সাথে সাথে তার কদমে চুমো খেলাম। বললাম, "হে জনাব, আপনি জানেন, আমি অনেক দূর থেকে আপনার কাছে ইলম শিখতে এসেছি। আর দশটি বছর আপনার খিদমতে কাটিয়েছি। আমি এ সময়ে আপনার কাছে অনেক ইলম শিখেছি। আমার মনে হয় আমার প্রতি আপনার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হবে এই নামটির পরিচয় দিলে।"...

তখন শাইখ কেঁদে দিলেন। তিনি বললেন, "হে বৎস, আল্লাহর শপথ, তোমার সেবা ও নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাকে সঙ্গ দেওয়ায় আমি তোমার প্রতি বড় ঋণী। আমার ওপর তোমার দায় আছে বটে। এই নাম জানার মধ্যে বিশাল এক উপকার নিহিত রয়েছে। কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি, তোমার মাধ্যমে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর সাথে সাথে খ্রিষ্টানরা তোমাকে হত্যা করবে।" আমি তাকে বললাম, "হে জনাব, মহান আল্লাহর শপথ, ইনজিলের সত্যতা এবং যিনি আগমন করবেন তার শপথ, আপনি আমার কাছে যা গোপন রেখেছেন, আপনার আদেশ ব্যতীত সে ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলব না।" তখন তিনি বললেন, "বৎস, তুমি আমার কাছে আসার শুরুতেই আমি তোমাকে তোমার এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিলাম, তোমার এলাকাটি কি মুসলিমদের কাছাকাছি? তোমাদের সাথে কি তারা যুদ্ধ করে এবং তোমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করো? এসব জিজ্ঞেস করেছিলাম, যাতে ইসলামের ব্যাপারে তোমার বিদ্বেষের বিষয়টি পরীক্ষা করে নিতে পারি। জেনে রাখো, হে

বৎস, "আল-বারকিলিত" হলো মুসলিমদের নবি মুহাম্মাদের একটি নাম[২৭৮]। দানিয়াল[২৭৯]-এর ভাষায়, চতুর্থ আসমানি কিতাব এ নবির ওপরই অবতীর্ণ হবে। তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন, অচিরেই তাঁর ওপর এই কিতাব অবতীর্ণ হবে। বলেছেন, তাঁর দ্বীনই সত্য দ্বীন। ইনজিলে উল্লেখিত স্বচ্ছ মিল্লাত তাঁর মিল্লাত।" আমি বললাম, "হে শাইখ, এ খ্রিষ্টানদের ধর্মের ব্যাপারে আপনার কী মত?" তিনি বললেন, "হে বৎস, যদি খ্রিষ্টানরা ইসা ﷺ-এর সেই দ্বীনের ওপর থাকত, তবে তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপরই থাকত। কারণ, ইসা ও সকল নবির দ্বীন আল্লাহর দ্বীন, একই দ্বীন। কিন্তু তারা পরিবর্তন করেছে এবং কুফরি করেছে।"[২৮০]

....

২৭৮. এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, এই পাদরি নবি ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ইমান এনেছিল। কারণ, তিনি তাওরাত ও ইনজিলে বর্ণিত রাসুল ﷺ-এর গুণাবলি জানতেন। আলিমগণ আহলে কিতাবের যাজকদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আহলে কিতাবের এ সকল জ্ঞানী রাসুল ﷺ-এর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছে।'

'فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ' [তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। - সুরা ইউনুস : ৯৪] ইমাম জুয়াইনি ﷺ এ আয়াত উল্লেখ করে এর ওপর আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তিনি 'আল-কাশশাফ' গ্রন্থ-প্রণেতার এ কথাটির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 'এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই বনি ইসরাইলকে রাসুল ﷺ সম্পর্কে জানিয়েছেন। তারাই হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত কিতাবপাঠকারী। আল্লাহ বর্ণনা করছেন, আহলে কিতাবদের নিকট ইলম এসেছে। তারা জেনেছে। কারণ, তাদের নিকট থাকা তাওরাত ও ইনজিলে রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে লেখা ছিল। তারা রাসুল ﷺ-কে সেভাবে চিনত এবং জানত, যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে এবং জানে।...' ইমাম জুয়াইনি এ উক্তিটিও এনেছেন তাঁর সারসংক্ষিপ্ত সে আলোচনায় যে, 'আহলে কিতাবদের আহবারদের 'ইলমি গভীরতা ও দৃঢ়তা'র বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর ওপর যে ওহি নাজিল হতো, তারা সে ওহির সত্যতার ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিল।' - বিস্তারিত জানতে দেখুন : শিফাউল গালিল ফি বায়ানি মা ওয়াকাআ ফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজিল মিনাত তাবদিল। লেখক : ইমাম আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ আল-জুয়াইনি ﷺ। ইমাম সুয়ুতি ﷺ রচিত 'আদ-দুররুল মানসুর' : ১/১৪৭।

২৭৯. শাইখ রাহমাতুল্লাহ হিন্দি একাদশতম সুসংবাদ উল্লেখ করেন এটি। এটি আছে দানিয়াল কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সে স্বপ্নটির বর্ণনায় যে স্বপ্ন বাবেলের রাজা বুখতেনসর দেখেছিল এবং ভুলে গিয়েছিল। এটি লম্বা এক স্বপ্ন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, দানিয়াল : ২/১-৪৬। শাইখ রাহমাতুল্লাহ এ উপসংহারে এসেছেন যে, এ সকল বৈশিষ্ট্যই রাসুল ﷺ-এর সাথে মিলে যায়। দেখুন, শাইখ রাহমাতুল্লাহ রচিত ইজহারুল হক। আরবি তরজমায় উমর দাসুকি : ২/২৬৭। আরও দেখুন, প্রফেসর আব্দুল আহাদ দাউদ রচিত মুহাম্মাদ ﷺ ফিল কিতাবিল মুকাদ্দাস : ৮৬-৯৪, ১৩৩-১৪৪ পৃষ্ঠা।

২৮০. মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের পর পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসুলের ধর্মগ্রন্থ রহিত হয়ে গেছে। ইসলামই এখন নাজাতের একমাত্র পথ। (-অনুবাদক)

আমি এবার বললাম, "জনাব, এ থেকে মুক্তির উপায় কী?" তিনি বললেন, "হে বৎস, ইসলাম গ্রহণেই মুক্তি।" বললাম, "ইসলামে প্রবেশকারী কি মুক্তি পাবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবে।" বললাম, "জনাব, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের জন্য নিজের জানা সর্বোত্তম জিনিসটিই গ্রহণ করে। আপনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব জেনেও কেন তা গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন?" তিনি বললেন, "হে বৎস, ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুসলিমদের নবির যে মর্যাদার কথা আমি তোমাকে বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে বৃদ্ধ বয়সে এবং দেহ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর বোঝার তাওফিক দিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কোনো ওজর নেই। বরং আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত। যদি তোমার বয়সে আল্লাহ তাআলা আমাকে হিদায়াত দিতেন, তবে আমি সবকিছু ছেড়ে দিতাম, সত্য দ্বীনে প্রবেশ করতাম। দুনিয়ার ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল। আর তুমি তো দেখছ যে, খ্রিষ্টানদের মাঝে আমি কি সুনাম-সুখ্যাতি ও মানমর্যাদা নিয়ে আছি এবং আমার সামনে কী পরিমাণে দুনিয়া পেশ করা হচ্ছে। যদি আমার থেকে ইসলামের প্রতি সামান্য ঝুঁকে পড়াও তারা আঁচ করতে পারে, তাহলে তারা আমাকে সাথে সাথে হত্যা করে ফেলবে। ধরে নাও, আমি এদের থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিমদের কাছে চলে গেলাম। আমি তাদের বললাম যে, আমি তোমাদের কাছে মুসলিম হয়ে এসেছি। তখন তারা বলবে, "সত্য দ্বীন গ্রহণ করে তুমি নিজেই নিজের উপকার করলে। তাই এমন ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছ মনে করো না। বরং তুমি এর মাধ্যমে নিজেকে আজাব থেকে রক্ষা করেছ। তখন আমি তাদের মধ্যে নব্বই বছরের একজন হতদরিদ্র বুড়ো হিসেবে বেঁচে থাকব। আমি তাদের ভাষা বুঝব না, আর তারাও আমার মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে না। ফলে আমার মৃত্যু হবে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায়।[২৮১] আমি আলহামদুলিল্লাহ ইসা

২৮১. এটি ভুল চিন্তা। এমন উম্মাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণা, যাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। এটি ইসলামের উদারতা ও পারস্পরিক দায়িত্ব, সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের ওপর গড়ে ওঠা ইসলামের চমৎকার সমাজব্যবস্থার ব্যাপারে তার অজ্ঞতা। ইসলাম মানুষের হকের প্রতি লক্ষ করে এবং তাদের মূল্যায়ন করে। এসব কিছু তখনও প্রযোজ্য, যখন তারা অমুসলিম থাকে। তাহলে বলা বাহুল্য যে, যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সামনে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, তার ক্ষেত্রে দয়া, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের বন্যা বয়ে যাবে।
চিন্তা করে দেখো, আবু উবাইদ থেকে উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর সম্পর্কে বর্ণনাটি নিয়ে। তিনি বলেন, 'উমর বসরায় আদি বিন আরতাহের নিকট লিখে পাঠালেন, "...জিম্মিদের মধ্যে যারা বয়সী, যারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রেখো।

ﷺ-এর ধর্ম ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার ওপর রয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমার ব্যাপারে তা জানেন।”

আমি বললাম, “শাইখ, আপনি কি আমাকে ইসলামের ভূমিতে গিয়ে তাদের ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দেবেন?” তিনি বললেন, “যদি তুমি জ্ঞানী ও মুক্তি-প্রত্যাশী হয়ে থাকো, তবে দ্রুত এটি করো। তোমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই অর্জিত হবে। কিন্তু হে বৎস, বর্তমানে কেউ আমাদের সাথে এই বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি সর্বাত্মকভাবে বিষয়টি গোপন রেখো। যদি এর সামান্য কিছুও তোমার থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে খ্রিষ্টান-জনতা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। আর আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। আর আমার থেকে তা বর্ণনা করেছ বলেও কোনো উপকার হবে না। কেননা, আমি তা অস্বীকার করব। তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা সত্যায়িত হবে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তোমার কথা সত্য বলে ধর্তব্য হবে না। যদি এর কোনো কিছু তোমার মুখ ফসকে বের হয়ে যায়, তবে আমি সেসব থেকে মুক্ত।” আমি বললাম, “শাইখ, আমি আল্লাহর কাছে এসব সংশয় ছড়িয়ে পড়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” আমি তার সন্তোষভাজন থাকার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর আমি ভ্রমণ প্রস্তুতি নিয়ে তাকে বিদায় জানালাম। বিদায়ের সময় তিনি আমার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন। পাথেয় হিসেবে দিলেন পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা। আমি আমার শহর মাইয়ুরকার উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা শুরু করলাম। তারপর সেখানে আমার পিতার কাছে ছয় মাস কাটালাম। সেখান থেকে সিসিলি

মুসলিমদের বাইতুল মাল থেকে তাদের জন্য বয়স্কভাতা চালু কোরো। যদি কোনো মুসলিমের অধীনস্থ কোনো গোলাম বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার দায়িত্ব হলো এই বৃদ্ধের খাদ্য ইত্যাদির জোগান দেওয়া। যতক্ষণ না আজাদি বা মৃত্যু তাদের মাঝে পৃথক করে দেয়। কারণ, একদিন আমিরুল মুমিনিন উমর ﷺ এক জিম্মির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছিল। উমর ﷺ তাকে বললেন, “যদি তোমার যৌবনে তোমার থেকে জিজিয়া গ্রহণ করে থাকি, এরপর তোমার বৃদ্ধাবস্থায় তোমাকে ফেলে রাখি, তবে আমরা তোমার প্রতি ইনসাফ করিনি। এরপর তিনি সে ব্যক্তির জন্য বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ভাতা চালু করেন।”' (কিতাবুল আমওয়াল। লেখক : ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সালাম)

এই ভ্রান্ত চিন্তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রত্যুত্তর হলো, স্বয়ং তার ছাত্র আত-তারজুমান। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন কতটা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। এটাই প্রমাণ করে ইসলামের মহত্ত্ব ও মহানুভবতার কথা।

দ্বীপে[২৮২] পাড়ি জমালাম। সেখানে পাঁচ মাস কাটালাম। মুসলিম দেশের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া জাহাজে চড়ার অপেক্ষায় ছিলাম। তিউনিসিয়াগামী একটি জাহাজ পেলাম। সিসিলি দ্বীপ থেকে তিউনিসিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। আমরা সিসিলি থেকে যাত্রা করি সূর্যাস্তের পূর্বে। তিউনিসিয়ার বন্দরে অবতরণ করি পরের দিন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে।

তিউনিসিয়ার উপকূলে অবতরণ করলে সেখানকার খ্রিষ্টান পাদরিরা আমার ব্যাপারে জানতে পারে। তাই তারা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হয়। আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। তাদের সাথে তিউনিসিয়ায় অবস্থানকারী কিছু ব্যবসায়ীও ছিল। আমি তাদের সাথে সুখে-শান্তিতে চার মাস তাদের আতিথ্য গ্রহণ করি। এরপর আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, সুলতানের সভার কেউ কি খ্রিষ্টানদের ভাষা জানেন? সে সময় মুসলিম শাসক ছিলেন আবুল আব্বাস আহমাদ ﵀। খ্রিষ্টানরা আমাকে জানাল, সে শাসকের দরবারে তার উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা আছে যার নাম, 'ইউসুফ আত-তাবিব'। তিনি ছিলেন বাদশাহর ব্যক্তিগত ডাক্তার। তার কাছের লোক। এ কথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। আমি এই ডাক্তারের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে ঠিকানা দেওয়া হলো। আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কারণও বললাম। এতে তিনি খুব খুশি হলেন। কারণ, এই কল্যাণের পূর্ণতা লাভ তার মাধ্যমেই হচ্ছিল। এরপর তিনি ঘোড়ায় চড়লেন। আমাকেও তুলে নিলেন। বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেলেন আমাকে। বাদশাহর নিকট প্রবেশ করে তিনি আমার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন। আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুমতি দেওয়া হলো।

আমি তাঁর সামনে বসলাম। তিনি প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করলেন আমার বয়স সম্পর্কে। আমি বললাম, "আমার বয়স ৩৫ বছর।" এরপর আমার শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি সে ব্যাপারে বললাম। তিনি বললেন, "তুমি কল্যাণের পথে পা বাড়িয়েছ। সুতরাং আল্লাহর বারাকাহর ওপর ভরসা করে ইসলাম গ্রহণ করো।" আমি দোভাষী তথা সে ডাক্তারকে বললাম, "আপনি বাদশাহকে বলুন, যেকোনো ধর্মত্যাগী ব্যক্তি বিভিন্ন কথাবার্তা ও অপবাদের সম্মুখীন হয় তার পূর্বের

....

২৮২. ইতালির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

ধর্মের লোকদের থেকে। তাই আমি আপনাদের এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, আপনাদের অধীনে যে সকল খ্রিষ্টান পাদরি ও ব্যবসায়ীরা রয়েছে, তাদের ডেকে এনে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন এবং আমার ব্যাপারে তারা কী উত্তর দেয়, তা শুনুন। এরপরই আমি ইসলাম গ্রহণ করব, ইনশাআল্লাহ।" তখন বাদশাহ দোভাষীর মাধ্যমে আমাকে জানালেন, "আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় রাসুল ﷺ-এর কাছে যা প্রার্থনা করেছিলেন, তুমি তা-ই করলে।"[২৮৩] সুলতান খ্রিষ্টান পাদরি ও কিছু ব্যবসায়ীদের খবর পাঠিয়ে ডেকে আনলেন। আর

....

২৮৩. আত-তারজুমানের ইসলাম গ্রহণের কাহিনি মহান সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনির সাথে মিলে যায়। তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত। নবি ইউসুফ বিন ইয়াকুব ﷺ-এর বংশধর। আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন :

'যখন রাসুল ﷺ মদিনায় আগমন করলেন, তখন লোকেরা বলতে লাগল, "আল্লাহর নবি এসেছেন।" সকলেই তাঁকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ-ও বিষয়টি শুনতে পেলেন। তিনি তখন খেজুর গাছ থেকে পরিবারের জন্য খেজুর পাড়ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি খেজুর পেড়ে তা সাথে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট চলে এলেন। নবিজি ﷺ-এর কথা শুনলেন। এরপর পরিবারের নিকট ফিরে গেলেন।' আনাস ﷺ বলেন, 'যখন নবি ﷺ একাকী হলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম আগমন করলেন। তিনি বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি বাস্তবেই আল্লাহর রাসুল। আপনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। তবে ইহুদিরা আমাকে তাদের সর্দার মনে করে। তাদের সবচেয়ে বড় আলিম এবং আলিমের পুত্র গণ্য করে আমাকে। আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ না করে আমার ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করুন। কারণ, তারা যদি জানে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাহলে আমার ব্যাপারে সেসব কথা বলবে, যা আমার মাঝে নেই।"

নবিজি ﷺ তাদের ডেকে পাঠালেন। তারা আসলো। নবিজি ﷺ তাদের বললেন, "ইহুদি জাতি, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। সে আল্লাহর শপথ—যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তোমরা জানো, আমি সত্যই আল্লাহর রাসুল। তোমরা জানো, আমি তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছি। তাই তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।" ইহুদিরা জবাব দিল, "আমরা এমনটা জানি না।" রাসুল ﷺ তাদের তিনবার দাওয়াত দিলেন। তিনবারই তারা একই জবাব দিল।

এরপর রাসুল ﷺ জানতে চাইলেন, "তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন সালামের অবস্থান কেমন?" তারা বলল, "তিনি আমাদের নেতা। আমাদের নেতার পুত্র। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র।" রাসুল ﷺ এবার বললেন, "যদি আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তোমরা কী করবে?" ইহুদিরা বলল, "আল্লাহ না করুন! কেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন?!" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "ইবনে সালাম বেরিয়ে আসো তাদের সামনে।" আব্দুল্লাহ বিন সালাম বেরিয়ে এলেন, বললেন, "হে ইহুদি জাতি, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, সে আল্লাহর শপথ করে বলছি—যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তোমরা জানো, ইনি সত্যই আল্লাহর রাসুল। ইনি সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন।" এবার ইহুদিরা আব্দুল্লাহ বিন সালামকে প্রত্যুত্তর দিল "তুমি মিথ্যে বলছ।" এরপর রাসুল ﷺ তাদের বের করে দিলেন সেখান থেকে।'" - ইবনু সাইয়িদিন নাস কৃত উয়ুনুল আখবার : ১/২৫০, ফাতহুল বারি : ৭/২৭২।

আমাকে পাশের একটি কামরায় লুকিয়ে রাখলেন। পাদরিরা তাঁর মজলিসে প্রবেশ করলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা নতুন এই পাদরির ব্যাপারে কী বলো, যে কিছু দিন আগে এখানে এসেছে?" তারা বলল, "হে আমাদের বাদশাহ, ইনি হলেন আমাদের ধর্মের অনেক বড় একজন আলিম। আমাদের শাইখগণ বলেছেন, "দ্বীন ও ইলমে আমাদের ধর্মে উনার চেয়ে উচ্চতায় কাউকে তারা দেখেননি।" বাদশাহ বললেন, "তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা কী বলবে?" তারা বলল, "আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি এমনটি কখনোই করতে পারেন না।" বাদশা খ্রিষ্টানদের কথা শুনে আমার কাছে লোক পাঠালেন। আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হলাম। খ্রিষ্টানদের উপস্থিতিতে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করলাম, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।" তখন তারা পরস্পর ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।[২৮৪] বলল, "বিয়ের আগ্রহই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারণ, আমাদের পাদরিরা বিয়ে করে না।"[২৮৫] তারা চিন্তিত ও লজ্জিত হয়ে বের হয়ে গেল।

বাদশাহ আমার জন্য প্রতিদিন এক দিনারের এক-চতুর্থাংশ ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। আমার সাথে আল-হাজ মুহাম্মাদ আস-সাফফারের কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

....

২৮৪. এটা খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। তারা যখন কোনো কিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন নিজেদের আঙুলগুলো একত্র করে প্রথমে কপালের দিকে ওঠায়, এরপর কয়েকবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। প্রথমে কপাল থেকে ডান কাঁধে, ডান থেকে বাম কাঁধে, এরপর মধ্যে রেখা এঁকে ক্রুশ চিহ্ন করে। তারা অনিষ্ট থেকে মুক্তি এবং কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এমনটা করে। এমনকি পোপ যখন সাধারণ মানুষের সামনে আসে, তখন এমনটা করে।

২৮৫. ক্যাথলিক চার্চ বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছে পাদরি, রাহিব, মহিলা রাহিবের ওপর। এ হারামকরণের কারণে তাদের মধ্যকার পুরুষ ও নারীদের মাঝে পাপাচার ও অবৈধ কাজ প্রসারিত হয়েছে। পাদরি ও রাহিবরা মহিলা রাহিবদের সাথে মিলিত হয়। তারা এ কর্মকে একপ্রকার আত্মিক প্রশান্তি লাভ হিসেবে উল্লেখ করে নিজেদের দোষমুক্ত ঘোষণা করে। - ড. আলি আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফি রচিত 'আল-আসফারুল মুকাদ্দাসাতু ফিল আদইয়ানিস সাবিকাহ লিল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং ১২২।

এ কারণে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান মার্টিন লুথার ষোড়শ শতকে গির্জার বিরুদ্ধে সংঘটিত বিপ্লবের সময় এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে। শুদ্ধিকরণের তার সেসব মতের একটি ছিল, "তাদের ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার একটি কারণ হচ্ছে, বিয়ে না করা। তার মতে, খ্রিষ্টবাদের প্রথম যুগে এ নিষেধাজ্ঞা ছিল না। মার্টিন লুথার ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বিবাহ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। সে নিজেও একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং নিজে এক মহিলা রাহিবকে বিয়ে করে। - আবু জাহরা কৃত মুহাদারাতুন ফিন নাসরানিয়্যা, পৃষ্ঠা নং ১৬।

যখন আমি স্ত্রীকে ঘরে আনার ইচ্ছা করলাম, বাদশাহ আমাকে একশ দিনার ও এক প্রস্থ চমৎকার পোশাক উপহার দিলেন। আমি সংসার শুরু করলাম। আমার একটি ছেলে জন্ম নিল। বরকতের জন্য আমাদের নবি ﷺ-এর নাম অনুযায়ী আমি তাঁর নাম রাখলাম মুহাম্মাদ।'

এরপর শাইখ আব্দুল্লাহ আত-তারজুমান দাওলাতু হাফসিয়ার আলোচনা করেন। যেখানকার দফতরে তিনি কাজ করেছিলেন। এরপর নয়টি অধ্যায়ে ইনজিলের চারটি কিতাব : মথি, মার্কস, লুক, জোহনের প্রকৃতরূপ ও ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরেন; যথার্থ ইলমি দলিলের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করেন যে, এই চার ব্যক্তি ইসা ﷺ-এর হাওয়ারি (সাথি) ছিল না; এরপর খ্রিষ্টানকরণ, ব্যাপ্টিজম, ত্রিত্ববাদ, প্রথমপাপ, প্রভুর ভোজ, ক্ষমার চুক্তি, ইমানের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এসব মতবাদকে ইনজিলের নস ও স্পষ্ট যুক্তিগত প্রমাণ দিয়ে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন।

এরপর একে একে ইসা ﷺ মানুষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেন, তাঁর ইলাহ হওয়ার ধারণার অপনোদন করেন, বর্তমান বিকৃত ইনজিলের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এরপর মুসলিমদের ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা যেসব আপত্তি করে, সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন। যেমন : আলিম ও নেককার লোকদের বিয়ে-শাদি, খতনা করা এবং জান্নাতের নিয়ামত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া। তিনি কিতাবটি শেষ করেছেন তাওরাত ও ইনজিলের রেফারেন্সে রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াত, তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি প্রমাণ করে।[২৮৬]

এই ছিল শাইখ আল-মাইয়ুরকির জীবনীর সামান্য আলোকপাত, আল্লাহর পথে তাঁর কলম ও জবানের জিহাদের প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত। আর তাঁর হাতের জিহাদ ছিল তাঁর বংশীয় কাফিরদের বিরুদ্ধে। সিসিলি দ্বীপে হাফসি নৌবহরের হামলায় (আনুমানিক ৭৯৬ হিজরিতে) তিনি শরিক হন। সে সময় তিনি সামুদ্রিক কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

---

২৮৬. এ কিতাবটি দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন প্রকাশ করেছে। প্রথম প্রকাশ : ১৪০৮ হিজরি, ১৯৮৮ ইসায়ি। তাহকিক ও তালিক : উসতাজ উমর ওয়াফিক আদ-দাওয়াক। প্রকাশিত কিতাবটির ভূমিকা থেকে আমরা কিছুটা পরিমার্জিতরূপে ঘটনাটি তুলে ধরেছি এখানে।

যদি তিউনিসিয়ায় খ্রিষ্টানদের আক্রমণকালে শাইখ আত-তারজুমানের শাহাদাতের বিষয়টি সত্য হয়, তবে এ শাহাদাত তাঁর ভাগ্যলিপিতে সত্য দ্বীনের খিদমত ও জিহাদ করার মর্যাদার পাশে আরও একটি মর্যাদাকর বিষয় যুক্ত করে।

নিশ্চয় শাইখ আত-তারজুমানের জীবনী হলো অন্ধকারে ডুবন্ত, দিকভ্রান্ত এবং অজ্ঞতার তিমিরে নিমজ্জিত লোকদের জন্য আলোক প্রদ্বীপ। যা তাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে এমন সত্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়, যে সত্তা জীবন বা রিজিক কোনোটির মালিক নয়। যে দিশেহারা হয়ে সত্যের অনুসন্ধান করে, তাকে সে সত্তার সঠিক পথ দেখায়, যিনি শাহরগের চেয়েও নিকটে থাকেন আমাদের। শাইখের জীবনী হলো নিজেদের দৃষ্টি বন্ধ করে রাখা ও চোখে আঙুল দিয়ে রাখা উদ্ধত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ। এরা চোখ বন্ধ রেখে নিজেদের এ সান্ত্বনা দেয় যে, আকাশে সূর্য নেই এবং পুরো দুনিয়া অন্ধকার।

وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

> 'কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর আলোর পূর্ণতা বিধান করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।'[২৮৭]

আল্লাহ তাআলা শাইখ আত-তারজুমান-এর প্রতি রহম করুন। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন। নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও নেককার লোকদের—যাঁদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন—সাথে জান্নাতুল ফিরদাওসে স্থান দান করুন। সঙ্গী হিসেবে এঁরাই উত্তম। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

সত্য দ্বীনের সন্ধানে ভাই রাহমাহ বুরনুমু-এর উচ্চ মনোবল

রাহমাহ বুরনুমু। পিতার দিক থেকে নেদারলেন্ডিয়ান। মায়ের দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ান। মা ছিলেন পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপের আমবুন শহরের অধিবাসী। খ্রিষ্টধর্ম ছিল বাপ-দাদা সূত্রে তার পারিবারিক ধর্ম।

....

২৮৭. সুরা আত-তাওবা : ৩২

তার দাদা ছিলেন একজন প্রটেস্ট্যান্ট পাদরি। আর বাবা ছিলেন বান্টি কোস্টা মাজহাবের একজন পাদরি। তার মা মহিলাদের ইনজিল শিক্ষা দিতেন। আর বুরনুমু নিজেও ছিলেন একজন পাদরি। বেতেল ইনজিল স্পিনো গির্জায় মিশনারি-প্রধান হিসেবে ছিলেন তিনি। নিজের ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন :

'আমার হৃদয়ে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও মুসলিম হওয়ার চিন্তা আসেনি। কেননা, বাল্যকাল থেকেই আমি আমার পিতার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; তিনি সব সময় আমাকে বলতেন, "মুহাম্মাদ একজন গ্রাম্য মরুবাসী। জ্ঞানবিদ্যা বলতে তার কিচ্ছু নেই। আর পড়ালেখাও করেনি। সে ছিল উম্মি, নিরক্ষর।" এভাবেই আমার পিতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; বরং এর চেয়েও বেশি কিছু বলতেন তিনি।

আমি খ্রিষ্টান ফরাসি প্রফেসর ড. রেকলুডি কর্তৃক রচিত একটি বইয়ে পড়েছি, "মুহাম্মাদ এক দাজ্জাল, যে জাহান্নামের নবম স্তরে বাস করবে।" এভাবেই রাসুল ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হতো। তখন থেকেই আমার মাঝে একটি ভ্রান্ত চিন্তা শক্তভাবে গেড়ে যায়, যা আমাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

বাস্তবতা হলো, আমি কখনো ইসলাম সম্পর্কে জানার কোনো ইচ্ছাই করিনি। কিন্তু সব সময় আমার মাঝে সত্য পথ গ্রহণের একটি অনুপ্রেরণা কাজ করত। তবে কেন আমি অজানা সত্যের অনুসন্ধান করতাম? কেন নিজের জাতির মাঝে প্রশান্তিদায়ক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করলাম? আমি তো ছিলাম গির্জার প্রধান ধর্মপ্রচারক। তাই আমার জীবন ছিল সুখ ও বিলাসিতাপূর্ণ। তাহলে আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম?

ঘটনার শুরুটা এভাবে—

একদিন আমাকে গির্জা কর্তৃপক্ষ মিশনারি কাজে তিন দিনের জন্য সীমান্তবর্তী 'দায়িরি' এলাকায় পাঠাল। দায়িরি সুমাত্রা উপদ্বীপের কয়েকশ কিলোমিটার দক্ষিণের মাইদান শহর থেকে দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। মিশনারি ও দাওয়াতের কাজ সমাপ্ত হলো। আমি সে অঞ্চলের গির্জার দায়িত্বশীলের

বাড়িতে অবস্থান করলাম। গাড়ি পৌঁছার অপেক্ষায় ছিলাম। এ গাড়িই আমাকে কর্মস্থলে নিয়ে যাবে। হঠাৎ এক লোক আমার দিকে উঁকি মেরে তাকাল। লোকটি কুরআনের শিক্ষক। ইন্দোনেশিয়ায় যাকে "মক্তবের স্বেচ্ছাসেবক" বলা হয়। মকতব হচ্ছে ছোট একটি মাদরাসা। এখানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। লোকটি দৃষ্টি সরিয়ে নিল। জীর্ণ-শীর্ণ দেহের অধিকারী সে। কাঠির মতো চিকন। মাথায় পুরোনো সাদা রুমাল। গায়ে অধিক ব্যবহারে রং জ্বলে যাওয়া পোশাক। এমনকি অধিক হাঁটার ফলে জুতো ছিল সেলাই করা।

লোকটি আমার কাছাকাছি এল। অভিবাদন জানানোর পর আমাকে সে বিরল একটি প্রশ্নটি করল। বলল, "তুমি নিজ বক্তব্যে বলেছ, ইসা ﷺ ইলাহ। কিন্তু তাঁর উলুহিয়্যাতের ওপর দলিল কোথায়?" আমি বললাম, "এখানে দলিল থাকুক বা না থাকুক, এটি তোমার চিন্তার বিষয় নয়। তুমি চাইলে তা বিশ্বাস করতে পারো; আর চাইলে অস্বীকার করতে পারো।" তখন লোকটি আমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে গেল। কিন্তু বিষয়টি এই পর্যন্তই ক্ষান্ত হলো না। আমি নিজের প্রশান্তির জন্য বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আর বললাম, "এই লোকটির জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব! অসম্ভব! কারণ জান্নাত শুধু তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা ইসা মাসিহকে প্রভু মানে।" সে সময়ে এটিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

বাড়ি ফিরে আসলাম। কিন্তু লোকটির আওয়াজ আমার কানে বারবার বাজছিল। খুব জোরে আমার কানে প্রশ্নটি এসে আঘাত হানছিল। এ প্রশ্ন আমাকে ইনজিলের কপিসমূহ থেকে সঠিক জবাব খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এটা জানা কথা, ইনজিলের চারটি কপি রয়েছে, যার একটি আরেকটির বিপরীত। একটি মথির লেখা, আরেকটি মার্কসের, তৃতীয়টি লুকের এবং চতুর্থটি জোহনের লেখা। ইনজিলের এ সবগুলো নাম তার লেখকের নাম অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ চারটি ইনজিল মানুষের তৈরি। এটি অনেক আশ্চর্যজনক বিষয়। এরপর আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষের হাতে লেখা কুরআনের পরস্পর বিরোধী কোনো কপি আছে?" আমার কাছে যে উত্তর এল, তা থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। উত্তরটা হলো, "অবশ্যই না, এমন কোনো কিছু কুরআনের ক্ষেত্রে নেই!" ইনজিলের এই গ্রন্থগুলো এবং অন্যান্য কিছু পুস্তিকা মূলত খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার উৎস।

আমি ইনজিলের চারটি কপিই পাঠ করতে থাকলাম। কিন্তু তাতে আমি কী পেলাম? মথির ইনজিল ইসা ﷺ-এর ব্যাপারে কী বলে? আমি তাতে এই বিষয়টি পড়ি, "ইসা মাসিহের বংশের সম্পর্ক ইবরাহিম ও দাউদের দিকে।..." (১ : ১)[২৮৮] তাহলে ইসা কে? তিনি কি তাহলে মানুষ নন? হ্যাঁ, তাহলে মথির ইনজিল মতে তিনি মানুষ। আর লুকের ইনজিলে বলা হয়েছে, "তিনি সর্বদার জন্য ইয়াকুব পরিবারের রাজত্বের অধিকারী। আর তার এই রাজত্বের কোনো অন্ত নেই।" (১ : ৩৩)[২৮৯] মার্কসের ইনজিলে বলা হয়েছে, "এটি আল্লাহর পুত্র ইসা মাসিহের বংশলতিকা।"(১)[২৯০] সর্বশেষ জোহন ইসা ﷺ-এর ব্যাপারে কী বলে? তাতে বলা হয়েছে, "তিনি শুরুতে কালিমা ছিলেন। আর কালিমা ছিল, আল্লাহর কাছে। আর কালিমাই হলো আল্লাহ।"(১ : ১)[২৯১] এর অর্থ হলো, 'তিনি শুরুতে মাসিহ ছিলেন। আর মাসিহ ছিলেন আল্লাহর কাছে। মাসিহই আল্লাহ।'

আমি মনে মনে বললাম, ইসা ﷺ-এর সত্তা নিয়ে এই চার কিতাবে সুস্পষ্ট মতানৈক্য রয়েছে যে, ইসা ﷺ মানুষ ছিলেন নাকি আল্লাহর পুত্র, রাজা ছিলেন নাকি তিনিই আল্লাহ? বিষয়টি আমার জন্য কঠিন হয়ে গেল। আমি এর সঠিক কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। তাই আমি আমার খ্রিষ্টান সাথিদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, "কুরআনের এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের সাংঘর্ষিকতা রয়েছে?" উত্তর—অবশ্যই না। কেন? কারণ, কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর এই ইনজিলগুলো মানুষের রচিত। তোমরা নিশ্চয় জানো, ইসা ﷺ নিজের দীর্ঘ জীবন আল্লাহর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জীবন কাটিয়েছেন। তাই আমাদের পরস্পর জিজ্ঞেস করা উচিত, "সেই মূল ভিত্তিটা কী ছিল, যার প্রতি ইসা ﷺ দাওয়াহ দিতেন?"

....

২৮৮. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. - Matthew 1:1

২৮৯. And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end. - Luke 1:33

২৯০. 1) The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; - Mark : 1

২৯১. 1) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. - John 1:1

এই তো মার্কসের ইনজিলে বর্ণিত আছে, "এক লেখক এসে দেখল, তারা (ইসা ﷺ ও তাঁর সাথিরা) কথা বলছে। সে দেখল, তিনি (ইসা ﷺ) খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "সর্বোত্তম উপদেশ কোনটি?" ইসা ﷺ নিজের কথাকে প্রশস্ত করে বললেন, "নিশ্চয় সর্বোত্তম উপদেশ হলো : হে বনি ইসরাইল, শোনো, আমাদের ইলাহ একক রব।"(১২ : ২৮-২৯)[২৯২] ইসা ﷺ যদি স্বীকার করে থাকেন যে, আল্লাহ তাআলাই একক রব, তাহলে ইসা কে? যদি ইসা ﷺ-ও আল্লাহ হন, তাহলে তো আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ বজায় থাকে না। বিষয়টি কি এমন নয়?

আমি আমার অনুসন্ধান জারি রাখলাম। একপর্যায়ে আমি জোহনের ইনজিলে এমন কিছু বাক্য পেলাম, যা ইসা ﷺ-এর দুআ এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর অনুনয়-বিনয়ের সাথে প্রার্থনার বিষয়ে ইঙ্গিত করে। তখন মনে মনে বললাম, "যদি ইসা ﷺ প্রতিটি বস্তুর ওপর একক ক্ষমতাধর আল্লাহ হয়ে থাকেন, তাহলে কি তাঁর এ দুআ ও অনুনয়ের প্রয়োজন আছে? কখনোই নয়। তাহলে ইসা কোনো ইলাহ নন; বরং তিনি আমাদের মতোই সৃষ্টি। জোহনের ইনজিলে যে দুআটি বর্ণিত হয়েছে, তা লক্ষ করুন! দুআর বাক্যগুলো এমন— "মানুষের দীর্ঘস্থায়ী জীবন লাভের উপায় হচ্ছে, তারা এটা জানবে যে, আপনিই হচ্ছেন প্রকৃত ইলাহ, এক ইলাহ। আর মাসিহকে আপনি প্রেরণ করেছেন। মাসিহ এ পৃথিবীতে আপনার প্রতিনিধি। আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছেন, আমি তা পূর্ণ করেছি।"(১৭ : ৩-৪)[২৯৩] এটি ছিল দীর্ঘ এক দুআ। এ দুআর শেষে তিনি বলেন, "হে রব, হে সৃষ্টিকর্তা, জগৎ তোমাকে চিনেনি। কিন্তু আমি

....

২৯২. 28) And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?
29) And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

- Mark 12:28-29

২৯৩. 3) And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
4) I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

- John 17: 3-4

তোমাকে চিনেছি। আর এরা চিনতে পেরেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তাদের তোমার পরিচয় দিয়েছি। অচিরেই আমি তাদের তোমার পরিচয় দিয়ে দেবো, যাতে তাদের মাঝে সে জিনিসের ভালোবাসা তৈরি হয়, যার কারণে তুমি আমাকে ভালোবেসেছ।" (১৭ : ২৫-২৬)[২৯৪]

এসব দুআ থেকে বোঝা যায় যে, ইসা ﷺ স্বীকার করতেন, আল্লাহ তাআলাই একক সত্তা এবং ইসা ﷺ নির্দিষ্ট একটি জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসুল। তিনি সকল মানুষের নিকট প্রেরিত ছিলেন না। আর এই জাতি কোন জাতি ছিল? মথির ইনজিলে তার উত্তর পাব আমরা, "পথভ্রষ্ট ইসরাইল পরিবারের কাছেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"(১৫ : ২৪)[২৯৫] যদি এ সকল স্বীকারোক্তিগুলো একটি অপরটির সাথে সংযোগ করি, তাহলে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, "আল্লাহ হলেন এক অদ্বিতীয়। আর ইসা ﷺ হলেন বনি ইসরাইলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসুল।"

এরপর আমি আরও খুঁজতে থাকলাম। আমার স্মরণে এল, আমি সালাতে সব সময় এই বাক্যগুলো পাঠ করি, "আল্লাহই পিতা, আল্লাহই ছেলে, আল্লাহই পবিত্র আত্মা; তিনটি একই সত্তা।" মনে মনে ভাবলাম, "সত্যিই আশ্চর্যকর একটি বিষয়! যদি আমরা প্রথম শ্রেণির একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করি, "১+১+১ = ৩?" সে বলবে, "হ্যাঁ"। এরপর যদি আমরা তাকে বলি, "৩ = ১"। এ কথায় সেও একমত হবে না। তাহলে আমাদের কথার মাঝেও সুস্পষ্ট বিরোধ রয়েছে। কারণ, ইসা ﷺ ইনজিলে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এক, যার কোনো শরিক নেই।

ছোটবেলা থেকে আমার হৃদয়ে লালিত দৃঢ় বিশ্বাসের মাঝে ফাটল ধরল। তিন সত্তা মিলে একই সত্তা এবং ইসা ﷺ-এর স্বীকারোক্তির মাঝে বৈপরীত্য

....

২৯৪. 25) O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
26) And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
- John 17: 25-26

২৯৫. 24) But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. - Matthew 15:24

দেখলাম আমি। আমাদের হাতে থাকা ইনজিলের কিতাবগুলোতেই বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। তাহলে কোনটি সত্য? আমার সাধ্য ছিল না যে, সাথে সাথে আমি সত্যকে স্বীকার করে নিই। কিন্তু সত্য কথা হলো, আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তাই আমি নতুনভাবে ইনজিলে অনুসন্ধান করতে লাগলাম। হয়তো আমার উদ্দিষ্ট বিষয়টি পেয়ে যাব। এবারের অনুসন্ধানে এ চরণটিতে এসে চোখ আটকে গেল আমার, "অনাদিকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে স্মরণ করো যে, আমিই আল্লাহ, অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমার কোনো সাদৃশ্যও নেই।" (বুক অফ আইজায়া, ৪৬ : ৯)[২৯৬] ইসলামের কিতাব অনুসরণ করে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। কারণ, সুরা আল-ইখলাসে আল্লাহর এই বাণী পেলাম :
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

হ্যাঁ, আল্লাহর কালাম যতক্ষণ আল্লাহর কালাম থাকবে, তা যেখানেই হোক বৈপরীত্য থাকবে না। এটাই খ্রিষ্টবাদের প্রথম শিক্ষা। খ্রিষ্টধর্মের প্রথম মূলনীতি। এখন আর আমার হৃদয়ে "একজনের মাঝে তিনজন" এ কথার বিশ্বাস রইল না।'

ভাই রাহমাহ বুরনুমু বর্ণনা করতে থাকেন সেসব উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলো, যা তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন, 'খ্রিষ্টবাদের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, প্রথম পাপ বা উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত পাপ। তারা মনে করে যে, আদম ﷺ জান্নাতের হারাম বৃক্ষের ফল খেয়ে যে পাপ করেছেন, এই পাপের ভাগী সমস্ত মানুষ; এমনকি মায়ের পেটে থাকা ভ্রূণও এবং সে পাপী হয়ে

২৯৬. 9) Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me, - Isaiah 46:9

জন্মগ্রহণ করবে। এই বিষয়টি কি সঠিক না বেঠিক? আমি এর স্বরূপ সন্ধানে নেমে পড়লাম। আমি ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অফ ইজিকিয়ালের বর্ণনায় পেলাম, "ছেলে পিতার পাপের বোঝা বহন করবে না। পিতা ছেলের পাপের বোঝা বহন করবে না। নেক-আমলকারী নিজের ভালো আমলের ফল ভোগ করবে এবং বদ-আমলকারী নিজের বদ-আমলের শাস্তি ভোগ করবে। যখন মন্দ লোক নিজের ভুল কর্ম থেকে ফিরে আসবে এবং আমার ফরজসমূহ আদায় করবে, সত্য ও ন্যায় কর্ম সম্পাদন করবে, তাহলে তা এমন জীবন যার মৃত্যু নেই। সে যে সকল অপরাধ করেছে, তার বিপক্ষে সেগুলো আলোচিত হবে না।" (বুক অফ ইজিকিয়াল, ১৮ : ২০-২১)[২৯৭]

এই ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিমে যা বলা হয়েছে, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

"কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে, তবে কেউ তা বহন করবে না; যদিও সে নিকটাত্মীয়ও হয়।"[২৯৮]

....

২৯৭. 20) The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.
21) But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.

- Ezekiel 18:20-21

[টীকায় উদ্ধৃত বাইবেলের ছত্রগুলো নেওয়া হয়েছে https://aruljohn.com/Bible/ সাইট থেকে।] - অনুবাদক

২৯৮. সুরা ফাতির : ১৮

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،

“প্রত্যেক নবজাতক সন্তান জন্মগ্রহণ করে ফিতরাতের ওপর। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।”[২৯৯]

এটিই ইসলামের নীতি। আর ইনজিলের বর্ণনাও এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে। তাহলে কীভাবে এ কথা বলা হয় যে, “আদম ﷺ-এর ভুল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হবে এবং মানুষ পাপিষ্ঠ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে?”

তবে তো যে কিতাবকে “আল-মুকাদ্দাস”(পবিত্র) উপাধি দেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমেই খ্রিষ্টবাদের এসব শিক্ষার ভ্রান্তি ও বানোয়াটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। খ্রিষ্টবাদের তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে, “ইসা ﷺ-এর শূলে চড়া ব্যতীত কোনো আদম-সন্তানের গুনাহ মাফ হবে না।” আমি এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করলাম। আমি নিজে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, “এটি কি সঠিক?” যে উত্তর থেকে পালানোর সুযোগ নেই, তা হলো, অবশ্যই এটি সঠিক নয়। কেননা, কিছুক্ষণ আগে উল্লেখিত ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা এ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে দেয়, “যদি মন্দ লোক নিজের সকল মন্দকর্ম ছেড়ে ফিরে আসে এবং আমার ফরজসমূহ আদায় করে, সত্য ও ন্যায় কর্ম সম্পাদন করে—তাহলে তা এমন জীবন, যার মৃত্যু নেই। সে যে সকল অপরাধ করেছে, তার বিপক্ষে সেগুলো আলোচিত হবে না।” অর্থাৎ যদি কেউ গুনাহ থেকে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাআলা কোনো মাধ্যম ছাড়াই সকল গুনাহ মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য কাউকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা বা অন্য কিছু করে মাধ্যম বানাতে হয় না।'

ইন্দোনেশিয়ান এই ভাই—একসময় যিনি পাদরি ছিলেন—কুফুর থেকে ইসলামের এই দীর্ঘ পথে পরিবর্তনের কাহিনি বর্ণনা করে বলেন, 'আমি আকিদার অন্যান্য কিছু বিষয়েও অনুসন্ধান জারি রাখলাম। একদিন আমি ইনজিল ও কুরআন উভয়টি আমার সামনে টেবিলের ওপর রাখলাম। আমি

....

২৯৯. সহিহুল বুখারি : ১৩৫৮, সহিহু মুসলিম : ২৬৫৮

ইনজিলকে এই প্রশ্নটি করলাম, "তুমি মুহাম্মাদের ব্যাপারে কী জানো?" সে বলল, "কিছুই না। কেননা, মুহাম্মাদ নামটি ইনজিলে নেই।" এরপর আমি সামনের প্রশ্নটি করলাম ইসা ﵇-কে লক্ষ করে; যেভাবে কুরআন বর্ণনা করেছে। আমি বললাম, "হে ইসা বিন মারইয়াম, তুমি মুহাম্মাদের ব্যাপারে কী জানো?" কুরআনের বর্ণনা, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, তিনি বলেছেন, "আমার পর অবশ্যই একজন নবি আসবেন, যার নাম আহমাদ।" আল্লাহ তাআলা ইসা ﵇-এর ভাষায় বলেন :

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

"স্মরণ করো, যখন মারইয়াম-তনয় ইসা বলল, হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমাদ। এরপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য জাদু।"[৩০০]

পাঠক, তাহলে সত্য কোনটি?

বারনাবাস নামে একটি ইনজিল আছে। এটি হলো ইতিপূর্বে উল্লেখিত চার ইনজিলের বাইরে। আফসোসের বিষয় হলো, এই ইনজিলের প্রতি খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গুরুরা সাধারণ খ্রিষ্টানদের জন্য উঁকি মেরে তাকানোও হারাম করে দিয়েছে। আপনারা কি জানেন, কেন এটি করা হয়েছে? কারণ, সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হলো, এটিই একমাত্র ইনজিল—যাতে আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুসংবাদ দেওয়ার কথাটি রয়েছে। এবং এতে বিকৃতি ও সংযোজন সবচেয়ে কম। আর এতে এমন কিছু বাস্তব জিনিস রয়েছে, যা কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

....

৩০০. সুরা আস-সাফ : ৬

বারনাবাসের ইনজিলে আছে, "একদা মাসিহের ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল, "উসতাজ, আপনার পরে কে আসবে?" তখন মাসিহ অত্যন্ত আনন্দের সাথে বললেন, "আমার পরে অচিরেই আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ শুভ্র মেঘখণ্ডের মতো আসবে, যা সকল মুমিনকে ছায়া দান করবে।" (ইসহাহ : ১৬৩)[৩০১]

এরপর আমি বারনাবাসের ইনজিলে আরেকটি আয়াত পাঠ করলাম। ইসহাহ : ৭২-এ বলা হয়েছে, "একসময় এন্ড্রু (ছাত্র) মাসিহকে জিজ্ঞেস করল : "হে উসতাজ, মুহাম্মাদ কখন আসবে? তাঁর নিদর্শনসমূহ কী কী, যাতে আমরা তাঁকে চিনতে পারি?" মাসিহ বললেন, "মুহাম্মাদ আমাদের এই যুগে আসবে না। তিনি আসবেন কয়েশ বছর পরে, যখন ইনজিল বিকৃত হয়ে যাবে। তখন মুমিনদের সংখ্যা ত্রিশজনও হবে না। সে সময়ে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদকে পাঠাবেন।"[৩০২] এ কথাটি বারনাবাসের ইনজিলে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমি গুনে দেখলাম, ৪৫টি আয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আলোচনা করা হয়েছে। দলিল হিসেবে আমি পূর্বের দুটি আয়াতের ওপরই ক্ষান্ত করলাম।'

....

৩০১. The disciples answered, 'O Master, who shall that man be of whom thou speakest, who shall come into the world?'
Jesus answered with joy of heart: 'He is Mohammed, messenger of God, and when he cometh into the world, even as the rain maketh the earth to bear fruit when for a long time it hath not rained, even so shall he be occasion of good works among men, through the abundant mercy which he shall bring. For he is a white cloud full of the mercy of God, which mercy God shall sprinkle upon the faithful like rain'

-The Gospel of Barnabas - chapter 163.

[বারনাবাসের বাইবেলের ছত্রগুলো নেওয়া হয়েছে https://www.sacred-texts.com/isl/gbar/ সাইট থেকে] -অনুবাদক।

৩০২. Then said Andrew: 'Master, tell us some sign, that we may know him.'
Jesus answered: 'He will not come in your time, but will come some years after you, when my gospel shall be annulled, insomuch that there shall be scarcely thirty faithful. At that time God will have mercy on the world, and so he will send his messenger,...

-The Gospel of Barnabas - chapter 72

হিদায়াতের পথে আসা ইন্দোনেশীয় এই ভাই তার শিক্ষার আরেকটি দিক উল্লেখ করে বলেন, 'খ্রিষ্টবাদের শিক্ষার মূলনীতির আরেকটি হলো, "ইসা ﷺ, তিনিই জগতের জন্য উদ্ধারকারী এবং মুক্তিদাতা।" অর্থাৎ যখন তুমি ইসা ﷺ-এর উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে ইমান আনবে, তখন অচিরেই তুমি মুক্তি পাবে; চাই তুমি যত গুনাহ ও অবাধ্যতাই করো না কেন! শুধু তোমাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসা তোমার উদ্ধারকারী; ব্যস তাহলেই সব পাপ মাফ। তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তুমি তাঁর অনুসারী। আমি মনে মনে বললাম, 'ইনজিলে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা জরুরি। সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট হওয়া দরকার। অ্যাক্টস অফ দি এপস্টলসের (৬ : ১৪)-তে উদ্ধৃত হয়েছে, ১ম পোপ থেকে প্রেরিত কোরিন্টসের অধিবাসীর নিকট একটি চিঠি। সেখানে ১ম পোপ বলেন, "প্রভু নিজ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং অচিরেই আমাদেরও তাঁর শক্তিতে দাঁড় করাবেন।" খ্রিষ্টবাদের শিক্ষায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "তারা যখন ইসা আ.-কে গ্রেফতার করল, তখন তাঁকে আদালতের সামনে পেশ করা হলো। সেখানে তাঁকে শূলে চড়ানোর দণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। এরপর তাঁকে দাফন করা হয়।" এখানের উক্তিটি সেই ঘটনার সাথেই উপযোগী।

ভাই রাহমাহ বুরনুমু এখানে সামান্য ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমি দীর্ঘ সময় যাবৎ এই উক্তিটি নিয়ে চিন্তা করেছি। এরপর মনে মনে বললাম, "কবর থেকে মাসিহ ﷺ-কে বের করার জন্য আল্লাহ তাআলা যদি হস্তক্ষেপ না করেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে মাটির নিচেই দাফন হয়ে থাকতে হবে। এখন কথা হলো, ইসা ﷺ নিজেকে কবর থেকে উদ্ধার করতে পারেন না, তবে কীভাবে অন্যদের উদ্ধার করার শক্তি থাকবে তাঁর? খ্রিষ্টানরা ইসা ﷺ-কে প্রভু বানিয়েছে, কিন্তু কোনো ইলাহের শানে কি এটি উপযোগী যে, তিনি এ ব্যাপারে অক্ষম থাকবেন? এটিতে কোনো সন্দেহ নেই, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার মতের সাথে একমত হবেন। বিষয়টি কি এমন নয়?

তখন আমি গির্জা থেকে বের হয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করি। আর কখনোই সেখানে ফিরে যাব না বলে স্থির করি। ১৯৬৯ সালের কাহিনি। আমি সেখান থেকে সত্যি সত্যি বের হয়ে আসি। গির্জায় যাওয়ার কোনো চিন্তাই ছিল না আমার। কিন্তু এর মানে এটা নয়, আমি খৃষ্ট ধর্ম থেকেই বের হয়ে গেছি।

কারণ এ ছাড়াও আরও অনেক গির্জা ছিল। এবং এটা ছাড়াও খ্রিষ্টধর্মেও অনেক মাজহাব ছিল। যেমন : ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, অর্থডোক্স, মেথোডিজম, বালাই কেসলামাতান, ইউনিটারিয়ানসহ আরও অনেক। এমনকি আমি বলতে পারি যে, খ্রিষ্ট ধর্মে ৩৬০-এর অধিক মাজহাব আছে। আর আল্লাহ সত্যই বলেছেন :

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।"[৩০৩]

কেউ বলতে পারে যে, ইসলামেও তো মাজহাব ও বিভিন্ন দলের উপস্থিতি রয়েছে! যেমন, প্রসিদ্ধ চারটি মাজহাব হলো : হানাফি, শাফিয়ি, হাম্বলি ও মালিকি।

এর উত্তর হলো, এখানে মাজহাবের অনুসারীগণ দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ করেন না; বরং সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল। তারা ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির ক্ষেত্রেও একমত। তাদের মতানৈক্য হলো শাখাগত বিষয়ে, মৌলিক বিষয়ে নয়। তাদের ইখতিলাফ হলো রহমত, যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, সেখানে আকিদার মৌলিক বিষয়েই মতানৈক্য। আর এটিই ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মাঝে পার্থক্য টেনে দেয়।

ইসলামে মাজহাবসমূহের ভিন্নতার কারণে এমন কোনো মসজিদ পাওয়া যাবে না, যেটি নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবের জন্য নির্ধারিত। বরং বিষয়টি এর বিপরীত। যখন মুয়াজ্জিন সালাতের জন্য আজান দেন, তখন প্রত্যেক

....

৩০৩. সুরা আল-আনআম : ১৫৩

মুসলিম সালাতের জন্য তার নিকটস্থ মসজিদে প্রবেশ করে। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। খ্রিষ্টধর্মে প্রতিটি গির্জা নির্ধারিত মাজহাব মেনে চলে এবং সেখানে সে মাজহাবের অনুসারী ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। তাই ক্যাথলিকরা প্রটেস্ট্যান্টদের গির্জায় প্রার্থনা করতে পারে না। প্রটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিকদের গির্জায় প্রার্থনা করতে পারে না। এভাবে অন্যান্য মতাবলম্বী গির্জাও এমন।'

ভাই রাহমাহ বুরনুমু তাঁর চমৎকার এই কাহিনির আরও সামনে গিয়ে বলেন, 'একদিন আমি আমার জনৈক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে সে আমাকে ক্যাথলিক মাজহাবের দাওয়াত দেয়। সে আমাকে সে মাজহাবের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরে, যা আমি প্রটেস্ট্যান্ট মাজহাবে পাইনি। আমার বন্ধু বলল, "এই মাজহাবে "হুজরাতুল গুফরান" (ক্ষমাকক্ষ) রয়েছে। "হুজরাতুল গুফরান" বলা হয়, গির্জার একটি কামরাকে, যেখানে লম্বা ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট কালো পোশাকপরিহিত একজন পাদরি বসেন। উপবেশন করেন উঁচু একটি চেয়ারে। যে ক্ষমাপ্রত্যাশী, সে তার কাছে যায়। পাদরি তখন কিছু অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ কদেরন। যখনই সে তা সমাপ্ত করে, তখন ওই ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে পবিত্র মনে করা হয়। আর সে সদ্যোজাত নিষ্পাপ শিশুর মতো প্রত্যাবর্তন করে।" আমার বন্ধু এভাবেই আমার কাছে বর্ণনা করেছে। সে আরও বলে, "গত সপ্তাহে তুমি যে পাপ করেছ, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, শনিবারে তুমি গির্জায় যাওয়ার পর তোমাকে ক্ষমা করা হবে এবং তুমি ক্ষমা অর্জন করতে পারবে। তোমার সালাতের কোনো প্রয়োজন নেই, ইবাদতের কোনো প্রয়োজন নেই। যখন তুমি এসব কিছু না করেও পাদরির কাছে যাবে এবং তার সামনে পাপ স্বীকার করবে, তোমার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।"'

ভাই রাহমাহ বুরনুমু বলেন, 'এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান আমার স্মরণ হলো। আর তা হলো, কোনো বান্দা যত উচ্চস্তর অর্জন করুক না কেন, তার জন্য এটি কখনো সম্ভব নয় যে, সে বান্দাদের গুনাহ মাফের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। যেমনিভাবে তাওবা ও ক্ষমা শরিয়তের বিধান ও ফরজসমূহ রহিত করে দেয় না। বরং তাওবাকারীর জন্য প্রতিদিন সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা আবশ্যক। যদি সে তা পরিত্যাগ করে, তবে তার তাওবার কোনো মূল্য নেই। সে কবিরা গুনাহকারী। যার গুনাহের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"কেউ অপরের বোঝা গ্রহণ করবে না।"

আমি হুজরাতুল গুফরানে প্রবেশকারীদের চেহারায় গুনাহের কারণে চিন্তা ও পেরেশানির নিদর্শন দেখলাম। কিন্তু যখনই তা থেকে কাউকে বের হতে দেখেছি, তার চেহারায় আনন্দের ঝলক দেখলাম। কারণ, তার বিশ্বাস হলো, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি সে কামরায় প্রবেশ করলাম চিন্তিত অবস্থায় এবং বেরও হলাম চিন্তিত অবস্থায়। হে পাঠক, কিন্তু কেন? কারণ, আমি চিন্তা করছিলাম এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করছিলাম, "আমাদের গুনাহসমূহ এই পাদরি বহন করে নিয়েছেন, কিন্তু তার থেকে সে গুনাহসমূহ কে বহন করবে?" এ কারণেই ক্যাথলিক মাজহাবের প্রতি আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই তা পরিত্যাগ করি। এরপর অন্য কোনো মাজহাবের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।'

সন্দেহ থেকে বিশ্বাসের এই সফরে ভাই রাহমাহ বুরনুমু তার পরবর্তী কাহিনি বর্ণনা করে বলেন, 'এরপর আমি খ্রিষ্টধর্মের আরও একটি মাজহাবের সাথে পরিচিত হই। যার নাম Jehovah's Witnesses—জেহোবার সাক্ষ্যদাতাগণ। এটিও খ্রিষ্টধর্মেরই একটি মাজহাব। আমি এ মাজহাবের প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাদের মাজহাবের শিক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "আপনারা কার ইবাদত করেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর"। আমি বললাম, "মাসিহ কে?" তিনি বললেন, "ইসা হলেন আল্লাহর রাসুল।" এটি আমার বিশ্বাসের অনুগামী মনে হলো। তাই আমি এই মাজহাবের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। আমি তাদের গির্জায় প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে একটিও ক্রুশ দেখলাম না। তাই এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "ক্রুশ হচ্ছে কুফরের আলামত। তাই আমরা নিজেদের গির্জায় তা ঝুলিয়ে রাখি না।"'

ভাই রাহমাহ বুরনুমু এ মাজহাবের ব্যাপারে কিছুটা সন্তুষ্ট হলেন, এ ব্যাপারে আরও ভালোভাবে জানতে চাইলেন। তিনি তার জীবনের এ সময়ের ব্যাপারটি বর্ণনা করে বলেন, 'আমি এই মাজহাব শিক্ষায় পূর্ণ তিনটি মাস অতিবাহিত করি। সবশেষে মাজহাবপ্রধানের সাথে আমার নিম্নোক্ত আলোচনা হয়। তিনি

ছিলেন নেদারল্যান্ডের অধিবাসী। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আমার নেতা, যদি আমি এই মাজহাবে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায় হবে?" তিনি বললেন, "বাতাসে ওড়া ধোঁয়ার মতো হবে।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমি কোনো সিগারেট তো নই যে, ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাব; বরং আমি আকল ও হৃদয়ের অধিকারী মানুষ।"

এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মৃত্যুর পর আমরা কোন দিকে যাব?" তিনি বললেন, "তোমাকে প্রশস্ত একটি ময়দানে নেওয়া হবে।" আমি বললাম, "সে ময়দানটি কোথায়?" তিনি বললেন, "আমি জানি না।" জিজ্ঞেস করলাম, "হজরত, আমি যদি এই মাজহাবের একজন অনুসারী হই, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করব?" তিনি বললেন, "না"। বললাম, "তাহলে কোথায় যাব?" তিনি বললেন, "জান্নাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা মাত্র ১ লাখ ৪৪ হাজার। তবে তুমি আরেকবার দুনিয়াতে বসবাস করবে।" আমি তার কথা কেটে বললাম, "হজরত, কিন্তু অচিরেই মহাঘটনা সংঘটিত হবে এবং দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।" তিনি বললেন, "তুমি কিয়ামতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারোনি। তোমার কাছে যদি একটি চেয়ার থাকে এবং চেয়ারের ওপর বিষাক্ত কীট থাকে, তাহলে কি কীট থেকে বাঁচার জন্য তুমি চেয়ারটি জ্বালিয়ে দেবে?" আমি বললাম, "না"। তিনি বললেন, "বরং কীট মেরে চেয়ারটি ঠিক রাখবে। এভাবেই দুনিয়াকে গুনাহ ও নাপাক থেকে পবিত্র করে নিরাপদ করা হবে। আর তখন সে ময়দান থেকে লোকজন দুনিয়ার দিকে ফিরে আসবে। সুতরাং এখানে জাহান্নাম বলতে কিছু নেই।"

এই পর্যায়ে এসে আমি নতুনভাবে চিন্তা শুরু করলাম। বিষয়টিকে এপিঠ-ওপিঠ করে দেখলাম। সব শেষে আমি খ্রিষ্টধর্মের প্রচলিত সকল মাজহাব ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম। এই ঘটনা ছিল ১৯৭০ সালের। একদিন আমি সত্যের সন্ধানে পথ চলতে থাকলাম। আমি অনেক বড় সুন্দর একটি বৌদ্ধমন্দির দেখলাম। তার নিকটে দিয়ে সেখানে অনেকগুলো মূর্তি দেখতে পেলাম। ছাদে দেখলাম, দৈত্য-দানবের ছবি আঁকা। দেয়ালেও ছিল মূর্তির ছবি। গেটেও নীরব সিংহের মতো দুটি মূর্তি ছিল। গেটের ভেতর প্রবেশ করার সাথে সাথে এক লোক এসে আমাকে আটকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন?" বললাম, "ভেতরে প্রবেশ করতে চাই।" সে বলল, "প্রবেশের আগে জুতো খুলে নিন।

এটি আমাদের ইবাদতখানা। তাই আমাদের ইবাদতখানাকে সম্মান করুন।" মনে মনে বললাম, "বৌদ্ধরাও পরিচ্ছন্নতা বোঝে। কিন্তু আমাদের প্রাক্তন ধর্মে পরিচ্ছন্নতা বলতে কিছু নেই। যখন আমি গির্জায় প্রবেশ করতাম, তখন জুতো খুলতাম না।"[৩০৪]

আমি কিছু সময় যাবৎ বৌদ্ধধর্মকে পরখ করে দেখলাম। কিন্তু যে কারণে আমি দ্রুত তা পরিত্যাগ করেছি, তা হলো, আমি যে সত্যের সন্ধান করছিলাম, সেখানে তা পাচ্ছিলাম না। তারপর হিন্দুধর্মের সাথে পরিচিত হলাম। যার সূচনা ও প্রতিপালন হিন্দুস্তানে হয়েছে। এ মতবাদ প্রসারিত হয়ে ইন্দোনেশিয়ার কিছু অঞ্চলেও ছড়িয়েছে। আমি যেসব অঞ্চলে হিন্দুধর্মের অনুসারী আছে, সেখানে গেলাম। তাদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করলাম। এরই মাঝে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি হিন্দুধর্মে প্রথম পর্যায়ে এতটা সফলতা অর্জন করেছি যে, অলৌকিক অনেক বিষয় শিখে নিয়েছি। যেমন, আগুনের ভেতর দিয়ে হাঁটা, ধারালো পেরেকের ওপর দিয়ে হাঁটা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গে পেরেক ঢুকানো ইত্যাদি। কিন্তু এটি সেই বিষয় ছিল না, যার অনুসন্ধান করছিলাম আমি।'

ভাই রাহমাহ বুরনুমু সামনে এগিয়ে বলেন, 'একদিন আমি মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কার ইবাদত করেন?" তিনি বললেন, "ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবের।" ব্রহ্ম সৃষ্টির ইলাহ, বিষ্ণু কল্যাণের ইলাহ এবং শিব অকল্যাণের ইলাহ। এই তিন ইলাহ একজন মানুষের দেহে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। যার নাম হলো কৃষ্ণা। হিন্দুদের নিকট যিনি জগতের উদ্ধারকারী।" আমি মনে মনে বললাম, "তাহলে তো খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মাঝে উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। যদিও নামে পরিবর্তন। কিন্তু উভয় শ্রেণি এক সত্তার মাঝে তিন সত্তার অস্তিত্বের কথা বলে।"

আমি হিন্দু পুরোহিতকে বললাম, "আমাকে কৃষ্ণের জন্ম কাহিনিটা খুলে বলুন।" তিনি বললেন, "হিন্দুস্তানে দুই হাজার খ্রিষ্টপূর্বে একজন প্রতাপশালী অত্যাচারী শাসক ছিল। যার কোনো দয়ামায়া ছিল না। এমনকি নিজ সন্তানদের

....

৩০৪. এখানে পরিচ্ছন্নতা বলতে নাপাকি থেকে পবিত্রতা বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় নাপাক থেকে পবিত্র পরিষ্কার জুতো নিয়ে সালাত আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিও না। সে তার পুত্র-সন্তানকে হত্যা করে ফেলত নিজের সিংহাসন ছুটে যাওয়ার ভয়ে। অন্ধকার এক রাতে বাদশাহ প্রাসাদের সামনে বসা ছিল। হঠাৎ তার মাথার ওপর আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ভেসে উঠল। সেটি অবিশ্বাস্য দ্রুত ছুটছিল। এরপর আকাশপথে সেটি থেমে যায়। আর তার উজ্জ্বল আলোর কিছুটা গরুর খামারের গোলাবাড়িতে প্রেরণ করে। বাদশাহ যখন বিশেষজ্ঞ ও ধর্মীয় লোকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তখন তারা নিজেদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে বলল, "এটি শ্রীকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তির দেহে ইলাহদের আত্মপ্রকাশের দলিল।" আমি মনে মনে বললাম, "খ্রিষ্টধর্মে হুবহু এই কাহিনিটিই ব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে বিদ্যমান রয়েছে পুরোপুরি। পাদরি থাকাকালীন আমি সেই ঘটনাটি মানুষের কাছে বর্ণনা করে শুনাতাম। পার্থক্য শুধু সেই ঘটনায় বর্ণিত এলাকাটির নাম হলো বেথেলহাম। আর মানুষটি হলো আল-মাসিহ। মৌলিক একটি বিষয় উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে উভয় ঘটনা ও আকিদায় কোনো পার্থক্য নেই। আর জগতের উদ্ধারকারী হওয়ার ব্যাপারেও কোনো পার্থক্য নেই।

হিন্দু পুরোহিতের সাথে আমার আলাপ চলতে থাকল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি যদি আপনাদের ধর্মের ওপর ইনতিকাল করি, তাহলে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায় হবে?" তিনি বললেন, "আমি জানি না। তবে তুমি পিপীলিকা ও মশা ইত্যাদি পোকা হত্যা থেকে বিরত থাকবে।" তিনি বলেন, "কারণ, এগুলো কখনো কখনো তোমার মৃত পিতা বা দাদাও হতে পারেন।'"

তারপর ভাই রাহমাহ বুরনুমু বলেন, 'সর্বশেষ আমি এ সকল দ্বীন পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম। আর আমার সামনে শুধু ইসলামই বাকি ছিল। কিন্তু আমি তা অনুসরণ করতে চাচ্ছিলাম না। কেননা, ছোটবেলা থেকেই আমার হৃদয়ে এই ধর্মের ব্যাপারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। আমি এই ধর্মের ব্যাপারে শুধু সন্দেহই পোষণ করতাম। এর বেশি কিছু জানা ছিল না আমার। আমি অজানা সত্যের অনুসন্ধান করছিলাম। আর এই অনুসন্ধানে ছিল দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্যের পরীক্ষা। একদিন রাতের বেলা আমার স্ত্রীকে বললাম, আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। আমি চাইছিলাম, প্রার্থনা করব, আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে চাইব। নিজের কামরা বন্ধ করে দিলাম। আল্লাহর সামনে অবনত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে হাত তুলে বললাম, "হে আমার রব, আপনি যখন

বাস্তবেই বিদ্যমান রয়েছেন, তখন আমাকে ধরে হিদায়াত ও আলোর পথে নিয়ে যান। মানুষের জন্য আপনি যে দ্বীনে সন্তুষ্ট, সেদিকে পথপ্রদর্শন করুন।"

আল্লাহর কাছে আমার এ প্রার্থনা অন্য প্রার্থনার মতো ছিল না। সামান্য কিছু সময়ের জন্যও ছিল না। দীর্ঘ সময় যাবৎ তা চলতে থাকে। আট মাস। ১৯৭১ সালের অক্টোবরের ৩১ তারিখ মোতাবেক সে বছরের রমাজানের ১০ তারিখ রাতে আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী দুআ শেষ করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার কাছে হিদায়াতের নুর আসলো। আমি দেখলাম, আমার চারপাশের সবকিছু গভীর অমানিশায় ছেয়ে গেছে। কিছু দেখার মতো সাধ্য ছিল না আমার। হঠাৎ দেখলাম, আমার সামনে একটি দেহ ভেসে উঠল। আমি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে সে দেহের দিকে তাকালাম। একটা স্নিগ্ধ আলো আমার চার পাশের অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। মহান এই লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। গায়ে সাদা পোশাক। মাথায় সাদা পাগড়ি। ঘন দাড়ি। উজ্জ্বল চেহারা। আমি ইতিপূর্বে এত সুন্দর ও উজ্জ্বল মানুষ দেখিনি। তিনি আমাকে কোমল সুরে বললেন, "তুমি শাহাদাতাইন পাঠ করো!" আমি তখন শাহাদাতাইন নামে কোনো জিনিসের নাম জানতাম না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "শাহাদাতাইন কী?" তিনি বললেন, "তুমি বলো : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।)" তখন আমি তার সাথে সাথে তিনবার পাঠ করলাম। এরপর লোকটি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন।

যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম, তখন নিজের দেহ ঘামে পরিপূর্ণ দেখলাম। আমি আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া প্রথম মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলাম, "শাহাদাতাইন কী এবং ইসলামে এর গুরুত্ব কেমন?" সে বলল, "শাহাদাতাইন হলো ইসলামের প্রথম রুকন। যে ব্যক্তি এগুলো পাঠ করবে, সে-ই কেবল মুসলিম বলে গণ্য হবে।" আমি তার কাছে এগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করলে সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি স্বপ্নে যে লোকটিকে দেখেছি, তিনি কে? তার চেহারা ছিল জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল চেহারা।" যখন আমার এই মুসলিম বন্ধুকে তার বর্ণনা দিলাম, সে আনন্দের সাথে বলে উঠল, "তুমি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখেছ।'"

ভাই রাহমাহ বুরনুমু তার কাহিনি এ কথার মাধ্যমে শেষ করলেন, 'এই ঘটনার বিশ দিন পর ছিল ইদুল ফিতরের দিন। আমাদের গৃহের আশপাশের মসজিদে মুসলিমদের তাকবির ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমার দেহ কেঁপে উঠল। হৃদয়ে শিহরণ জেগে উঠল। আমার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। চিন্তায় নয়; বরং এই নিয়ামতের ওপর আল্লাহর শোকর আদায়স্বরূপ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি অবশেষে কয়েক বছর যাবৎ হিদায়াতের খোঁজ করার পর আমাকে হিদায়াত দান করলেন। সত্যের সন্ধানে আমার এ যাত্রা সফল হয়েছিল ১৯৭১ সালে। আমি নিজ স্ত্রীকে খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মাঝে স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম। সে ইসলামকেই গ্রহণ করল। উল্লেখ্য, সে ছোটবেলায় মুসলিম ছিল এবং মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠেছিল। পরে মিশনারিদের প্ররোচনায় খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কারণ, সে ছিল তার বিশুদ্ধ দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ। আমাদের সন্তানরাও আমাদের অনুসরণ করল, সবাই মুসলিম হয়ে গেল। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকে আমরা সবাই মুসলিম। আল-হামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে উচ্চ মনোবল উচ্চ মনোবলের অধিকারী উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা করে

একজন দায়ি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকে তার জাতির হিদায়াত এবং তাদের কাছে সর্বোচ্চ উপদেশ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে। সুরা নুহ সম্পর্কে চিন্তা করলে বিষয়টি যে কারও কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ ছাড়া অন্য সকল নবি-রাসুলের ঘটনাগুলোও এ ক্ষেত্রে শিক্ষণীয়। এভাবে সর্বশেষ নবি ও সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনীতেও রয়েছে উত্তম দৃষ্টান্ত। একইরূপে নবিদের অনুসারীদের মাঝেও রয়েছে উজ্জ্বল উদাহরণ। যেমন ফিরআওনের বংশধর মুমিন ব্যক্তি তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন :

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا

'হে আমার কওম, আজ তোমাদেরই রাজত্ব, জমিনে তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এসে গেলে কে আমাদের সাহায্য করবে?'[৩০৫]

হাবিব আন-নাজ্জার। নিজ জাতিকে দাওয়াত দেওয়ার চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন তিনি। এবং শহিদ হওয়ার পরেও নিজ জাতির কল্যাণ প্রত্যাশা করেছেন।

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ - بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

'সে বলল, হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোনোক্রমে জানতে পারত যে, আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!"[৩০৬]

আপনি যখন ইসলামের প্রথম প্রজন্ম ও তৎপরবর্তী প্রজন্মের মহান ব্যক্তিদের নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন দেখতে পাবেন যে, উচ্চ মনোবল এদের প্রত্যেকের

৩০৫. সুরা গাফির : ২৯
৩০৬. সুরা ইয়াসিন : ২৬-২৭

মাঝে সমানভাবে বিরাজমান ছিল। যারা ইসলামের মাধ্যমে মর্যাদাবান হয়েছেন—যাদের নিয়ে ইসলাম গর্বিত, তারা নিজেদের জীবন দ্বীনের প্রহরায় এবং উম্মাহর খিদমতে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। চাই তারা আলিম হন বা দায়ি, মুজাদ্দিদ কিংবা মুজাহিদ, শিক্ষক হন বা নেককার আবিদ। যদি তারা উচ্চ মনোবলের গুণে সজ্জিত না হতেন, তবে মহান ব্যক্তিদের তালিকায় তাদের কোনো স্থান থাকত না। যদি তারা উচ্চ মনোবলে সজ্জিত না হতেন, তবে তারা ইসলামের সন্তানদের হৃদয়মসনদে আরোহণ করতে পারতেন না। ইতিহাসের পাতায় আলোচিত হতেন না তারা। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত না তাদের নাম। যদি তারা উচ্চ মনোবলের অধিকারী না হতেন, তবে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আল্লাহ তাআলা তাদের কোনো আলোচনা অবশিষ্ট রাখতেন না।

উম্মাহর চিন্তায় চিন্তিত হওয়া, উম্মাহর সমস্যার সমাধানে ছুটে আসাসহ প্রতিটি কল্যাণকর কাজেই তাদের আদর্শ হলো সত্যবাদী নবি মুহাম্মাদ ﷺ। যিনি মুসলিমদের দুঃখে তাদের সাথে শরিক ছিলেন। মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণে সদা তৎপর থাকতেন, এমনকি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বলও হয়ে পড়তেন মাঝে মাঝে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ

আব্দুল্লাহ বিন শাকিক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা রা.-এর কাছে জানতে চাইলাম, "নবিজি ﷺ কি বসে সালাত আদায় করতেন?" আয়িশা রা. জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। মানুষজন যখন তাঁকে বৃদ্ধ করে দেয়।"'[৩০৭]

উম্মাহর চিন্তায় চিন্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো হুজাইফা রা.। সে চিন্তা তাঁর বর্ণিত এ হাদিসে প্রকাশিত হয়েছে—

৩০৭. সহিহু মুসলিম : ৭৩২।
অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ সাধন, তাদের যাবতীয় কল্যাণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করা এবং সেগুলো তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন যখন।

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي

'মানুষজন রাসুল ﷺ-কে কল্যাণকর বিষয়ে প্রশ্ন করত। কিন্তু অকল্যাণকর বিষয় আমাকে পেয়ে বসে কি না, এই ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতাম।...'[৩০৮]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, ফিতনার সময়ের ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে, ফিতনার সময়ের করণীয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর পরবর্তী সকল মুসলিমের নিকট কল্যাণ পৌঁছানোর ইচ্ছা করেছিলেন হুজাইফা ﵁। চাইছিলেন সে সময়ের মুসলিমদের জন্য করণীয় বর্ণিত হোক রাসুল ﷺ-এর মাধ্যমে। উম্মাহর চিন্তাই তাঁকে এমনটা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এক বেদুইনের দুআ রাসুল ﷺ-এর অপছন্দ হওয়ার বিষয়টি লক্ষ করুন। এখানেও উম্মাহর জন্য তাঁর চিন্তা ও দরদ দেখতে পাই আমরা। আবু হুরাইরা ﵁ বলেন :

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا. يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ

'রাসুল ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। তখন এক বেদুইন সালাতরত অবস্থায় দুআ করল, "হে আল্লাহ, আমার ও মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করুন। আর আমাদের সাথে কারও প্রতি দয়া করবেন না।" নবিজি ﷺ সালাম ফিরিয়ে বেদুইনকে বললেন, "তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে—অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে—সংকুচিত করেছ!"'[৩০৯]

....

৩০৮. সহিহুল বুখারি : ৩৬০৬
৩০৯. সহিহুল বুখারি : ৬০১০

এমনিভাবে রাসুল ﷺ বলেন :

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

'যে ব্যক্তি মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর বিনিময়ে তার জন্য নেকি লিখে দেন।'[৩১০]

রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে বলেন :

وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِمٍ،

'(জান্নাতের অধিবাসী হলো) নিকটাত্মীয় ও মুসলিমের প্রতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও দয়াশীল ব্যক্তি।'[৩১১]

আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী উচ্চ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তি এই মহৎ বিষয়ের দায়ভার উপলব্ধি করতে পারেন। যেখানে মানুষ পরিতৃপ্ত, তিনি সেখানে তৃষ্ণার্ত। মানুষ যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন তিনি নির্ঘুম চোখে স্বপ্ন আঁকেন। মানুষ যখন তৃপ্তির ঢেকুর তোলে, তিনি তখন ক্ষুধার্ত। মানুষ যখন আরাম করে, একজন দায়ি তখন পরিশ্রম করে যান দাওয়াতের মাঠে। মানুষজন যেখানে পশ্চাদ্‌গামী, দায়ি সেখানে অগ্রগামী। আলি ﷺ বলেন :

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْهُ

'যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করত এবং একদল আরেক দলের মুখোমুখি হতো, তখন আমরা রাসুল ﷺ-এর মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে তাঁর চেয়ে কেউ শত্রুদের অধিক নিকটবর্তী হতো না।'[৩১২]

....

৩১০. তাবারানি ﷺ কৃত মুসনাদু শামিইন : ৩/২৩৪

৩১১. সহিহু মুসলিম : ২৮৬৫

৩১২. মুসনাদু আহমাদ : ১৩৪৮। হাদিসের সনদ সহিহ।

বারা ﷺ বলেন :

كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আল্লাহর শপথ, যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করত, তখন আমরা নবিজি ﷺ-এর মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষা করতাম। নিশ্চয় আমাদের মধ্যে বীর ছিল সে, যে (সে সময়) নবিজি সা.-এর পাশে থাকত।'[৩১৩]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَدْتُهُ بَحْرًا» يَعْنِي الْفَرَسَ

'রাসুল ﷺ ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও শ্রেষ্ঠ সাহসী।' আনাস ﷺ বলেন, 'এক রাতে মদিনাবাসী একটি আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে গেল। তখন নবিজি ﷺ আবু তালহার গদিবিহীন ঘোড়ায় চড়ে কাঁধে তরবারি ঝুলানো অবস্থায় তাদের সামনে এলেন। তিনি বললেন, "তোমরা ভয় পেও না, তোমরা ভয় পেও না।" এরপর রাসুল ﷺ বললেন, "আমি এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো বেশ গতিময় পেয়েছি।"'[৩১৪]

....

৩১৩. সহিহু মুসলিম : ১৭৭৬

৩১৪. সহিহুল বুখারি : ৩০৪০

রাসুল ﷺ বলেন :

وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ - وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

'"তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে হাঁটা আমার এই মসজিদে দুই মাস ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম।" তিনি নিজ আঙুল মদিনার মসজিদের দিকে ইশারা করলেন।'[৩১৫]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়াবি কোনো বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার কোনো বিপদ দূর করে দেবেন।'[৩১৬]

আব্দুল করিম আবু উমাইয়া বলেন, 'কারও দুশ্চিন্তা দূর করা আমার কাছে এক মাসের ইতিকাফ অপেক্ষা উত্তম।'

ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক তাঁর স্বামী উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন, 'তিনি নিজেকে মুসলিমদের জন্য অবসর করে নিয়েছেন। তাদের বিষয়গুলোর ব্যাপারে নিজের মস্তিষ্ককে শূন্য করে নিয়েছেন। তাই সন্ধ্যা হলেও যেদিনের প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করতে পারতেন না, সেদিন দিনের সাথে রাতকে মিলিয়ে নিতেন এবং মানুষের প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত সময় কাটাতেন।'

ইমাম বুখারি ﷺ-এর উসতাজ আবু উসমান ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তিই আমার কাছে প্রয়োজন পেশ করেছে, আমি নিজেই তা সমাধানে এগিয়ে গিয়েছি। যদি তা সম্পন্ন হয়, তাহলে তো হলো; অন্যথায় আমি নিজ সম্পদ দিয়ে

....

৩১৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৭০৭
৩১৬. সহিহু মুসলিম : ২৬৯৯

তা পূর্ণ করেছি। যদি তাতে পূর্ণ হয়, তাহলে তো হলো; অন্যথায় তার জন্য নিজ ভাইদের কাছে সাহায্য চেয়েছি। যদি তাতে পূর্ণ হয়, তাহলে তো হলো; অন্যথায় বাদশাহর কাছে সাহায্য চেয়েছি।'

লাইস বিন সাদ ﷺ মাসআলার জন্য বসলে লোকজন তাঁকে ঘিরে মাসআলা জিজ্ঞেস করত, তিনি উত্তর দিতেন। আবার তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশে বসতেন; কেউ চেয়েছে কিন্তু তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন—এমনটা হয়নি; চাই প্রয়োজন ছোট হোক বা বড়।

শাইখ মুহাম্মাদ রশিদ রেজা ﷺ-কে তাঁর মা চিন্তিত দেখতেন, যখন মুসলিমরা কোথাও বিপদগ্রস্ত হতো বা কোনো মুসলিম বিপদে পড়ত। একদিন তার মা তাঁকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী হয়েছে? চীনের কোনো মুসলিম কি মারা গেছে?'

সমকালীন ইসলামি দাওয়াহর কবি উমর বাহাউদ্দিন আল-আমিরি। হার্টের ডাক্তারের অধীনে হাসপাতালের ওয়ার্ডে তিনি। তার হার্টের সাথে হরেক রকমের তার লাগানো। ইলেকট্রিক যন্ত্রের পর্দায় হার্টবিটের ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে গেছে। তাই রক্ত তরল করার জন্য প্রতিদিন কয়েকবার পেটে ইনজেকশান দিতে হচ্ছে। ডাক্তার এসে রোগীর ব্যাপারে জানতে চাইলেন হাসপাতালের নার্সের কাছে। কবিকে জিজ্ঞেসও করলেন, এখন কেমন আছেন? আপনি কি আরামবোধ করছেন? কবি আশ্চর্যকর এক উত্তর দিলেন প্রত্যুত্তরে—যা আজকের মুসলিমদের মাঝে বিরল। তিনি বললেন :

كَلَّا رُوَيْدَكَ يَا طَبِيْبُ *** وَقَدْ سَأَلْتَ: أَمَا اسْتَرَاحَ؟

هَلْ يَسْتَرِيْحُ الحُرُّ يُوْقِدُ *** صَدْرَهُ الْعِبْءُ الرَّزَاحُ؟

'মোটেই না! একটু ধীরে ধীরে ডাক্তার! আপনি জানতে চাইলেন, তিনি কি আরামবোধ করছেন? মুসলিম ভাইদের চিন্তায় যার হৃদয়ে ব্যথার আগুন জ্বলে, সে কি আরামবোধ করতে পারে?'[৩১৭]

....

৩১৭. প্রখ্যাত কবি ও দায়ি উমর বাহাউদ্দিন আমিরি হাসপাতালের বেডে শুয়ে ছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেবককে ডাক্তার যখন জিজ্ঞেস করে, 'কবি এখন কেমন বোধ করছেন?' তখন সেবক ওই কথাগুলো বলে।

দায়ির তৎপরতা

তৎপরতা থেকে কর্মের সূচনা। তৎপরতা হলো প্রসবকারিণীর মতো। আর নিশ্চলতা হলো বন্ধ্যাত্ব। দায়িদের অভিধানে তৎপরতা হলো জীবন, আর নিশ্চলতা হলো মৃত্যু।

আল-জিলানি বলেন, 'তৎপরতা হলো সূচনা। আর নিশ্চলতা হলো সমাপ্তি।' সময়কে বিলাসিতায় ডুবিয়ে দেওয়া আর দৃঢ়তা, অঙ্গীকার ও সংকল্পের সঙ্গে দায়িত্ব আদায়ের মাঝে পার্থক্য করে দেয় একজন দায়ির তৎপরতা। একজন দায়ির তৎপরতাই প্রমাণ করে, তার মধ্যে কতটা দায়িত্ববোধ রয়েছে এবং উম্মাহর প্রতি কতটা সে আত্মনিবেদিত।

এ তৎপরতার মাধ্যমেই প্রথম যুগের মুসলিমরা সূর্যের আলোর ন্যায় পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য জয় করেছিলেন। জয় করেছিলেন নানান শ্রেণির মানুষের হৃদয়। তারা তাওহিদের দাওয়াত দিতেন। চূর্ণ-বিচূর্ণ করতেন তাগুতের শক্তিমত্তা। আর মানুষকে নিয়ে আসতেন জান্নাতের পথে।

তৎপরতার মাধ্যমেই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে উঠেছেন। ফলে বাতিল জ্বলে ওঠার পর নির্বাপিত হয়েছে এবং জেগে ওঠার পর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

إِنَّمَا التَّوْحِيْدُ إِيْجَابٌ وَسَلْبٌ *** فَهُمَا فِيْ النَّفْسِ عَزْمٌ وَمَضَاءُ

لَا وَإِلَّا قُــوَّةٌ قَــاهِـرَةٌ *** لَهَـا فِيْ النَّفْسِ فِعْلُ الْـكَهْــرَبَاءِ

'তাওহিদের কালিমায় আছে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের সমষ্টি। এ দুটিতেই রয়েছে সংকল্প, রয়েছে দৃঢ়তা। "না" ও "হ্যাঁ" অপ্রতিরোধ্য এক শক্তি। বিদ্যুতের নেগেটিভ-পজেটিভের মতোই এর কাজ।'[৩১৮]

....

৩১৮. অর্থাৎ 'লা ইলাহা' (কোনো উপাস্য নেই) বলে তাগুতকে অস্বীকার করা, তাগুতের দাপট ও মসনদ ধ্বংস করে তাগুতকে নিশ্চিহ্ন করার শক্তি আছে কালিমায়। আর 'হ্যাঁ' এর মাধ্যমে, ইল্লাল্লাহ (একমাত্র আল্লাহই সত্যিকার মাবুদ) বলে, আল্লাহকেই এক ও অদ্বিতীয় প্রভু স্বীকার করা, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতে নিজেকে সঁপে দেওয়া, অন্য সবাইকে এ আনুগত্য ও ইবাদতে নিয়ে আসার শক্তি রয়েছে এ কালিমায়। - অনুবাদক।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ কর্মতৎপরতার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন অলসতা ও আলসেমির প্রতি। নিশ্চলতাকে তুলনা দিয়েছেন আবদ্ধ পানির সাথে। আবদ্ধ পানি থেমে থাকার কারণে নষ্ট হয়ে যায় একসময়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'যদি সিংহ শিকারের খোঁজে তৎপর না হয়, তবে সিংহকে অনাহারে মরতে হয়। তেমনিভাবে যদি তির তূণীর থেকে বের করে ধনুকে লাগানো না হয় এবং ধনুক থেকে লক্ষ্যস্থলে ছোড়া না হয়, তবে তির কখনো লক্ষ্যভেদ করবে না। কবিতায় ইমাম শাফিয়ির কথা—

إِنِّيْ رَأَيْتُ وُقُوْفَ الْمَـــاءِ يُفْـــسِـــدُهُ

إِنْ سَاحَ طَابَ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبْ

وَالْأُسْدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ

وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ

وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِيْ الْفُلْكِ دَائِمَةً

لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ

'আমি দেখেছি, প্রবাহিত হতে না পারলে পানি নষ্ট হয়ে যায়। বহমান পানিই ভালো থাকে—বদ্ধ পানি নষ্ট হয়ে যায়। সিংহ জমিন ছেড়ে লাফিয়ে না উঠলে শিকার ধরতে পারে না। ধনুক থেকে তির পৃথক না হলে কখনো তা লক্ষ্যে পৌঁছে না। যদি সূর্য সব সময় আকাশে নিশ্চল হয়ে থাকত, তবে আরব ও অনারব সকলেই তার প্রতি বিরক্ত হয়ে যেত।'

মুসলিম কবি ওলিদ আজমির মুখে শুনে নিই কবিতার দুটি চরণ। এ কবিতায় কবি দায়িদের উৎসাহ দিচ্ছেন, অনুপ্রাণিত করছেন দ্বীনের কাজে এগিয়ে যাওয়ার এবং অন্যের মাঝে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রতি। বলছেন, সবার আগে যেন আমরা পরিবারের মাঝে দাওয়াত ছড়িয়ে দিই।

كُنْ مَشْعَلًا فِيْ جُنْحِ لَيْلٍ حَالِكٍ *** يَهْدِيْ الْأَنَامَ إِلَى الْهُدَى وَيُبِيْنُ

وَانْشَطْ لِدِيْنِكَ لَا تَكُنْ مُتَكَاسِلًا * وَاعْمَلْ عَلَى تَحْرِيْكِ مَا هُوَ سَاكِنُ

وَابْدَأْ بِأَهْلِكَ إِنْ دَعَوْتَ فَإِنَّهُمْ *** أَوْلَى الْوَرَى بِالنُّصْحِ مِنْكَ وَأَقْمَنُ

وَاللهُ يَأْمُــرُ بِالْعَــشِــيْرَةِ أَوَّلًا *** وَالْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْعَــشِيْرَةِ هَيِّنُ

'অন্ধকার রজনীতে তুমি প্রজ্জ্বলিত মশাল হও। জগৎবাসীকে দেখাও হিদায়তের রাজপথ। দ্বীনের কল্যাণে উদ্যমী হও, অলস হয়ে পড়ে থেকো না যেন। কর্মহীন যারা ঠায় বসে আছে, তাদেরও তৎপর করে তোলো। সবার আগে নিজ পরিবারকে দাওয়াত দাও। কারণ, সৃষ্টির মাঝে তোমার নসিহতের সবচেয়ে বেশি হকদার তারাই। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আত্মীয়দের পরে অন্যদের উপদেশ প্রদান খুবই সহজ হয়ে যাবে।'

তৎপরতা হলো আত্মার জাগরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ

'হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন।'[৩১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

'বলুন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু দুজন করে দাঁড়াও। এরপর চিন্তাভাবনা করো।'[৩২০]

আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফের ব্যাপারে বলেন :

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

---

৩১৯. সুরা আল-মুদ্দাসসির : ১-২

৩২০. সুরা সাবা : ৪৬

'আমি তাদের দিল মজবুত করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তারা তখন বলল, "আমাদের প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক।"'[৩২১]

অন্তর-আত্মার জাগরণ দাওয়াতের পথের তৎপরতার প্রথম স্তর, প্রথম পদক্ষেপ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

'বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে সজ্ঞানে দাওয়াত দিই; আমি এবং আমার অনুসারীরা।'[৩২২]

কালবি ﷺ বলেন, 'তাঁর প্রত্যেক অনুসারীর দায়িত্ব হলো, তিনি যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন, সে বিষয়ে তারাও দাওয়াত দেবে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের একজন—তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?'[৩২৩]

হাসান ﷺ এই আয়াত পাঠ করে বলেন, 'ইনি হলেন সেই মুমিন, আল্লাহ তাআলা যার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা তার যে ডাকে সাড়া দিয়েছেন, মানুষকেও সে তার প্রতি আহ্বান করে। প্রত্যুত্তরে সে নেক আমল করে। এই ব্যক্তিই হলো আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর অলি।'

ওয়াজির বিন হুবাইরা দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ

....

৩২১. সুরা আল-কাহফ : ১৪
৩২২. সুরা ইউসুফ : ১০৮
৩২৩. সূরা ফুসসিলাত : ৩৩

‘এরপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল।’[৩২৪]

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ

‘এ সময় শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো।’[৩২৫]

এরপর ওয়াজির বললেন, ‘আমি শহরের প্রান্তভাগ নিয়ে চিন্তা করলাম। এরপর বুঝতে পারলাম, দুজন লোক দূর থেকে সৎ কাজের আদেশে ছুটে এলেন। তারা পথের দূরত্বের কারণে বসে থাকেনি; বরং পথের দূরত্ব অতিক্রম করে দায়িত্ব আদায় করেছেন।’

একজন সচল হৃদয়ের অধিকারী মুমিন নিজেও তৎপর থাকে এবং অন্যকেও তৎপর করে তোলে। আর ধীরগামী নির্জীব ব্যক্তি সফলতার নিদর্শন দেখার পরই কেবল সেটা পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তার প্রস্তুতি হলো দুর্বলের প্রস্তুতি।

صَاحَ مَا الْحُرُّ مَنْ يَّثُوْرُ عَلَى الظُّلْمِ *** وَقَدْ ثَارَتْ لِحَقِّهَا الأَقْوَامُ

إِنَّمَا الْحُرُّ مَنْ يَّسِيْرُ إِلَى الظُّلْـــمِ فَيُصْمِيْهِ وَالْأَنَامُ نِيَامُ ***

‘মাজলুম চিৎকার করে বলে, কার আছে সাহস? কে পারে জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে? কত জাতি তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বিদ্রোহ করেছে। সেই তো সাহসী, পৃথিবী যখন বেঘোরে ঘুমায়, সে তখন জুলুমের দিকে পা বাড়ায় এবং জুলুমের মূলোৎপাটন করে।’

সুতরাং সত্যের পতাকাতলে সমবেত হতে ভয় পেও না, দেরি করো না। অন্যথায় অনুশোচনায় দাঁত কামড়াতে হবে তোমাকে।

‘বদর যুদ্ধের পর রাসুল ﷺ জুল জাওশান দিবাবি ﵁-কে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, “তুমি কি ইসলামের প্রথম সারির লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও?” সে উত্তর দিল, “না।” রাসুল ﷺ বললেন, “এ ব্যাপারে

৩২৪. সুরা ইয়াসিন : ২০
৩২৫. সুরা আল-কাসাস : ২০

তোমাকে কোন জিনিস বাধা দিচ্ছে?” সে বলল, “আমি দেখছি যে, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আপনাকে বের করে দিয়েছে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করছে। আমি দেখব, যদি আপনি তাদের ওপর বিজয়ী হন, তবে আমি আপনার প্রতি ইমান আনব, আপনার আনুগত্য করব। আর যদি তারা বিজয় লাভ করে, তবে আপনার আনুগত্য করব না।” কিন্তু পরবর্তী সময়ে জুল জাওশান এ আচরণের জন্য খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। কারণ, রাসুল ﷺ শুরুতে যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন তিনি তা পরিত্যাগ করেছিলেন।’[৩২৬]

তাই অগ্রদূত হও। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও। দায়ি ইলাল্লাহর আহ্বানকে ফিরিয়ে দিও না। কোনো ধরনের গড়িমসি, ইতস্তত ও দ্বিধাবোধ করো না। এটাই মুমিনের শান—

ইবরাহিম عليه السلام বলেন, ‘হে ইসমাইল, আল্লাহ তাআলা আমাকে একটি আদেশ করেছেন।’ ইসমাইল عليه السلام বললেন, ‘আপনার রব যা আদেশ করেছেন, তা-ই করুন।’ ইবরাহিম عليه السلام বললেন, ‘তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?’ ইসমাইল عليه السلام বললেন, ‘আমি আপনাকে সাহায্য করব।’[৩২৭]

সত্যবাদী নবি ﷺ হজের মৌসুমে ডাক দিয়ে বলতেন, ‘কে আছে যে, আমার দায়িত্ব বহন করবে; যাতে আমি আমার রবের বার্তা পৌঁছাতে পারি?’[৩২৮] এই তো তিনিই তোমাকে বলছেন, (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) ‘আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছে দাও।’[৩২৯]

যে তাঁর বাণী পৌঁছে দেবে, তার জন্য দুআ করে তিনি বলেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

....

৩২৬. আল-মুনতালিক : ১৯১

৩২৭. সহিহুল বুখারি : ৩৩৬৪

৩২৮. হাদিসে কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : (أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي) দেখুন—সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৩৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২০১। এ ছাড়াও এর কাছাকাছি অর্থে আরও বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে এসেছে।

৩২৯. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬১

“আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে আলোকজ্জ্বল করুন, যে আমার কাছ থেকে কিছু শ্রবণ করে, তারপর যেমন শুনেছে—তেমন পৌঁছে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় শ্রোতার চেয়ে সে অধিক হৃদয়ংগমকারী হয়, যার কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।’[৩৩০]

বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ দুআয় বলতেন :

اللهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

‘হে আল্লাহ, আমাদের ইমানের সাজে সাজিয়ে দিন এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিন।’[৩৩১]

আল্লাহ তাআলা রহমানের সে সকল বান্দার প্রশংসা করেছেন, যাদের প্রার্থনায় থাকে :

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

‘আর আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।’[৩৩২]

অর্থাৎ আমরা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করব এবং আমাদের এমন হওয়ার তাওফিক দিন, যেন পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করে।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহকে একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘যিনি তার পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেন এবং পরবর্তীদের জন্য ইমাম হন।’

نَحْنُ فِيْ ذِيْ الْحَيَاةِ رَكْبٌ سُفَّارٌ *** يَصِلُ اللَّاحِقِيْنَ بِالْمَاضِيْنَا

قَدْ هَدَانَا السَّبِيْلَ مَنْ سَبَقُوْنَا *** وَعَلَيْنَـا هِـدَايَةُ الْأَتِيْـنَا

‘আমরা জীবনসফরের সে আরোহী দল, যাদের সাথে পূর্বসূরিদের সংযোগ রয়েছে। পূর্বসূরিগণ আমাদের পথ দেখিয়েছেন। এখন আমাদের কর্তব্য উত্তরসূরিদের পথনির্দেশনা দেওয়া।’

৩৩০. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৫৭
৩৩১. সুনানুন নাসায়ি : ১৩০৫
৩৩২. সুরা আল-ফুরকান : ৭৪

ইমাম গাজালি ﷺ বলেন :

'জেনে রাখো, এ যুগে বাড়িতে বসে থাকা ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন, সে মন্দ থেকে মুক্ত নয়। কেননা, সে মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া ও তাদের সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা ছেড়ে বসে আছে। অথচ শহরের অধিকাংশ মানুষ সালাতের ফরজ-ওয়াজিবের ব্যাপারে অজ্ঞ। তাহলে গ্রামাঞ্চলের কী অবস্থা হবে?! এ ছাড়াও বেদুইন, কুর্দি, তুর্কমেনিয়ানসহ অন্য মুসলিমদের কী অবস্থা?

তাই শহরের প্রতিটি মসজিদে, প্রতিটি মহল্লায় একজন ফকিহ থাকা দরকার, যিনি মানুষকে তাদের দ্বীন শিক্ষা দেবেন। এমনিভাবে প্রতিটি গ্রামেও এমন লোক থাকা দরকার। প্রত্যেক ফকিহর জন্য ফরজে আইন আদায় করে ফরজে কিফায়ার জন্যও অবসর হওয়া জরুরি। নিজ শহর ছেড়ে অন্য এলাকা, বেদুইন, কুর্দি ও অন্যদের জন্যও সময় বের করা তার কর্তব্য। দ্বীন ও শরিয়তের ফরজ বিধানগুলো তাদের শেখানো তার দায়িত্ব।'[৩৩৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ

'হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন।'[৩৩৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন, 'উম্মাহর ওপর কর্তব্য হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর কাছে যা নাজিল হয়েছে, তা পৌঁছে দেওয়া এবং তিনি যেভাবে মানুষকে সতর্ক করেছেন, সেভাবে সতর্ক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

---

৩৩৩. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৩৪২

৩৩৪. সুরা আল-মুদ্দাসসির : ১-২

"তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যেন তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।"[৩৩৫]

জিন জাতি যখন আল্লাহ তাআলার বাণী শুনল, তখন—

وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ

"তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।"[৩৩৬-৩৩৭]

শাইখুল ইসলামের যোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহসমূহ উম্মাহর কাছে পৌঁছে দেওয়া শত্রুর গর্দানে তির পৌঁছানো অপেক্ষা উত্তম। কারণ, তির পৌঁছানোর কাজ বহু মানুষ করে।[৩৩৮] কিন্তু উম্মাহর মাঝে সুন্নাহসমূহ পৌঁছাতে পারেন শুধু নবিদের ওয়ারিশ ও তাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণই। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'[৩৩৯]

সম্ভাব্য পূর্ণতা লাভ উচ্চ মনোবলেই নিহিত। যে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে চায়, তার জন্য পার্থিব এই জীবনেও সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা আবশ্যক। একটার পর একটা অর্জন করতে হয়। প্রতিটি পণ্যেরই যথার্থ মূল্য রয়েছে।[৩৪০]

দুনিয়াতে এই উচ্চ স্তরটি হলো আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং নববি উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব। যার ওপরে শুধু নবুওয়াতের স্তরই বাকি থাকে। ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ তোমাকেই লক্ষ্য করে বলছেন, 'তুমি কি তাঁর নিকটবর্তী হতে চাও না? যদি চাও, তবে আল্লাহর বান্দাদের তাঁর দিকে পথপ্রদর্শন করতে থাকো। এটিই আম্বিয়া ﷺ-এর কাজ ছিল। তুমি কি জানো

....

৩৩৫. সুরা আত-তাওবা : ১২২
৩৩৬. সুরা আল-আহকাফ : ২৯
৩৩৭. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৬/৩২৭
৩৩৮. এটা সে সময়ের কথা, যখন মুসলিমদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল; কিন্তু আজ!? (-অনুবাদক)
৩৩৯. আত-তাফসিরুল কাইয়িম : ৪৩১
৩৪০. আল-মুনতালিক : ১২১

না যে, তাঁরা নির্জনে ইবাদতের চেয়ে মানুষকে শিক্ষাদানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন? তাঁরা জানতেন যে, এটি তাঁদের প্রিয়জনের কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। মানুষকে কল্যাণের ব্যাপারে সাহায্য করা, কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহিত করা, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাই তো নবিদের কাজ।'

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে মেলামেশাকারী ও মানুষের দেওয়া কষ্টের ওপর সবরকারী বীর এবং মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকা, দাওয়াত ছেড়ে বসে থাকা নিস্তেজ ব্যক্তির মাঝে তুলনা করে শাইখ ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, 'নীরব সাধকরা দিনের সময়টাতে অন্ধকারে থাকে—বাদুড় যেমন দিনের বেলা অন্ধকারে থাকে—তারা মানুষের উপকার করা থেকে বিরত থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের দাফন করে দিয়েছে। যদি এরা কল্যাণকর কাজ—যেমন : জামাআত, জানাজার অনুসরণ এবং অসুস্থদের দেখতে যাওয়া থেকে বিরত না থাকে—তবে এ অবস্থা তাদের জন্য ভালো। অন্যথায় এটি হলো কাপুরুষদের অবস্থা। কিন্তু বাহাদুররা নিজেরা শেখে ও শেখায়। আর এটিই হলো নবিগণ ﵈-এর অবস্থান।'

আদর্শবান দায়ি শাইখ আব্দুল কাদির আল-কিলানি ﵀। যিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে ইরাকবাসীকে দাওয়াত দিয়েছেন। তার সে আহ্বানে ভাষা ছিল। ছিল মর্ম। ৫৪৫ হিজরির জুমআর খুতবা। খুতবার সময়ে দ্রুত হাতে সংকলন করে তার এক ছাত্র আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সে শব্দাবলি। তিনি এটিকে কিতাবের রূপ দিয়ে নাম রাখলেন 'আল-ফাতহুর রব্বানি ওয়াল ফাইজুর রহমানি'। এই কিতাবে তার বিরুদ্ধে তোলা কিছু আপত্তির উত্তর পাওয়া যায়। কিতাবটি ছিল সত্যের আওয়াজে পূর্ণ। এতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ এবং দাওয়াতের আবশ্যকতার ব্যাপারে বেশ জোরালো বক্তব্য।

শাইখ আব্দুল কাদির ﵀-এর সত্য আহ্বানের প্রতিধ্বনি শুনুন :

'প্রাথমিক পর্যায়ের সাধক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে, মানুষের কাছ থেকে পলায়ন করে। কিন্তু একজন পূর্ণ সাধক মানুষের পরোয়া করে না। তাদের থেকে পলায়নও করে না; বরং সে মানুষকে খুঁজে বেড়ায়।

কারণ, সে আরিফ বিল্লাহ—আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত বান্দা। আর যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে কোনো জিনিস থেকে পলায়ন করে না। সে কেবল আল্লাহকেই ভয় করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের সাধক ফাসিক ও অবাধ্যদের থেকে পলায়ন করে, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ের সাধক এদের খুঁজে বেড়ায়। আর কেনই-বা তাদের খুঁজে বেড়াবে না, অবাধ্যদের সকল ওষুধ তো তাদের নিকট।

এ কারণেই কেউ কেউ বলেছেন, "কেবল আরিফ বিল্লাহগণই ফাসিকের চেহারা দেখে হাসে।"

যে পূর্ণভাবে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে আল্লাহর পথে পথপ্রদর্শক হয়ে যায়। সে এমন এক জাল হয়ে যায়, যার মাধ্যমে দুনিয়ার সমুদ্র থেকে বান্দাদের শিকার করে আখিরাতমুখী করা হয়। আরিফ বিল্লাহ মানুষের মাঝে এমন এক শক্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়, যার মাধ্যমে মানুষ ইবলিস ও ইবলিসের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে দেয়। আরিফ বিল্লাহ বান্দাদেরকে শয়তানের ছোবল থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকে।

হে মূর্খ সাধক, তুমি সাধনা নিয়ে একাকিত্ব গ্রহণ করেছ! এগিয়ে আসো, শোনো আমি কী বলছি। হে পৃথিবীর সাধকশ্রেণি এগিয়ে আসো! তোমাদের মঠ ধ্বংস করে সামনে এগিয়ে আসো! তোমরা কোনো সঠিক নীতি ছাড়াই নির্জনে বসে আছ। তোমরা কিছুই করছ না। তাই সামনে এগিয়ে আসো, কাজে লেগে যাও।'...

এ কথাগুলো শাইখের বৃদ্ধকালে বলা।

এমনই ছিল একজন নেককার আমলকারী আলিমের জ্ঞান। তার কথা শ্রবণে হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

তাঁর এই কথাটি নিয়ে চিন্তা করুন, 'হে পৃথিবীর সাধকশ্রেণি, তোমাদের মঠ ধ্বংস করে সামনে এগিয়ে আসো।' তাই আমরাও তাঁর সুরে বলি, বিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী চিন্তা ও তাগুতের বুদ্ধির নিচে চাপা পড়া হে পলাতক,

তোমাকে ঘরে বসিয়ে রাখা মঠ-মন্দির ভেঙে দাও এবং ইসলামি দাওয়াতের ময়দানে অবস্থান নাও।'[৩৪১]

বিশিষ্ট দায়ি মুহাম্মাদ আহমাদ আর-রশিদ বলেন :

'যদি একজন দায়ি দৈনিক তাহাজ্জুদের জন্য দণ্ডায়মান না হতে পারেন, তাহলে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। একইভাবে বেশি বেশি কুরআন খতম করতে না পারায়ও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা, দাওয়াত, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া এবং যুবকদের জন্য ভালো কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রতিদানের দিক থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ একটি আমল। এ ক্ষেত্রে একজন দায়ির জন্য আদর্শ ও অগ্রদূত হলেন পূর্ববর্তী নেককার দায়ি ইমামগণ। যারা দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেছেন। মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোয় তারা ছিলেন উদ্যোগী ও প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণকারী। নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে তারা মানুষের সাথে ওঠাবসা করেছেন। মানুষ তাদের কাছে আসবে, তাদের কাছে জানতে চাইবে—এই অপেক্ষায় ছিলেন না তারা। বরং তারাই মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন।

সর্বদা এমনই ছিল দায়িদের অবস্থা। বর্তমান যুগের দায়িদেরও কর্তব্য নিজ শহরের অলিগলি এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

লক্ষ করুন, রাসুল ﷺ-এর দূতেরা কীভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেদুইনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে ছিলেন, তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন ইসলামের। বেদুইনরা নিজ থেকে মদিনায় আসবে, এ আশায় বসে থাকেননি তারা। আপনি জানেন, রাসুল ﷺ-কে এক বেদুইন ইসলামের রুকনসমূহের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করেন। এরপর সে বেদুইন বললেন, 'আমি এ থেকে সামান্যও বাড়াব না এবং কমাবও না।' এ বেদুইনের প্রশ্নের শুরুটা কেমন ছিল? খেয়াল করে দেখুন।

তিনি বলেছিলেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমাদের কাছে আপনার দূত এসেছে। সে আমাদের বলল, আপনি নাকি দাবি করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রাসুল

৩৪১. আল-মুনতালিক : ১১৪-১১৫

হিসবে পাঠিয়েছেন?'[৩৪২] তাদের কাছে দূত গিয়েছে দাওয়াত নিয়ে। আর এভাবেই মানুষের কাছে যেতেন দায়িরা। যে এ অপেক্ষায় আছে যে, লোকেরা তার কাছে আসবে, সে আদৌ দায়ি নয়।

যদি তুমি এই বেদুইনের কথা সামান্য ব্যাখ্যা করো, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, এই বেদুইন জাতির কাছে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিকে পাঠালেন, তখন তিনি কেন মদিনাকে ত্যাগ করেছেন। কেন নিজের পরিবার, বাড়িঘর ও সন্তানসন্ততিকে ছেড়ে গেছেন। কেন তিনি অতিক্রম করেছেন মরুর পর মরু, বনের পর বন—এত দীর্ঘ পথ। কেন তিনি বিপদাপদ আর গরম-ঠান্ডার মাঝে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ সবই তিনি করেছেন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে।

তুমি যে দাওয়াতের লক্ষ্যে পৌঁছার ইচ্ছা করেছ, তার অবস্থা এমনই। এখানে তৎপরতা, উদ্যম, সকাল-সন্ধ্যা সব সময় চলার পথে অবিচল থাকা, কথা বলা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের দরকার। পথে না নেমে শুধু আশা নিয়ে বসে থাকলেই হবে না।-লক্ষ্য এমনি বসে বসে অর্জিত হবে না। পূর্বসূরিদের জীবনী অধ্যয়ন করে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। অন্যথায় সন্ধ্যা তোমার ঘরেই হবে। কারণ, তুমি ঘরই ছাড়োনি। যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে।'[৩৪৩]

কুফার অধিবাসী প্রখ্যাত তাবিয়ি ফকিহ আমির আশ-শাবি ﷺ আমাদের উদ্দেশে বলেন :

'কিছু লোক কুফা থেকে বের হয়ে গেল। উদ্দেশ্য—নিকটস্থ একটি স্থানে গিয়ে তারা ইবাদত-বন্দেগি করবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর কানে এ খবর পৌঁছালে তাদের নিকট গেলেন তিনি। তারা নিজেদের মাঝে ইবনে মাসউদ ﷺ-কে পেয়ে বেশ খুশি হলো। কিন্তু তাদের আশায় গুড়ে বালি। তিনি বললেন, "তোমাদের এমন কাজের কারণ কী?" তারা বলল, "আমরা জনসমুদ্র থেকে বের হয়ে ইবাদত করা পছন্দ করেছি।" আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তোমাদের মতো অন্যান্য লোকও এমন করা শুরু করে, তবে শত্রুদের সাথে

৩৪২. সহিহু মুসলিম : ১২
৩৪৩. আল-মুনতালিক : ১১৯-১২০

কে যুদ্ধ করবে? তোমরা যদি ফিরে না যাও, তাহলে আমিও এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব না।'"[৩৪৪]

ইমাম আহমাদ ﷺ যখন কোনো পুণ্যবান, দুনিয়াবিমুখ বা কোনো দায়িত্ব পালনরত বা সৎ কাজের অনুসরণকারী মানুষের ব্যাপারে জানতে পারতেন, তিনি সে মানুষটির সাথে দেখা করতে চাইতেন; তার সাথে পরিচিত হওয়া ও তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া পছন্দ করতেন।[৩৪৫]

তিনি মানুষ থেকে পলাতক ও জনবিচ্ছিন্ন কোনো লোক ছিলেন না। একজন দায়ির বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের খোঁজখবর রাখা, মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করা, সভা-সমাবেশে তাদের সাথে উপস্থিত হওয়া। বিপরীতে যে ব্যক্তি মসজিদে বা নিজের ঘরে তার কাছে মানুষের ছুটে আসার অপেক্ষা করে, সে সারা জীবন একাকী পড়ে থাকে এবং হাই তোলার শাস্ত্র রপ্ত করে বেশ করে।[৩৪৬]

বুখারি ও তিরমিজি ﷺ-এর উসতাজ মুসা বিন হাজ্জাম ﷺ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে সালাফ বলেন, 'তিনি ছিলেন সিকাহ, নেককার। কিন্তু তিনি শুরুতে ইরজা মতাদর্শের লোক ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন। ফলে তিনি আহলে সুন্নাহর মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং ইরজায়ি চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসেন। অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে আহলে সুন্নাহর বিরোধীদের মূলোৎপাটন করেছেন, সঠিক দাওয়াত দিয়ে গেছেন।'[৩৪৭]

....

৩৪৪. ইবনুল মুবারকের কিতাবুজ জুহদ, পৃষ্ঠা নং ৩৯০

৩৪৫. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ : ২১৮

৩৪৬. আল-মুনতালিক : ১২৭

৩৪৭. তাহজিবুত তাহজিব : ১০/৩৪১

আল্লাহর পথে দাওয়াতে সালাফের উদ্যম-তৎপরতার কিছু দৃষ্টান্ত

জাফর বিন সুলাইমান বলেন, 'আমি মালিক বিন দিনার ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যদি আমি নিদ্রাহীন থাকতে সক্ষম হতাম, তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় আজাব নেমে আসার ভয়ে নিদ্রাহীন থাকতাম। আর যদি কিছু সহযোগী পেতাম, তাহলে এই দাওয়াত নিয়ে তাদের পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতাম যে, "হে মানুষ, জাহান্নামকে ভয় করো, জাহান্নামকে ভয় করো।""

ইবরাহিম বিন আশআস বলেন, 'আমরা ফুজাইল ﷺ-এর সাথে কোনো জানাজায় বের হলে তিনি উপদেশ দিতেন আর কাঁদতে থাকতেন। কেমন যেন তিনি সাথে থাকা সাথিদের বিদায় দিচ্ছেন আখিরাতের পথযাত্রী হিসেবে। কবরস্থানে পৌঁছে এমনভাবে বসতেন, যেন তিনি মৃতদের একজন। সেখানে বসে উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁদতে থাকতেন। সবশেষে এমনভাবে উঠে আসতেন, যেন তিনি আখিরাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন; জেনে এসেছেন আখিরাত সম্পর্কে, এখন গিয়ে মানুষকে তা জানাবেন।'

শুজা বিন ওয়ালিদ বলেন, 'আমরা সুফইয়ান সাওরির সাথে বের হলে তিনি আসা-যাওয়ার পথে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে নিজের জিহ্বাকে ব্যস্ত রাখতেন।'

ইমাম আজ-জুহরি ﷺ কেবল তারবিয়াত দিয়ে ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে শুদ্ধ করা এবং হাদিস শিখিয়ে হাদিস বিশেষজ্ঞ তৈরি করার পেছনে কাজ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং বেদুইনদের কাছে গিয়ে তাদের বিভিন্ন বিষয় শেখাতেন তিনি।

ফকিহ আহমাদ আল-গাজালি ছিলেন আবু হামিদ আল-গাজালি ﷺ-এর ভাই। তিনি গ্রামে গ্রামে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষকে উপদেশ দিতেন, ওয়াজ করতেন।

শাইখ আবু ইসহাক আল-ফাজারি ﷺ। সাধারণ মানুষদের সাথে চলাফেরা, ওঠাবসা করতেন। সীমান্তে বসবাসকারীদের আদব শেখাতেন। বিশেষ করে রোমের নিকটাঞ্চল সিরিয়ার উঁচু অঞ্চল এবং উপদ্বীপে। তিনি তাদেরকে নবিজি ﷺ-এর সুন্নাতের শিক্ষা দিতেন। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে

নিষেধ করতেন। সীমান্তে যদি কোনো বিদআতি প্রবেশ করত, তাকে বের করে দিতেন তিনি।

দুনিয়াবিমুখ শাইখ ফকিহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আদ-দাবাহি ﷬। অনবরত ইবাদত, আমল ও চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকতেন। সব সময় ডুবে থাকতেন কল্যাণকর কাজে। দ্বীনের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। মুসলিম ভাইদের উপদেশ দিতেন। মানুষ তাকে দেখলেই তার চেহারায় মেহনতের ছাপ দেখত স্পষ্ট।

وَعَلَى الْفَتَى لِطِبَاعِهِ *** سِمَةٌ تَلُوْحُ عَلَى جَبِيْنِهِ

'যুবকের স্বভাব তার কপালে চমকাতে দেখা যায়।'

মহান ইমাম আল-খিরকি ﷬। আল-মুখতাসার কিতাবের লেখক। ইমাম ইবনে কুদামা ﷬ বলেন, 'আমি শুনেছি, তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল, তিনি দামেস্কে একটি মন্দ কাজে বাধা প্রদান করলে তাঁকে আঘাত করা হয় এবং এটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

সাধারণের মাঝে জ্ঞান বিতরণে সালাফের আগ্রহ-উদ্দীপনা

জাফর বিন বুরকান ﷬ বলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ আমাদের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন। লিখলেন, "তোমার বাহিনীতে যারা ফকিহ, তাদের আদেশ করো, আল্লাহ তাআলা তাদের যে ইলম দিয়েছেন, তারা যেন নিজেদের মসজিদ ও মজলিসে সে ইলম প্রচার-প্রসার করে। ওয়াসসালাম।"'

উসমান বিন আতা ﷬ বর্ণনা করেন, তার পিতা আতা ﷬ বলেন, 'আমার মনে হয়, আমার সবচেয়ে দৃঢ় আমল হলো ইলমের প্রচার।' আতা বিন আবি রবাহ ছিলেন মক্কার মুফতি। তিনি আরও বলেন, 'আমার ঘরে একটি শয়তান থাকা একটি বালিশ থাকার চেয়ে উত্তম। কারণ, বালিশ ঘুম ডেকে আনে।'

ইমাম রবিআতুর রায় ﷬ বলেন, 'কারও কাছে ইলমের কিছু থাকলে তা নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়।'

হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন :

‘এ কথা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, যার মাঝে বোধশক্তি রয়েছে এবং ইলম গ্রহণের যোগ্যতা আছে, এমন ব্যক্তির জন্য অবহেলা করে ইলম অর্জন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেন ইলম না-শেখা ইলম উঠে যাওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। অথবা এ উক্তির মাধ্যমে “যোগ্য লোকদের ইলম প্রচারে উৎসাহিত করা” উদ্দেশ্য। যেন কোনো আলিম নিজের অর্জিত ইলম অন্যদের শেখানোর পূর্বেই মৃত্যুবরণ না করেন। যেন কোনো আলিমের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম না উঠে যায়। অথবা এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো, আলিম যেন নিজেকে প্রকাশিত করেন এবং মানুষ তার থেকে ইলম গ্রহণের জন্য উৎসুক হন। যাতে নিজের মাঝে ইলম সমাহিত রাখার কারণে তা বিনষ্ট না হয়ে যায়।’[৩৪৮]

ইবনে কাসিম ﷺ ইসা বিন দিনারকে উপদেশ দিয়ে বলেন, ‘তুমি স্পেনের বড় বড় শহরে অবস্থান করবে। এমন শহরে অবস্থান করবে না, যেখানে তোমার ইলম বিনষ্ট হয়ে যাবে।’

সালাফ : দ্বীনের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন যারা

দৃঢ় মনোবলের অধিকারী একজন দায়ি বাতিলের মোকাবেলা করেন দৃঢ়তার সাথে। পথের মাঝেই বাতিলের বন্ধুত্ব ছুড়ে মারেন। পরিস্থিতির ভাষা বলে, বন্ধুত্বপূর্ণ বিলাসিতা আমার জন্য সম্ভব ছিল...

وَلَكِنَّهُمْ رَكِبُوْا مَسْــلَــكًا *** يَحِيْدُ عَنْ الْجَــدَدِ الْمُــشْــرِقِ

وَقَدْ مَلَكَ الْأَمْرَ مِنْهُــمْ رِجَالٌ *** يُخَالِفُ مَنْطِقَهُمْ مَنْــطِقِيْ

نَأَوْا عَنْ هُدَى اللهِ فِيْ نَهْجِهِمْ *** وَسَارُوْا، وَسِرْتُ، فَلَمْ نَلْتَقِ

‘কিন্তু তারা এমন এক পথ ধরেছে, যে পথ ক্রমশ নিচে সরে গেছে আলোকিত সমতল ছেড়ে। তাদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে, যাদের ভাষা ও চিন্তা আমাদের সঙ্গে মিলে

....

৩৪৮. ফাতহুল বারি : ১/১৭৮

না। তারা হিদায়াতের রাজপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আলাদা হয়ে গেছে আমাদের পথ। তাই তারাও এগিয়ে চলেছে, আমিও এগিয়ে চলেছি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।'

সালাফ দ্বীনের ব্যাপারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, নিজের দাওয়াতের ব্যাপারে দৃঢ়তার অধিকারী; যদিও জগৎবাসীর সবাই তার বিরোধিতা করে।

সুলাইমান আদ-দারানি ﷺ বলেন, 'যদি সমস্ত মানুষ সত্য নিয়ে সন্দেহ করে, তবুও আমি সত্য নিয়ে সন্দেহে পড়ব না।' তিনি তখন মনে করবেন যে, তিনি একাকী সৃষ্টি হয়েছেন, একাকীই সত্যের ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন এবং একাকীই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

হাজম বিন আবু হাজম ﷺ বলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ তাকে লক্ষ্য করে বলেন, "যদি আল্লাহ তাআলা আমার দেহের কোনো অংশের বিনিময়ে আমার হাতে সব বিদআতের মৃত্যু ঘটান এবং সব সুন্নাহর পুনর্জাগরণ করেন—এমনকি শেষ পর্যন্ত আমার প্রাণও চলে যায়, তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে এ কুরবানি কমই হবে।"'

তিনি জানতেন, দাওয়াতের পথ দীর্ঘ ও কঠিন, দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। মহান ব্যক্তিরাই কেবল এ দায়িত্ব বহন করতে পারেন। বীর ও সত্যবাদীদের হিম্মতই এ কাজ সম্পাদন করতে পারে। যার সংকল্প দুর্বল হয়ে গেছে এবং যার ইমানের ইন্ধন ফুরিয়ে গেছে, রোগাক্রান্ত হৃদয়ের অধিকারী সে ব্যক্তি এ পথে চলা অব্যাহত রাখতে পারে না।...এটি হচ্ছে নবিদের পথ, যে পথে ক্লান্ত হয়েছেন আদম ﷺ, কেঁদেছেন নুহ ﷺ, ইবরাহিম খলিল ﷺ নিক্ষিপ্ত হয়েছেন আগুনে, ইসমাইল ﷺ-কে শোয়ানো হয়েছে জবাইয়ের জন্য, স্বল্প মূল্যে বিক্রি হয়েছেন ইউসুফ ﷺ, রোগ-বালাই সহ্য করেছেন আইয়ুব ﷺ। আর এমনই ছিল সর্বশেষ নবি ও রাসুল ﷺ-এর জীবনী।'[৩৪৯]

উচ্চ মনোবলের অধিকারী দায়ি পাপিষ্ঠদের শক্তি ও নির্যাতনের সামনে নীরবতার অবকাশ গ্রহণ করেন না। কেননা, তিনি দেখতে পান, এ অবস্থায়

....

৩৪৯. বাসায়িরুন তারবাবিয়্যাহ : ১৩৫

অবকাশ গ্রহণ করা সাধারণ দুর্বল মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাই দায়ি, নেতা ও আলিমগণ আজিমাত ও দৃঢ়তাকে আঁকড়ে ধরেন। তারা সত্যের উচ্চারণ করেন উচ্চকণ্ঠে। যদিও এ জন্য শাস্তি ও নির্যাতন আসে, যদিও মৃত্যু এসে তাদের সঙ্গী হয়, তবুও তারা লড়ে যান।

এ ক্ষেত্রে বাস্তব এক উদাহরণ হলেন আহলে সুন্নাহর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আশ-শাইবানি ﵀। 'কুরআন মাখলুক'—এ বাতিল মতবাদ প্রসারিত হয়ে গেলে তিনি যথার্থ প্রতিরোধ করেন, তখন তাঁর ওপর নেমে আসে এক দীর্ঘ পরীক্ষা। এখানে তাঁর ছেলের বর্ণনায় সে ঘটনার কিয়দাংশ তুলে ধরছি। সালিহ বিন আহমাদ বলেন, 'আমার বাবা বলেন, "যখন তার সামনে চাবুক আনা হলো, তখন মুতাসিম সেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কাছে এটি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে এসো।" এরপর জল্লাদদের বলল, "এগিয়ে যাও!" তার আদেশে জল্লাদদের একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে দুটি চাবুক মারল। মুতাসিম তাকে বলল, "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! আরও জোরে মারো।" এরপর সে সরে গেলে আরেকজন এগিয়ে এসে আমাকে দুটি চাবুক মারল। আর এভাবে মুতাসিম সবার ক্ষেত্রেই বলত, "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! আরও জোরে মারো।" উনিশটি চাবুক মারা হলে মুতাসিম আমার কাছে আসলো। বলল, "আহমাদ, তুমি কেন নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছ? আল্লাহর শপথ, আমি তোমার প্রতি সদয়।" এদিকে এক লোক তার তলোয়ারের বাঁট দিয়ে আমাকে খোঁচা দিতে লাগল। মুতাসিম আবার মুখ খুলল, "তুমি কি মনে করেছ, এদের সকলের বিপরীতে তুমিই বিজয়ী হবে?" এরপর তাদের কেউ একজন বলল, "ধ্বংস হও তুমি, খলিফা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন!" কেউ বলল, "হে আমিরুল মুমিনিন, তার রক্তের দায়ভার আমার ঘাড়ে, তাকে হত্যা করে দিন!" এরপর তারা বলতে লাগল, "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি রোজা রেখে সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন!" মুতাসিম আমাকে বলল, "ধ্বংস হও তুমি, হে আহমাদ, তুমি কী বলো?" জবাব দিলাম, "আমার সামনে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসুল থেকে কোনো প্রমাণ এনে দাও, তাহলে আমি সেটাই বলব।"

মুতাসিম ফিরে গিয়ে বসল। জল্লাদকে বলল, "এগিয়ে গিয়ে তাকে শাস্তি দাও, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন!" এরপর দ্বিতীয়বার দাঁড়িয়ে এসে বলল, "ধ্বংস

হও তুমি, হে আহমাদ! আমাকে উত্তর দাও।" তারা সবাই আমার কাছে এসে বলতে লাগল, "হে আহমাদ, তোমার ইমাম তোমার সামনে দণ্ডায়মান!" আব্দুর রহমান বলল, "তোমার সাথিরা এ ক্ষেত্রে যা করেছে, তুমি তা করছ না কেন?" মুতাসিম বলতে লাগল, "ধ্বংস হও তুমি, তুমি আমাকে এমন একটি উত্তর দাও, যাতে তোমার জন্য সামান্য সুযোগ থাকে এবং আমি তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনিন, আমাকে আল্লাহর কিতাব থেকে কোনো দলিল এনে দিন।" মুতাসিম আবার ফিরে গিয়ে জল্লাদদের বলল, "এগিয়ে যাও।" জল্লাদ এসে আমাকে দুটি চাবুক মেরে সরে যেত। আর এ সময়ে মুতাসিম বলত, "কঠিনভাবে মারো, আল্লাহ তোমার হাত কর্তন করুন!""

সালিহ বিন আহমাদ বলেন, 'বাবা বলেন, "আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন দেখলাম, আমার বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। তখন উপস্থিত এক লোক আমাকে বলল, "আমরা তোমাকে উপুড় করে পা দিয়ে মাড়িয়েছি, পদদলিত করেছি।"' আমার পিতা বলেন, "কিন্তু আমি সেটি উপলব্ধি করতে পারিনি। তারা আমার কাছে ছাতু নিয়ে এসে বলল, "পান করো এবং বমি করো।" আমি বললাম, "আমি ইফতার করব না।" এরপর আমাকে ইসহাক বিন ইবরাহিমের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তখন জোহরের সময়। ইবনে সামাআহ এগিয়ে গিয়ে সালাত পড়ালেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে আমাকে বললেন, "আপনি সালাত আদায় করছেন! আপনার পোশাকে তো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে?" আমি বললাম, "উমর ﵁ সালাত আদায়কালে তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরেছিল।"'

সালিহ বলেন, 'এরপর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। মোট ২৮ মাস জেলে ছিলেন তিনি। তাঁর সাথে থাকা দুজন লোকের একজন আমাকে বলেছেন, "ভাতিজা, আবু আব্দুল্লাহর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। আমাদের কাছে খাবার নিয়ে আসা হলে আমি তাঁকে বলতে থাকতাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি রোজাদার। আর আপনার জন্য তাকিয়্যা[৩৫০] গ্রহণের সুযোগ আছে।" তিনি তৃষ্ণার্ত হলে পানির

৩৫০. আল্লামা আহমাদ শাকির ﵀ বলেন, 'সে সকল দুর্বল মুসলিমদের জন্য তাকিয়্যা করা জায়িজ, যারা হকের ওপর স্থির থাকতে পারবেন না বলে আশঙ্কা করেন, যারা মানুষের জন্য কোনো আদর্শবান

দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বললেন, "আমার জন্য পানি নিয়ে এসো।" সে একটি পেয়ালা নিয়ে আসলো; যাতে বরফ ও পানি ছিল। তিনি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলেন। এরপর না পান করেই ফিরিয়ে দিলেন। ক্ষুধা ও পিপাসায় তাঁর সবর দেখে আমি খুব বিস্মিত হলাম। অথচ তিনি ছিলেন ভয়াবহ এক বিপদে।'"[৩৫১]

ব্যক্তিও নন। এমন লোকদের জন্য শরিয়তের রুখসত বা অবকাশ গ্রহণ জায়িজ আছে। কিন্তু দৃঢ়তার অধিকারী ইমামগণ আজিমাত বা দৃঢ়তাকে গ্রহণ করবেন, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করে অবিচল থাকবেন। যদি তাঁরা তাকিয়্যা গ্রহণ করেন এবং রুখসতের ওপর চলেন, তবে সাধারণ মানুষ—যারা তাদের আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে মান্য করে—তারা গোমরাহ হয়ে যাবে। সাধারণ সেসব মানুষ জানতেও পারবে না যে, এটি তাকিয়্যা ছিল।

সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আলিমদের দুর্বলতার কারণে মুসলিমদের ওপর বিরাট বিপদ আপতিত হয়। এসব আলিম সত্য বলে না, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদের বলে না। এসব আলিম নিজেদের কর্তব্য পালন করে না। বরং তারা দ্বীন ও সত্য নিয়ে আপস করে। এ আপসের ফলে তারা কেবল শাসক-সরকারের সামনেই সত্যটা গোপন করে না; বরং প্রত্যেক এমন মানুষ থেকেই গোপন করে, যারা তার কোনো উপকারে আসে অথবা তার কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপস ও গোপন করার এ নীতি মেনে না চললে নিজের স্বার্থ হাসিল হয় না বলে সর্বসাধারণের সাথে এ দুর্নীতি বজায় রাখে তারা। দুনিয়ার যেকোনো ছোট-বড় ক্ষেত্রে তারা এটা বজায় রাখে। আর দুনিয়ার সবকিছুই তুচ্ছ।

আমাদের পর্যবেক্ষণ থেকে বলছি, মুসলিমদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় তাদের আলিমদের দুর্বলতার কারণে। এ যুগের হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামসম একজন আলিম আমার বাবার কাছে চিঠি লেখেন। বেশ জোরালো বক্তব্য। ১৩৩৭-এর জুমাদাল উলার চিঠি। চিঠিতে লেখেন, 'আজকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, মুসলিমদের কাছে তাদের কিতাব কুরআনে কারিমের স্রেফ একটি নির্দেশনাই এসেছে যে, যখন জুলুম তাদের ঘিরে নেয়, তখন তাদের করণীয় হচ্ছে إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً [(মুমিনরা কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না) তবে ব্যতিক্রম হলো, যদি তোমরা তাদের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করো। - সুরা আলি ইমরান : ২৮] মনে হচ্ছে মুসলিমদের কাছে কেবল এ আয়াতটিই পৌঁছেছে। তারা এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়। এ আয়াতের পেছনে তারা উদ্ভট সব তাফসির নিয়ে আসছে। আমি জানি না, তারা এ আয়াত থেকে কী বুঝল। তাহলে তারা জিহাদের ফরজিয়াতের ব্যাপারে কী বলবে? জিহাদের মাঝে তো জানমালের ধ্বংস নিহিত আছে?! রাসুল ﷺ নিজেকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন করেছেন, তারা এ থেকে কী বুঝল?! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা দুঃখ-কষ্টে সবর করে, যারা শহিদ হন—তাদের কারামাতের প্রতি ইমান রাখে কেন এসব মানুষ?! [আল্লাহ তো মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেছেন : وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ (যারা কষ্ট-সংকটে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে... - সুরা আল-বাকারা : ১৭৭)। সুতরাং মুমিন মুত্তাকিদের ওপর দুঃখ-কষ্ট আসবে, তাদের ওপর বিপদাপদ আপতিত হবে। এসবে সবর করতে হবে। এসব তো কুরআন-হাদিসে এসেছে, অথচ এরা কিনা তাকিয়্যার মালা জপে যায় সর্বদা!] - জাহাবি ﷺ কৃত তরজমাতুল ইমাম আহমাদ : ৪৯-৫০।

৩৫১. জাহাবি ﷺ কৃত তরজমাতুল ইমাম আহমাদ : ৪৮-৫০

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ ইমাম আহমাদ ﷺ-এর অবস্থান বর্ণনা করে বলেন, 'তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে তা উৎসর্গ করে দিয়েছেন, যেমন করেছিলেন বিলাল ﷺ। সাইদ বিন মুসাইয়িব ﷺ থেকে বর্ণিত, "তাঁর নিকট আল্লাহর জন্য নিজের জীবন মশার চেয়েও তুচ্ছ ছিল।" তাদের নিকট নিজেদের জীবন তুচ্ছ ছিল পরিণামের প্রতি লক্ষ করে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতের প্রতি তাকান, বর্তমানের প্রতি নয়। ইমাম আহমাদের কঠিন পরীক্ষা তাঁর দ্বীনদারি শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ। কারণ, সহিহ সূত্রে হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল ﷺ বলেন, "মানুষ তাঁর দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষিত হয়।" পবিত্র সে সত্তা যিনি আহমাদ ﷺ-কে শক্তিশালী করেছেন, দূরদৃষ্টি দান করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন।'

হাফিজ ইবনে তাহির আল-মাকদিসি ﷺ বলেন :

'আমি ইমাম আবু ইসমাইল আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারিকে বলতে শুনেছি, "আমাকে পাঁচবার তরবারির সামনে পেশ করা হয়েছে। আমাকে এ কথা বলা হয়নি যে, "তোমার মত পরিত্যাগ করো।" বরং বলা হয়েছে যে, "তুমি বিরোধীদের ব্যাপারে চুপ থাকো।" কিন্তু আমি বলেছি, "আমি চুপ থাকব না।"'[৩৫২]

দৃঢ় মনোবলের অধিকারী দায়ি শুধু মন্দকর্মের মন্দত্ব বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন না; বরং মন্দকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদেরও যথাসাধ্য প্রতিরোধ করেন। ব্যাপক সম্বোধনে বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কথা বলেন না; বরং নিজের আঙুল দিয়ে অপরাধী তাগুতের দিকে ইশারা করেন। কুফরির কদর্যতা বর্ণনায় কুফরিকে তার নাম, নম্বর ও শিরোনামসহ উচ্চ আওয়াজে কথা বলেন। কেবল এক আঙুলে ইশারা করেই ক্ষান্ত হন না; বরং হাতের সবগুলো আঙুল কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এভাবে ইশারার আঙুল দিয়ে শুরু করে পুরো হাতকে কাজে লাগিয়ে মন্দকে পরিবর্তন করেন।[৩৫৩]

ইমাম জাহাবি ﷺ আবু বকর আন-নাবলুসি ﷺ-এর জীবনীতে উল্লেখ করেন, হাফিজ আবু জার ﷺ বলেন, 'তাঁকে বনু উবাইদ বন্দী করে। আহলে সুন্নাহ

....

৩৫২. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ লি ইবনি মুফলিহ : ১/২০৭
৩৫৩. আল-মুনতালিক, পৃষ্ঠা নং ১৯৮।

হওয়ার কারণে তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। আমি দারাকুতনিকে তাঁর আলোচনা করে কাঁদতে শুনলাম। তিনি বলেন, "নাবলুসির শরীর থেকে যখন চামড়া ছিলে নেওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর জবানে একটা কথাই ছিল : كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [এটা তো (তাকদিরের) কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।]"

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'ফাতিমীয়দের রাজত্ব তখন। আবু তামিমের শাসনকাল। ফাতিমীয়দের সেনাপতি জাওহার সিকলি। যে ছিল শিয়া। শাইখ আবু বকর নাবলুসি বাস করতেন দামেস্কে। কুঁড়েঘরে। দুনিয়াবিমুখ এ শাইখকে ধরে নিয়ে আসে জাওহার সিকলি। বলল, "আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, তুমি বলেছ, "যখন কারও কাছে দশটি তির থাকবে, তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে, রোমানদের বিরুদ্ধে একটি তির নিক্ষেপ করা আর আমাদের ওপর নয়টি?" নাবলুসি অস্বীকার করলেন। বললেন, "আমি এমন বলিনি; বরং আমি বলেছি, যখন কারও সাথে দশটি তির থাকবে, তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে, নয়টি তোমাদের ওপর নিক্ষেপ করা আর দশম তিরটিও তোমাদের ওপরই নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কারণ, তোমরা দ্বীনকে পরিবর্তন করছ। নেককারদের হত্যা করছ। ইলাহি নুরের দাবি করেছ।" জাওহার সিকলি শাইখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁকে প্রহর করল। এরপর এক ইহুদিকে তাঁর চামড়া তুলে নেওয়ার আদেশ দিল। ইবনুল আকফানি ﷺ বলেন, "তাঁর চামড়া খসানো হয়। চামড়ার ভেতর ভরা হয় ঘাস, লতাপাতা। এরপর তাঁকে শূলবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়।" বলা হয়, "তাঁর মাথার মাঝখান থেকে চামড়া খসানো শুরু করে সে ইহুদি। চেহারায় পৌঁছালেও তিনি জিকির করতে থাকেন। বুকে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সবর করেন। এখানে এসে কসাইয়ের দয়া হলো। তাঁর হৃদয় বরাবর চুরি দিয়ে গুঁতো মারে সে। তখন তিনি নিহত হন।" বলা হয়ে থাকে, "যখন তাঁর চামড়া তুলে নেওয়া হয়, তখন তাঁর দেহ থেকে কুরআন পাঠের আওয়াজ শোনা যায়।"'[৩৫৪]

দৃঢ় মনোবলের অধিকারী দায়ি—যতক্ষণ মুমিন থাকে, সে নিজের দৃষ্টি ঊর্ধ্বে রাখে। বিশ্বাস রাখে, এ দুঃসময় চলে যাবে। একদিন মুমিনদের পালা আসবেই। এ থেকে পলায়নের সুযোগ নেই। এটা ঘটবেই। তাই উচ্চ

৩৫৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৬/১৪৮

মনোবলের অধিকারী কখনো পরিস্থিতির সামনে মাথা নত করে না। সব মানুষ তো মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু সে ইমানের পথে শাহাদাতবরণ করে।[৩৫৫]

শাইখ উমরি আজ-জাহিদ বলেন, 'নিজেকে নিয়ে উদাসীনতা এবং আল্লাহ থেকে বিমুখতার আলামত হলো, যে নিজের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না তার ভয়ে তুমি আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী কর্মকাণ্ড দেখেও এড়িয়ে যাও, সৎ কাজের আদেশ করো না এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দাও না।'[৩৫৬]

রাক্কার কাজি মুহাম্মাদ বিন হুবুলি ﷺ-এর জীবনীতে ইমাম জাহাবি ﷺ উল্লেখ করেন, 'তাঁর কাছে গভর্নর এসে বলল, "আগামীকাল ইদ।" তিনি বললেন, "যতক্ষণ না আমরা চাঁদ দেখি, আমি মানুষকে রোজা ভাঙতে বলে তাদের গুনাহের বোঝা বহন করতে যাব না।" গভর্নর বলল, "মানসুরের চিঠিতে এমনই লেখা আছে যে, কাল ইদ।" [এটা ছিল উবাইদিয়ার অভিমত। তারা চাঁদ দেখে নয়; বরং গণিতের হিসাব দিয়ে রোজা ভাঙত।]

সেদিন চাঁদ দেখা যায়নি। গভর্নর ঢোল-তবলা বাজিয়ে, পতাকা উঁচিয়ে, ইদগাহ প্রস্তুত করে সকালে মাথা তুলল। এদিকে কাজি মুহাম্মাদ বললেন, "আমি ইদগাহে বের হব না। ইদের সালাতও পড়াব না।" গর্ভনর একজনকে খুতবা দিতে বলল। আর নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করে মানসুরের নিকট চিঠি লিখল। গভর্নর আদেশ দিল কাজিকে তার কাছে উপস্থিত করতে। কাজি মুহাম্মাদ এসে হাজির হলেন। গভর্নর বলল, "নিজের মত পরিত্যাগ করো। তোমাকে মাফ করে দেবো।" কাজি অস্বীকার করলেন। এ জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে সূর্যের প্রখর তাপের মাঝে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ করা হলো। হুকুম তামিল করা হলো। কাজি মুহাম্মাদ পিপাসায় ছটফট করে পানি চাইলেন। কিন্তু তাঁকে এক ফোঁটা পানিও দেওয়া হয়নি। এরপর তাঁকে কাঠের শূলে চড়িয়ে হত্যা করল তারা। জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।'[৩৫৭]

৩৫৫. মাআলিম ফিত তারিক, পৃষ্ঠা নং ১৬৮।
৩৫৬. আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা নং ৪৪।
৩৫৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫/৩৭৪

কবি ইকবাল বলেন :

لَيْسَ يَـدْنُوْ الخَوْفُ مِنْـهُ أَبَدًا *** لَيْـسَ غَيْرَ اللهِ يَخْشَى أَحَـدَا

كُلُّ مَنْ مَوْطِـنُـهُ إِقْـلِيْمُ «لَا» *** مِنْ قُيُوْدِ الزَّوْجِ وَالْـوَلَدِ خَـلَا

مُعْرِضٌ عَمَّا سِوَى اللهِ الأَحَدْ *** يَضَعُ السِّكِّيْنَ فِيْ حَلْقِ الْوَلَدِ

'ভয় কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও সে ভয় করে না। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র মহাদেশে যার বাস, সে স্ত্রী-সন্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে সে মুক্ত। দ্বীনের খাতিরে সন্তানের গলায় ছুরি ধরতেও কাঁপে না তার হাত।'

এই তো কবি ওয়ালিদ আল-আজমি রণাঙ্গনের কবিতায় বলেন :

مَهْمَا تَمَطَّى لَيْلُنَا الأَسْوَدُ ** مَهْمَا اسْتَبَدَّ الظَّالِمُ (السَّيِّدُ)

مَهْمَا عَتَا الْأَقْزَامُ وَالأَعْبُدُ ** وَلَوَّحُوْا بِالْقَيْدِ أَوْ هَـدَّدُوْا

عَنْ نُصْرَةِ الإِسْلَامِ هَلْ نَقْعُدُ **كَلَّا، سَنَبْقَى دَائِمًا نُنْشِدُ

بِـفَـجْـرِهِ لَا بُـدَّ أَنْ يَـأْتِـيَ الْـغَـدُ

'আঁধার এ রাত যতই দীর্ঘ হোক। জালিমশাহির নিপীড়ন যতই বেড়ে যাক। জালিমের নিকৃষ্ট গোলামরা যতই উদ্ধত হোক। রক্তচক্ষু কিংবা জেল-জুলুমের ভয় যতই দেখাক। দ্বীনের জন্য এ লড়াই কি আমরা থামিয়ে দেবো? কখনো না। আমরা সর্বদা আলোকময় ফজরের গান গেয়ে যাব, অচিরেই সেদিন আসবে, যেদিন এ ধরাবুকে কালিমার পতাকা উড়বে।'

অন্য এক কবি বলেন :

نَحْنُ عُصْـبَةُ الْإِلَـهِ *** دِيْنُهُ لَنَـا وَطَـنُ

نَحْنُ جُنْدُ مُصْطَفَاهُ *** نَسْتَخِفُّ بِالْمِحَنِ

'আমরা হলাম আল্লাহর দল। তাঁর মনোনীত দ্বীনই আমাদের আবাসভূমি। আমরা হলাম মুসতফা ﷺ-এর সৈনিক। দুঃখ, দুর্দশা কিংবা বিপদকে আমরা গোনায় ধরি না।'

একজন মুসলিম দায়িকে কেউ কোনো দেশ-ভূমির কাটাতারের বেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। কোনো রক্তচক্ষুই তাকে ভয় দেখিয়ে বিরত রাখতে পারে না দাওয়াতের মহান কাজ থেকে।

সে এমনভাবে কাজ করে যে, মন থেকে জেনে নেয়, আমি বিতাড়িত নির্বাসিত। সে কোনো মাটিকে ভালোবাসে না, এমন কোনো নির্ধারিত সীমানায় বন্দীও থাকে না—যে সীমানা বেঁধে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা। সে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তির সাথেই ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। যদি নির্বাসিত না হয়ে বন্দী হয়, তবে জেলখানা হয় তার আত্মা ও চিন্তার ভ্রমণস্থল। যদি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়, তবে ফাঁসির দড়ি নিচে নামার অর্থ ওপরে ওঠা। ফাঁসির অর্থ সম্মান ও নয়নাভিরাম ঘরের দিকে প্রত্যাবতন।'[৩৫৮]

خُذُوْا كُلَّ دُنْيَاكُمْ وَاتْرُكُوْا *** فُؤَادِيْ حُرًّا وَحِيْدًا غَرِيْبًا

فَإِنِّيْ أَعْظَمُكُمْ دَوْلَةً *** وَإِنْ خِلْتُمُوْنِيْ طَرِيْدًا سَلِيْبًا

'তোমরা তোমাদের পুরো দুনিয়া নিয়ে যাও। আর আমার হৃদয়কে নির্জনে একাকী স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। কেননা, আমার রাজত্ব তোমাদের চেয়ে বহুগুণে বড়; যদিও তোমরা আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে দাও।'

....

৩৫৮. আল-মুনতালিক : ২২১-২২২

চেষ্টা ও তৎপরতায় রয়েছে বারাকাহ

তাবলিগ জামাআতের চিন্তাধারা ও মানহাজকে একপাশে রেখে চিন্তা করলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বিস্তৃত পরিসরে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ইসলামি জামাআহ। এ ক্ষেত্রে তাদের বিস্ময়কর কিছু সফলতা রয়েছে, যার কারণে অনেক মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছে, অনেক ফাসিক হিদায়াতের পথে ফিরে এসেছে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে।

তাদের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন—এমন একজন আমার কাছে বর্ণনা করেন, 'পরিচিতির জন্য একদা আমি মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমার নাম আল-হাজ ওয়াহিদুদ্দিন। আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার বয়স এখন নয় বছর!" আমরা খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "নয় বছর?" তিনি বললেন, "জি। কারণ, আমি দাওয়াতের এ কাজে প্রবেশ করার পর থেকে নিজের জীবনের হিসাব শুরু করেছি। আর এর পূর্বের জীবনকে আমি অকেজো মনে করি।" এই লোকটি যখন বয়ানের উদ্দেশে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন, "তোমরা আমার মতো নিজের জীবন নষ্ট কোরো না। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতে বেরিয়ে পড়ো।"

আমরা তাদের আমিরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কফির দোকানে মানুষকে দাওয়াত দিতে যান কেন?" তিনি বললেন, "যদি আপনাদের কাছে কোনো রোগী থাকে, তাহলে আপনারা কী করবেন?" আমরা বললাম, "যদি রোগ বেশি হয়, তবে আমরা ডাক্তার ডেকে আনব। আর যদি রোগ হালকা হয়, তবে সে নিজে নিজেই ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে।" তিনি বললেন, "বিষয়টি এমনই। যারা মসজিদের পথ চিনে না, তাদের ইমানি রোগ বেশি, তাই আমরা ডাক্তার হিসেবে তাদের কাছে যাই।"'[৩৫৯]

আমি তাদের জনৈক শাইখকে নিজের কাহিনি বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি একদা ইউরোপের মদের বারে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি মদ্যপায়ী একজন মুসলিমকে লক্ষ করে এগোলেন। লোকটি এক নারীর সাথে

....

৩৫৯. লাতায়িফ মিন সিরাতির রাসুল ও ওয়াস সালাফিস সালিহ : ১৮৮

বসা ছিল আর মদপান করে যাচ্ছিল। তিনি তাকে উপদেশ দিলেন। আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সে লোকটির হৃদয় বিগলিত হলো। নয়নযুগল অশ্রু সিক্ত হলো। এই শাইখ তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার হাত ধরলেন। কিন্তু ওই মহিলাটি তার অপর হাত ধরে টানতে লাগল। উভয় দিক থেকে প্রচণ্ড টানাটানির পর শাইখই সফল হলেন এবং তাকে মসজিদে নিয়ে আসলেন। তাকে শেখালেন কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এবং কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়। এরপর লোকটি তাওবা করল। তাওবার শর্ত পূরণ করতে থাকল।

তারা মানুষকে দ্বীনের পথে আনার জন্য কল্যাণকর অনেক কৌশল অবলম্বন করে, তেমনই একটি ঘটনা ছিল এক ডাক্তারকে দাওয়াত দেওয়ার ঘটনা। জামাআতের এক ব্যক্তি ডাক্তারের ভিজিট দিল। যখন তার সময় এল, সে চেম্বারে প্রবেশ করল। ডাক্তার তার জন্য প্রেসক্রিপশন রেডি করলে সে জানাল, তার কোনো রোগ নেই; বরং সে ডাক্তারকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে। সে ডাক্তারকে নসিহত করতে থাকল। একপর্যায়ে ডাক্তারের হৃদয় কোমল হলো। তার বয়ানে ডাক্তারের মাঝে ভালো প্রভাব পড়ল। ডাক্তার ভিজিটের টাকাটা ফেরত দিতে চাইলে সে এ কথা বলে তা ফেরত নিতে অস্বীকার করল, 'এটি হলো আমাকে দেওয়া আপনার সময়ের মূল্য।'

মানুষ যেদিন চাঁদে গেল, তখন তাদের এক লোক বললেন, 'যদি মানুষ পৃথিবী ছেড়ে একেবারে চাঁদের দেশে চলে যায়, তাহলে আমরা পৃথিবী থেকে তাদের উদ্দেশে আল্লাহর পথে একটি কাফেলা পাঠিয়ে দেবো। এই কাফেলা চাঁদে গিয়ে তাদের দাওয়াত দেবে।'

উসতাজ রশিদ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, 'তাবলিগি আন্দোলন নিজেদের দায়িদের মাঝে খুব সুন্দরভাবে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করেছে। তারা নিজেদের শেখা একটি ভাষণের মাধ্যমেই পুরো বিশ্ববাসীর জবাব দেয়, সমাজের মোকাবেলা করে।'[৩৬০]

৩৬০. সানাআতুল হায়াত, পৃষ্ঠা নং ৬০।

❋ দাওয়াতের প্রতি প্রবল আগ্রহ

- এক মুয়াজ্জিন ভাই যখন এই খবর শুনল, লন্ডনের প্রসিদ্ধ বিগ বেন ক্লক টাওয়ার হেলে পড়ছে, সে খুব চিন্তিত হয়ে আফসোস করতে লাগল। তাকে তার আফসোস ও চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, 'আমি সব সময় আশা করতাম, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সম্মানিত করবেন এবং তারা ব্রিটেন জয় করবে। আমার আশা ছিল, তখন আমি এই টাওয়ারে আরোহণ করে আজান দেবো।'

- আমি আমেরিকার এক ভাইকে চিনি। সে ছিল স্পেনের অধিবাসী। আমেরিকার নিউইয়র্কে নিজ স্ত্রীর সাথে থাকত। স্ত্রী তার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। খুব সুন্দরভাবে ইসলামি জীবনযাপন করছিল তারা। সে ভাই নিজেকে আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজে নিযুক্ত করল। সে ও তার স্ত্রী গির্জার সামনে গিয়ে দাঁড়াত। উদ্দেশ্য—সেখানে কিছু মানুষকে বেছে বের করা। তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। ভাইটি পুরুষদের দাওয়াত দিত। আর তার স্ত্রী নারীদের মাঝে। এভাবেই প্রতি রোববার তাদের দাওয়াত চলত।

- জার্মানে বসবাসকারী এক ভাইকে চিনি। আমার ধারণা, (বর্তমানে) আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানে সর্বাত্মক মেহনতকারী সে। আমি এমনটি মনে করি, আর আল্লাহ তাআলাই তার হিসাবগ্রহণকারী। সে বিশ্রামেও কোনো সুখ পেত না। তার দাওয়াত বিস্তৃত ছিল প্রতিটি স্থানে। নিজেকেও সে অনেক কষ্ট দিচ্ছিল। নিজের সন্তান, পরিবার ও বাড়িঘরের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ল। তার ভাইয়েরা তাকে জোরপূর্বক অব্যাহতি দিতেন। তাকে পরিবারসহ এমন কোনো বিনোদনকেন্দ্রে নিয়ে যেতেন, যেখানে না সে কাউকে চিনত, আর না অন্য কেউ তাকে চিনত, যাতে বিশ্রামের মাধ্যমে কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করে সে। তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিতেন, কিছু দিনের ভেতরই তারা তাকে ফেরত নিতে আসবেন। কিন্তু যখন তারা পুনরায় তার কাছে আসতেন, দেখতেন ইতিমধ্যে তিনি এখানে একটি জামাআত তৈরি করে ফেলেছেন। এ জামাআতে রয়েছে পশ্চিমা কিছু কর্মচারী এবং অন্য কিছু লোক। এতদিন যাদের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাদের খুঁজে খুঁজে বের করলেন। আল্লাহর পথের দাওয়াত দিলেন। তাদের সাথে সম্পর্ক করলেন। আর তারা একটি

মসজিদ তৈরি করে নিল। পরবর্তীকালে সে মসজিদটি সে শহরের দাওয়াহ-সেন্টারে পরিণত হলো।

এই আন্দোলনটি ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার একটি মাধ্যম। এই কাজে সম্পৃক্ত এমন কিছু বাহিনী, যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

(وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) 'আর তোমার রবের সৈন্যসংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।'[৩৬১]

উসতাজ মুহাম্মাদ আহমাদ রশিদ হাফিজাহুল্লাহ আমাদের একটি দাঁড়িপাল্লার প্রতি মনোনিবেশ করান, যা দিয়ে আমরা জীবন্ত-বিস্ফোরিত এই আন্দোলনকে পরিমাপ করতে পারি।

তিনি বলেছেন, 'আমি ছুটির দিনগুলোতে কোমলতার সাথে সাথিদের জুতোগুলো যাচাই করতাম। পরিচ্ছন্নতা, রং বা সৌন্দর্যের ভিত্তিতে নয়—যেমনটা সামরিক অনুসন্ধানে করা হয়। বরং জুতো নষ্ট হয়ে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া বা জুতোর ওপর বালু আছে কি না, সেটা অনুসন্ধান করতাম। জুতো উল্টিয়ে নিচের অংশ দেখতাম। যার জুতোর তলা বিদীর্ণ ও ফাটা সেই সফল বলে গণ্য হতো। আমি তাকে বলতাম, "তোমার সাক্ষী তোমার সাথেই আছে। তোমার জুতো তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, তুমি আমল করেছ এবং দাওয়াতের কল্যাণে সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছ। তখন এই আয়াতটি তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

> "এরপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসুলগণের অনুসরণ করো।"[৩৬২]

অধিক তৎপরতার কারণে তোমার জুতো নষ্ট হলে তুমিই আমার কাছে সন্তোষভাজন ও সফল ব্যক্তি।"'

....

৩৬১. সুরা আল-মুদ্দাসসির : ৩১
৩৬২. সুরা ইয়াসিন : ২০

সাবাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ, বিশ বছর পরেও যখন আমি নিজের জুতোয় কোনো বালু না দেখি, তখন আমার মন আমাকে নিন্দা করে আর আমি শাইখ আর-রশিদের সেই যাচাইয়ের কথা স্মরণ করি।'[৩৬৩]

একজন ফাসিক : দায়ির হারানো সম্পদ

দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া, মাদউর কাছে দ্রুত ছুটে যাওয়া, সতত তৎপরতায় মাদউর পরিচর্যা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এমন জায়গাও ছুটে যেতে হবে, যেখানে দায়িদের আনাগোনা খুবই কম। সেসব লোকের খোঁজে, যারা মুসলিম, কিন্তু পাপে ডুবে আছে। কারণ, একজন ফাসিক একজন দায়ির হারানো সম্পদ। দাওয়াতের গুরুত্ব বোঝার স্বার্থে এখানে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন শাইখ আলি তানতাবি। তাওবার ঘটনা। স্থান : ড্যান্স ক্লাব। শাইখ বলেন :

'আলেপ্পোর একটি মসজিদে প্রবেশ করলাম আমি। এক যুবককে সালাত আদায়রত দেখলাম। দেখে বললাম, "সুবহানাল্লাহ, এই যুবকটি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বিশৃঙ্খল ছিল। ছিল মদপানকারী, জিনাকারী, সুদখোর, পিতামাতার অবাধ্য। মা-বাবা তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন কোন জিনিস তাকে মসজিদে টেনে আনল?!"

কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি অমুক না?" সে বলল, "হ্যাঁ"। বললাম, "আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন।... আমাকে বলো, আল্লাহ তোমাকে কীভাবে হিদায়াত দান করেছেন?" সে বলল, "আমার হিদায়াত হয়েছে এক শাইখের হাতে। তিনি ড্যান্স ক্লাবে আমাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।" আমি হতবাক হয়ে বললাম, "ড্যান্স ক্লাবে?!" সে বলল, "হ্যাঁ, ড্যান্স ক্লাবে।" বললাম, "কীভাবে?" বলল, "ঘটনাটি ছিল এমন—

আমাদের মহল্লায় ছোট একটি মসজিদ ছিল। বয়স্ক একজন শাইখ ইমামতি করতেন। একদা তিনি মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লোকজন কোথায়?... কেন অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে যুবকদের মসজিদের কাছে

....

৩৬৩.সানাআতুল হায়াত, পৃষ্ঠা নং ১১২।

আসতে দেখছি না। তারা কি মসজিদ চেনে না?" মুসল্লিরা বলল, "তারা ড্যান্স ক্লাবে ফূর্তিতে মত্ত।" শাইখ বললেন, "ড্যান্স ক্লাব কী?" এক মুসল্লি বলল, "ড্যান্স ক্লাব হলো একটি মিলনায়তন, যেখানে কাঠে তৈরি বড় একটি স্টেজ থাকে। আর নগ্ন বা নগ্নপ্রায় যুবতিরা সে স্টেজে উঠে নাচ দেখায়। আর লোকজন এ দৃশ্য উপভোগ করে।" শাইখ বললেন, "যারা তাদের দিকে তাকায়, তারা কি মুসলিমদের কেউ?" তারা বলল, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। চলো, আমরা সে ড্যান্স ক্লাবে গিয়ে মানুষকে উপদেশ প্রদান করি।" তারা বলল, "হে শাইখ, আপনি কোন দুনিয়ায় বাস করেন?! লোকদের বয়ান করবেন, তাও আবার ড্যান্স ক্লাবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তারা তার দৃঢ়তা ভঙ্গ করতে চাইল। তারা বলল, "লোকেরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে, তারা নির্যাতনের সম্মুখীন হবে।" তিনি বললেন, "আমরা কি মুহাম্মাদ ﷺ থেকে উত্তম?" তিনি একজন মুসল্লির হাত ধরে তাকে ড্যান্স ক্লাবের পথ দেখিয়ে দিতে বললেন। সেখানে পৌঁছালেন তারা। ক্লাবের মালিক জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কী চাও?" শাইখ বললেন, "আমরা ক্লাবের লোকদের উপদেশ দিতে চাই।" ক্লাবের মালিক অবাক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল। ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল না। তারা অনুমতির জন্য দর কষাকষি করতে থাকল। অবশেষে তারা তার একদিনের আয়ের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে অনুমতি পেল ভেতরে যাওয়ার।

ক্লাব-মালিক তাদের কথা মেনে নিল। তবে বলল, পরের দিনের নাচ শুরুর আগের সময়টায় উপস্থিত হতে।

পরদিন আমিও ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম। এক তরুণীর নাচ শুরু হলো। তার নাচ শেষ হলে পর্দা পড়ে যায়। এরপর আবার তা তুলে নেওয়া হয়। হঠাৎ দেখি, গুরুগম্ভীর চেহারার এক শাইখ চেয়ারে বসে আছেন। তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করলেন। এরপর তিনি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা লোকদের উদ্দেশে উপদেশ দিতে থাকলেন। সকলেই তখন হতবাক। তারা ধারণা করছিল যে, তারা যা দেখছে, তা কৌতুকের একটি অংশ। যখন সকলে বুঝতে পারল, তারা একজন শাইখের সামনে রয়েছে এবং তিনি তাদের উদ্দেশে বয়ান করছেন, তখন হাসি-ঠাট্টা শুরু করল। তাদের হাসি-তামাশার আওয়াজ অনেক উঁচু হয়ে

গেল। কিন্তু শাইখ কোনো পরোয়া করলেন না। ওয়াজ ও উপদেশ চালিয়ে গেলেন। এরপর এক লোক দাঁড়িয়ে সবাইকে নীরব হতে বলল, যাতে শাইখের কথা স্পষ্ট শোনা যায়।

পুরো ক্লাবে নীরবতা ছেয়ে গেল। সবাই স্থির হলো। শাইখের কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না তখন। তিনি এমন একটি কথা বলেছিলেন, যা আমরা এর আগে কখনোই শুনিনি। আমাদের সামনে অনেকগুলো আয়াত ও হাদিস পাঠ করলেন তিনি। এরপর কিছু নেককার লোকের তাওবার কাহিনি বর্ণনা করলেন। তিনি বলছিলেন, "হে লোকসকল, তোমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত। কিন্তু নাফরমানির সে স্বাদ কোথায় গেল? স্বাদ চলে গেছে, কিন্তু আমলনামা কালো রয়ে গেছে। অচিরেই কিয়ামতের দিন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে তোমরা। অচিরেই এমন দিন আসছে, যেদিন আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। হে লোকসকল, তোমরা কি নিজেদের কর্মের প্রতি লক্ষ করেছ? ভেবে দেখেছ কখনো, এ আমল তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? তোমরা দুনিয়ার আগুন সহ্য করতে পারছ না; অথচ এটি জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এ সামান্য আগুনও আমরা সহ্য করতে পারি না। ভেবে দেখো, জাহান্নামের আগুন তাহলে কতটা ভয়াবহ! সময় চলে যাওয়ার পূর্বেই তাওবা করো। এখনো সুযোগ আছে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসো।

এরপর সবাই কাঁদতে লাগল। শাইখ ড্যান্স ক্লাব থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর পিছু পিছু সবাই বের হয়ে আসলো। সকলে তাঁর হাতে তাওবা করল। এমনকি ক্লাবের মালিকও তাওবা করল। নিজ কর্মে লজ্জিত হলো।'"[৩৬৪]

বাতিলের সাহায্যে কাফিরদের তৎপরতা

দ্বীনের সাহায্যে দায়িদের চেষ্টা-সাধনা যদি উচ্চ মনোবলের নিদর্শন হয়, তাদের কাজ ও ঘটনা প্রচার যদি গাফিলদের সতর্ক করার মাধ্যম হয়ে থাকে—তাহলে আমরা অসতর্ক ও ঘুমন্ত লোকদের জাগিয়ে তুলতে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, বাতিলকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে বাতিলপন্থীরাও সদা তৎপর হয়ে কাজ করছে। ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে তারা পরিশ্রম ও সাধনা করে চলেছে। কিন্তু পরিণামে তারা দুরাশা-হতাশায় ভোগবে। তারা পারবে না

....

৩৬৪. আল-আয়িদুনা ইলাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৭৩-৭৬।

ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে। কেননা—

وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নুরের পূর্ণতা বিধান করবেন; যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।'[৩৬৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

'তাদের প্রধানরা এ কথা বলে সরে পড়ে যে, তোমরা চলে যাও আর তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাকো। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।'[৩৬৬]

ইবরাহিম ﷺ-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

'তারা বলল, একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো; যদি তোমরা কিছু করতে চাও।'[৩৬৭]

কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

'আর যখন সে ফিরে যায়, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাশ করা। অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না।'[৩৬৮]

---

৩৬৫. সুরা আত-তাওবা : ২০
৩৬৬. সুরা সাদ : ৬
৩৬৭. সুরা আল-আম্বিয়া : ৬৮
৩৬৮. সুরা আল-বাকারা : ২০৫

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ

'আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, দৌড়ে দৌড়ে পাপে সীমালঙ্ঘন ও হারাম ভক্ষণে পতিত হয়।'[৩৬৯]

তিনি আরও বলেন :

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

'আর যারা অবিশ্বাসে তৎপর, আপনি তাদের জন্য বিষণ্ন হবেন না।'[৩৭০]

তাদের এ তৎপরতা এক দুর্গন্ধযুক্ত নিন্দিত আন্দোলন। এটা তাদের জন্য ধ্বংস ও বরবাদির কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

'নিশ্চয়ই কাফিররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। তারা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাজিতও হবে। সবশেষে কাফিরদের জাহান্নামে একত্র করা হবে।'[৩৭১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।'[৩৭২]

....

৩৬৯. সুরা আল-মায়িদা : ৬২

৩৭০. সুরা আলি ইমরান : ১৭৬

৩৭১. সুরা আল-আনফাল : ৩৬

৩৭২. সুরা আল-গাশিয়াহ : ২-৩

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

'বলুন, আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা হলো সেসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না।'[৩৭৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।'[৩৭৪]

কাফিরদের সব আমল বিনষ্ট হওয়া তাদের ইমান-শূন্যতার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ

'তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।'[৩৭৫]

একইভাবে তাদের এ অপতৎপরতার আন্দোলন তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। কারণ, তাদের আন্দোলনটি হয়তো দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে—

....

৩৭৩. সুরা আল-কাহফ : ১০৩-১০৫

৩৭৪. সুরা আল-ফুরকান : ২৩

৩৭৫. সুরা আল-আহজাব : ১৯

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি এখানে তাদেরকে তাদের আমলের প্রতিফল পুরোপুরি দিয়ে দিই, আর তাতে তাদের প্রতি কোনো কমতি করা হয় না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে তারা যা করেছিল, তা বরবাদ হয়ে যাবে; আর তারা যা করত, তা ছিল নিরর্থক।'[৩৭৬]

নতুবা আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে—

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

'যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন।'[৩৭৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

'যার ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা পূর্ণমাত্রায়, আর (আংশিক) তাদেরও পাপের বোঝা, যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে নিজেদের অজ্ঞতার কারণে। হায়, তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট!'[৩৭৮]

এতদসত্ত্বেও ইমানদারগণ যে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাত, ক্লান্তি-অবসাদের শিকার হয়, সেসবের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

৩৭৬. সুরা হুদ : ১৫-১৬
৩৭৭. সুরা মুহাম্মাদ : ১
৩৭৮. সুরা আন-নাহল : ২৫

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মতো তারাও তো কষ্ট পায়। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন আশা করো, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৭৯]

কেবল মুমিনরাই যন্ত্রণা আর বিপদাপদে পড়ে না। মুমিনদের শত্রুরাও এমন বিপদের শিকার হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা তাদেরও স্পর্শ করে। কিন্তু মুমিনরা জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাঁর কাছে প্রতিদানের আশা করে। পক্ষান্তরে কাফিররা অস্থির-বিভ্রান্ত, অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করে না এবং পার্থিব জীবনে আল্লাহর কাছে কিছু আশা করতে পারে না আর মৃত্যুপরবর্তী জীবনেও তাদের কোনো আশা থাকে না।

কাফিররা যখন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তির আশা ছাড়াই সত্যের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে যায়, তখন তো মুমিনদের অটল ও অবিচলতায় আরও বেশি অগ্রগামী হওয়ার কথা। একইভাবে মুমিনদের উচিত নয় ধূর্ত কাফির সম্প্রদায় থেকে—এসব নরাধমদের খুঁজে খুঁজে বের করা হতে হাত গুটিয়ে নেওয়া। মুমিনদের কর্তব্য এ জন্য কাজ করা, যাতে কাফিরদের কোনো শক্তি ও দাপট অবশিষ্ট না থাকে। জমিনে কোনো ফিতনাও না থাকে। আর আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দুনিয়া অর্জন কিংবা আল্লাহর পথে বাধা প্রদানে কাফিরদের অপচেষ্টা ও অপতৎপরতার ব্যাপারে সামনে উল্লেখিত কথাগুলো এ অর্থই ধারণ করে যে, মুমিনদের এগিয়ে আসা উচিত, প্রচণ্ড পরিশ্রম ও সাধনা করা উচিত আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য।

তা ছাড়া সামনের কথাগুলো দ্বিতীয় আরেকটি অর্থও বহন করে, যে ব্যাপারে রাসুল ﷺ ইশারা করে বলেন :

....

৩৭৯. সুরা আন-নিসা : ১০৪

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

> 'জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং জান্নাতের তালাশকারীকে কখনো আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখিনি।'[৩৮০]

অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষাকারী ও জান্নাতের তালাশকারী অচেতন হয়ে বেঘোরে ঘুমোয় না। বরং নিজের মুক্তি ও প্রাপ্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সদা তৎপর থাকে, থাকে কর্মমুখর—হয়ে ওঠে অদম্য পরিশ্রমী।

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﵁ এদিকেই ইশারা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পাপাচারীর শক্তিমান ও সহিষ্ণু হওয়া এবং বিশ্বস্ত মুমিনের অলস-অকর্মণ্য হওয়ার ব্যাপার অভিযোগ জানাচ্ছি।'

আহমাদ বিন হারবও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'ওই ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য—যে জানে, তার ওপরে জান্নাত সজ্জিত আছে এবং তার নিচে প্রজ্জ্বলিত আছে জাহান্নাম, অথচ সে এতদুভয়ের মাঝে গভীর ঘুমে অচেতন রয়েছে।'

তৃতীয় দিকটি হলো, মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে যেন আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়। তারা সামনের কথাগুলো পড়বে আর দেখবে, আল্লাহ তাআলার কাছে যাদের কোনো প্রতিদান নেই, যারা আল্লাহর কাছে কিছুই পাওয়ার আশা রাখে না, তারা বাতিলের সাহায্যে সর্বাত্মক সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করছে এবং তাদের ইমাম ইবলিসের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করছে, যে ওয়াদায় ইবলিস বলেছিল :

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

> 'আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেবো। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদের ছাড়া।'[৩৮১]

....

৩৮০. সুনানুত তিরমিজি : ২৬০১। হাদিসটি হাসান।

৩৮১. সুরা সাদ : ৮২-৮৩

অথচ একই সময়ে মুসলিমদের বৃহৎ একটা অংশ আল্লাহ তাআলার সাথে শরিয়তের আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে পিছিয়ে রয়েছে!

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

'আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো এবং তাঁর ওই অঙ্গীকারকেও স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।'[৩৮২]

এসো, আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করি

সামনে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছি সে সকল কাফিরের—যারা কেউ নিজেদের দুনিয়াবি স্বার্থে, কেউ দেশের খিদমতে কিংবা কেউ নিজ মতবাদের প্রতি আহ্বানের জন্য এ সকল দৃষ্টান্ত কায়িম করেছিল। আশা করি এসব পড়ে দ্বীনের হক ও মুসলিম উম্মাহর অধিকার আদায়ে নিজেদের অবহেলার অপরাধের বিষয়টিতে আমরা একটু হলেও লজ্জিত হব। এসব ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পর আশা করি এ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব; নিজেদেরকে মহৎ কাজের অধিক উপযুক্ত ও যোগ্য মনে করব।

- হিউস্টেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ। হিউস্টেন আমেরিকার কংগ্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে এমন এক সাহিত্যপূর্ণ ভাষণ দিল। ভাষণে এক শব্দ দুবার উচ্চারণ করা হয়নি। সামনে থাকা জ্ঞানী লোকেরা অবাক হয়ে গেল। হিউস্টেন রেড ইন্ডিয়ানদের বিদ্রোহ শান্ত করার চক্রান্তে সফল হয়েছিল। সরকারের সাথে তাদের সমঝোতা পর্যন্ত টেনে আনতে সমর্থ হয় সে। তখন আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে পাঠাল। তাকে বলল, 'টেক্সাস মেক্সিকোর অধীন। কিন্তু তার সাথে আমেরিকার ভবিষ্যৎ জড়িত। তাই টেক্সাসকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। আর আমি চাই, তুমি করবে সেটা।'

....

৩৮২. সুরা আল-মায়িদা : ৭

হিউস্টেন বলল, 'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। আমাকে সম্পদ ও জনবল দিন।'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'যদি আমার কাছে সম্পদ ও জনবল থাকত, তবে আমি তোমাকে ডাকতাম না। তুমি একা যাবে। একটি ডলারও সাথে নেবে না। তোমার সাথে একজন প্রহরী প্রেরণ করব। সে তোমার সাথে মিসিপিসি নদী পার হওয়া পর্যন্ত থাকবে। তারপর চলে আসবে।'

জনবল নেই, সম্পদ নেই; এ যেন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, তবুও রাজ্য করতে হবে—এমন একটা অবস্থা। হিউস্টেন দায়িত্ব গ্রহণ করল। প্রহরী তাকে নদীর পাড়ে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসলো। হিউস্টেন টেক্সাসের দিকে রওয়ানা করল। সেখানের প্রথম শহরে প্রবেশ করে একটি ওকালতি অফিস খুলল। তার সাহিত্যপূর্ণ বাচনভঙ্গি ও বাকপটুতায় বাদী অভিযুক্ত প্রমাণিত হতো আর অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যেত। একপর্যায়ে মানুষ তার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে গেল। মানুষ তার আশপাশে সমবেত হতে লাগল। আর সে মানুষের চিন্তাধারা ও বোধশক্তি নিয়ে খেলা শুরু করল। মানুষের হৃদয়ে মেক্সিকো থেকে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার বীজ বপন করতে থাকে হিউস্টেন। একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলল সে। এমনকি একসময় স্বাধীনতা পেল টেক্সাস। এরপর হিউস্টেন টেক্সাসের মানুষের হৃদয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হওয়ার বীজ বপন করল। হিউস্টেনের এই বীজ বপনে ফল হলো। টেক্সাসবাসী স্বেচ্ছায় আমেরিকার সাথে যুক্ত হলো। হিউস্টেন অল্প কয়েক বছর পর আমেরিকার প্রধানমন্ত্রীর কাছে আসলো। টেক্সাসের চাবি অর্পণ করল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এ স্বাধীনতা আমেরিকার অর্জিত ছিল না এবং আমেরিকা এ ক্ষেত্রে একটি ডলারও ব্যয় করেনি। শর্ত পূরণ হলো। প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি শহরের নামকরণ করল হিউস্টেনের নামে। হিউস্টেনের কর্মকে চির অমর করে দিল। বর্তমানে হিউস্টেন শহর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর একটি। এবং খনিজ তেলের কেন্দ্র এটি।'[৩৮৩]

এখানে আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি, ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ডা. তাওফিক আল-ওয়ায়ি। তিনি বলেন :

....

৩৮৩. সানাআতুল হায়াত : ৮৮-৮৯

- শিল্পোন্নত হওয়ার পূর্বে জাপান একদল লোককে জার্মানে যন্ত্রবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠাল। আরবও বিভিন্ন রাষ্ট্রে এমন গবেষকদল পাঠিয়েছিল। জাপানি দল ফিরে এসে নিজের জাতিকে সেসব শিল্প-কারিগরি শিক্ষা দিয়ে উন্নত করল। কিন্তু আমাদের লোকেরা ফিরে আসে রিক্তহস্তে। কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে নিচের ঘটনাটি পড়তে হবে আমাদের—

জাপানি গবেষক আউসাহির। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জার্মানে পাঠানো হয়েছিল তাকে গবেষণার জন্য। তিনি বলেন, আমি হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকের কাছে পড়তাম, যদি আমি তার উপদেশ অনুযায়ী চলতাম, তবে কিছুই করতে পারতাম না। আমাদের রাষ্ট্র আমাকে যন্ত্রবিজ্ঞান শিখতে পাঠিয়েছে। আমিও তা শেখার স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম, কীভাবে ছোট একটি মেশিন তৈরি করা যায়? আমি জানতাম, প্রতিটি শিল্পেরই একটি মৌলিক কাঠামো আছে। যাকে মডেল বলা হয়। এটাই সব শিল্পের মূল। যদি তুমি জানতে পারো, কীভাবে তা তৈরি করা হয়, তবে পুরো শিল্পের মূল রহস্য নিজের হাতে পেয়ে গেলে। শিক্ষকরা আমাকে হাতে-নাতে না শিখিয়ে বা কোনো প্রশিক্ষণ সেন্টারে না নিয়ে পড়ার জন্য আমার হাতে গাদাগাদা বইপত্র ধরিয়ে দিল। আমি এই বিষয়ে পড়াশোনা করলাম। যন্ত্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞান জানলাম। কিন্তু ইঞ্জিনের সামনে অক্ষম হয়ে পড়লাম। তাত্ত্বিক তো হলো, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান হলো না। জানতে পারলাম না, কী থেকে কী হয়। কেমন যেন আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। কোনো সমাধান পাচ্ছিলাম না।

একদিন আমি ইটালিয়ান ইঞ্জিনের মেলার ব্যাপারে পড়লাম কোথাও। সেটি ছিল মাসের শুরু। তখন আমার কাছে মাসের পুরো বেতনটা ছিল। মেলায় দুই হর্সপাওয়ারের একটি ইঞ্জিন পেলাম, যার দাম আমার পূর্ণ বেতনের সমান। আমি বেতনের টাকাগুলো বের করে মূল্য পরিশোধ করে দিলাম। তারপর যন্ত্রটি তুলে নিয়ে এলাম। খুব ভারী ছিল সেটি। নিজের কামরায় এনে যন্ত্রটি টেবিলের ওপর রাখলাম। আর সেটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কেমন যেন একটি মুক্তার মুকুটের প্রতি তাকিয়ে আছি আমি। আমি মনে মনে বলছিলাম, এটাই ইউরোপীয় শক্তির গোপন রহস্য। যদি আমি এমন একটি যন্ত্র বানাতে পারি, তবে জাপানের ইতিহাস পাল্টে দিতে পারব। আমার মাথায় তখন একটা চিন্তা খেলছে, এ ইঞ্জিনটি বিভিন্ন আকার-প্রকারের হরেক রকমের যন্ত্রাংশে

তৈরি। একেকটার একেক কাজ। মুক্তাদানার মতো অনেকগুলো চুম্বক। এদিক সেদিক কত তার। চালানোর বিভিন্ন ট্রিগার। কত শত চাকা। গিয়ার-চাকা, খাঁজকাটা চাকাসহ আরও কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রাংশ। আমি ভাবলাম, যদি আমি এটি ভেঙে আবার জোড়া দিতে পরি। চালু করলে যদি চালু হয়ে যায়, তবে কেল্লা ফতেহ। আমি ইউরোপীয় কারিগরির গোপন রহস্য জানার দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম তবে।

আমার কাছে থাকা বইয়ের তাকগুলোতে খুঁজতে থাকলাম। ইঞ্জিনবিষয়ক বিশেষ আর্টের বইটি নিলাম। নিলাম অনেকগুলো কাগজ। কাজের যন্ত্রপাতির বাক্সটাও আনলাম। কাজ চালিয়ে গেলাম।

ইঞ্জিনের কভারটা খুলে প্রথমে ইঞ্জিনের ড্রয়িং করলাম। এরপর এক এক করে প্রতিটি যন্ত্রাংশ খুলতে থাকলাম। যখনই কোনো একটা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ খুলতাম, তার ড্রয়িং করে নিতাম যথাসম্ভব সূক্ষ্মতার সাথে। প্রতিটির নম্বর দিলাম। এভাবে একে একে পুরো যন্ত্রটি খুলে ফেললাম। পুনরায় জোড়া দিতে শুরু করলাম। চালু করলে দেখি, সাথে সাথে সচল হয়ে গেল ইঞ্জিনটি।

আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি। খুশিতে যেন আমার হৃদপিণ্ড থেমে গেয়েছিল সেদিন। তিন দিনের কাজ। দিনে মাত্র একবার আহার। খুব অল্প সময়ের ঘুম আর বিরতিহীন কাজ।

আমাদের মিশনপ্রধানকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি খুব ভালো করেছ। এখন আমি তোমাকে পরীক্ষা করব। শীঘ্রই একটি অকেজো মেশিন নিয়ে আসব। তোমার কাজ হবে, সেটি খুলে তার সমস্যাটি নির্ণয় করা এবং তা ঠিক করা। অকেজো মেশিনটি চালু করতে হবে তোমাকে।' আমি দশ দিন যাবৎ এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এ সময়ে ত্রুটির জায়গাগুলো বুঝেছি। পুরাতন তিনটি অংশ ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া বাকিগুলো আমি হাতুড়ি, যন্ত্র আর রেডিয়টরের সাহায্যে ঠিক করে দিয়েছি।

এরপর মিশনপ্রধান—যিনি আমার আত্মিক নেতৃত্বে ছিলেন—বললেন, 'তোমাকে নিজে নিজে কিছু যন্ত্রাংশ বানিয়ে তা জোড়া দিতে হবে। এরপর তুমি নিজের বানানো সে যন্ত্রাংশ দিয়ে নিজেই একটা ইঞ্জিন তৈরি করবে।' আমার

জার্মান শিক্ষকরা চাইছিল আমি ডক্টরেট ডিগ্রির থিসিস লিখি। স্রেফ এটাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু আমি থিসিস লেখা রেখে লোহা, কাঁচ ও অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কারখানায় ভর্তি হলাম।

সেখানে আমি একজন কর্মচারীতে পরিণত হলাম। খনিজ কারখানায় লাঞ্ছনার সাথে অবস্থান করলাম। কারখানার ছোট এক কর্মচারী হয়ে অবস্থান করতে থাকলাম। সেখানকার ম্যানেজারের কথা শুনছিলাম। তার হুকুম তামিল করছিলাম। যেভাবে বলছিল, সেভাবেই করছিলাম। যেন সে একজন বিরাট কেউ। আমি খাবারের সময় তার সেবা করেছি। অথচ আমি ছিলাম সামুরাই পরিবারের সদস্য। কিন্তু আমি জাপানের সেবা করছিলাম। তাই এ পথে সবকিছু সহ্য করে নিচ্ছিলাম। প্রায় আট বছর যাবৎ এভাবে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে কাটালাম। দৈনিক প্রায় দশ থেকে পনেরো ঘণ্টা কাজ করতাম। আমার কাজ শেষ হওয়ার পর রাতে গার্ডের দায়িত্ব পালন করতাম। রাতের বেলা সাধারণভাবে কারিগরি নিয়মগুলো নিয়ে গবেষণা করতাম।

জাপানের গভর্নর 'মিকাডো' আমার বিষয়টি জানতে পারলেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আমার জন্য স্বর্ণের পাঁচ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড পাঠালেন।

আমি এ টাকা দিয়ে পুরো একটা কারখানার ইঞ্জিন কিনলাম। সবগুলো যন্ত্রাংশ কিনলাম। এগুলো যখন জাপানে স্থানান্তর করতে চাইলাম, ততদিনে আমার হাতের নগদ টাকা শেষ হয়ে যায়। তাই আমি নিজের বেতন ও সব জমাপুঁজি একত্র করলাম। পরিশেষে যেদিন নাগাসাকিতে পৌঁছালাম, সেদিন আমাকে জানানো হলো, রাষ্ট্রপ্রধান মিকাডো আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি বললাম, 'পূর্ণ ইঞ্জিনটি পরিপূর্ণ সেটিং করা পর্যন্ত আমি তার সাক্ষাতের উপযুক্ত নই।'

নয় বছর লেগে গেল এ কাজে। নয় বছর কাজ করার পর সহযোগীদের সহায়তায় দশটি ইঞ্জিন প্রাসাদে নিয়ে গেলাম। যে ইঞ্জিনগুলোর প্রতিটি যন্ত্রাংশ ছিল Made in Japan (জাপানে প্রস্তুতকৃত)। মিকাডো আমাদের কাছে আসলেন। ঝুঁকে সম্মান জানালেন। মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমার জীবনে শোনা সবচেয়ে মিষ্ট মিউজিক এটি। একটি খাঁটি জাপানিজ মেশিনের আওয়াজ।'

এভাবেই আমরা 'মডেল'-এর অধিকারী হয়েছি। এটিই পশ্চিমাদের শক্তির গোপন রহস্য। আমরা তা জাপানে নিয়ে এসেছি। ইউরোপীয় শক্তিকে আমরা নিয়ে এসেছি জাপানে। এমনকি জাপানকে উন্নীত করলাম পশ্চিমের দেশগুলোর মানে।[৩৮৪]

জাপান থেকে আমেরিকায় পাঠানো ছাত্রদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের একজন বলেন, 'অনেক সময় তারা অর্ধরাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে অবস্থান করত। আর অনেক সময় কেউ কেউ লাইব্রেরিতে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে যেত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ি না গিয়ে সোজা ক্লাসে চলে যেত।'

উসতাজ মুহাম্মাদ আহমাদ আর-রশিদ বলেন, 'একদিন আমি এক দায়ির জন্য উসতাজ ফুআদ সিজকিনের নিকট ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠান "মাহাদু তারিখিল উলুমিল ইসলামিয়া"-তে ছাত্র হিসেবে ভর্তির ব্যাপারে সুপারিশ করলাম। তখন উসতাজ সিজকিন শর্ত করলেন, দৈনিক ষোলো ঘণ্টা পড়াশোনায় কাটাতে হবে। কিন্তু সে দায়ি প্রত্যাখ্যান করল। এরপর উসতাজ সিজকিন আমাকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কিছু জাপানি ছাত্রকে দূর থেকে দেখালেন। তারা হাতে লেখা আরবি কিতাবের ওপর উবু হয়ে গবেষণা করছে গভীর মনোযোগে। কিতাবগুলোকে তারা জীবন দিচ্ছে নতুন করে। এসব জাপানি ষোলো ঘণ্টা পড়াশোনা করার শর্তে রাজি হয়েই এসেছে সেখানে। চিন্তা করুন।'[৩৮৫]

ড. আব্দুল ওয়াদুদ শালবি তাঁর কিতাব 'ফি মাহকামাতিত তারিখ'-এ উল্লেখ করেন—

'আমি দ্বিধায় পড়ে যাই মাদ্রিদে যখন ধর্মপ্রচারকদের প্রস্তুতির একটি কেন্দ্র দেখি। বিশাল একটি ভবনের আঙিনায় বড় একটি ফলকে লিখে রেখেছে, হে ধর্মপ্রচারক যুবক, আমরা তোমাকে কোনো পেশা বা কাজ অথবা বিছানা ও জাজিমের জন্য প্রস্তুত করছি না। আমরা তোমাকে সতর্ক করছি যে, তোমার মিশনারি জীবনে শুধু দুঃখ-কষ্টই পাবে। আমরা তোমার সামনে যা পেশ করতে

৩৮৪. আল-মুজতামা পত্রিকা। সংখ্যা : ৯৯৮। মূল : আল-হিম্মাহ তারিকুন ইলাল কিম্মাহ : ৩২-৩৮।
৩৮৫. সানাআতুল হায়াত : ১১১

পারব, তা হলো জ্ঞান, রুটি এবং ছোট কুটিরে শুষ্ক বিছানা। আর এর সবকিছুর বিনিময় তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে পাবে মৃত্যুর পরে। তুমি মাসিহের পথে থাকলে তুমি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।'

এই কথাগুলো শয়তানের সৈন্যদলের জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী অনেক লোককে নাড়া দিয়েছে, তাদের তৎপর করেছে। ডাক্তারি, সার্জারি, ফার্মাসিউটিক্যালসহ নানান পেশার বড় বড় ডিগ্রিধারী বহু লোককে মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে নিয়ে গেছে। যেখানে একটি তাঁবু ছাড়া আর কিছুই মিলে না। আবার অনেককে নিয়ে গেছে দুর্গন্ধ জলাভূমিতে—যেখানে জীবাণু ছড়িয়ে আছে। সেখানে তারা দীর্ঘকাল বেতনবিহীন ও বিনা পদে অবস্থান করছে। যদি তাদের কেউ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করত, তবে লাখ লাখ ডলার কামাতে পারত। কিন্তু সে তা বিসর্জন দিয়েছে এক বাতিল মতবাদের জন্য, যাকে সে সঠিক ধারণা করেছে।'[৩৮৬]

জার্মানের কয়েকজন মুসলিম যুবক আমাকে বলেন, 'জেহোবার সাক্ষ্যদাতাগণ[৩৮৭]-এর ধর্মের দায়িরা একেবারে কাকডাকা ভোরে রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ি বাড়ি চলে যায়। বাড়ির দরজায় করাঘাত করে মানুষকে তাদের আকিদার প্রতি দাওয়াত দেয়।' তাদের একজন বর্ণনা করল, 'এক জার্মান তরুণী সকাল ছয়টায় তার দরজায় করাঘাত করল। যখন সে জানতে পারল যে, তার উদ্দেশ্য হলো, তার আকিদার দাওয়াত দেওয়া। তখন সে সুস্পষ্টভাবে বলে দিল, সে মুসলিম আর এগুলো শোনার কোনো প্রয়োজন নেই তার। কিন্তু সে তার সাথে ঝগড়া শুরু করল। তার কাছে ইসা ﷺ-এর দোহাই দিয়ে কয়েক মিনিট সময় হলেও দেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাল। সে মেয়েটির বাড়াবাড়ি দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু মেয়েটি তার আকিদার দাওয়াতে অবিচল রইল। প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ বন্ধ দুয়ারের সামনে ভাষণ দিয়ে তার আকিদার ব্যাখ্যা করতে থাকল। তার দ্বীন গ্রহণে প্ররোচিত করল।'

আর আমাদের মুসলিমদের কী অবস্থা? আমাদের একেকজন পরিতৃপ্ত হয়ে বালিশের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকে। যখন তার কাছে সত্য দ্বীনের জন্য

....

৩৮৬. আল-মাসফা মিন সিফাতিত দুআত : ২/১৭৪

৩৮৭. Jehovah's Witnesses

কাজ করতে বলা হয় অথবা কোনো ছোটখাটো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় কিংবা তাকে ক্রীড়া-কৌতুক নিয়ে সময় বিনষ্টের কারণে তিরস্কার করা হয়, তখন সে রকেটের মতো গতিবেগে চলে যায় আর মুখে রাসুল ﷺ-এর একটি কথা বলতে থাকে, (يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً) 'হে হানজালাহ, (সব সময় মানুষের একই অবস্থা থাকে না) কিছু সময় (আল্লাহর ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (পারিবারিক কাজের জন্য)।'[৩৮৮] যেন সে এই বাক্যটি ছাড়া কুরআন-সুন্নাহর আর কিছুই জানে না। অসৎভাবে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হাদিসের এ অংশটা কাজে লাগায়। এই হলো আমাদের মুসলিমদের অবস্থা।

উসতাজ আর-রশিদ ﷺ বলেন, 'দায়ি মানুষের মাঝে সত্যের আহ্বান জানিয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে। অন্যদিকে দেখা যায় বাতিলপন্থীরা, প্রোপাগাণ্ডাকারীরা আত্মত্যাগ করে তাদের পথচলা অব্যাহত রাখছে। সত্যের আমানতদার যখন মুসলিমদের দিকে তাকায়—দেখতে পায়, মুসলিমরা উদাসীন, গাফিল, নিদ্রিত। তবে আল্লাহ যাদের ওপর রহম করেছেন, তারা ব্যতীত। কিন্তু এমন লোকদের সংখ্যা অল্প। সত্যের আমানতদার দায়ি তখন ফিরে যায় নিজের চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তি পেতে, নিজেকে সম্বোধন করে বলে :

تَبَلَّدَ فِيْ النَّاسِ حِسُّ الْكِفَاحِ *** وَمَالُوْا لِكَسْبٍ وَعَيْشٍ رَتِيْبِ

'মুসলিমদের মধ্যে সংগ্রাম ও লড়াইয়ের অনুভূতি নাই হয়ে গেছে। তারা টাকা-পয়সা, বৈচিত্র্যহীন আয়েশি জীবনের প্রতি ঝুঁকে গেছে।'

সে নিজেকে তিরস্কার করে, কারণ সে আহ্বানে শক্তিশালী ছিল না। সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় দাওয়াত দিতে পারেনি। কিন্তু দ্রুতই সে বুঝতে পারে, প্রাঞ্জলতা, কথার বালাগাত সে অর্জন করেছে সবদিক থেকেই। তাহলে তার ডাকে কেন মুসলিমরা উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলছে না! তখন সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আরেকবার। শোকগাথাটা আরেকবার সাজিয়ে তোলে। আর বলে :

مِنْ حَرِّ شَدْوِيْ يُرَى فِيْ الْخَرِيْفِ *** طَرُوْبًا بِصُحْبَتِيْ الْعَنْدَلِيْبُ

وَلَكِنْ خُلِقْتُ بِأَرْضٍ بِهَا *** نُفُوْسُ الْعَبِيْدِ بِرِقٍّ تَطِيْبُ

....

৩৮৮. সহিহু মুসলিম : ২৭৫০

‘শরতে আমার সুরেলা গানে বুলবুলিটাও বিহ্বল হয়ে চলে আসে আমার সান্নিধ্যে। কিন্তু আমি এমন এক ভূমিতে জন্ম নিয়েছি, যেখানে বাস করে এমন কিছু মানুষ, যারা গোলামিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে!’

উসতাজ মালিক ﷺ বলেছিলেন, ‘উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে আমাদের কোনো ক্ষতি ও বিপদ নেই। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করার মানসিকতা মানুষের মাঝে তৈরি হওয়ার মধ্যেই আমাদের আসল ক্ষতি ও বিপদ।’

আজকাল প্রাঞ্জলতা ও আকর্ষণের মাপকাঠি বদলে গেছে। বড় বড় কারনামাকারী সে প্রজন্মও নেই এখন। তাই এখন অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে, যেমন রাফিয়ি বলেছেন, ‘মানুষের জন্য এখন বিরাট শব্দের ভান্ডারে বিবিধ জিনিস লেখা হয়, যাতে মানুষ তা উপভোগ করে মত্ত থাকতে পারে।’

ফিতনা-ফাসাদ সত্ত্বেও মুসলিম দায়ি হাত গুটিয়ে বসে থাকে না; বরং সে আল্লাহর বান্দাদের উদ্ধারকর্মে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখে। শুদ্ধির পথে শত হতাশার বাধাও টেকে না তার এক মুহূর্তের ইমানি জাগরণের সামনে। প্রতিটি মুসলিমকে দেখাতে হবে ইমানি জাগরণে তার অবস্থান কোথায়? চলতে হবে সালাফের পথে। তবেই উত্তম খালাফ হতে পারব আমরা। আর আল্লাহ আমাদের হাতে পৃথিবীতে তাঁর নির্ধারিত নেতৃত্বের সেই আমানত সোপর্দ করবেন। এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আর সত্যপন্থীদের সিলসিলা কখনো শেষ হয় না। সত্যপন্থীদের একটি দল সর্বদা পৃথিবীতে বিরাজমান থাকে, যাদের ব্যাপারে প্রিয় নবি ﷺ বলেছেন :

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে। তাদের পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) এসে পড়বে, ততক্ষণ তারা সেই অবস্থায় থাকবে।’[৩৮৯-৩৯০]

৩৮৯. সহিহু মুসলিম : ১৯২০
৩৯০. আল-মুনতালিক : ৬১-৬৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জিহাদের পথে দৃঢ় মনোবল

ইসলামের প্রথম প্রজন্ম জানতেন, জিহাদেই রয়েছে অতুলনীয় মর্যাদা এবং অন্তহীন কল্যাণ। তারা বিশ্বাস করতেন, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত। শাহাদাতের পেয়ালাই সর্বোত্তম তৃষ্ণা নিবারক। তাই তাঁরা জিহাদের পথে সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কুফর ও অবাধ্যতায় লিপ্তদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন। গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন সামরিক বাহিনী। প্রেরিত হলো সারিয়া। পরিচালিত হলো গাজওয়া। আল্লাহর পথে যথাসাধ্য সম্পদ ব্যয় করেছেন তাঁরা। যিনি সম্পদে প্রাচুর্যতা দেন এবং তা পবিত্র করেন, তাঁকে তাঁরা কর্জ দিলেন। টালবাহানা না করে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিলেন, বিনিময় তাঁরা জান্নাত লাভ করলেন। কাফিরদের ঘাড়ে আঘাত করলেন তাঁরা। আস্বাদন করালেন কাফিরদের মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ। পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।

এখানে তাঁদের নিয়ে কিছু কথা বলব। সাথে সাথে তাঁদের ওপর আপতিত পরীক্ষার কথাও তুলে ধরব। আশা করি এ বর্ণনা পড়ে আমাদের নিস্তেজ হিম্মতে কিছুটা হলেও দোলা লাগবে। জেগে উঠব আমরা। আমাদের বসে থাকা সংকল্প শক্তিশালী হবে। যার জন্য এতটুকু বর্ণনা যথেষ্ট হবে না, যার আরও বেশি দরকার হবে—সে যেন সামনে উল্লেখিত ঘটনার বিস্তারিত দেখে নেয়।

মুজাহিদদের একক আমির ও প্রথম সেনাপতি রাসুল ﷺ—যিনি সকল কল্যাণকর বিষয়ে আদর্শ আমাদের। আল্লাহ তাআলা যাঁর ব্যাপারে বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[৩৯১]

....

৩৯১. সুরা আল-আহজাব : ২১

হিম্মতের দিক থেকে রাসুল ﷺ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব। মানুষের মাঝে সবচেয়ে সাহসী। সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী। সর্বাপেক্ষা বেশি স্নেহশীল। এমন অনেক কঠিন পরিস্থিতি এসেছে, যখন বীর-বাহাদুররা সরে পড়েছে, কিন্তু তখনও তিনি আপন অবস্থানে অবিচল ছিলেন। সামনে অগ্রসর হয়েছেন। সরে পড়েননি। প্রত্যেক বীর-বাহাদুরই কখনো না কখনো স্বভাবের কাছে অপারগতা স্বীকার করে অথবা পলায়ন করে। কিন্তু রাসুল ﷺ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। কারণ, তিনি কখনো পলায়ন করেননি। আল্লাহ তাঁকে এ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

'অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।'[৩৯২]

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا

'রাসুল ﷺ ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও শ্রেষ্ঠ সাহসী। কোনো এক রাতে মদিনাবাসী (অজানা এক শব্দে) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। লোকজন আওয়াজের উৎসের দিকে ছুটে চলল। রাসুল ﷺ তখন ফিরতি পথে তাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাদের পূর্বেই আওয়াজের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি আবু তালহার গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর কাঁধে তরবারি ঝুলছিল। তিনি বলছিলেন, "তোমরা ভয় পেও না, তোমরা ভয় পেও না।"'[৩৯৩]

....

৩৯২. সুরা আল-কলাম : ৪

৩৯৩. সহিহুল বুখারি : ৩০৪০, সহিহু মুসলিম : ২৩০৭। ইবারত মুসলিমের।

আলি ﷺ বলেন, 'যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করত এবং আমাদের চোখ রক্তিম বর্ণ হয়ে যেত, তখন আমরা রাসুল ﷺ-এর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। তাঁর চেয়ে অন্য কেউ শত্রুদের এত বেশি নিকটবর্তী থাকত না। বদরের দিন আমরা রাসুল ﷺ-এর পেছনে আশ্রয় নিলাম। তিনিই আমাদের মধ্যে শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। সেদিন তিনিই সর্বাধিক প্রতাপধর ছিলেন।'[৩৯৪]

বর্ণিত আছে, "বীর ছিল সে, রাসুল ﷺ যুদ্ধে শত্রুদের নিকটবর্তী থাকার সময় যে তাঁর পাশে থাকত।'

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ এমন কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হননি, যার ওপর তিনি প্রথম আঘাতকারী ছিলেন না।'

রাসুলের উম্মাহর মাঝেও বীর-বাহাদুরের সংখ্যা অগণিত। 'অনেক' বললেও তাঁদের সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার নয়। বিশেষ করে রাসুল ﷺ-এর সাহায্যকারী সাহাবিগণ। আল্লাহ তাআলা এ বাণীর মাধ্যমে যাঁদের প্রশংসা করেছেন—

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, আর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[৩৯৫]

- সাহাবিদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর; বরং নবিদের পর সকল মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ বীর হলেন রাসুল ﷺ-এর খলিফা আবু বকর সিদ্দিক ﷺ। তাঁর ব্যাপারে আলি ﷺ স্বাক্ষ্য দিয়েছেন, 'তিনি হলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে সাহসী।' আলি ﷺ সত্যি বলেছেন। আবু বকর ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ও সবচেয়ে বেশি স্নেহশীল। বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর দৃঢ়তা ছিল অতুলনীয়। উদাহরণ হিসেবে এগুলোই যথেষ্ট তোমার জন্য। এমনকি রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর মতো শোকাবহ পরিস্থিতিতেও তিনি ছিলেন দৃঢ় ও সংযমী। এমন পরিস্থিতিতে তিনি মুসলিমদের দৃঢ়তার শিক্ষা দিয়েছেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনড় ও

৩৯৪. সহিহু মুসলিম, মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৪
৩৯৫. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

অবিচল। সাহাবায়ে কিরামের এ বীরত্বের সামনে অন্যান্য জাতির বীরগণও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁদের উচ্চ মনোবলের সামনে অন্যদের মনোবল ম্লান হয়ে আছে।

- সাহাবিদের আরেকজন ছিলেন সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী, দ্বীনের সাহায্যকারী আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﷺ। যিনি বীরত্ব ও দৃঢ়তার চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছেছিলেন। দ্বীনের জন্য কুরবানি এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি ও কঠোরতা সর্বজনবিদিত।

- শোনো এবার দুর্দমনীয় সিংহ, শান্তিময় মুষলধার বৃষ্টি, মুশরিক বাহিনীর সারি ছিন্নভিন্নকারী, আশ্চর্য সব বীরত্বময় কারনামার অধিকারী আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবি তালিব ﷺ-এর কথা। তাঁর বর্ম ছিল সামনের দিকে। পিঠের দিক উন্মুক্ত থাকত। তাঁকে একবার বলা হলো, 'আপনি কি পিঠের ওপর কোনো আঘাত আসার আশঙ্কা করেন না?' তিনি বললেন, 'শত্রু আমার পিঠের দিক দেখলে তো! আলি জীবিত থাকতে আল্লাহ শত্রুকে জীবিত রাখবেন না।'—ইবনে আসাকিরের বর্ণনা।

ইবনে আব্দুল বার আলি ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন, 'আলি ﷺ যদি কারও হাত ধরতেন, তবে সে ছুটতে পারত না। তাঁর ভয়েই সে তটস্থ হয়ে যেত আর তাঁর শক্ত পাকড় তো আছেই।'

আলি ﷺ-এর বীরত্বগাথা বেশ প্রসিদ্ধ। তাঁর উচ্চ হিম্মত ও দৃঢ় মনোবলের কারনামা অনেক বিখ্যাত।

- রাসুল ﷺ যখন বদর যুদ্ধের ব্যাপারে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন মিকদাদ বিন আসওয়াদ ﷺ বলেছিলেন :

  'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন, আপনি তার ওপর আমল করুন, আমরা আপনার সাথেই আছি। আল্লাহর শপথ, বনি ইসরাইল মুসা ﷺ-কে যা বলেছিল, আমরা আপনাকে তা বলব না—

  فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

“আপনি ও আপনার রব যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসে আছি।”[৩৯৬]

বরং আমরা বলব, “আপনি ও আপনার রব যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সাথে যোদ্ধা হিসেবে আছি।”

সাদ বিন মুআজ ﷺ বলেন :

‘...তাই আপনি যখন ইচ্ছা এগিয়ে যান। আমরা আপনার সাথেই আছি। সে সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের কেউ পেছনে ফিরে যাবে না। আর আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখি হতেও ভয় করি না আমরা। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল। শত্রুর মোকাবেলায় সত্যবাদী। হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনাকে এমন কিছু দেখাবেন, যাতে আপনার চক্ষু শীতল হবে। সুতরাং আল্লাহর ওপর ভরসা করে সামনে এগিয়ে চলুন।’

আনাস ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ও তাঁর সাথিগণ মুশরিকদের আগেই বদর প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এরপর মুশরিকরা এল। রাসুল ﷺ বললেন, “আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা কেউ কোনোকিছু আগ বাড়িয়ে কোরো না।” এরপর মুশরিকরা এগিয়ে এল। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “তোমরা আসমান-জমিনসম প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাও।” উমাইর বিন হুমাম ﷺ বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, তার প্রশস্ততা আসমান-জমিন সমান!?” রাসুল বললেন, “হ্যাঁ।” উমাইর ﷺ বললেন, “বাহ! বাহ!”[৩৯৭] রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি “বাহ! বাহ!” বললে কেন?” উমাইর ﷺ বললেন, “আল্লাহর শপথ, জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার আশায় আমি এমনটি বলেছি।” রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তার অধিবাসী।” এরপর তিনি থলে থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, “এ খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকা তো অনেক দীর্ঘ সময়!” তাই নিজের খেজুরগুলো

৩৯৬. সুরা আল-মায়িদা : ২৪
৩৯৭. এটি খুশি ও আশ্চর্যজনক বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়।

ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।'[৩৯৮]

- আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'আমার চাচা আনাস বিন নজর ﷺ বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, তাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দেন, তবে আল্লাহ তাআলা দেখবেন, আমি কী করি।" এরপর যখন উহুদের দিন আসলো এবং মুসলিমদের (একপর্যায়ে) পরাজয় প্রকাশ পেল, তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এদের (সাহাবিদের) কাজের ব্যাপারে ক্ষমা চাচ্ছি এবং এদের (মুশরিকদের) থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। এরপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। সাদ বিন মুআজ ﷺ তাঁর সামনে পড়লেন। তখন তিনি বললেন, "জান্নাত! হে সাদ বিন মুআজ, নজরের রবের শপথ, আমি উহুদের অদূরেই জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।" সাদ বলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে যা করেছে, আমি তা করতে পারিনি।"' আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা তাঁর মাঝে আশির অধিক তরবারির বা বর্শার আঘাত অথবা তিরের জখম দেখতে পেলাম। আমরা তাঁকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তাঁকে মুসলা করেছিল। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর বোন শুধু তাঁর আঙুল দেখে চিনতে পারে।' আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা মনে করতাম, এই আয়াত তাঁর বা তাঁর মতো লোকদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

"মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।"'[৩৯৯_৪০০]

- জাফর বিন আবু তালিব ﷺ মুতার যুদ্ধে ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। কিন্তু তাঁর ডান হাত কেটে গেল। পতাকাটি তিনি বাম হাতে নিলেন, কিন্তু একটু পর তাঁর বাম হাতও কেটে গেল। ফলে তিনি উভয় বাহু দিয়ে তা

৩৯৮. সহিহু মুসলিম : ১৯০১
৩৯৯. সুরা আল-আহজাব : ২৩
৪০০. সহিহুল বুখারি : ২৮০৫

চেপে ধরলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। আল্লাহ তাআলা দুহাতের পরিবর্তে তাঁকে জান্নাতে দুটি ডানা দান করেছেন, যা দিয়ে তিনি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ান। বর্ণিত আছে, এক রোমান সৈন্য তলোয়ার দিয়ে তাঁর ওপর বেশ জোরে আঘাত করে এবং তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। তিনি যখন নিহত হলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ পতাকা তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি তখন ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন না, সে ব্যাপারে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তখন এ কবিতাগুলো পাঠ করলেন—

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ *** لَتَنْزِلَنَّ طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّهْ *** مَا لِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّهْ

قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّهْ *** هَلْ أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ فِي شَنَّهْ

'স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ময়দানে তোমায় নামতেই হবে। এদিকে শোরগোল করে সমবেত দুশমন আর মুহুর্মুহু শোনা যায় রণহুংকার। কী হলো তোমার? তুমি দেখি জান্নাতকেই অপছন্দ করছ! জীবনের কত সময় তুমি কাটিয়েছ প্রশান্ত মনে; অথচ তুমি তুচ্ছ বীর্যবিন্দু ছাড়া তো কিছুই ছিলে না!'

يَا نَفْسِ إِنْ لَّا تُقْتَلِيْ تَمُوتِيْ

هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيتِ

إِنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيتِ

وَإِنْ تَأَخَّرْتِ فَقَدْ شَقِيتِ

'মন আমার, নিহত না হলেও যে তোমায় মরতে হবে! কেননা, জীবন হলো মরণপ্রান্তর, যেখানে তুমি হেঁটে চলেছ। তোমার যত সাধ, সব

তো পূরণ হয়েছে। এখন জাইদ ও জাফরের পথ যদি ধরো, তবে সফল হতে পারবে। আর যদি ছিটকে পড়ো তাদের রাস্তা থেকে, তবে তুমি বড়ই দুর্ভাগা হবে।'

এখানে তিনি দুজন দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন জাইদ ও জাফর ﷺ-কে। এরপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তখন তাঁর এক চাচাতো ভাই এক টুকরো হাড্ডি-জড়িত গোশত এনে তাঁকে বললেন, 'নাও, এটা খেয়ে একটু শক্তি অর্জন করো। কারণ, আজ তুমি অনেক কষ্ট করেছ।' তিনি গোশতের টুকরো নিয়ে দাঁত দিয়ে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়েছেন—এমন সময় এক পার্শ্বের লোকজনের ভীষণ হুড়োহুড়ির শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে?' তিনি গোশতের টুকরো ছুড়ে ফেলে তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে একপর্যায়ে শহিদ হয়ে গেলেন।[৪০১]

- শাদ্দাদ বিন হাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর নিকট আগমন করল। ইমান এনে নবিজি ﷺ-এর আনুগত্য শুরু করল সে। এরপর বলল, "আমি আপনার কাছে হিজরত করব।" নবিজি ﷺ কয়েকজন সাহাবিকে তার ব্যাপারে অসিয়ত করলেন। কোনো এক যুদ্ধের পর নবিজি ﷺ যখন গনিমতের মাল বণ্টন করে দিচ্ছিলেন, তখন সে সাহাবির জন্যও কিছু অংশ নির্ধারণ করে দিলেন। তার সাথিরা বণ্টিত অংশ নিয়ে তাকে দিল। সে কাফেলার পেছনে পাহারাদারির দায়িত্বে ছিল বিধায় সরাসরি নবিজি ﷺ-এর হাত থেকে নিতে পারেনি। সে বলল, "এটা কী?" তারা বলল, "তোমার জন্য নবিজি ﷺ কর্তৃক বণ্টিত অংশ।" সে তা নিয়ে নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, "এটা কী?" নবিজি ﷺ বললেন, "আমি তোমার জন্য যা বণ্টন করেছি।" সে বলল, "আমি এ জন্য আপনার আনুগত্য করিনি; বরং আমি আপনার আনুগত্য করেছি, যাতে আমার এখানে কোনো তির নিক্ষেপ করা হয় (তিনি নিজের কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন)। এবং এরপর আমি মৃত্যুবরণ করি আর জান্নাতে প্রবেশ করি।" নবিজি ﷺ বললেন, "যদি তুমি আল্লাহর সাথে সততা বজায় রাখো, তবে তিনিও তোমাকে সত্যায়িত করবেন।" তারা কিছু সময় অবস্থান করল। এরপর কোনো এক যুদ্ধের জন্য

৪০১. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/১৩-১৪

বের হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষে ওই লোকটাকে বহন করে নবিজি ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। সে যেখানে ইশারা করেছিল, ঠিক সেখানেই বিদ্ধ ছিল একটি তির। নবিজি ﷺ বললেন, "এই লোকই কি সে লোক?" তারা বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "সে আল্লাহর সাথে সততা বজায় রেখেছিল, তাই আল্লাহও তাকে সত্যায়িত করেছেন।" তারপর তিনি তাঁকে নিজ জুব্বা দিয়ে কাফন দিলেন। তাকে সামনে রেখে জানাজা আদায় করলেন। সালাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যে আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তা হলো—

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ

"হে আল্লাহ, এ তোমার বান্দা, সে তোমার পথে মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছে, এখন সে শহিদি মৃত্যুবরণ করেছে—আমি এর সাক্ষী""[৪০২]

- জাফর বিন আব্দুল্লাহ বিন আসলাম ﷺ বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধ। লোকজন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তখন সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল আবু আকিল। তিরবিদ্ধ হলেন কাঁধ ও হৃদয়ের মাঝখানে। মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। তিরটি টেনে বের করে ফেললেন তিনি। দিনের প্রথম অংশেই শরীরের বাম পাশ দুর্বল হয়ে পড়ল তার। শরীর টেনে ছাউনির দিকে যাচ্ছিলেন। রণাঙ্গন যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠল, মুসলিমরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল, তখন সবাই ছাউনির দিকে ছুটতে শুরু করে। আবু আকিল আঘাতের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেন। মাআন বিন আদির কণ্ঠ শুনলেন তিনি। চিৎকার করে বলছে সে কণ্ঠ, "হে আনসারগণ, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ ভয় করো। দ্বীনের সাহায্যে ছুটে আসো! শত্রুদের ওপর দ্বিতীয়বার আঘাত হানো।" আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, "তখন আবু আকিলও নিজ সম্প্রদায়ের আহ্বানে সাড়া দিতে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কী করতে চাচ্ছেন? আপনার মাঝে তো যুদ্ধের শক্তি নেই!" তিনি বললেন, "আহ্বানকারী আমাকে ডেকেছেন।" ইবনে উমর ﷺ বলেন, "আমি বললাম, তিনি বলেছেন, হে আনসারগণ, তবে আহতদের উদ্দেশ্য করেননি।" আবু আকিল বললেন,

৪০২. সুনানুন নাসায়ি : ১৯৫৩

"আমি আনসারদের একজন। আমি তার ডাকে সাড়া দেবো; যদিও হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় আমাকে।" ইবনে উমর ﷺ বলেন, "এরপর আবু আকিল দৃঢ় সংকল্পে ডান হাতে তরবারি নিয়ে ডাকতে থাকলেন, "হে আনসারগণ, হুনাইনের যুদ্ধের মতো পুনরায় আঘাত হানো! সকলে একযুগে আক্রমণ করো এবং এগিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের সকলের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয় মুসলিমরা হলো তাদের শত্রুদের জন্য ফাঁদ।" অবশেষে মুসলিমরা শত্রুদেরকে বাগানের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হলো। এবং শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়ল। আমাদের তরবারি ও শত্রুদের তরবারি একে অপরকে আঘাত করছিল।

ইবনে উমর ﷺ বলেন, "আমি আবু আকিলের দিকে লক্ষ করে দেখলাম। তাঁর ক্ষত হাতটি কাঁধ থেকে কেটে মাটিতে পড়ে গেছে। তাঁর দেহে চোদ্দোটি আঘাত। প্রতিটি আঘাতই মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ছিল। সেদিন আল্লাহর শত্রু মুসাইলামা নিহত হয়েছিল।"

ইবনে উমর ﷺ বলেন, "আমি আবু আকিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আবু আকিল। শেষ নিশ্বাস নিচ্ছেন। আমি বললাম, "হে আবু আকিল!" তিনি জড়তার সাথে তখন বললেন, "জি"। জিজ্ঞেস করলেন, "কারা পরাজিত হয়েছে?" আমি বললাম, "সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শত্রু নিহত হয়েছে।" তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর মৃত্যুবরণ করলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।"'[৪০৩]

- সাহসী বীর বারা বিন মালিক ﷺ। আনাস ﷺ-এর ভাই। ইবনে সিরিন ﷺ বলেন, '(ইয়ামামার যুদ্ধে) মুসলিমরা একটি দেয়ালের নিকট পৌঁছাল। ভেতরে মুশরিকরা অবস্থান করছিল। বারা ﷺ একটি ঢালের ওপর বসে বললেন, "তোমাদের বর্শা দিয়ে আমাকে ওপরে তুলে তাদের ওপর নিক্ষেপ করো।" সাহাবিগণ তাঁকে দেয়ালের ওপারে নিক্ষেপ করলেন। বারা ﷺ-এর পা ভেতরে মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে মুশরিকরা তাঁর কাছে ছুটে এল। তিনি তাদের দশজনকে হত্যা করেন। সেদিন বারা ﷺ শরীরে আশির ওপর

৪০৩. মাশারিউল আশওয়াক : ১/৫০৯

আঘাত পেয়েছেন। কিছু ছিল বর্শার ও তিরের, কিছু ছিল তলোয়ারের। খালিদ বিন ওয়ালিদ ﵁ এক মাস অবস্থান করলেন সেখানে। অবশেষে বারা ﵁ সুস্থ হয়ে উঠলেন।'[৪০৪]

- মুহাম্মাদ বিন সাবিত বিন কাইস বিন শিমাস আনসারি ﵁ বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে যখন মুসলিমরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন আবু হুজাইফার গোলাম সালিম বলেন, "আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে এমন করতাম না।" তিনি নিজের জন্য একটি বাংকার খনন করলেন। সে বাংকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিল মুহাজিরদের পতাকা। তিনি যুদ্ধ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত বারোতম হিজরিতে ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হয়ে সফল হলেন তিনি।[৪০৫]

- আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, 'ইয়ামামার দিন আমি সাবিত বিন কাইস বিন শিমাস ﵁-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তিনি মৃত ব্যক্তির আতর মাখছেন।[৪০৬] আমি বললাম, "চাচাজান, আপনি কি মুসলিমদের অবস্থা দেখছেন না, আপনি এখনো এখানে?" তিনি মুচকি হেসে বললেন, "ভাতিজা, এখনই সময়।" এরপর তিনি অস্ত্রসজ্জিত হলেন। ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। অবশেষে যুদ্ধের কাতারে চলে এলেন এবং বললেন, "এদের জন্য এবং এদের কর্মের জন্য আফসোস!" আর শত্রুদের উদ্দেশে বললেন, "তাদের জন্য এবং তারা যাদের উপাসনা করে, তাদের জন্য আফসোস!" এরপর বললেন, "তোমরা আমার ঘোড়ার জন্য পথ ছেড়ে দাও, যাতে আমি তাদের গভীরে প্রবেশ করতে পারি।" এরপর তিনি আঘাত হানলেন। বীরবিক্রমে তুমুলভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে শহিদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'[৪০৭]

- আব্দুল্লাহ বিন আবু মুসা আশআরি ﵁ বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "রাসুল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় জান্নাতের দরজাসমূহ

---

৪০৪. উসদুল গাবাহ : ১/২০৬
৪০৫. মাশারিউল আশওয়াক : ১/৫৫৫
৪০৬. তাঁরা মৃত্যুর সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এমনটা করতেন। এভাবে সুগন্ধি মেখে নিজের দৃঢ় সংকল্পকে দৃঢ়তর করতেন শাহাদাত লাভের আশায়। আল্লাহ ভালো জানেন।
৪০৭. ইবনুল মুবারক ﵀ কৃত কিতাবুল জিহাদ : ১২১

তরবারির ছায়াতলে।" এ কথা শুনে আলুথালু বেশের এক লোক দাঁড়াল। বলল, "হে আবু মুসা, আপনি কি রাসুল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" এরপর লোকটি তাঁর সাথিদের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, "আমি তোমাদের প্রতি সালাম পাঠ করছি।" তারপর সে তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেলল। অতঃপর তলোয়ার হাতে (শত্রুর ওপর) আঘাত হানতে হানতে শহিদ হয়ে গেল।"'[৪০৮]

- আল্লাহর তরবারি, ইসলামের অশ্বারোহী, রণাঙ্গনের সিংহ, মুজাহিদদের আমির আবু সুলাইমান খালিদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি বলেন, 'আমি একশ বা এর কাছাকাছি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার শাহাদাত অর্জন হয়নি। এখন আমি বিছানায় উটের মতো মরছি। কাপুরুষদের ঘুম না আসুক। তারা মৃত্যুর ভয়ে আরও বেশি ভীত হোক।'[৪০৯]

আসিম বিন বাহদালা বর্ণনা করেন, আবু ওয়ায়িল বলেন, 'যখন খালিদ رضي الله عنه-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তিনি বললেন, "আমি শাহাদাতকে তার প্রাপ্তিস্থানে খুঁজেছিলাম। কিন্তু আমার তাকদিরে বিছানার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদানের পর আমার এমন কোনো আমল নেই, যার আশা করতে পারি—তবে একটি রাত আছে, যে রাতটি আমি ঢাল হাতে আত্মরক্ষা করে অপেক্ষা করছিলাম। আর আকাশ আমার ওপর বারি বর্ষণ করছিল। আমরা প্রভাতের অপেক্ষায় ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সকালবেলায় কাফিরদের ওপর অতর্কিত আঘাত হানা।" এরপর তিনি বলেন, "আমি মরে গেলে তোমরা আমার ঘোড়া ও হাতিয়ারের প্রতি লক্ষ রেখো। এগুলো আল্লাহর পথে জিহাদের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ কোরো।" তিনি ইনতিকাল করলেন। উমর رضي الله عنه তাঁর জানাজায় শরিক হতে আসলেন। তিনি বললেন, "ওয়ালিদ পরিবার যদি খালিদের জন্য এক জলাশয় অশ্রু বইয়ে দিতে না পারে, তবে খালিদের জন্য তাদের কাঁদা উচিত নয়।"'[৪১০]

....

৪০৮. সহিহু মুসলিম : ১৯০২, সুনানুত তিরমিজি : ১৬৫৯

৪০৯. উসদুল গাবাহ : ২/১১১

৪১০. আল-ইসাবাহ : ৩/৭৪

কতক যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব পৌঁছে গিয়েছিল অতি উচ্চতায়। একবার পারস্যবাহিনীর সেনাপতি তাদের সারিগুলো ঠিক করছিল। এমন সময় খালিদ ﷺ কাতার ভেঙে তাদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। বিদ্যুৎচমকের মতো আকস্মিকভাবে কোলে তুলে উভয় হাত বেঁধে বন্দী হিসেবে মুসলিম বাহিনীর কাছে নিয়ে আসলেন পারস্যবাহিনীর সেনাপতিকে। ওদিকে তারা খালিদ ﷺ-এর এমন বীরত্ব দেখে হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

- আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﷺ। রোমানরা তাঁকে বন্দী করে ফেলে। এক পাপিষ্ঠ তাঁকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। ঘরে মদমিশ্রিত পানি ও শূকরের ভুনা গোশত রেখে দেয়, যেন তিনি এ গোশত খান; মদমিশ্রিত পানি পান করেন। এভাবে তারা তিন দিন আটকে রাখে তাঁকে। কিন্তু তিনি একটুও খাননি। যখন তারা হুজাফা ﷺ-এর মৃত্যুর আশঙ্কা করল, তখন তাঁকে বের করে আনল। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণে এগুলো আমার জন্য হালাল ছিল। কিন্তু আমি ইসলাম নিয়ে এ উপহাসে আনন্দ দিতে চাইনি তোমাদের।'

আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমি ﷺ মিশরে ইনতিকাল করেন। মিশরের কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সময়টা ছিল উসমান ﷺ-এর খিলাফতকাল।

রোমসম্রাটের সাথে তাঁর যে ঘটনা, সেটার ব্যাপারে আবু রাফি বলেন, 'উমর ﷺ একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন রোমের উদ্দেশে। রোমানরা আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে বন্দী করে তাদের বাদশাহর কাছে নিয়ে যায়। বাদশাহকে বলে, "এ মুহাম্মাদের সাথি।" বাদশাহ বলল, "তুমি কি খ্রিষ্টান হবে? বিনিময়ে আমি তোমাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেবো?" ইবনে হুজাফা জবাব দিলেন, "যদি তুমি তোমার মালিকানার সবকিছু এবং আরবের সবকিছুও আমাকে দিয়ে দাও, তবুও আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন থেকে চোখের পলক পরিমাণও সরব না।" বাদশাহ বলল, "তবে আমি তোমাকে হত্যা করব!" তিনি বললেন, "তবে তুমি তা-ই করো।" বাদশাহ হত্যার আদেশ দিল। তাঁকে শূলির বেদিতে চড়ানো হলো। তিরন্দাজদের বলে দেওয়া হলো, "একেবারে কাছ থেকে তির নিক্ষেপ করো।" এ সময় তাঁর সামনে আবার

খ্রিষ্টধর্ম পেশ করা হলো। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন আগের মতো। এরপর তাঁকে শূল থেকে নামিয়ে আনা হলো। একটি বড় পাতিল আনতে বলা হলো। পানি ঢেলে গরম করা হলো। তারপর দুজন মুসলিম বন্দীকে আনার আদেশ দিল বাদশাহ। তাঁদের একজনকে ডেকচিতে নিক্ষেপের আদেশ করা হলে তাকে তাতে নিক্ষেপ করা হলো। তারপর আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﷺ-এর নিকট পুনরায় খ্রিষ্টধর্ম পেশ করা হলো, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তখন বাদশাহকে বলা হলো, "সে কাঁদছে।" বাদশাহ মনে করল, ইবনে হুজাফা হয়তো ভয় পেয়েছে। বাদশাহ বলল, "তাকে ফিরিয়ে আনো।" এরপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাঁদছ কেন?" তিনি বললেন, "আমি ভাবছি, আমার একটি মাত্র প্রাণ। এই মুহূর্তে আমাকে পাতিলে নিক্ষেপ করা হবে আর সে প্রাণ চলে যাবে। কিন্তু আমার বাসনা হচ্ছে, যদি আমার পশম সমপরিমাণ প্রাণ থাকত, প্রত্যেকটি প্রাণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে পারত!" তখন সে জালিম শাসক বলল, "তুমি কি আমার মাথায় চুম্বন করবে, তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো?" ইবনে হুজাফা ﷺ বললেন, "সকল বন্দীদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত?" সে বলল, "হ্যাঁ।" আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﷺ তার মাথায় চুম্বন করলেন এবং বন্দীদের নিয়ে উমর ﷺ-এর কাছে চলে এলেন। আর নিজেদের কাহিনি বর্ণনা করলেন। তখন উমর ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, তারা ইবনে হুজাফার মাথা চুম্বন করবে, আর আমিই এর সূচনা করছি।" এ কথা বলে উমর ﷺ তাঁর মাথায় চুম্বন করলেন।'[৪১১]

কবি বলেন :

أَجْدَرُ النَّاسِ بِالْكَرَامَةِ عَبْدٌ ** تَلِفَتْ نَفْسُهُ لِيَسْلَمَ دِيْنُهُ

'মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে জীবনের বিনিময়ে দ্বীনের হিফাজত করে।'

- এক আবিদ তার বন্ধুর কাছে ইবাদত ও আনুগত্যের ব্যাপারে উপদেশ চাইল। তখন তার বন্ধু বলল, 'সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হলো, আল্লাহর

....

৪১১. উসদুল গাবাহ : ৩/২১২-২১৩

সন্তুষ্টিতে নিজেকে উৎসর্গ করা। এ ছাড়া অন্য সব ইবাদত তো বিলাসমাত্র।'

اَلْجُوْدُ بِالْمَالِ جُوْدٌ فِيْهِ مَكْرَمَةٌ *** وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُوْدِ

'সম্পদের দানে রয়েছে সম্মান। কিন্তু আত্মদানই হলো শ্রেষ্ঠ দান।'

- আলা বিন সুফইয়ান হাজরামি ﷺ বলেন, 'বুসর বিন আরতা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করলেন। তাঁর সেনাদলের পেছনের অংশ বারবার আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল। আক্রমণকারীরা ওত পেতে থেকে আক্রমণ করছিল। অবশেষে যারা ওত পেতে ছিল, তারা আঘাতপ্রাপ্ত হলো। এ দেখে তিনি তাঁর ১০০ সৈন্যের সেনাদল থেকে পেছনে থেকে গেলেন। একদিন রোমের এক উপত্যকায় একা কাটালেন। সেখানেই তিনি ত্রিশটি ঘোড়া বাঁধা দেখলেন। পাশেই দেখলেন একটা গির্জা। ঘোড়সওয়ারিরা সেখানে অবস্থান করছিল। এরাই তাহলে মুসলিমদের তাড়া করছিল। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে সেটিকে বেঁধে রাখলেন। এরপর গির্জায় প্রবেশ করে সকলের সামনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রোমানরা এটি দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ল। তারা বর্শা উত্তোলনের আগেই তিনি তাদের তিনজনকে আঘাত করে বসলেন। এদিকে তাঁর সাথিরা তাঁকে না পেয়ে খুঁজতে শুরু করলেন। তাঁরা সেখানে এসে তাঁর ঘোড়া দেখে চিনতে পারলেন। এরপর তাঁরা গির্জার ভেতর হইচই শুনতে পেয়ে গির্জার কাছে আসলেন। কিন্তু গির্জার ফটক বন্ধ পেলেন তাঁরা। তাই তাঁরা ছাদের কিছু অংশ উপড়িয়ে ফেলে এরপর ভেতরে নামলেন। তাঁরা দেখলেন, বুসর সেখানে নিজের পেটের নাড়িভুঁড়ি এক হাতে ধরে রেখে ডান হাতে অবিরত তরবারি চালিয়ে যাচ্ছেন। সাথিরা গির্জার সে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। ওদিকে বুসর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। রোমানদের কয়েকজন নিহত আর কয়েকজন বন্দী হলো। বন্দীরা তাঁদের কাছে জানতে চাইল, "আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এ কে?" তাঁরা বললেন, "বুসর বিন আরতা।" তখন রোমান বন্দীরা বলল, "আল্লাহর শপথ, কোনো মা এমন দ্বিতীয় কাউকে জন্ম দেননি।" সাথিরা বুসরের কাছে এসে তাঁর নাড়িভুঁড়ি পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর পেটে বড় কোনো ছিদ্র হয়নি। সাথিরা পাগড়ি দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে দিলেন। এবং তাঁকে তুলে

নিয়ে এলেন। এরপর তাঁর পেট সেলাই করে দিলেন। অবশেষে সব ঠিক হয়ে গেল। বুসর বিন আরতা-ও সেরে উঠলেন।'[৪১২]

মুজাহিদগণ উচ্চ মনোবলের কারণে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, কঠিন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া—এ সবই অনায়াসে করে নেন। ওই সকল বীরের মতো, যাঁরা কাদিসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত লাভের আশায় প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন। তাঁদের একজন বলেন, 'আমরা কাদিসিয়ার রণাঙ্গনে আসলাম। নাখিয়িদের অনেকেই শহিদ হলো।' এ ব্যাপারে উমর ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'নাখিয়িরাই এ যুদ্ধে নিবেদিত হলো।'[৪১৩]

- আল্লাহ তাআলা ওজরগ্রস্ত লোকদের থেকে এ কষ্ট তুলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

'দুর্বল, রুগ্ণ এবং ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের গুনাহ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে।'[৪১৪]

আরও বলেন :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

'অন্ধের জন্য, খোঁড়ার জন্য এবং রুগ্ণের জন্য কোনো অপরাধ নেই।'[৪১৫]

আল্লাহ তাআলা ওজরগ্রস্তদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মানুষ নিজেদের আটকে রাখতে পারেননি। তাই তো দেখুন, ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুসলিমদের ঝান্ডা বহন করতে চেয়েছিলেন।

....

৪১২. মাশারিউল আশওয়াক : ১/৫৪১
৪১৩. আল-ইসাবাহ : ১/২৮
৪১৪. সুরা আত-তাওবা : ৯১
৪১৫. সুরা আল-ফাতহ : ১৭

কিন্তু পতাকা বহন করেছিলেন মুসআব বিন উমাইর ﵁। এক কাফির এসে তাঁর ডান হাত কেটে দিল। তাঁর ডান হাতে পতাকা ছিল। ডান হাত কেটে যাওয়ায় তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে নিলেন। কিন্তু সে হাতও কেটে ফেলা হলো। এরপর তিনি বাহু দিয়ে বুকে চেপে ধরে এই আয়াত পাঠ করেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসুল। তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়েছেন।'[৪১৬]

এই ছিল তাঁদের দৃঢ়তা ও মনোবল। আল্লাহ তাআলা বাণী : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ (অন্ধের জন্য অপরাধ নেই।) এটি প্রথম জন তথা ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁-এর ব্যাপারে। আর وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ (খোঁড়ার অপরাধ নেই) এটি আমর বিন জামুহ আনসারি ﵁-এর ব্যাপারে। তিনি ছিলেন খোঁড়া। মুসলিম সেনাদলের সামনের অংশে ছিলেন তিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি এ খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই।' আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন, 'সাহাবিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে দুজনের কাঁধে ভর করে নিয়ে আসা হতো। আর সে যুদ্ধের কাতারে এসে দাঁড়াত।'[৪১৭]

- একদা পারস্যবাহিনী আকস্মিকভাবে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে বসে। মুসলিমরা কৌশল গ্রহণ ও পেছনের বাহিনীর সাথে মিলিত হতে পিছু হটে। কিন্তু কাফিররা একজন দুর্বল মুসলিমের নাগাল পেয়ে তাকে দ্রুত বন্দী করে ফিরে যায়। কিন্তু হাঁটতে না পারা এ দুর্বল মুসলিম রুস্তমকে কী জবাব দিয়েছিল?

  রুস্তম : তোমরা এখানে কেন এসেছ এবং কী চাও?

  মুসলিম : আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির খোঁজে এসেছি।

....

৪১৬. সুরা আলি ইমরান : ১৪৪

৪১৭. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন লিল কুরতুবি : ৮/২২৬

রুস্তম : আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কী?

মুসলিম : তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করো, তবে তোমাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও সন্তানাদি সব আমাদের।

রুস্তম : যদি এর পূর্বেই তোমরা মরে যাও।

মুসলিম : আমাদের মধ্যে যে নিহত হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা জীবিত থাকবেন, তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। আর এর ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।

রুস্তম : তবে আমাদের লাঞ্ছনা তোমাদের হাতে!

মুসলিম : ধ্বংস হও হে রুস্তম, তোমাদের আমলই তোমাদের লাঞ্ছিত করেছে। আশপাশের যা কিছু দেখছ, তাতে প্রবঞ্চিত হয়ো না। কেননা, তোমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করছ না; বরং যুদ্ধ করছ আল্লাহর ফয়সালা ও শক্তির সাথে। আর আমরাই হলাম আল্লাহর ফয়সালা ও শক্তি।[৪১৮]

খালিদ ﵁ পারস্য-সম্রাটের সামনে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছি, তোমরা জীবিত থাকতে যতটা আগ্রহী, তারা মৃত্যুবরণ করতে তার চেয়ে বেশি আগ্রহী।'

- মহান তাবিয়ি আবু ওয়ায়িল শাকিক বিন সালামা আসাদি ﵀। তিনি ছিলেন চার খলিফা, ইবনে মাসউদ, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﵃-সহ প্রমুখ সাহাবির শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ফল। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘরবাড়ি তৈরি করা পছন্দ করতেন না। কুফাতে তাঁর জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। সে ঘরে শুধু তিনি থাকতে পারতেন। সাথে রাখতে পারতেন তাঁর ঘোড়া ও অস্ত্র। পুরো জীবনটা তিনি জিহাদের ছায়াতলে কাটিয়ে দিয়েছেন। জিহাদের জন্য তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। এমনকি বাজারের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপজোক করার বিষয়টি পর্যন্ত জানতেন না তিনি।[৪১৯]

---

৪১৮. মিন আতায়িবিল কালাম : ১/২৬-২৭

৪১৯. আস-সিকাত লি ইবনি হিব্বান : ১০৮

যখন তিনি একাকী হতেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকতেন। কারও সামনে কাঁদতেন না তিনি। যদি পুরো দুনিয়া তাঁকে দিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কারও সামনে কাঁদতে বলা হতো, তবে তিনি তা করতেন না। তাঁর ছিল ছোট্ট একটি ঘর। তাঁর ঘোড়া আর তিনি থাকতেন সেখানে। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ঘরটি তিনি ভেঙে ফেলতেন। আবার ফিরে এলে পুনরায় বানিয়ে নিতেন।

এভাবেই একজন মুজাহিদ তার মহৎ লক্ষ্যে ছুটে যায়। না পেছনে ফিরে তাকায়; আর না দুনিয়ার পরোয়া করে। কোনো দুঃখ না করে নির্ভয়ে বলে :

وَأَرَانِيْ أَسْمُوْ بِسَعْيِيْ وَوَعْيِيْ *** عَنْ جَزَاءٍ مِنْ مَعْدَنِ الْأَرْضِ بخس

حَسْبُ نَفْسِيْ مِنْ الْجَزَاءِ شُعُوْرِيْ *** أَنَّنِيْ فِيْ الْإِلَهِ أَبْذُلُ نَفْسِيْ

'জিহাদের পথে আমার চেষ্টা-সাধনার বিনিময়ে যদি পৃথিবীর সব মূল্যবান খনিজ সম্পদের খনিও দেওয়া হয়, তবুও তা কমই বটে। আমি এর চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে। আমার জন্য এ অনুভূতিটুকুই যথেষ্ট যে, জিহাদের পথে এসে রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছি।'

ইবনুল মুবারক ﵀ বলেন :

بُغْضُ الْحَيَاةِ وَخَوْفُ اللهِ أَخْرَجَنِيْ *** وَبَيْعُ نَفْسٍ بِمَا لَيْسَتْ لَهُ ثَمَنَا

إِنِّيْ وَزَنْتُ الَّذِيْ يَبْقَى لِيَعْدِلَهُ *** مَا لَيْسَ يَبْقَى فَلَا وَاللهِ مَا اتَّزَنَا

'তুচ্ছ এ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও আল্লাহর প্রতি ভয় আমাকে বের করে এনেছে। আমার এই জীবন এক অমূল্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করতে বেরিয়েছি। দুনিয়ায় সে অমূল্য বস্তুর সমমান কিছু আমি অনেক খুঁজেছি—কিন্তু পাইনি। আল্লাহর কসম, আমি সবকিছু মেপে দেখেছি।'

- মুসা বিন আবু ইসহাক ﵀ বলেন, 'আলি বিন আসাদ অনেক মন্দকর্মে জড়িত ছিলেন। এক রাতে তিনি কুফা নগরী অতিক্রম করছিলেন। তখন এক লোক এই আয়াত পাঠ করছিলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তখন আলি বিন আসাদ তাকে বললেন, "পুনরায় পাঠ করো।" লোকটি পুনরায় পাঠ করল। এরপর আবার বললেন, "পাঠ করো।" লোকটি পাঠ করল। তিনি আবারও বললেন, "পাঠ করো।" সে লোকটি পাঠ করতে থাকল।

আলি বিন আসাদ আল্লাহর পথে ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। গোসল করলেন। নিজের কাপড়ও ধুয়ে নিলেন। তারপর ইবাদত শুরু করলেন। অধিক কান্নার কারণে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল তার। হাঁটুদ্বয় উটের হাঁটুর মতো হয়ে গেল। তিনি সমুদ্র-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। রোমানদের মুখোমুখি হলেন। যখন তাদের নৌবহর শত্রুদের নৌবহরের সাথে মিলিত হলো, আলি বলেন, "আজকের পর কখনো আমি জান্নাত কামনা করব না।" এ বলে তিনি একাকী শত্রুদের নৌকার ভেতর ঢুকে পড়লেন। তিনি সেখানে তাদের ওপর আক্রমণ করতে থাকলেন। তারা একদিকে সরতে থাকল। এভাবে চলতে চলতে তারা সবাই নৌকার এক পাশে জড়ো হয়ে গেলে নৌকাটি তাদের নিয়ে তলিয়ে গেল। লোহার বর্ম পরে থাকায় তিনিও ডুবে যান।'[৪২০]

- আলা বিন হাজরামি ﷺ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের ঘোড়াকে পানিতে নামিয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, হে মহাসাগর, যদি আমি জানতাম, তোমার অপর প্রান্তে কোনো ভূমি রয়েছে, তবে তোমার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তাম এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সে ভূমি জয় করতাম।'[৪২১]

- ৪৬৩ হিজরি। রোমের সম্রাট আরমানুস মুসলিম ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে বের হলো। ঐতিহাসিকদের মতে তাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল দুলক্ষ। এ বিশাল

....

৪২০. মাশারিউল আশওয়াক : ১/৫৫৪- ৫৫৫
৪২১. মিন আতায়িবিল কালাম : ৩/১৪

সামরিক বাহিনীতে ইউরোপ, রাশিয়া, সার্বিয়া, আর্মেনিয়া, বোচনাক ও রোমেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বাহিনী যুক্ত হয়েছিল। ইরাকের পথে চলতে লাগল এ সেনাদল। বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতে করতে বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল তারা। সামনে বাড়ার আগেই আরমানুস বাগদাদে একজনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে নিল। তাকে খলিফার সাথে সৎ ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে বলল, 'এ শাইখের সাথে কোমল আচরণ কোরো, কারণ ইনি আমাদের সাথি।' আরমানুস পুরো ইসলামি জগৎ এবং মুসলিমদের ধ্বংসের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বের হয়েছিল। ইরাক ও খোরাসান দখল সম্পন্ন করে শামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সে। একযোগে আক্রমণ করে মুসলিমদের নির্মূল করে দিল।

আরমানুস কনস্টান্টিনোপল থেকে বের হয়ে পূর্বে দিকে রওয়ানা শুরু করল। এরপর আজকের তুরস্কের পূর্ব অংশে মালাজকারদে পৌঁছাল। উপসাগরের 'ওয়ান'-এর নিকটবর্তী এক জায়গায়। এ সংবাদ সালজুকি সুলতান আলাব আরসালানের কানে পৌঁছাল। তিনি তখন আজারবাইজানে। সদ্য হালাব থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর রাজধানী দূরে হওয়ায় এবং শত্রুরা কাছে চলে আসার কারণে সৈন্য সমাবেশ সম্ভব ছিল না। তাই নিজের সাথে যে সৈন্য ছিল তা নিয়ে রওয়ানা শুরু করলেন। সংখ্যায় তাঁরা ছিল পনেরো হাজার। তাঁরা শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'আমি ধৈর্য সহকারে প্রতিদানের আশায় যুদ্ধ করব। যদি নিরাপদ থাকি, তাহলে আল্লাহর নিয়ামত। আর যদি শহিদ হয়ে যাই, তাহলে আমার ছেলে মালিকশাহ আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।' তিনি দ্রুত পথ চলতে থাকলেন। অগ্রবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। যখন তাঁরা 'খালাত' নামক অঞ্চলে পৌঁছালেন, তখন রাশিয়ার অগ্রবাহিনীর মুখোমুখি হলেন। তাদের সাথে যুদ্ধ হলো। রুশরা ছিল দশ হাজার। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা পরাজিত হলো। তাদের সেনাপতি বন্দী হলো।

দুদল কাছাকাছি হলো। মুসলিম শাসক রোমসম্রাটের নিকট সন্ধির আবেদন করে দূত পাঠালেন। আরসালান রোমান বাহিনীর আধিক্যের আশঙ্কা করছিলেন। রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর পনেরো গুণ বেশি ছিল। কিন্তু রোমসম্রাট অহংকার দেখিয়ে বলল, 'রায় (তেহরান) ছাড়া আর কোনো কিছুতে সন্ধির অবকাশ নেই।' আরসালান এমন অহমিকাপূর্ণ উত্তরে খুবই

উত্তেজিত হয়ে গেলেন। তিনি বাহিনীর ইমাম আবু নাসর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বুখারির সাথে পরামর্শ করলেন। আবু নাসর বললেন, 'আপনি এমন দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করবেন, যার বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা দিয়েছেন। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন, এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করবেন। আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা আপনার নামেই এ বিজয়ের কৃতিত্ব লিখে রেখেছেন। জুমআর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুদ্ধ শুরু করুন। যে সময় খতিবরা মিম্বারের ওপর থাকে। তাঁরা মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য দুআ করেন। দুআর ফলে সাড়া আসবে।" সেদিনটি ছিল বুধবার। জিলকদ মাসের পাঁচদিন বাকি।

তারপর আসলো জুমআর দিন। সূর্য ঢলে গেল। আবু নাসর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বুখারি সৈন্যদের নিয়ে জুমআর সালাত আদায় করলেন। বাদশাহ কাঁদলেন। তাঁর ক্রন্দনে অন্য সকলেই কাঁদলেন। সালাতের পর বাদশাহ দুআ করলেন। তাঁর সাথে সকলেই দুআ করলেন। আরসালান সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন, 'যে ফিরে যেতে চায়, সে যেন ফিরে যায়। কারণ, এখানে আদেশ বা নিষেধকারী কোনো বাদশাহ নেই। আর এটি হলো জিহাদ ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ।' এরপর তিনি তির-ধনুক নিলেন। তরবারি হাতে তুলে নিলেন। আর সাদা কাপড় পরলেন। মৃত ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত আতর মাখলেন গায়ে। বললেন, 'যদি আমি মরে যাই, তবে এটিই আমার কাফন।' তিনি রোমানদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারাও তাঁর দিকে এগিয়ে এল। যখন তাদের কাছাকাছি এলেন ঘোড়া রেখে পায়ে হাঁটা শুরু করলেন। নিজের চেহারায় ধুলো মাখিয়ে নিলেন। আর কাঁদতে থাকলেন। খুব দুআ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এরপর ঘোড়ায় আরোহণ করে রোমানদের ওপর আক্রমণ করলেন। মুসলিমরাও আক্রমণ শুরু করল। একপর্যায়ে তাঁরা রোমানদের মাঝ বরাবর চলে গেলেন। কিন্তু ধূলিবালি তাঁদের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এটি ছিল একটি ঘূর্ণিঝড়ের মতো। আল্লাহ তাআলা সাহায্য নাজিল করলেন। রোমানরা পরাজিত হলো। মুসলিমদের সামনে ঘাড় অবনত করল। মুসলিমরা সেদিন রোমানদের বিরাট সংখ্যক সেনা হত্যা করে। পুরো মাঠ তাদের লাশে ভরে গেল। ধারণা করা হয়, মৃতের সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম রোমানদের

দশজন করে হত্যা করে সেদিন। রোমসম্রাট আরমানুস ও তার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো।

আরমানুসকে সুলতান আলাব আরসালানের সামনে নিয়ে আসা হলো। সে সুলতানের সামনে দাঁড়াল। সুলতান নিজ হাতে তাকে তিনটি চাবুক মেরে বললেন, 'যদি আমি তোমার হাতে বন্দী হতাম, তবে তুমি কী করতে?' সে বলল, 'সব রকমের মন্দ কাজ করতাম।' সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কী?' সে বলল, 'হয় তোমার দেশে আমাকে বন্দী অবস্থায় ঘুরিয়ে এরপর হত্যা করবে। না হয় ক্ষমা করে মুক্তিপণ চাইবে আর আমাকে ফিরিয়ে দেবে।' আরসালান বললেন, 'আমি ক্ষমা ও মুক্তিপণেরই সংকল্প করেছি।' আরমানুস দেড় মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। এরপর এসে সুলতানের সামনে দাঁড়ায়। তাঁকে পানীয় পান করায়। তাঁর সামনে মাটিতে চুম্বন করে। ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য সুলতান তাকে দশ হাজার দিনার দিয়ে দিলেন। সাথে এক দল খ্রিষ্টান সম্ভ্রান্ত বন্দীকে মুক্তি দিলেন।[৪২২]

- শোনো, এবার আরেকটি উচ্চ মনোবলের কাহিনি। সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন সুলতান ইউসুফ বিন সুলতান আব্দুল মুমিন বিন আলি আল-মাগরিবি আল-মুররাকিশি আজ-জাহিরি। আদফানুশ তাঁকে ভয় দেখিয়ে একটি বার্তা পাঠাল। বার্তাতে সে সুলতানকে অনেক তিরস্কার করল এবং কিছু অঞ্চল তাকে দিয়ে দিতে বলল। সে বলল, 'তুমি নিজেকে নিয়ে দ্বিধায় রয়েছ। এক কদম সামনে বাড়লে আরেক কদম পিছিয়ে যাচ্ছ। আমি জানি না, কাপুরুষতাই তোমাকে পিছিয়ে রেখেছে নাকি তোমার নবির প্রতিশ্রুতি মিথ্যা।' সুলতান এ চিঠি পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। ক্রোধে ফেটে পড়লেন। চিঠিটিকে তিনি টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আর একটি টুকরোয় লিখে দিলেন—

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

....

৪২২. রাসায়িল ইলাশ শাবাব। উসতাজ মাহমুদ শাকির : ১৪৪-১৪৬। দেখুন, মাশারিউল আশওয়াক : ১/৫৫১-৫৫৩।

'তাদের কাছে ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই, আমি অবশ্যই তাদের অপমানিত করে সেখানে থেকে বের করে দেবো আর তারা হবে অপদস্থ।'[৪২৩]

আমার উত্তর তুমি কানে শুনবে না, স্বচক্ষে দেখবে।

وَلَا كُتْبَ إِلَّا الْمَشْرَفِيَّةُ عِنْدَنَا *** وَلَا رُسُلٌ إِلَّا الْخَمِيْسُ الْعَرَمْرَمُ

'কোনো চিঠি নয়, আমাদের কাছে কেবল তলোয়ার। কোনো দূত নয়, শক্তিশালী সেনাবাহিনীই আমাদের জবাব।'

সুলতান মুসলিমদের যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দিলেন। তাঁদের একত্র করলেন। সৈন্যদের সংখ্যা দাঁড়াল এক লাখে। সাথে সমপরিমাণ স্বেচ্ছাসেবক। প্রস্তুতি শেষে স্পেনে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধটি এক বিরাটাকার ধারণ করে। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অবতীর্ণ হয় মুসলিমদের জন্য। বলা হয়, এ যুদ্ধে ষাট হাজার বর্ম গনিমত পায় মুসলিমরা।

ইবনুল আসির ﵀ বলেন, '১ লাখ ৪৬ হাজার শত্রুসেনা নিহত হয় এ যুদ্ধে। আর মুসলিমদের ২০ হাজার জন (শাহাদাত লাভ করেন)।'[৪২৪]

- সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀-এর সাহসিকতা ও উচ্চ মনোবল নিয়ে কাজি শাদ্দাদ লেখেন—

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ব্যাপারে সালাহুদ্দিন ﵀-এর সংকল্প এতই দৃঢ় ছিল যে, কোনো পাহাড়ও সে সংকল্প বহনের উপযুক্ত নয়।... সালাহুদ্দিন সন্তানহারা মায়ের মতো হয়ে গেলেন। সন্তানহারা মা যেমন অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার সাথে তার সন্তানকে খুঁজে ফিরে, ঠিক তেমনই হয়ে গেলেন সালাহুদ্দিন বাইতুল মুকাদ্দাস নিয়ে। একাকী এখানে সেখানে ঘুরতে থাকতেন। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন জিহাদের প্রতি। জায়গায় জায়গায়

....

৪২৩. সুরা আন-নামল : ৩৭

৪২৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১/৩১৮-৩১৯

ফিরতেন আর ডেকে ডেকে বলতেন, 'হায়, ইসলামের সাহায্যে ছুটে এসো!' এ কথা বলতেন আর তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকত।'[৪২৫]

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গমালার দিকে তাকালেন। এরপর কাজি ইবনে শাদ্দাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'আমি কি আমার মনের কিছু কথা বলব তোমাকে?

আল্লাহ তাআলা যখন সমুদ্রের বাকি উপকূলগুলো বিজয় দান করবেন, আমি বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে দেবো; এরপর অসিয়ত করব; বিদায় জানাব সবাইকে; এ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্বীপে দ্বীপে ক্রুসেডারদের খুঁজে বের করব—এভাবে চলতে থাকব, যতদিন না ভূপৃষ্ঠ থেকে সব কাফিরকে নিশ্চিহ্ন করে দিই অথবা আমি মৃত্যুবরণ করি।'[৪২৬]

হিত্তিন বিজয়ের পর এক দরিদ্র ব্যক্তির কাছে সালাহুদ্দিন ﷺ একজন যুদ্ধবন্দীকে জুতোর বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এদের লাঞ্ছিত দেখতে চাই।'

এমনই আরেকটি ঘটনা। হাওরানে এক মুসলিমকে দেখা গেল ৩০ জনেরও বেশি ক্রুসেডারকে তাঁবুর রশি দিয়ে বেঁধে একাই টেনে নিয়ে আসছেন। ক্রুসেডারদের মনে মুসলিমদের দাপট কী রকম কাজ করত! আর বিধর্মীদের ভেতর কতটা নিরাশা ও লাঞ্ছনা ছিল, আল্লাহই ভালো জানেন।

আর এ যুগের মুসলিমদের মনে ওয়াহান বাসা বেঁধেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর একটি ঘটনা ঘটে। এক মুসলিম নামধারী ইরাকি সৈন্য আমেরিকান এক সৈন্যের জুতোয় চুমু খেয়েছে। কতটা অধঃপতন হলে কতটা নিচে নামলে এমন কিছু সম্ভব হতে পারে! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

কাতিব ইমাদ বলেন, 'হিত্তিন যুদ্ধে যে নিহতদের দেখেছে, সে বলেছে, 'এ যুদ্ধে কেউ বন্দী হয়নি। সকলেই মরেছে।' আর যে বন্দীদের দেখেছে, সে বলেছে, 'এ যুদ্ধে কেউ মরেনি, সকলেই বন্দী হয়েছে।'[৪২৭]

....

৪২৫. ড. আব্দুল্লাহ উলওয়ান রচিত সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, পৃষ্ঠা নং ৭২।
৪২৬. ড. আব্দুল্লাহ উলওয়ান রচিত সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, পৃষ্ঠা নং ১৪৫।
৪২৭. মাশারিউল আশওয়াক : ২/৯৩৫

ইসলামের অশ্বারোহী সুরমারি ﷺ-এর উচ্চ মনোবল

ইমাম জাহাবি ﷺ বলেন, 'ইমাম, দুনিয়াবিমুখ সাধক, বিশিষ্ট আবিদ, মুজাহিদ ও ইসলামের অশ্বারোহী আবু ইসহাক রহ।' তিনি 'সিকাহ' পর্যায়ের রাবি ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ছিল দৃষ্টান্তপূর্ণ। এ মহান বীরযোদ্ধার ঘটনাপ্রবাহ মুসলিমদের হৃদয়ে আনন্দের সুর তোলে। ইবরাহিম বিন আফফান বাজ্জাজ বলেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহ বুখারি ﷺ-এর নিকট ছিলাম। সেখানে আবু ইসহাক আস-সুরমারি ﷺ-এর আলোচনা উঠল। তখন আবু আব্দুল্লাহ বললেন, "ইসলামের ইতিহাসে এমন আরেকজন বীর ছিল বলে আমি জানি না।" আমি সেখান থেকে বের হলাম। পথেই অভিযোজিত সেনাপতি আহমাদের সাথে দেখা। তাঁকে আমি বুখারি ﷺ-এর কথাটা বললাম। তিনি রাগান্বিত হয়ে তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, "আপনি কী বলেছেন? শুধু ইসলামের যুগেই নয়। জাহিলি যুগেও তাঁর মতো কোনো বীর দেখা যায়নি।"'

আহমাদ বিন ইসহাক ﷺ বলেন :

'একজন কমান্ডারের জন্য দশটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার : ১. সিংহহৃদয়ের অধিকারী হবেন, কাপুরুষতা দেখাবেন না। ২. বড়ত্বের দিক থেকে বাঘের মতো হবেন, নমনীয় হবেন না। ৩. বীরত্বের দিক থেকে ভালুকের মতো হবেন, সকল অঙ্গ দিয়ে হত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ৪. আক্রমণের দিক থেকে শূকরের মতো হবেন, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন না। ৫. আকস্মিক আক্রমণের দিক থেকে নেকড়ের মতো হবেন, একদিক থেকে আক্রমণ করে উদ্দেশ্য পূরণ না হলে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করবেন। ৬. অস্ত্রধারণে পিপীলিকার মতো হবেন, নিজের ওজনের চেয়ে বেশি অস্ত্র বহন করবেন। ৭. অবিচলতার দিক থেকে পাথরের মতো হবেন। ৮. ধৈর্যের দিক থেকে হবেন গাধার মতো। ৯. দুঃসাহকিতার দিক থেকে হবেন কুকুরের মতো, শিকার যদি আগুনে প্রবেশ করে—তবে সেও আগুনে প্রবেশ করবে শিকারের পেছনে। ১০. সুযোগ সন্ধানে হবেন মোরগের মতো।'

ইবরাহিম বিন শিমাস ﷺ বলেন, 'আমার ও আহমাদ বিন ইসহাক সুরমারির মাঝে পত্র বিনিময় হতো। একবার তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, "তুমি যখন

বন্দী ক্রয়ের জন্য কোনো যুদ্ধকবলিত ভূমিতে যাবে আমাকে জানাবে।" আমি তা-ই করলাম। লিখে জানালাম। তিনি সমরকন্দে আসলেন। আমরা একসঙ্গে বের হলাম গন্তব্যপানে। কাফিরদের সেনাপতি জাইগাওয়াইহ আমাদের আগমনের খবর জানতে পেরে তার কিছু সভাসদ নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল। আমরা তার কাছেই অবস্থান গ্রহণ করলাম। একদিন তার সেনাদের প্রদর্শনী দেখাল আমাদের। এক লোক তখন জাইগাওয়াইহ-র পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার বড়ত্ব বর্ণনা করতে থাকল। আর জাইগাওয়াইহ তাকে হাদিয়া-উপহার দিতে লাগল। তখন জাইগাওয়াইহ আমার কাছে সুরমারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, "তিনি হলেন বিশিষ্ট যোদ্ধা। এক হাজার অশ্বারোহীর সমান।" সে বলল, "আমি তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।" আমি চুপ করে থাকলাম। জাইগাওয়াইহ বলল, "সে কী বলেছে?" আমি বললাম, "তিনি এই এই বলেছেন।" জাইগাওয়াইহ বলল, "হয়তো সে মাতাল, কোনো বোধশক্তি নেই। তবে আমরা আগামীকাল রওয়ানা দেবো।"

পরের দিন সুরমারি ﷺ ঘোড়ায় চেপে বসলেন। তাঁর জামার আস্তিনে ছিল একটি লৌহদণ্ড। প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। প্রতিদ্বন্দ্বী লোকটি তাকে আক্রমণের ইচ্ছা করলে সরে যেতে লাগলেন। অবশেষে লোকটিকে নিজ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। এরপর তার ওপর আক্রমণ করলেন এবং নিজের লৌহদণ্ড দ্বারা তাকে আঘাত করে হত্যা করলেন। লোকটা সেখানেই মারা গেল। ইবরাহিম বিন শিমাস তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে তাঁর নাগাল পেলেন। জাইগাওয়াইহ বিষয়টি জানতে পারল। তাই সুরমারির খোঁজে ৫০ জনের বিশেষ অশ্বারোহীদল পাঠাল। তারা যখন সুরমারির কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি একটি টিলায় আত্মগোপন করলেন। এক এক করে সবাই টিলাটি অতিক্রম করে চলে গেল। তিনি তাদের একদম পেছনের লোকটির ওপর লৌহদণ্ডটি দিয়ে আঘাত হানলেন। এভাবে তিনি ৪৯ জনকে হত্যা করলেন। একজনকে জীবিত বন্দী করলেন। তার নাক ও উভয় কান কেটে ছেড়ে দিলেন। যাতে সে এসে সংবাদ নিয়ে যেতে পারে।

দুবছর পরের কথা। আহমাদ সুরমারি ইনতিকাল করেন। এ সময়ে ইবনে শিমাস একবার বন্দী বিক্রির জন্য সে বাজারে গেলেন। তখন জাইগাওয়াইহ তাকে জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটি আমাদের অশ্ববাহিনীকে হত্যা করল,

সে কে?" তিনি বললেন, "উনি হলেন আহমাদ সুরমারি।" সে বলল, "তুমি কেন তাকে তোমার সাথে নিয়ে এলে না?" আমি বললাম, "তিনি ইনতিকাল করেছেন।" এ কথা শুনে সে নিজের চেহারায় আঘাত করে বলল, "যদি তুমি আমাকে জানাতে সে-ই আহমাদ সুরমারি। তবে আমি তাকে পাঁচশ বারজুন (একপ্রকার ভালুক) এবং দশ হাজার ছাগল উপহার দিতাম।"'

উবাইদুল্লাহ বিন ওয়াসিল বলেন, 'আমি আহমাদ বিন সুরমারিকে নিজ তরবারি হাতে নিয়ে বলতে শুনেছি, "আমি নিশ্চিত এ তরবারির আঘাতে এক হাজার তুর্কিকে হত্যা করেছি। বেঁচে থাকলে আরও এক হাজার হত্যা করব। যদি বিদআতের আশঙ্কা না করতাম, তবে এ তরবারি আমার সাথে কবরস্থ করার আদেশ দিতাম।"'

কাতিব মাহমুদ বিন সাহল বলেন, 'কোনো এক যুদ্ধে তারা একটি দুর্গ অবরোধ করলেন। শত্রুসেনার কমান্ডার শামিয়ানার নিচে বসা ছিল। শামিয়ানার ছাদটি ছিল অনেক প্রশস্ত এবং উঁচু। সুরমারি একটি তির নিক্ষেপ করলেন। তিরটি শামিয়ানায় গিয়ে বিদ্ধ হলো। শত্রু-কমান্ডার ইশারায় সেটি খুলে বের করতে বলল। তখন সুরমারি ﵀ দ্বিতীয় আরেকটি তির নিক্ষেপ করলে তা গিয়ে কমান্ডারের হাতে বিদ্ধ হলো। কাফিররা তিরটা খোলার জন্য ছুটে এল। এমন সময় সুরমারি তৃতীয় তিরটি নিক্ষেপ করলেন। এ তিরটি সোজা গিয়ে শত্রু কমান্ডারের গলায় বিদ্ধ হলো। শত্রুরা পরাজিত হলো। মুসলিমদের বিজয় হলো।'[৪২৮]

ইমরান বিন মুহাম্মাদ মুতাউয়ি ﵀ বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, সুরমারি ﵀-এর লৌহদণ্ডটি ছিল ৩৬ রিতল (প্রায় ১৬ কেজি)। যৌবন শেষ হয়ে এলে তিনি লৌহদণ্ডটিকে ২৪ রিতলে (প্রায় ১১ কেজিতে) কমিয়ে আনেন। এটি যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতেন তিনি।'[৪২৯]

....

৪২৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৩/৩৭-৪০

৪২৯. মাশারিউল আশওয়াক : ২/১০০৮

লুলু আল-আদিলি ﵀-এর উচ্চ মনোবল

ইমাম জাহাবি ﵀ তাঁর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'-তে বলেন :

'আল-হাজিব। ইসলামের বীরদের অন্যতম তিনি। তুর্কি ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে তিনি প্রশংসিত হন। এরা মদিনাতুত তাইবিয়া দখল করার জন্য একটি অভিযানে বের হয়। অথবা অন্য ফিরিঙ্গিদের সাথে লড়াইয়ের কারণে লুলু আদিলি প্রশংসিত—যারা বাহরুল মালিহ দিয়ে যাত্রা করছিল একটি অভিযানে। লুলু আদিলি এদের ব্যাপারে জানতে পেরে তাদের বন্দী করার সরঞ্জাম নিয়ে বের হলেন। (মদিনার পশ্চিমে ৯০ কিলো দূরে অবস্থিত) ফাহলাতাইনে তাদের পাকড়াও করেন। তাদের ঘিরে ফেলেন তিনি। ফিরিঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করে। তিনিও তাদের বন্দী করে নেন। তারা ছিল তিনশরও অধিক। তিনি তাদের কায়রোতে নিয়ে এলেন। সেদিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন।'[৪৩০]

- শোনো এক মুজাহিদের কথা, যিনি ভারী ভারী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উচ্চ মনোবল অনুযায়ী সামনে অগ্রসর হন। মাওলার কাছে তাঁর প্রার্থনা থাকে—

'হে আমার রব, আমায় তুমি এমন মৃত্যু দিয়ো না, যে মৃত্যুর পর আমাকে খাটিয়াতে তোলা হবে। এমন মৃত্যু নয়, যে মৃত্যুর পর মানুষের হাতের ওপর করে আমার দেহ কবরে নামানো হবে। বরং আমার দেহকে তুমি শকুন-চিলের উদরে কবর দিয়ো। যেন মৃত্যুর পর মাটিতে দাফন না হই। মৃত্যুর পর যেন আমার আত্মার মতো আমার দেহও আকাশের সাথে মিতালি গড়তে পারে।[৪৩১]
শহিদ হয়ে সন্ধ্যাবেলায় আমি আবাস গড়ব তাদের মাঝে, যারা অপূর্ব শান্তিময় জীবন কাটাচ্ছেন শহিদ হয়ে। তারা বাগদাদের সেসব অশ্বারোহী, যাদের

৪৩০. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১/৩৮৪

৪৩১. এ মুজাহিদের মনোভাব হচ্ছে, কেবল তার রুহ উর্ধ্বজগতে উঠে যাবে, সেটা যথেষ্ট নয়। তার প্রার্থনা হচ্ছে, যেন তার শরীরও উর্ধ্বজগৎপানে যাত্রা করতে পারে। যাতে কাফিররা তার শরীরের নাগাল না পায়, কেননা, সে তো চিল-শকুনের পেটে থাকবে, আর কাফিররা তাদের নাগাল পাবে কী করে! তারা তো আকাশে থাকবে। এভাবে এ মুজাহিদ মৃত্যুর পরও কাফিরদের সাথে তার বৈরী আচরণ বজায় রাখতে চান, যেমন তিনি বজায় রেখেছিলেন জীবিত অবস্থায়।

মাঝে আল্লাহর ভয় সম্প্রীতি গড়েছে। যারা যুদ্ধের ময়দানের সেরা বীর। তারা যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, তখন সব দুঃখ-কষ্টকে বিদায় জানিয়ে সে স্থানে পাড়ি জমিয়েছে, যার ওয়াদা এসেছে কুরআনুল কারিমে—জান্নাত।'

- আহমাদ বিন ইবরাহিম বলেন, 'ইউনুস ﷺ মৃত্যুর সময় পায়ের দিকে তাকিয়ে কেঁদে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি কাঁদছেন যে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার পা আল্লাহর রাস্তায় ধুলোয় ধুসরিত হলো না!"'

- এই তো ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ। যিনি একাকিত্বে ইবাদতে মগ্ন আর জিহাদকে প্রাধান্য দানকারীর তুলনামূলক আলোচনা করে কবিতায় বলেন :

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا *** لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِيْ الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوْعِهِ *** فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

أَوْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهُ فِيْ بَاطِلٍ *** فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الْكَرِيْهَةِ تَتْعَبُ

رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا * رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ

وَلَقَدْ أَتَانَا عَنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا *** قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ

لَا يَسْتَوِيْ غُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِيْ *** أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ

هَذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا ** لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ

'ওহে হারামাইনের ইবাদতকারী, যদি তুমি একবার দেখতে আমাদের, তবে বুঝতে, ইবাদতের বালখিল্যতায় ডুবে আছ তুমি। সে তো সিক্ত করছে তার গণ্ডদেশ লোনা অশ্রুজলে, এদিকে আমাদের গলদেশ রঞ্জিত হচ্ছে আমাদেরই তপ্ত খুনে। অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে যদি ক্লান্ত হয় তাদের অশ্ব, আমরা হাঁকিয়েছি আমাদের ঘোড়া লড়াইয়ের ময়দানে। তোমরা মাখছ আতর-গোলাব তোমাদের শরীরে; আমাদের দেহ সুরভিত হয় ময়দানের পবিত্র ধূলিতে—অশ্বখুরের কঠিন আঘাতে যা নিয়ত উড়ে আসে। প্রিয় নবির অমীয় বাণী এসেছে আমাদের কাছে—সংশয় বা সন্দেহের লেশমাত্র নেই যেখানে।

কখনো লাগবে না জাহান্নামের লেলিহান শিখা আমাদের নাসিকায় জমে ওঠা ধূলোর আস্তরণে। আর পরম সত্যবাদী কুরআন আমাদের নিয়ত বলে, শহিদেরা মরে না কখনো, শাহাদাতের সুধা পিয়ে বেঁচে ওঠে চিরতরে।'

- ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলি বিন হাজম আন্দালুসি ﷬ বলেন :

مُنَايَ مِنَ الدُّنْيَا عُـــلُومٌ أَبُثُّهَا *** وَأَنْشُرُهَا فِي كُلِّ بَادٍ وَحَــاضِرِ

دُعَاءٌ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ الَّتِي ** تَنَاسَى رِجَالٌ ذِكْرَهَا فِي الْمَحَاضِرِ

وَأَلْزَمُ أَطْرَافَ الثُّغُورِ مُجَاهِدًا *** إِذَا هَيْـــعَةٌ ثَارَتْ فَأَوَّلُ نَــافِرِ

لِأَلْقَى حِمَامِي مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ *** بِسُمْرِ الْعَوَالِي وَالدِّقَاقِ الْبَوَاتِرِ

كِفَاحًا مَعَ الْكُفَّارِ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى ** وَأَكْرَمُ مَوْتٍ لِلْفَتَى قَتْلُ كَافِرِ

فَيَا رَبِّ لَا تَجْعَلْ حِمَامِي بِغَيْرِهَا *** وَلَا تَجْعَلَنِّي مِنْ قَطِينِ الْمَقَابِرِ

'আমার লক্ষ্য এ দুনিয়ার গ্রাম-শহরের প্রতি প্রান্তে পৌঁছে দেবো ইলমের আলো, ছড়িয়ে দেবো ইলম। কুরআনের দিকে ডাকা এবং সুন্নাহর দিকে আহ্বানের কথা অনেকেই ভুলে গেছে। যখন ভীতি ছড়িয়ে পড়বে নগরে আমিই প্রথম বের হব। মুজাহিদ হয়ে পাহারা দেবো সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি। পিছিয়ে গিয়ে নয়; বরং সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়ে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব। মজবুত ঢাল হাতে, হাতে নিয়ে ধারালো তলোয়ার লড়ে যাব কাফিরদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড লড়াই। একজন যুবকের জন্য জিহাদের ময়দানে শহিদ হওয়াই সবচেয়ে সম্মানের মৃত্যু। হে আমার রব, আমার মৃত্যু যেন রণাঙ্গনেই হয়। আমাকে তুমি কবরের বাসিন্দা বানিয়ো না, হে প্রভু।'

- মহান ইমাম আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জাজি আল-মালিকি ﷬ (৭৪১ হি.) মৃত্যুর পূর্বে বলেন :

قَصْدِيَ الْمُؤَمَّلُ فِيْ جَهْرِيْ وَإِسْرَارِيْ * وَمَطْلَبِيْ مِنْ إِلَهِيْ الْوَاحِدِ الْبَارِيْ

شَهَادَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَالِصَةً *** تَمْحُوْ ذُنُوْبِيْ وَتُنْجِيْنِيْ مِنَ النَّارِ

إِنَّ الْمَعَاصِيَ رِجْسٌ لَا يُطَهِّرُهَا *** إِلَّا الصَّوَارِمُ فِيْ أَيْمَانِ كُفَّارِ

'আমার ভেতরে-বাহিরে এই একটি প্রত্যাশাই গুঞ্জরিত হয়; আল্লাহর কাছে আমার এই একটিই প্রার্থনা, হে আমার রব, আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাত দান করুন—যা আমার সব পাপ মুছে দেবে, আমাকে মুক্তি দেবে জাহান্নামের আগুন থেকে। গুনাহ এমন এক নাপাকি, যা কেবল কাফিরের হাতের তরবারিই পাক করতে পারে।'

কবিতাগুলো আবৃত্তি করার পর তিনি বলেন, 'আমি এ কবিতায় যে জিনিসের প্রার্থনা করেছি, আল্লাহ তা দান করবেন বলে আশা করি।' বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। আল্লাহ তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। সেদিনই তিনি তারিফ নামক স্থানে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে নিহত হন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন। শাহাদাতের উন্নত মর্যাদা দান করুন।

بَرِئَ الْإِسْلَامُ مِنْ شَاكٍّ مَضِيْمٍ *** لَا يَرَاهُ غَيْرَ صَوْمٍ وَّصَلَاةْ

ذُرْوَةُ الدِّيْنِ جِهَادٌ فِيْ الصَّمِيْمِ *** فَلْنُجَاهِدْ أَوْ لِتَلْفِظْنَا الْحَيَاه

'সংশয়গ্রস্ত সেই মজলুমের সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক, যে কেবল নামাজ-রোজাকেই মনে করে ইসলাম। দ্বীনের সুউচ্চ চূড়া হলো জিহাদ। আমরা হয় জিহাদ করব, নয়তো জীবন আমাদের ঝেড়ে ফেলবে। আমাদের বয়ে বেড়াতে হবে লাঞ্ছনা আর অপমান।'

অন্য একজন বলেন :

إِنَّ نَفْسًا تَرْتَضِيْ الْإِسْـــلَامَ دِيْـنًـــا

ثُمَّ تَرْضَـى بَعْـدَهُ أَنْ تَسْـــتَكِـيْنَـــا

أَوَ تَرَى الْإِسْـــلَامَ فِيْ أَرْضٍ مُهِـــيْنَا

ثُمَّ تَهْوِيْ الْعَيْشَ نَفْسٌ لَنْ تَكُوْنَا

فِيْ عِدَادِ الْمُسْلِمِيْنَ الْعُظَمَاء

'কোনো অন্তর ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট হওয়ার পর কি আরামে বসে থাকতে পারে? পৃথিবীতে ইসলামকে অপদস্থ হতে দেখেও কি সে সুখ ও বিলাসিতার দিকে ছুটতে পারে? এমন লোক কখনো মর্যাদাবান মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।'

উম্মাহর বীর-বাহাদুরদের সংখ্যা গুনে শেষ করার মতো নয়। উম্মাহর ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহাদুরদের সংখ্যাও অগণিত। তাদের আলোচনা করতে বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন। যা আলোচনায় এল, তা-ই যথেষ্ট হবে—যদি আমরা শিক্ষা নিতে চাই। যিনি এর চেয়েও বেশি জানতে চান, তিনি যেন যুদ্ধসংক্রান্ত রচনা ও ইতিহাসের বইপত্র অধ্যয়ন করেন। জিহাদের ময়দানে মুসলিমদের উচ্চ মনোবলের অসংখ্য কারনামা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন তিনি।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

'এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান, তাকে দান করেন। আর আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহশীল।'[৪৩২]

৪৩২. সুরা আল-জুমুআ : ৪

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোবলশূন্য উম্মাহর অবস্থা

মনোবলশূন্যতা ও হিম্মতের অধঃপতনের অনিবার্য ফল লাঞ্ছনা, অপদস্থতা। বর্তমানে আমাদের উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়া রোগগুলোর মূল এ হীনম্মন্যতা ও মনোবলশূন্যতা। মনোবলহীনতা উম্মাহর মাঝে বীরপুরুষের আকাল ঘটিয়েছে ব্যাপক ও ভয়ংকর আকারে। মনোবলহীনতা নিষ্প্রাণ স্বভাব, অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ, পরনির্ভরতা, অলসতা, পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকারের মতো ভয়ানক সব রোগের জন্ম দিয়েছে।

- অতীত ইতিহাসের একটি চিত্র দেখে আসি। এক তাতার সৈনিক মনোবলহীন এক মুসলিমকে বসে থাকার আদেশ করল। তাতার সৈন্যটির মনে জিঘাংসা। হত্যার জন্য পাথর নিয়ে আসলো সে। আর মুসলিম এটি মেনে নিল। তাতারি নিজের জিঘাংসা মেটানোর আগ পর্যন্ত সেখান থেকে সে একটুও সরল না। এতটাই মনোবলহীন হয়ে পড়েছিল সে মুসলিম। বর্তমান যুগেও এমন চিত্র দেখি আমরা। ইরাকি এক সেনা কীভাবে আমেরিকান সেনার জুতোর কাছে বসে। জুতো মোছা শুরু করে। এরপর চুমু খেতে থাকে। তার কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। তখন আরেকজন আমেরিকান এসে ইরাকির কাঁধে হাত রেখে লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে, 'ভয় পেও না, তোমার কোনো অসুবিধা নেই!'

- আমরা দেখেছি, ইমাম ইবনে খালদুন নিজ যুগের মনোবলহারা মুসলিমদের কাফিরদের সাথে তুলনা করেছেন। এ হীনম্মন্যতাকেই স্পেন হারানোর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। তিনি বলেন :

'এ কারণেই তুমি সব সময় পরাজিত ব্যক্তিকে পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা ও অস্ত্রধারণে বিজয়ী ব্যক্তির সাদৃশ্য অবলম্বন করতে দেখবে, তার অনুকরণ করতে দেখবে। বরং শুধু এ বিষয়গুলোতেই নয়, অন্য সব ক্ষেত্রেই পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ী ব্যক্তির সাদৃশ্য গ্রহণ করে। বিষয়টি তুমি পিতার সন্তানদের প্রতি লক্ষ করলেও দেখতে পাবে। কেন সন্তানরা পিতার সাদৃশ্য গ্রহণ করে? কারণ সন্তান নিজের বাপ-দাদাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে। এমনকি পাশাপাশি বসবাসরত দুটি জাতির মধ্যে যে জাতি বিজয় ও দাপটের অধিকারী,

পরাজিত জাতি সে জাতির অনুসরণ ও অনুকরণ শুরু করে বিরাটাকারে। যেমন : স্পেন। স্পেনের মুসলিমদের গ্যালিসিয়ান খ্রিষ্টানদের অনুসরণ। তুমি দেখবে, মুসলিমরা পোশাক-পরিচ্ছদ, চিহ্ন-প্রতীক, আয়-উপার্জনসহ গ্যালিসিয়ানদের অনেক কিছুর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ শুরু করবে। এমনকি দেয়ালে দেয়ালে হরেক রকম প্রতিকৃতি আঁকা, কলকারখানা ও বাড়িঘরের নকশার ক্ষেত্রেও তাদের অনুকরণ করবে। এ থেকে একজন গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, মুসলিমদের ওপর শত্রুদের প্রভাব বিস্তারের নিদর্শন এটি। বস্তুত সকল বিষয় আল্লাহ তাআলারই হাতে।'[৪৩৩]

ইবনে খালদুন ﷺ যে আশঙ্কা করেছিলেন, তা-ই ঘটেছিল। ইসলামি স্পেনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিল ফ্রান্স। ইবনে খালদুনের এ লাইনগুলো লেখার দুইশ বছর পর মুসলিমরা স্পেন ছাড়তে বাধ্য হলো।

বর্তমান যুগে আমরা এমন কিছু যুবককে দেখছি, যারা ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ঠিক, কিন্তু তাদের মনোবল একেবারেই ক্ষীণ। তারা তুচ্ছ, হীন ও নিম্ন বিষয়ে ব্যস্ত করে রাখছে নিজেদের। কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণে তারা খুবই উৎসুক। চোখ বন্ধ করে কাফিরদের অনুসরণ করে। অনেকে তো বাড়াবাড়ির সীমাটাও লঙ্ঘন করে ফেলে। শুধু এতটুকুই নয়। হীনম্মন্যতা তাদের এতই ভয়ংকরভাবে গ্রাস করেছে যে, নিজেদের গাড়ি ও নিজেদের বুকের ওপর তারা সেসব রাষ্ট্রের নিদর্শন ঝুলিয়ে রাখে, যেসব রাষ্ট্র তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে, তাদের গর্দানকে অবনত করেছে, ধূলিসাৎ করেছে তাদের সম্মান-প্রতিপত্তি, আর উম্মাহকে করেছে দাসে পরিণত।

অপরদিকে আমরা কিছু লোককে দেখছি, যারা উম্মাহকে দাসে পরিণত করে উম্মাহর শত্রুদের আনুগত্যকে বৈধতা ঘোষণা দিচ্ছে। তাদের দলিল হলো, 'যতদিন আমরা নিজেরা স্বাবলম্বী না হতে পারছি, ততদিন আমরা বিজয় ও স্বাধীনতার চিন্তাও করতে পারব না!' অথবা আমরা যে অধঃপতনে রয়েছি, 'তার জন্য দায়ী আমাদের পূর্বপুরুষরা আর এ অবস্থা থেকে সংশোধনকারী আমাদের উত্তরসূরিরা! এখানে আমাদের কোনো কিছু করার নেই!' যুক্তি ও প্রমাণের বহর দেখলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হয়।

....

৪৩৩. মুকাদ্দামাতু ইবনি খালদুন, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নং ১৪৭।

আমরা এমন এক যুগে আছি, যে যুগে খিয়ানত-বিশ্বাসঘাতকতাকে কোনো দোষ মনে করা হয় না যে, এটা গোপন রাখতে হবে। বরং এ যুগে খিয়ানতকে বিশেষ মর্যাদার কাজ বলে গণ্য করে মানুষেরা। তাই সবাই এমনটা প্রকাশ্যেই করে। নিজের দ্বীন ও উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এক বিশেষ কাঙ্ক্ষিত কর্ম বলে পরিগণিত হচ্ছে আমার জাতি ভাইদের কাছে! বিশ্বাসঘাতকতা এ যুগে এক গৌরবময় কর্মে পরিণত হয়েছে!

উসতাজ মুহাম্মাদ আহমাদ রশিদ ﷺ মনোবলহীনতার এ যুগে মুসলিমদের কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতির ব্যাপারে বলেন :

'মুসলিমদের ওপর ভয়ানক এক বিপদ হচ্ছে, তাদের ঘাড়ের ওপর পথভ্রষ্ট নেতাদের চেপে বসা। বিপদ এতটুকুতেই থেমে নেই। বরং বিপদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র—ইসলামি মূল্যবোধ ও মুসলিমদের চিন্তাশক্তি বিনষ্ট করতে শিক্ষা-সিলেবাসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে, সংবাদপত্র ও প্রচার মিডিয়ার পরিচালকদের মাঝে ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে গেছে যে, শিকার নিজেই ফাঁদে পা দিচ্ছে আনন্দের সাথে! শিকার মনে করছে, পুরোনো এসব ধ্যানধারণা ছুড়ে ফেলে সে মুক্ত হচ্ছে!

বর্তমানের পাপী মুসলিমরা পৃথিবীতে বিদ্যমান এক নষ্ট শিক্ষাপ্রক্রিয়ার দ্বারা জর্জরিত। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রথমে তাদের মাঝে অবাধ্যতা তৈরি করে। পরিশেষে তাগুতরা তাদের বোকা বানায় এর মাধ্যমে। এ ষড়যন্ত্রটি বহু পুরোনো। তাগুতি পরম্পরায় এ ষড়যন্ত্র বর্তমান তাগুত পর্যন্ত পৌঁছেছে। এক তাগুত তার পূর্বের তাগুত থেকে গ্রহণ করেছে। এভাবে এ ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে ফিরআওন। ব্যাপারটি ঠিক তেমন, যেমন আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন—

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

'এরপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।'[৪৩৪]

---

৪৩৪. সুরা আজ-জুখরুফ : ৫৪

ইতিহাসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এটিই। যদি জনগণ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অবাধ্য না হতো, তবে ফিরআওন তাদের বোকা বানাতে সক্ষম হতো না। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুমিনকে তাগুত বোকা বানাতে পারে না। আর কোনো মুমিনের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব যে, সে তাগুতের আদেশ মানবে।'[৪৩৫]

তাগুতরা ফিরআওনের প্রয়োগকৃত সে ষড়যন্ত্র প্রয়োগ করল। তারা পরস্পরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপদেশ দিতে লাগল। তারা পরিকল্পিতভাবে 'সমাজ-ভাঙনে নেমে পড়ল। সমাজকে এমন এক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিল, যেখানে সবাই কলঙ্কিত হবে জন্মসূত্রে, যেখানে সবাই পাপ ও অশ্লীলতায় ডুবে থাকবে। যেখানে মানুষ কেবল খাওয়ার জন্য বাঁচবে, খাবার জোগানোর জন্য কষ্ট-পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করে যাবে। মানুষের জীবনে উন্নত হওয়ার কোনো কামনা-বাসনা থাকবে না। মানুষের মাঝে সুস্থতা ও চেতনা থাকবে না। মানুষের জীবন হবে কেবল খাওয়া ও যৌনতা ভোগ করার জন্য। মানুষ হিদায়াতের বাণী শোনার জন্য উৎসুক হবে না। উৎসুক হবে না দ্বীনের দিকে ফিরে আসার জন্য।'[৪৩৬] এটিই তাদের রাজনীতি হয়ে গেল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অব্যর্থ কৌশলে রূপ নিল। এ রাজনীতিই তারা ব্যবহার করল। 'মসজিদের বিরুদ্ধে ড্যান্স ক্লাব দিয়ে যুদ্ধ করার রাজনীতি। পবিত্রা স্ত্রীদের বিরুদ্ধে নষ্টা নারীদের দিয়ে যুদ্ধ করার রাজনীতি। রাজনীতি মুক্তচিন্তার বুলি আওড়ানো বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে আকিদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। রাজনীতি মোহ ও ভোগের শাস্ত্রাদির মাধ্যমে শক্তি ও জ্ঞানের শাস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার।[৪৩৭]

এভাবেই কুশিক্ষার এ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামি বাজপাখিকে তারা রূপান্তর করল তিতির পাখিতে, যে পাখিকে শিকার করে খাওয়া হয়। যেমন কবি ইকবাল বলেন, এ ব্যবস্থা হলো পোষ মানানোর সিস্টেম। পথভ্রষ্টদের নেতারা এটাই ব্যবহার করেছে মুসলিমদের ওপর। যে সিংহ ছিল বনের রাজা, বড় বড় প্রাণী শিকার করত যে—সে সিংহের বাচ্চাকেই মানুষ ভুলিয়েভালিয়ে, পোষ মানিয়ে সার্কাসের খেলা দেখায়। মুসলিমরা একসময় রাজা ছিল, পৃথিবীর মুকুট ছিল তাদের হাতে। কিন্তু আজ বনের রাজা সিংহের চাইতে তাদের বেশি মিল

....

৪৩৫. ফি জিলালিল কুরআন : ৯/৪৫

৪৩৬. ফি জিলালিল কুরআন : ৯/১২২

৪৩৭. রাফিয়ি ﷺ রচিত ওয়াহইউল কলাম : ২/২৮৫

হচ্ছে সার্কাসের পোষমানা শান্তিতে শয়ান সে সিংহের সাথে—যে না গর্জন করে, না শিকার করে, না একটু নড়েচড়ে।

يَسْلُبُ السَّرْوَ جَمِيْلَ الْمَـيْلِ *** وَيَرُدُّ الصَّقْرَ مِثْلَ الْحَـجَلِ

يُسَخِّرُ الرُّكْبَانَ بِاللَّحْنِ الْمُبِيْنِ * وَلِقَاعِ الْبَحْرِ يَهْوِيْ بِالسَّفِيْنِ

نَوَّمَتْ أَلْحَانُهُ يَقْـظَتَـنَا *** أَطْفَأَتْ أَنْفَاسُـهُ وَقْدَتَـنَا

'মনোহর দেবদারু বৃক্ষের সৌন্দর্য তারা হরণ করেছে। শিকারী বাজকে পরিণত করেছে নিরীহ তিতিরে। দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারকে বশীভূত করেছে সুরেলা গানে। সমুদ্রের গভীরে তারা যাত্রা করতে চায় নৌকায় চেপে। এই সুর কেড়ে নিয়েছে আমাদের চেতনা, নিভিয়ে দিয়েছে আমাদের হৃদয়ের জ্বলন্ত অঙ্গারকে।'

أُشْرِبُ النَّاسُ الذُّلَّ—মানুষকে লাঞ্ছনাপ্রীতি পান করানো হয়েছে। তাদের মনের ভেতর লাঞ্ছনা বসত গেড়েছে।

'লাঞ্ছনাময় জীবন মানুষের ফিতরাত নয়। মানুষের ফিতরাত হলো, লাঞ্ছনা থেকে দূরে থাকা। মানুষের ফিতরাত হলো, অন্যায়ের বিরোধিতা করা। কিন্তু বর্তমানে মানুষকে বেষ্টন করে রেখেছে দুর্গতি। একের পর এক দুর্যোগ নেমে আসে। ফলে তারা ধীরে ধীরে একসময় নতি শিকারে সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, লাঞ্ছনার সামনে অবনত হয়ে যায়। সময়ের পরিবর্তনে এগুলোতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। যেমন শিকারি প্রাণী পোষ মেনে নিরীহ হয়ে যায়।

কিন্তু শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে সম্মানের ছিটেফোঁটা হলেও অবশিষ্ট থাকে। একটু হলেও রক্ত গরম থাকে। তাই যখন কোনো দায়ি সম্মানের পথে ডাকে, স্বাধীনতার ঘোষণা শোনায়, জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির মাঝে চেতনা আনে, ইবাদতের অনুভূতিতে নাড়া দেয়—তখন হৃদয়ে তার আত্মমর্যাদার একটু ঝলক খেলে যায়, এতদিনের হীমশীতল রক্তে আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে, এতদিনে মানুষটির মাঝে মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে; যেন নতুন করে জন্ম হয় তার, অন্যায়-জুলুম-অবিচার মানতে সে অস্বীকার করে, প্রতিরোধ করে বিরোধী শক্তিকে, প্রতিটি বস্তু ও কাজকে ইবাদতের সামনে তুচ্ছ মনে

করে এবং পশুত্বকে ছুড়ে ফেলে ইবাদতকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে।

মানুষ অন্যের মাধ্যমে বা বহিরাগত কোনো কারণে যত লাঞ্ছনার শিকার হয়, এসব লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির আশা করা যায়, এসব লাঞ্ছনার মূলোৎপাটন সহজ। কিন্তু লাঞ্ছনা যদি কারও ভেতর থেকে উদ্ভূত হয়, কারও হৃদয় থেকে যদি তা উত্থিত হয়, তবে সেটা দুরারোগ্য ব্যাধি ও গোপন মরণব্যাধি; এমন লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির আশা করা দুরূহ।[৪৩৮]

এ জন্যই সাম্রাজ্যবাদী তাগুতরা নিকৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা, লাঞ্ছনাকর সংস্কৃতি, নবউদ্ভাবিত বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে মানুষের ভেতরটা, মানুষের অন্তরাত্মা বিনষ্ট করে দেয়। অপচেষ্টা চালিয়ে যায়, যাতে মানুষের ভেতরের হিম্মত মরে যায়। যেন তারা মনোবলহীন ও হীনম্মন্য হয়ে পড়ে। তাদের মুক্তির আগুন নিভিয়ে দেয় তারা। তারা এসব পারে, এসব করতে তারা সমর্থ; কারণ, তাদের হাতেই তো শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ।'[৪৩৯]

ইসলামের প্রকৃত দায়িদের পথ সংকীর্ণ করে দিয়ে তাগুতের এ পোষ মানানো নীতি ষোলোকলা পূর্ণ হয়। তাগুত ইসলামের প্রকৃত দায়িদের আটকে দিয়ে ষড়যন্ত্র ও ছলনায় ভরা কুশিক্ষা ও কুসংস্কৃতি ছড়ানোর জন্য ইলম ও হিকমাহর দাবিদার কিছু কীটপতঙ্গকে এককভাবে দাপিয়ে বেড়াবার সুযোগ করে দেয়। যারা বিভিন্ন সংগঠনের নামের আড়ালে নিজেদের গোপন কাজ করে যায়, বাস্তবায়ন করে যায় বাতিলের এজেন্ডা। এসব সংগঠন ওপরে একরকম ভেতরে

---

৪৩৮. এখানে একটা কথা না বললেই নয়। মানুষ যখন কারও জবরদস্তি, কারও অপমানের মুখে পড়ে বা প্রকাশ্য কোনো কারণে লাঞ্ছিত হয়—তখন তা থেকে উত্তরণ সহজ। কিন্তু আসল সমস্যাটা কোন জায়গায়, সে বিষয়ে মালিক বিন নাবি ﷺ বলেন, 'উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হলো, যে জাতির ওপর উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস আপতিত হয়েছে, সে জাতি এটা গ্রহণ করে নেওয়া, লাঞ্ছনাকে কবুল করে নেওয়া। যে নিজ থেকেই লাঞ্ছনা-বঞ্চনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এসবে সন্তুষ্ট, এসবের মধ্যে থেকে সুখানুভব করে—সে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হবে না তো আর কে হবে!

মানুষের মুখ থেকে কখনো সখনো এমন তুলনার কথাও শোনা যায় যে, "রুশ সাম্রাজ্যবাদ উত্তম নাকি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ উত্তম?!" কোন জাতি উত্তম, ইহুদি না ওই জাতি?! এমন তুলনার কথাও মুখে আনার মতো! কতটা অধঃপতন গ্রাস করলে এমন প্রশ্ন তোলা যায়! লাঞ্ছনা অন্তরের কতটা গভীরে গেড়ে বসলে এমন কোনো কিছু মুখে আনা যায়!'

৪৩৯. আব্দুল ওয়াহহাব আজ্জাম কৃত আশ-শাওয়ারিদ : ৩১৮

অন্যরকম। তারা যৌনতা, অশ্লীলতা, বিলাসি জীবনযাপনের প্রতি আসক্ত এক দাস প্রজন্ম তৈরি করে। ইলম ও হিকমাহর দাবিদার এসব কীটপতঙ্গ উম্মাহর জাগরণের চাবিকাঠি উত্তরাধিকারময় ইলমকে মুছে দিতে শুরু করে, সত্যিকার আলিমদের ঘটনা ও ইতিহাস অন্ধকারে রেখে দেয়; যাতে সত্যিকার সে ইলম ও সত্যিকার আলিমদের গৌরবময় ইতিহাস এ প্রজন্মকে আমলের পথের রাহবারি না করতে পারে।... এ ব্যাপারেই কবি ইকবাল বলেন :

لَيْسَ يَخْلُوْ زَمَانُ شَعْبٍ ذَلِيْلٍ *** مِنْ عَلِيْمٍ وَشَاعِرٍ وَحَكِيْمٍ!

فَرَّقَتْهُمْ مَذَاهِبُ الْقَوْلِ لَكِنْ *** جَمْعُ الْآرَاءِ مَقْصَدٌ فِيْ الصَّمِيْمِ:

عَلِّمُوْا اللَّيْثَ جَفْلَةَ الظَّبْيِ وَامْحُوْا * قَصَصَ الْأُسْدِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْقَدِيْمِ

هَمُّهُمْ غِبْطَةُ الرَّقِيْقِ بِرِقٍّ *** كُلُّ تَأْوِيْلِهِمْ خِدَاعُ عَلِيْمِ

'লাঞ্ছনাকে আপন করে নেওয়া কোনো জনগোষ্ঠীর মাঝেই আলিম, কবি ও হিকমতওয়ালার অভাব হয় না। তারা বিভিন্ন মত ও মাজহাবের হলেও একটি সিদ্ধান্তে সবাই একমত থাকে, "সিংহশাবকদের হরিণের মতো জান বাঁচিয়ে পালিয়ে বেড়াতে শেখাও। তাকে কখনো পূর্বসূরি সিংহদের বীরত্বগাথা শুনতে দিয়ো না।" তাদের একটিই লক্ষ্য গোলামের মতো সুখ ও স্বস্তির জীবন। তাদের প্রতিটি অপব্যাখ্যায় ফুটে ওঠে জেনে-শুনে ধোঁকা দেওয়ার মনোবৃত্তি।'

আর এমনটাই হয়েছে...[৪৪০]

মোটাদাগে এটাই ইহুদি ও ক্রুসেডারদের নীলনকশা। ইসলামি সিংহকে হরিণের মতো ভয় করতে শেখানো। এ জিহাদি উম্মাহর মন থেকে ইসলামি সিংহ আলিম, জাহিদ ও মুজাহিদের ইতিহাস মুছে ফেলা।

সে কুশিক্ষার ফলে এমন হরিণের জন্ম হয়েছে, যে কখনো কোনো ভীতিকর পরিস্থিতিতে বাতিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না সিংহের মতো। সে কুশিক্ষা-

৪৪০. বিস্তারিত দেখুন, তাতবিরুত তালিম বাইনাল হাকিকাতি ওয়াত তাদলিল।

ব্যবস্থার ফলে আজ উম্মাহর হৃদয়রাজ্যে দৃঢ়তার স্থলে হীনম্মন্যতা প্রোথিত হয়েছে। জিহাদের ময়দানে দ্রুত ছুটে যাওয়ার জায়গায় আজ উম্মাহ পালিয়ে বেড়াচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সে নীলনকশার ফলে। সিংহশাবক পরিণত হয়েছে অলস অকর্মণ্য হরিণে। মুক্ত-স্বাধীন মুসলিমকে দাসে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু তাও সে কেন খুশি!'[৪৪১]

৪৪১. আল-মুনতালিক : ৫৩-৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হীনবল হওয়ার কারণ

১.ওয়াহান : রাসুল ﷺ যার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'[৪৪২]

ক. দুনিয়ার ভালোবাসা : প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রবাদে এসেছে, দুনিয়ার ভালোবাসা সকল পাপের মূল। বস্তুত দুনিয়ার ভালোবাসা জমিন আঁকড়ে ধরে থাকার মূল কারণ। মোহ ও ভোগে নিমজ্জিত হওয়া এবং প্রবৃত্তির সাগরে হাবুডুবু খাওয়া, প্রতারণাময় এ ভুবন নিয়ে প্রতিযোগিতার কারণও দুনিয়ার ভালোবাসা।

تَفَانَى الرِّجَالُ عَلَى حُبِّهَا *** وَمَا يَحْصُلُوْنَ عَلَى طَائِلٍ

'কত মানুষ তার ভালোবাসায় নিবেদিত হয়, কিন্তু দীর্ঘ জীবনেও তারা তা অর্জন করতে পারে না।'

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন :

'মনে রেখো, বিপদের সময়টা হলো অতিথি। তার আপ্যায়ন হলো সবর। যেমন আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন, "এটি হলো স্বাদহীন খাবার ও আবরণবিহীন পোশাকের মতো। দুনিয়া হলো সামান্য কিছু দিনের। তাই বিলাসীদের বিলাসিতার প্রতি নজর দিয়ো না। বরং তাদের শেষ পরিণামের প্রতি লক্ষ করো। জীবিকার সংকীর্ণতায় হৃদয়কে সংকীর্ণ কোরো না। উটকে হাদির গানে মনোরঞ্জন করো, উট চলতে থাকবে।"'

খলিফা মানসুরের পক্ষ থেকে আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-কে হাদিয়া পাঠানো হলো। ইমাম আহমাদ ফিরিয়ে দিলেন সে উপহার। এক বছর পর তিনি সন্তানদের বললেন, 'আমি তা গ্রহণ করলেও তো এ সময়ের মাঝে তা নষ্ট হয়ে যেত।'

বিশর ﷺ একটা কূপের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথি বলল, 'আমি তৃষ্ণার্ত।' তিনি বললেন, 'আরেকটা কূপ আসুক।' এরপর দ্বিতীয় কূপটিও

....

৪৪২. একটি হাদিসের অংশ। আবু দাউদ ও ইমাম আহমাদ ﷺ বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি সহিহ।

অতিক্রম করে গেলেন, বললেন, 'আরেকটা আসুক।' এরপর সাথিকে বললেন, 'এভাবেই দুনিয়া কেটে যায়।'

লোকেরা বিশর আল-হাফি ﷺ-এর ঘরে আসলেন। ঘরে কোনো চাটাই নেই। তাঁকে বলা হলো, 'এতে কি আপনার কষ্ট হয় না?' তিনি বললেন, 'এ কষ্ট তো একদিন শেষ হয়ে যাবে।'[৪৪৩]

খ. মৃত্যুকে অপছন্দ করা : দুনিয়ার ভালোবাসা ও দুনিয়ার মোহ-মায়া, ভোগ-উপভোগের প্রতি লোভের কারণে সৃষ্টি হয় মৃত্যুকে অপছন্দ করার এ রোগটি। দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের কারণেই আখিরাতে পাড়ি দেওয়াকে দুনিয়ার সাথে বিচ্ছেদের কারণ বলে মনে করে অনেকে। তাই দুনিয়ালোভী মৃত্যুকে অপছন্দ করে। সে আবাদ দুনিয়া ছেড়ে দুনিয়াধ্বংসের পরের স্তরে যাওয়া অপছন্দ করে। মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়ার লোভে মানুষের মাঝে হিম্মতের অধঃপতন দেখা দেয়, এ বিষয়ে আত-তাগরায়ি বলেন :

حُبُّ السَّلَامَةِ يُثْنِيْ عَزْمَ صَاحِبِـــهِ

عَنِ الْمَعَالِيْ وَيُغْرِيْ الْمَرْءَ بِالْكَسَلِ

'নিরাপত্তা ও স্বস্তি-প্রিয়তা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সংকল্প থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং মানুষকে অলস হতে প্রলুব্ধ করে।'

দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা সহোদরের মতো। এমন যুগলের ন্যায়, যা কখনো পৃথক হয় না। উচ্চ মনোবল ভীরু-কাপুরুষের হৃদয়ে বাস করে না। হীনবল লোকদের অবস্থা চিন্তা করুন, কুশিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জীবনের প্রতি লোভী করে তুলেছে।

যেমনটা ইহুদিদের অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ - 'আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভী দেখবেন।'[৪৪৪] এ জন্য কুরআন তাদের চ্যালেঞ্জ করেছে এ নিয়ে।

৪৪৩. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৫৪০-৫৪১।
৪৪৪. সুরা আল-বাকারা : ৯৬

এটা কুরআনুল কারিমের অলৌকিকতার একটি নিদর্শন। ইহুদিরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস করেনি। কুরআনের সে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে : فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ - 'যদি তোমরা নিজ দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো।'[৪৪৫] আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আরও বলেন : وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ - 'কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না।'[৪৪৬]

কাফির ও ইহুদিদের জন্য কখনো মৃত্যুকামনা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

'তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গপ্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন।'[৪৪৭]

এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থটিই বহন করে ইহুদিদের নির্মিত Bar Lev Line।

আমরা দেখব, যখনই কোনো মুসলিম স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো ইহুদির ওপর হামলে পড়ে, তখন যদিও ইহুদির হাতে অধিক শক্তিশালী অস্ত্রও থাকে, ইহুদি তখন মুসলিমের সামনে টিকতে পারে না। একজন মুসলিম তার ন্যূনতম সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইহুদিকে নিমিষে ধরাশায়ী করতে পারে। কারণ, মুসলিম কখনো মৃত্যুকে ভয় করে না। বিপরীতে ইহুদি যুদ্ধ করে দেয়ালের ওপার হতে আড়াল থেকে অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট বহর নিয়ে। দেয়ালের এপারে আসার সাহস তাদের নেই। (অনুরূপভাবে আমরা দেখি, ইহুদি-খ্রিষ্টান ও বিধর্মীরা মুসলিমদের ওপর বিমান দিয়ে হামলা করে ময়দানে আসতে সাহস

....

৪৪৫. সুরা আল-বাকারা : ৯৪
৪৪৬. সুরা আল-বাকারা : ৯৫
৪৪৭. সুরা আল-হাশর : ১৪

পায় না বলে। আবার তারা Proxy War-এর মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর হামলা করে দেয়ালের ওপার থেকে।-অনুবাদক)

হীনবল লোকদের অবস্থা চিন্তা করুন, কুশিক্ষাব্যবস্থা তাদের জীবনের প্রতি লোভী করে তুলেছে। যদিও সে জীবন লাঞ্ছনার জীবন হোক না কেন। তাদের জীবন যতই লাঞ্ছনাময় হোক না কেন, তারা এ জীবনের প্রতি বেশ লোভী। আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতটিতে حَيَاةٍ শব্দটি বলেছেন। নাকিরা রূপটি ব্যবহার করেছেন। এ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা জীবনের প্রতি লোভী হবে, চাই সে জীবন যেমনই হোক না কেন। এখানে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন, যদি তাদের যাপিত জীবন লাঞ্ছনাময়ও হয়, তবুও তারা সে জীবনের প্রতি লোভাতুর থাকবে। শরীরে স্রেফ শ্বাস-প্রশ্বাস গমনাগমনই গুরুত্ব রাখে তাদের কাছে। কারণ, এ কুশিক্ষাব্যবস্থা ও এ চলমান কুসংস্কৃতি সাহসিকতা দেখানো, সামনে অগ্রসর হওয়া এবং বিপদের অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে উপযুক্ত কাজটি করার বদলে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি লোভী বানিয়ে দিয়েছে মানুষকে।

এক নপুংসক বলল—

يَقُوْلُ لِيَ الْأَمِيْرُ بِغَيْرِ جُرْمٍ *** تَقَدَّمْ حِيْنَ حَلَّ بِنَا الْمِرَاسُ

فَمَا لِيْ إِنْ أَطَعْتُكَ فِيْ حَيَاةٍ *** وَلَا لِيْ غَيْرُ هَذَا الرَّأْسِ رَاسُ

'যুদ্ধের ময়দানে সংঘাত যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, সেনাপতি কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে বললেন, সামনে অগ্রসর হও। আমি বললাম, আমি যদি আপনার কথা শুনি তো আমার প্রাণের জামিন কে হবে! আমার তো মোটে একটাই মাথা আছে।'[৪৪৮]

المراسُ - 'আল-মিরাস' দ্বারা এখানে যুদ্ধে ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধমাঠে শক্তি ও দাপটের প্রদর্শনী উদ্দেশ্য। কোথায় এ ভীরু-কাপুরুষ-নপুংশক আর কোথায় সে মহান মুমিন, যার ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

....

৪৪৮. জাহিজ কৃত আল-মাহাসিন ওয়াল আজদাদ : ৫৭

طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

'সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে ব্যস্ত থাকে জিহাদের ময়দানে; তার মাথার চুল থাকে আলুথালু, পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারায় নিযুক্ত করা হলে পাহারায় থাকে নিবেদিত। আর তাকে সেনাদলের পেছনের অংশে রাখা হলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে। যদি সে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি সে সুপারিশ করে, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না।'[৪৪৯]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ

'জিহাদের পথে ঘোড়ার লাগামধারী ব্যক্তি—যখনই সে শত্রুর আনাগোনার টুঁ শব্দটি পায়, সাথে সাথে ঘোড়ায় চড়ে উদ্দিষ্ট স্থানে বেরিয়ে পড়ে শত্রুকে হত্যা ও শাহাদাতের আশায়।'[৪৫০]

২. শৈথিল্য : আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدْ اِهْتَدَى ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ هَلَكَ

'প্রতিটি কাজের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভেতরে থাকে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়। আর যে এর অন্যথা করে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।'[৪৫১]

....

৪৪৯. সহিহুল বুখারি : ২৮৮৭

৪৫০. মুসনাদু আহমাদ : ৯৭২৩, সহিহু মুসলিম : ১৮৮৯

৪৫১. সহিহু ইবনি খুজাইমা : ২১০৫, মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৬৪, সহিহু ইবনি হিব্বান : ১১, মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/১০১; হাদিস সহিহ।

মানুষের স্বভাবটাই এমন। মানুষ একাধারে পরিশ্রম করে যেতে পারে না। কাজে দুর্বলতা এসে পড়ে। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটু আরাম করতে হয় তাকে। হাদিসে বলা হয়েছে, সে অবকাশ যাপন ও আরাম করাটাও যেন রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।

বোঝার জন্য সহজ একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মানুষ গাড়ি চালিয়ে যায়। কিছু সময় গাড়ি চালানোর পর পেট্রল স্টেশনে থামে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য। এ থামাটা হয়ে থাকে পেট্রল নেওয়ার জন্য, কিছুটা আরামের জন্য, কিছু সামগ্রী কেনার জন্য। এমন আরাম ও অবকাশ মানুষকে শক্তি দেয়, যাতে আবার কাজে ফিরে যাওয়া যায়। এখন পেট্রল স্টেশনে থামার অর্থ এ নয় যে, পেট্রল স্টেশনকেই থাকার জায়গা বানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু জীবনগাড়ি চালানোর সময় আমরা এ ভুলটাই করি। অবিরত কাজ চালিয়ে যাওয়ার স্থলে আমরা কাজে বিরতি দিয়ে অবিরাম আরামে লেপ্টে থাকি। আমাদের জীবনটা পূর্ণ করে নিই খেল-তামাশায়। আমাদের জীবনে কষ্ট ও পরিশ্রমের এতটুকু প্রভাবও দেখা যায় না।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ

'হে লোকসকল, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করো। কেননা, আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না, কিন্তু তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা সর্বদা করা হয়; যদিও তা অল্প হয়ে থাকে।'[৪৫২]

কবি বলেন :

لِكُلٍّ إِلَى شَأْوِ الْعُلَا حَرَكَاتُ *** وَلَكِنْ عَزِيْزٌ فِيْ الرِّجَالِ ثُبَاتُ

....

৪৫২. সহিহুল বুখারি : ৫৮৬১, সহিহ মুসলিম : ৭৮২

'মহৎ লক্ষ্যে প্রত্যেকেই কদম বাড়ায়, কিন্তু খুব অল্প লোকই কাজে অবিচল থাকতে পারে।'

এ কারণেই রাসুল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ-কে বলেছিলেন :

لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

'তুমি অমুকের মতো হোয়ো না—যে তাহাজ্জুদ পড়ত, কিন্তু পরে তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিয়েছে।"[৪৫৩]

অর্থাৎ তাহাজ্জুদের প্রতি শিথিলতা দেখিয়ে সে তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিয়েছে। তাই করণীয় হচ্ছে, তুমি নিজের শারীরিক শক্তি, আমল ও সময়ের বাস্তব অবস্থা দেখবে, তারপর সে পরিমাণ তাহাজ্জুদ পড়বে, যতটুকু তোমার সামর্থ্য কুলাবে। তুমি শক্তি, সময় ও আমলের সাথে সমন্বয় করে যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত ও দৈনিক অজিফা আদায় করার সামর্থ্য রাখো, ততটুকু করবে এবং এ আমলের ওপর সব সময় অটল থাকবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি কিছু দিন পুরো রাত তাহাজ্জুদে কাটালে, এরপর তাহাজ্জুদ পড়াই ছেড়ে দিলে। এমন হঠাৎ প্রবল বর্ষণে কোনো উপকার কার্যকর হয় না অন্তরে। বরং সব সময় আমলের ওপর অটল থাকলেই উপকার পাওয়া যায়; যদিও আমল পরিমাণে কম হয়।

এ জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে মধ্যপন্থার এবং এ কর্মপন্থার ওপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। রাসুল ﷺ যখন কোনো আমল শুরু করতেন, সে আমলকে স্থায়ী ও সর্বদা করণীয়-রূপে গ্রহণ করতেন।

৩. মূল্যবান সময় নষ্ট করা : ভ্রমণ, বিনোদন ও অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করা। রাসুল ﷺ বলেন :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ প্রতারিত : সুস্থতা ও অবসরতা।'[৪৫৪]

....

৪৫৩. সহিহুল বুখারি : ১১৫২, সহিহু মুসলিম : ১১৫৯

৪৫৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২

কবি বলেন :

اَلْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيْتَ بِحِفْظِهِ *** وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيْعُ

'সময় হলো হিফাজত করার জন্য সবচেয়ে দামি জিনিস। কিন্তু আমি দেখছি, এটিকেই তুমি অনায়াসে বিনষ্ট করছ।'

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ বলেন, 'আমি এমন লোকদের চিনি, যারা এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত নিজেদের কথাগুলো গণনা করেন।'

- এক সালাফের কাছে লোকেরা গিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা আপনাকে বিরক্ত করে ফেলেছি?' তিনি বললেন, 'সত্য বলছ। আমি পাঠ করছিলাম, কিন্তু তোমাদের আগমনে তা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি।'

- এক আবিদ সিররি সাকতি ﵀-এর কাছে এসে একদল লোককে তার সামনে বসা দেখল। সে বলল, 'তুমি অলসদের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছ।' এরপর না বসেই চলে গেল সে আবিদ।

- মারুফ কারখির কাছে একদল লোক আসলো। অনেক সময় ধরে বসে রইল তারা। তিনি বললেন, 'সূর্যের দায়িত্বে থাকা ফেরেশতা তা পরিচালনায় ক্লান্ত হন না। সুতরাং তোমরা কখন ফিরে যাওয়ার চিন্তা করেছ?'

- জনৈক সালাফ বললেন, 'মজলিস দীর্ঘ হলে শয়তান তাতে অংশ নেয়।'

- উসমান বাকিল্লাবি সব সময় জিকির করতেন। তিনি বলেন, 'ইফতারের সময় আল্লাহর জিকির বাদ দিয়ে আহারে ব্যস্ত হওয়ায় আমার মনে হয় যে, আমার রুহ বের হয়ে যাচ্ছে।'

- জনৈক সালাফ তার সাথিদের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে বের হলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো, তাহলে হয়তো তোমাদের কেউ পথে কুরআন পাঠ করতে পারবে; কিন্তু একত্র হলে তো তখন আলাপ শুরু হবে।'[৪৫৫]

....

৪৫৫. কিমাতুজ জামান ইনদাল উলামা : ৪৩

৪. অক্ষমতা ও অলসতা

এই দুটি প্রতিবন্ধকতা থেকে রাসুল ﷺ অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তবে কখনো অক্ষম ব্যক্তি শক্তি না থাকার কারণে ছাড় পেয়ে যায়। কিন্তু অলস ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উচিত কাজে ঢিলেমি করে এবং শিথিলতা দেখায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

'তাদের যদি (যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার ইচ্ছেই থাকত, তবে তারা সে জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিত। কিন্তু তাদের অভিযানে গমনই আল্লাহর পছন্দ নয়, কাজেই তিনি তাদের পশ্চাতে ফেলে রাখেন আর তাদের বলা হয়, যারা (নিষ্ক্রিয় হয়ে) বসে থাকে, তাদের সাথে বসে থাকো।'[৪৫৬]

- এক লোক খালিদ বিন সাফওয়ানকে বলল, 'আমার কী হলো যে, যখন তোমরা হাদিস নিয়ে আলোচনা করো, আসার শিক্ষা করো এবং কবিতা আবৃত্তি করো, তখন আমার ওপর ঘুম চেপে বসে?' তখন তিনি বললেন, 'কারণ, তুমি মানুষের খোলসে একটা গাধা।'

কখনো তুমি এমন কাউকে দেখবে যে, সে বিরল প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু অলসতা এসে তার মনোবল ভেঙে দেয়। ফলে তার প্রতিভা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তার দূরদৃষ্টির আলো নিভে যায়। তার শক্তি অবশ হয়ে যায়। ফাররা ﵀ বলেন, 'দুব্যক্তির প্রতি আমার বেশ করুণা জাগে। এক. এমন ব্যক্তি যে ইলম অর্জন করে, কিন্তু তা বোঝে না। দুই. এমন ব্যক্তি যে ইলম বোঝে, কিন্তু অর্জন করে না। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্মিত হই, যার ইলম অর্জনের সামর্থ্য আছে, কিন্তু সে ইলম অর্জন করে না।'

মুতানাব্বি বলেন :

وَلَمْ أَرَ فِيْ عُيُوْبِ النَّاسِ عَيْبًا *** كَنَقْصِ الْقَادِرِيْنَ عَلَى التَّمَامِ

....

৪৫৬. সুরা আত-তাওবা : ৪৬

‘সম্পূর্ণ কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তির অর্ধসমাপ্ত কাজ ফেলে যাওয়ার মতো মন্দ বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে আমি আর দেখিনি।’

৫. উদাসীনতা

অলসতার বৃক্ষ সিঞ্চিত হয় অজ্ঞতার পানি দ্বারা, যা সকল শ্রেষ্ঠ গুণের শত্রু।

- উমর ﷺ বলেন, ‘পুরুষের জন্য আরাম হলো উদাসীনতা।’
- শুবা বিন হাজ্জাজ ﷺ বলেন, ‘অবসর হয়ে বসে থেকো না। আমল করে যাও। কারণ, মৃত্যু তোমাদের খুঁজছে।’
- ইবনুল জাওজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘মুবাহ বিনোদনের ক্ষেত্রে আমার নফসকে সুযোগ দেওয়া কি জায়িজ আছে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার নফসের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ উদাসীনতা রয়েছে। একে আরও উদাসীনতায় নিমজ্জিত করো না।’
- উসতাজ মুহাম্মাদ আহমাদ রশিদ হাফিজাহুল্লাহ পেছনের উক্তিগুলো বর্ণনা করার পর বলেন :

[যদি কোনো আপত্তিকারী আপত্তি তুলে, তবে আমরা ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর এই বাণী নিয়ে আসব—যেখানে তিনি বলেছেন, ‘উদাসীনতার নিদ্রা বা তন্দ্রা আসতেই পারে। কিন্তু তুমি অল্প ঘুমাবে।’

উদ্দেশ্য হলো, আরামকে কমিয়ে আনা। শরীরের জন্য যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু আরাম করা। এ ক্ষেত্রে সকলে নিজের সুস্থতা ও অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করবে, সে কতটা আরাম করবে। আগেকার মুসলিমদের তুলনায় এ যুগের মুসলিমদের জন্য সতর্কতা, হৃদয়ের পরিচর্যা ও যাচাইবাছাই আরও অধিক প্রয়োজন। কারণ, আগেকার মুসলিমরা ইসলামি ছায়ায় বসবাস করেছেন, ইসলামি পরিবেশে জীবনযাপন করেছেন। তখন উত্তম কাজ ও গুণাবলির প্রসার ছিল প্রবল। সত্যের ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া হতো ব্যাপকভাবে। মন্দ-নিকৃষ্ট কাজ আলিমদের দৃষ্টি ও আমিরদের তরবারি থেকে লুকিয়ে ফিরত। কিন্তু বর্তমান যুগে, আধুনিক নাগরিক জীবনে পত্রপত্রিকা,

টেলিভিশন ও মিডিয়ার মাধ্যমে কাফিরদের কুফরিগুলো দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে প্রবেশ করছে সবার মাঝে। মুসলিমদের সন্নিকটে ঢেলে সাজানো হয়েছে শয়তানি সকল অপকর্মকে। এ কারণেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানের মুসলিমদের মাঝে এ সকল শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল আকার ধারণ করেছে। সর্বোপরি মুসলিমরা যে ভূখণ্ডে বসবাস করে, সে ভূখণ্ডসমূহে ইসলামি বিধিবিধানের বাস্তবায়ন নেই। এ কারণেই পূর্ববর্তীদের তুলনায় এ সময়ের মুসলিমদের জন্য পরিশ্রম-সাধনা ও সঠিকরূপে সময় সংরক্ষণ করা অধিক আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

তুর্কি ইমাম বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি ﷬ বলেন, 'এসব ধ্বংসাত্মক শহরায়ণ—যা পুরো পৃথিবীকে একটি শহরে রূপান্তর করেছে—তার অধিবাসীরা পরস্পর পরিচিত হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যায় পত্রিকার মাধ্যমে অনর্থক ও নোংরা আলাপচারিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এসব ক্রীড়া-কৌতুকের ফলে গাফিলতি ও উদাসীনতার পর্দা আরও ভারী হয়েছে। উদাসীনতার এ পর্দা শক্তিশালী হিম্মত ছাড়া বিদীর্ণ করা সম্ভব নয়।']৪৫৭

৬. দীর্ঘসূত্রতা ও দীর্ঘ আশা

এগুলো হলো নির্বোধ ও অবহেলাকারীর বৈশিষ্ট্য। যখনই তার মাঝে কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা জাগে, তখন 'অচিরেই করব'-জাতীয় ওয়াসওয়াসা তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে দীর্ঘসূত্রতার মরুভূমিতে থেকে একসময় হঠাৎ মৃত্যু চলে আসে তার। অচিরে যে কাজটা করার ছিল, তা আর অস্তিত্ব লাভ করে না। তার মৃত্যু চলে আসে আর সে বলে :

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন?'[৪৫৮]

অথবা যখনই তার মাঝে কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা জাগে, তখনই সে নিজেকে আশার সাগরে ভাসিয়ে দেয়। বস্তুত দীর্ঘ আশা এমন এক সমুদ্র, যার

৪৫৭. আর-রাকায়িক : ৫৭-৫৯
৪৫৮. সুরা আল-মুনাফিকুন : ১০

কোনো কূল-কিনারা নেই। এর আরোহী হওয়ার নেশায় পড়ে বিশ্বের হতদরিদ্র লোকেরা।

দীর্ঘ আশার সমুদ্রের যাত্রীদের রসদ হলো, শয়তানদের প্রতিশ্রুতি এবং অসম্ভব সকল ধ্যানধারণা। ফলে মিথ্যা আশাভরসা ও অকেজো চিন্তাভাবনার ঢেউ তাকে নিয়ে খেলতে থাকে সব সময়। যেমন কুকুররা মরা জন্তু নিয়ে খেলতে থাকে। দীর্ঘ আশা নষ্ট, নিম্ন ও ধিকৃত লোকের রসদ। তার মাঝে এমন কোনো অভিলাষ নেই, যার বাস্তবতা পাওয়া যায়। বরং তার থেকে মন্দ ধিকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়।...আশাবাদী নিজের হৃদয়ে কাঙ্ক্ষিত একটি আকৃতি তৈরি করে রাখে। আর স্বপ্নে সেটি অর্জনের মাধ্যমে সে সফলও হয়—ধন্য হয় বিজয়ের স্বাদ উপভোগে। কিন্তু এ অবস্থায় যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন দেখে তার হাত পড়ে আছে চাটাইয়ের ওপর। আর তার অর্জনের ঝুলিতে কিছুই যুক্ত হয়নি।'[৪৫৯]

وَانْتَبِهْ مِنْ رَقْدَةِ الْغَفْـــ *** ـــلَةِ، فَالْعُمْرُ قَلِيْلُ

وَاطْرَحْ سَـــوْفَ وَحَـــتَّى *** هُمَـــا دَاءٌ دَخِـــيْلُ

'গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে ওঠো। কারণ, জীবন বড়ই স্বল্প। "কাল করব" এবং "অমুক কাজের পর করব" এই ধরনের বাক্যের ব্যবহার ছেড়ে দাও। কারণ, এই দুটি হলো অভ্যন্তরীণ ব্যাধি।'

....

৪৫৯. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৪৫৬-৪৫৭

'এক লোকের কাছে বড় পাত্রভর্তি মধু ও ঘি ছিল। সে একদিন চিন্তা করতে লাগল মনে মনে, "আমি এ পাত্র ভরা মধু ও ঘি ১০ দিরহামে বিক্রি করব। এরপর ৫টি ছাগল কিনব। ছাগল প্রতি বছর দুবার বাচ্চা দেয়। এভাবে কয়েক বছর ছাগল পালতে থাকলে একসময় ছাগলের সংখ্যা দুইশতে পৌঁছাবে। প্রতি ৪টি ছাগলের বিনিময়ে আমি একটি করে গরু কিনব। এরপর কিছু বীজ কিনব। সেগুলো দিয়ে চাষাবাদ করব। আমার হাত অর্থকড়িতে ভরে যাবে! আমি মিসকিন, গোলাম, বাঁদি ও পরিবারের ভালো পরিচর্যা করব। আমার একটি ছেলে হবে। তার এ নাম রাখব। তাকে আদব শেখাব। ভদ্র বানাব। যদি সে আমার অবাধ্য হয়, তবে আমার লাঠিটা দিয়ে তার মাথায় দেবো এক ঘা বসিয়ে।" এত সব চিন্তা করার সময় সে লোকটার হাতে একটা লাঠি ছিল। সত্যি সত্যি সে মনে মনে এগুলো বলতে বলতে লাঠিটা উঁচিয়ে একটা ঘা বসাল। লাঠির বাড়িটা গিয়ে লাগল মধু ও ঘির বড় পাত্রটাতে। পাত্রটা ভাঙল আর মধু ও ঘি তার মাথার ওপর পড়তে থাকল।' - উয়ুনুল আখবার : ৩/২৬৩-২৬৪।

জনৈক লোক ইবনে সিরিন ﷺ-কে বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি পানি ছাড়া সাঁতার কাটছি আর ডানাবিহীন উড়ছি! আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?' তিনি বললেন, 'তুমি অতি আশা-আকাঙ্ক্ষা করো আর অলীক স্বপ্ন দেখো।'

আবু তামাম কত সুন্দর কথাই না বলেছেন :

مَنْ كَانَ مَرْعَى عَزْمِهِ وَهُمُومِهِ *** رَوْضَ الْأَمَانِيْ لَمْ يَزَلْ مَهْزُوْلَا

'যে ব্যক্তি কল্পনা ও প্রত্যাশার বাগানে সংকল্প ও উচ্চাভিলাষের চাষাবাদ করে, বাস্তবজীবনে কিছুই করে না, সে সারাজীবন অধঃপতিতই থাকবে।'

হাসান ﷺ বলেন, 'মুমিন সে ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তা অবশ্যই যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে মুমিন সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী, সবচেয়ে বেশি ভয়কারী। সে পাহাড় পরিমাণ সম্পদ সদাকা করলেও জান্নাতে নিজের অবস্থান না দেখা পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না। তার তাকওয়া, সততা ও ইবাদত যতই বৃদ্ধি পায়, ভয়ও তত বৃদ্ধি পায়। সে বলতে থাকে, "আমি নাজাত পাব না, আমি নাজাত পাব না।" আর মুনাফিক বলে, "মানুষের সংখ্যা অনেক। আমি যা-ই করি, মাফ পেয়ে যাব। আমার কোনো সমস্যা হবে না।" এভাবে সে মন্দ আমল করে আর আল্লাহর ওপর আশা করে বসে থাকে।'[৪৬০]

মুতানাব্বি নিজেকে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা থেকে মুক্ত ঘোষণা করে এবং কীভাবে বাস্তবতায় বিশ্বাস করে ঝুঁকি গ্রহণে অভ্যস্ত হয়েছেন, তা বর্ণনা করে বলেন :

وَمَا كُنْتَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْمُلْكَ بِالْمُنَى *** وَلَكِنْ بِأَيَّامٍ أَشَبْنَ النَّوَاصِيَا

لَبِسْتَ لَهَا كُدرَ الْعَجَاجِ كَأَنَّمَا *** تَرَى غَيْرَ صَافٍ أَنْ تَرَى الْجَوَّ صَافِيًا

'আপনি তো এমন বাদশাহ নন যে নিছক আকাঙ্ক্ষা থেকে কিংবা ঘটনাচক্রে রাজত্ব পেয়ে গেছে। বরং সিংহাসন অর্জনে আপনি এত কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ

৪৬০. ইবনুল মুবারক ﷺ কৃত কিতাবুজ জুহদ : ১৮৮

হয়েছেন, যা দুশমনের চুল পর্যন্ত পাকিয়ে দিয়েছে। এই মর্যাদা অর্জনের জন্য আপনি রণাঙ্গনের ধুলো গায়ে মেখেছেন। লড়াইয়ের ধুলোঝড়ে ধূসরিত দিগন্তকেই আপনি বিবেচনা করেন ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ হিসেবে।'

৭. দুনিয়া-অন্বেষী নিম্ন মানসিকতার লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা

যখনই তোমার হিম্মত জেগে উঠবে, (দুনিয়া-অন্বেষী নিম্ন মানসিকতাধারী লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে) তোমাকে সে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং এ কথা বলে প্রতারিত করবে যে, 'রাত অনেক লম্বা, এখন শুয়ে পড়ো। পরে ওঠা যাবে।'

আবু মুসা আল-আশআরি ﵁ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

> إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً
>
> 'উত্তম বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর উদাহরণ হলো, সুগন্ধি বিক্রেতা ও হাপরে ফুঁকদানকারীর ন্যায়। সুগন্ধিওয়ালা হয়তো তোমাকে উপহারস্বরূপ সুগন্ধি দেবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিনে নেবে। তাও না হলেও তার কাছ থেকে অন্তত সুগন্ধি পাবে। আর হাপরে ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়ে ফেলবে অথবা দুর্গন্ধ পাবে।'[৪৬১]

তাই ক্রীড়া-কৌতুককারী, অকাজে লিপ্ত ও নিরুৎসাহকারী লোকদের সংশ্রব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো। তাদের থেকে দূরে থাকো। কারণ, তোমার স্বভাব তোমার অজান্তেই তাদের স্বভাব নকল করবে। বাজে লোকদের সাথে বসে কিছু করলে বা কোনো কথা বললেই কেবল তাদের জীবাণু তোমার মাঝে সংক্রমিত হবে না; বরং তাদের দিকে সামান্য দৃষ্টিপাতের কারণেই তাদের জীবাণু তোমার মাঝে সংক্রমিত হতে পারে! কোনো জিনিসের প্রতি

....

৪৬১. সহিহু মুসলিম : ২৬২৮

দৃষ্টি দিলে দৃষ্টের মাঝে যে চরিত্র ছিল, তা দৃষ্টিপাতকারীর ভেতরেও সৃষ্টি হয়ে যায়।... এর দৃষ্টান্ত হলো, মৃত জিনিস বয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পানি ও আবহাওয়া উভয়টিই দূষিত হয়। তাহলে মানুষের হৃদয়ের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী?'[৪৬২]

وَلَا تَجْلِسْ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا *** فَإِنَّ خَلَائِقَ السُّفَهَاءِ تَعَدَّى

'দুনিয়াদারদের সাথে বোসো না। কেননা, নির্বোধদের চরিত্র সংক্রামক।'

৮. প্রেম

প্রেমিকের সকল হিম্মত তার প্রেমিকাকে পাওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরূপ অবৈধ প্রেমই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা থেকে গাফিল করে রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) 'জালিমদের এই বিনিময় বড়ই নিকৃষ্ট!'[৪৬৩]

উচ্চ মনোবলের অধিকারী এরূপ প্রেমে বন্দী হয় না, যা স্থিতিশীলতার প্রতিবন্ধক। যা ঘুম কেড়ে নেয়; বুদ্ধি হরণ করে; উন্মাদনা তৈরি করে। কত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাওয়ার পেছনে নিজের অর্থসম্পদ, মান-সম্মান ও আত্মমর্যাদা ধ্বংস করেছে! ধ্বংস করেছে নিজের দ্বীন ও দুনিয়া!

প্রেম অনেক রাজাকে গোলাম বানিয়েছে। বাদশাহকে চাকরে পরিণত করেছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হতে চায়, কিন্তু পরিত্রাণ খুব কমই হয়। প্রেমের ফিতনা কত মানুষকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে! কত মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কবলে সমর্পণ করেছে! কত মানুষকে জাহান্নামের বিবিধ স্তরে তার ফুটন্ত পানির পেয়ালা পান করিয়েছে!'[৪৬৪]

৯. আকিদার ভ্রান্তি

বিশেষ করে তাকদির ও ফয়সালার মাসআলা না বোঝা। আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল না করা। ইরজায়ি চিন্তাধারা পালন করা।

৪৬২. ফাইজুল কাদির : ৫/৫০৭
৪৬৩. সুরা আল-কাহফ : ৫০
৪৬৪. রওজাতুল মুহিব্বিন : ১৮২-১৯০

১০. পরিবার ও সন্তানাদির দেখাশোনায় নিজের জীবন শেষ করে দেওয়া

(وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) 'আর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে তোমার ওপর।'—হাদিসের এই বাণীর প্রতি লক্ষ করে পরিবার ও সন্তানসন্ততির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সীমাহীন মেহনত ও পরিশ্রমকারী ব্যক্তি কেবল এ অংশটুকু নিয়েই চিন্তা করে। হাদিসের অপর অংশ থেকে উদাসীন থাকে সে—যেখানে বলা হয়েছে, (وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا) 'আর তোমার পালনকর্তার অধিকার রয়েছে তোমার ওপর।' ভুলে থাকে হাদিসের সে অংশটাও—(فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) 'সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করো।'[৪৬৫]

এভাবে ভুল বুঝে, উদাসীন থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অধিকার, দ্বীনি কর্তব্যসমূহ অনাদায় রেখে পরিবারের জন্য নিজের সবটুকু বিলীন করে দেয় সে। পরিবার ও সন্তানসন্ততি যখন আল্লাহর আনুগত্যের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন এগুলোকে মুমিনের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেছে কুরআনুল কারিম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।'[৪৬৬]

ইবনে জারির ﷺ আতা বিন ইয়াসার ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'এই আয়াতটি আওফ বিন মালিক আশজায়ি ﷺ-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছিলেন সম্পদ ও সন্তানে পূর্ণ। যখন তিনি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন সন্তানরা এসে কান্নাকাটি করে তাকে বিগলিত করে ফেলত। তারা বলত, "কার কাছে রেখে যাচ্ছেন আমাদের?" তাদের কথা শুনে তিনি নরম হয়ে যেতেন এবং বাড়িতেই থেকে যেতেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়—

৪৬৫. সহিহুল বুখারি : ১৯৬৮ (উল্লেখ্য, হাদিসের এই বাণীসমূহ সালমান ﷺ আবু দারদা ﷺ-এর উদ্দেশে বলেছিলেন, যা শোনার পর রাসুল ﷺ তাকে সত্যায়ন করে বলেছেন, «صَدَقَ سَلْمَانُ» 'সালমান সত্য বলেছে।' - অনুবাদক)
৪৬৬. সুরা আত-তাগাবুন : ১৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

“হে মুমিনগণ, তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।” (সুরা আত-তাগাবুন : ১৪)’

১১. ধ্বংসাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা

ধ্বংসাত্মক এ শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিমদের হতোদ্যম করে, হিম্মত নষ্ট করে, প্রতিভা ধ্বংস করে, শক্তি খর্ব করে, বোধশক্তি বিগড়িয়ে দেয় এবং তাদের পরাধীনতার শিক্ষা দেয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলিমদের অন্তরে আত্মমর্যাদাহীনতার চাষাবাদ করে, নীচতা ও হীনতার অনুভূতি প্রবেশ করিয়ে দেয় হৃদয়ের গভীরে।

যেমন কতক সুফি বলেন, ‘ফকির হলো সে, যার শরীরে উকুনের রাজত্ব হবে, উকুন যেন তাকে খেয়ে ফেলছে—কিন্তু তার হাতে কোনো নখ থাকে না, যা দিয়ে সে নিজেকে চুলকাবে।’

অন্য এক সুফি বলেন, ‘সুফি হলো সে, যে নিজের রক্তকে মূল্যহীন মনে করে এবং কেউ তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলাকে সে বৈধ মনে করে।’ এর চেয়ে লাঞ্ছনাময় অবস্থা আর আছে কী? কোথায় এসব সুফি আর কোথায় রাসুল ﷺ-এর শিক্ষা : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - ‘যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হলো, সে শহিদ। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার রক্ষার্থে নিহত হলো বা নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো, সে শহিদ। যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হলো, সে শহিদ।’[৪৬৭] এ হলো ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু সুফিবাদের শিক্ষা হলো, ‘যে তোমার এক গালে চড় মেরেছে, তাকে অপর গাল এগিয়ে দাও আরেকটা চড় মারার জন্য।’ অথবা ‘যে তোমার গায়ের চাদর ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাকে তোমার জামাটাও দিয়ে দাও।’

....

৪৬৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৭২। হাদিসের মান : সহিহ।

তৃতীয় আরেক সুফি বলেন, 'সে ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র তিনবার আনন্দিত হয়েছিল।' তার ভাষ্য, 'আমি একবার নৌকায় ছিলাম, তখন আমার মতো কাউকে এত তুচ্ছ দেখিনি। একদা আমি মসজিদে অসুস্থ অবস্থায় ছিলাম, তখন মুয়াজ্জিন আমাকে টেনে বের করে দিয়েছিল মসজিদ থেকে। আমার গায়ে একটি পশমি কাপড় ছিল, আমি সেটির দিকে তাকিয়ে উকুন ও পশমের মাঝে কোনো পার্থক্য করতে পারিনি। কেননা, প্রচুর উকুন ছিল তাতে।' আশ্চর্য, এ তিন অবস্থা তার খুশির কারণ হলো!

কিছু সুফির কর্মপদ্ধতি হলো, কুরআন-সুন্নাহর ইলম থেকে বিমুখ থাকা, শরিয়তের ইলম না শেখার জন্য মুরিদদের প্ররোচিত করা। এমনকি একদা এক মুরিদের জামার আস্তিন থেকে একটি কলম পড়ে যায়। কলমটি সে এ ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিল যে, তার ওপর ইলম শেখার অপরাধ আরোপ করে তাকে তিরস্কার করা হবে। কলম দেখে তার পির বলল, 'তোমার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখো।'

ইবনুল জাওজি ﵀ বর্ণনা করেন, জাফর আল-খালিদি বলেন, 'যদি সুফিরা আমাকে ছেড়ে দিত, তবে দুনিয়ার সব সনদ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত হতাম। আমি আব্বাসের নিকট হাদিস শিখতে গেলাম। যখন একটি মজলিসে তাঁর থেকে হাদিস লিখে বের হলাম, তখন আমার সাথে জনৈক সুফির সাক্ষাৎ হলো, ইতিপূর্বে আমি যার সংশ্রবে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার সাথে এগুলো কী?" আমি তাকে দেখালাম। তিনি বললেন, "ধ্বংস হও তুমি! তুমি বাতিনি ইলম ছেড়ে কাগজের ইলম ধরেছ।" এরপর তিনি কাগজগুলো টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তার কথাটি আমার হৃদয়ে বসে গেল। তাই আর কোনো দিন আব্বাসের নিকট আমার যাওয়া হয়নি।'

তবে এর চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ও ভয়ংকর হলো সেক্যুলারিজম প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলিম যুবকরা যে কূপ থেকে পানি পান করছে, সে কূপে বিষ ঢেলে আনন্দ লাভ করে এই সেক্যুলারিজম। যাতে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়, যাদের আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্কই থাকবে না; যারা পশ্চিমাদের ভর্ৎসনার আবর্জনায় নিজেদের সম্মান খুঁজে বেড়াবে, আর ইসলামের দিকে নিজেদের সম্বন্ধ করাকে অপমানজনক মনে করবে।

১২. একের পর এক বিপদের আগমন ও আমলকারী মুসলিমদের ওপর আপতিত নির্যাতন

এটা বিপদের স্বরূপ এবং সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের হৃদয়ে দুর্বলতা ও নিরাশা সৃষ্টি করে। তার কাছে রাস্তা দীর্ঘ মনে হয়। ফলে আল্লাহর পথে চলা তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। রাসুল ﷺ মক্কায় নির্যাতিত সাহাবিদের এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, ভবিষ্যৎ ইসলামের এবং শেষ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য।

খাব্বাব বিন আরাত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন কাবা প্রাঙ্গণে চাদর বালিশ বানিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম। মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমরা কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা বললাম, "আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য দুআ করবেন না?" তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের এক একজনকে ধরে আনা হতো, তারপর মাটি খনন করে তাকে গর্তে রেখে করাত নিয়ে আসা হতো এবং তার মাথার ওপর করাত রাখা হতো। এরপর তা দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। আবার কারও শরীরে লোহার চিরুনি দিয়ে গোশত তুলে নেওয়া হতো, শরীরের হাড়টুকুই কেবল বাকি থাকত। কিন্তু এসব নির্যাতন নির্যাতিতকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি একজন লোক সানআ থেকে হাজরামাওত পর্যন্ত একাকী যাতায়াত করবে—সে আল্লাহভীতি এবং মেষ পালের ওপর নেকড়ের আক্রমণের ভয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ের ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।"'[৪৬৮]

أَخِيْ سَتَبِيْدُ جُيُوْشُ الظَّلَامِ *** وَيُشْرِقُ فِيْ الْكَوْنِ فَجْرٌ جَدِيْدْ

فَأَطْلِقْ لِرُوْحِكَ إِشْـــرَاقَـــهَا *** تَرَ الْفَجْرَ يَرْمُقُنَا مِنْ بَعِــيْد

'ভাই, অচিরেই কেটে যাবে রাতের অমানিশা। জগৎজুড়ে উদ্ভাসিত হবে নতুন প্রভাত। ভোরের শুভ্র আলোতে উজ্জ্বল করে নাও তোমার আত্মা। দেখবে নতুন যুগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমায়।'

....

৪৬৮. ফাতহুল বারি : ৭/১৬৪-১৬৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনোবল বৃদ্ধির পথ ও পদ্ধতি

০১. ইলম ও দূরদর্শিতা

ইলম হিম্মত বাড়িয়ে দেয়। সৃষ্টি করে উচ্চ মনোবল। ইলম অর্জনকারী অন্ধ অনুসরণের নীচুতা থেকে মুক্ত থাকে। তার নিয়ত পরিশুদ্ধ হয়। বর্ণিত আছে, এক লোক এক বংশীয় সুন্দরী রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু লোকটি দরিদ্র এবং বংশমর্যাদায় দুর্বল হওয়ায় সে রমণী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। লোকটি তখন চিন্তা করল কোন জিনিসের মাধ্যমে সে নারীকে পাওয়া যাবে—সম্পদের মাধ্যমে নাকি মর্যাদার মাধ্যমে? তখন সে মর্যাদার পথ গ্রহণ করে ইলম শিখতে থাকল। একপর্যায়ে সে (ইলমের কারণে) মর্যাদাশীল হয়ে উঠল। তখন ওই রমণী নিজের পক্ষ থেকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল। এবার সে লোকটি 'আমি ইলমের ওপর কোনো জিনিসকে অগ্রাধিকার দিতে চাই না' বলে ওই সুন্দরী রমণীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

- ইলম তার বাহককে দ্বীনের বুঝ দান করে। এ বুঝের মাধ্যমে সে আমলের স্তরভেদ সম্পর্কে জানতে পারে; বুঝতে পারে, কখন কী করণীয় তার। তাই একজন আহলে ইলম ইবাদত থেকে দূরে রাখে—এমন অনর্থক বৈধ কাজসমূহ যেমন : অতিরিক্ত আহার, নিদ্রা ও কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকে। বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য আদায়ের ক্ষেত্রে সে মধ্যপন্থা গ্রহণ করে এবং তাতে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। যেমন : হাদিসে এসেছে, (فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) 'প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করো।'[৪৬৯] আহলে ইলম প্রত্যেক হকদারকে তার হক সঠিকভাবে আদায় করে দেয়। ইলম তার মাঝে এ বুঝ সৃষ্টি করে।

- ইলমের বাহক শয়তানের প্রতারণা বুঝতে পারে। শয়তান চায়, মানুষকে বেশি সাওয়াবের কাজ থেকে বিরত রাখতে। কিন্তু আহলে ইলমের সামনে শয়তানের সে প্রতারণা কার্যকর হয় না। আবু সুলাইমান ﷺ বলেন, 'তুমি

....

৪৬৯. সহিহুল বুখারি : ১৯৬৮

একটি কল্যাণকর কাজ করছ, কিন্তু শয়তান এসে এর চেয়েও কম সাওয়াবের আমলের দিকে তোমাকে ইশারা করবে। যেন সে তোমাকে কম সাওয়াবের কাজে লাগিয়ে একটু হলেও তোমার ওপর বিজয় লাভ করতে পারে।'

০২. আখিরাতকে একমাত্র লক্ষ্য বানানো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

'আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে।'[৪৭০]

রাসুল ﷺ বলেন, 'যার চিন্তাচেতনা জুড়ে হবে আখিরাত, আল্লাহ তাআলা তার সবকিছু সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করবেন, তার হৃদয়ে আল্লাহ ধনাঢ্যতা ঢেলে দেবেন। দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়ে ছুটে আসবে। পক্ষান্তরে যার চিন্তা হবে দুনিয়া নিয়ে। আল্লাহ তাআলা তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেবেন, তার দুচোখে দারিদ্র্য ঢেলে দেবেন। আর দুনিয়ার সে অংশই সে পাবে, যা আল্লাহ তার তাকদিরে লিখে দিয়েছেন।'[৪৭১]

০৩. অধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

অধিক পরিমাণে মৃত্যুর স্মরণ আখিরাতের আমলের প্রতি অনুপ্রাণিত করে, প্রতারণাময় দুনিয়া থেকে পৃথক থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের আত্মসমালোচনা করতে এবং তাওবার নবায়ন ও দৃঢ়তার ওপর সংকল্পকে ধরে রাখতে উৎসাহিত করে।

বারা বিন আজিব رضي الله عنه বলেন, 'একদা আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোককে দেখে বললেন, "এই লোকগুলো কেন একত্র

....

৪৭০. সুরা আল-ইসরা : ১৪

৪৭১. সুনানু ইবনি মাজাহ। হাদিস সহিহ। (প্রায় কাছাকাছি অর্থে হাদিসটি এসেছে সুনানুত তিরমিজি-তে। হাদিস নং ২৪৬৫)

হয়েছে?" বলা হলো, "তারা একটি কবর খুঁড়ছে।" রাসুল ﷺ এতে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি খুব দ্রুত সাহাবিদের দিকে ছুটে গেলেন। এবং কবর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তিনি কবরের ওপর ঝুঁকে বসলেন। তিনি কী করেন, তা দেখার জন্য আমি তাঁর মুখোমুখি হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। তাঁর কাঁদার ফলে অশ্রুতে মাটি ভিজে গেল। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "হে আমার ভাইয়েরা, এমন দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।"'[৪৭২]

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'আমাকে তিনটি জিনিস হাসায় আর তিনটি জিনিস কাঁদায়। আমাকে হাসায়—এক. সেই দুনিয়াপ্রত্যাশী, মৃত্যু যাকে খুঁজে ফিরছে। দুই. সে ব্যক্তি, যে গাফিল হয়ে আছে, অথচ তার ব্যাপারে গাফিলতি করা হয় না। তিন. যে ব্যক্তি খুব হাসে, অথচ সে জানে না যে, তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি ক্রোধান্বিত। আর আমাকে কাঁদায়—এক. মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের বিচ্ছেদ। দুই. অন্তিম বিদায়ের ভীতিকর পরিস্থিতি। তিন. আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সময়টা, যেদিন মানুষের সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে; সে জানবে না, সে জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে?'

জনৈক দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সবচেয়ে মূল্যবান উপদেশ কোনটি?' তিনি বললেন, 'মৃতদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।'

উমর বিন আব্দুল আজিজ ইমাম আওজায়ি ﷺ-এর নিকট লিখে পাঠান, 'পরসমাচার, যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, সে দুনিয়ার সামান্যতেই পরিতুষ্টি লাভ করে।'

আতা ﷺ বলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ প্রতিরাতে ফকিহদের একত্র করতেন। সবাই মৃত্যু, কিয়ামত ও আখিরাতের কথা আলোচনা করতেন আর কাঁদতেন।'

সালিহ মুররি বলতেন, 'যদি সামান্য সময়ের জন্য আমার মৃত্যুর স্মরণ ছুটে যেত, তবে আমার হৃদয় নষ্ট হয়ে যেত।'

দাক্কাক ﷺ বলেন, 'যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, সে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে সম্মানিত হয় : দ্রুত তাওবা, আত্মতুষ্টি এবং ইবাদতে

৪৭২. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৬০১। হাদিসটি হাসান।

উদ্যম। আর যে মৃত্যুর কথা ভুলে যায়, সে তিনটি জিনিস দ্বারা বঞ্চিত হয় : তাওবার দীর্ঘসূত্রতা, অল্পতে তুষ্ট হতে না পারা এবং ইবাদতে অলসতা করা।'

(এমনিভাবে মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখা, তার মৃত্যুযন্ত্রণা অবলোকন করা এবং মৃত্যুপরবর্তী সময়ে মৃত ব্যক্তির অবস্থা নিয়ে চিন্তা করার মাধ্যমে প্রবৃত্তির চাহিদা নিভে যায়—হৃদয়ের আনন্দ দূর হয়ে যায়, চোখের নিদ্রা উবে যায়, শারীরিক সুখের চাহিদা চলে যায়, আমলে উদ্যম তৈরি হয় এবং সাধনা ও পরিশ্রম বৃদ্ধি পায়।

হাসান বসরি ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক অসুস্থ লোককে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, লোকটি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার যন্ত্রণা ও আপতিত মুসিবতের প্রতি লক্ষ করে তিনি পরিবারের কাছে ফিরে এলেন। ঘর থেকে বের হলেন এক চেহারায় আর ফিরলেন ভিন্ন অভিব্যক্তির চেহারা নিয়ে। পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'খাবার খেয়ে নিন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।' তিনি বললেন, 'হে আমার পরিবার, তোমরা নিজেরা খাও, পান করো। আল্লাহর শপথ, আমি যে বিপদ প্রত্যক্ষ করেছি, তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আমল করতে থাকব।')[৪৭৩]

লাবিদি বলেন, 'আবু ইসহাক জিবনিয়ানি ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর চাটাইয়ের নিচে আমি একটি কাগজের টুকরা পেলাম। তাতে আবু ইসহাকের লেখা ছিল, "এক লোকের জন্য অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসলো। তাকে লক্ষ্য করে বলা হলো—নেক আমল করো, নেক আমল করো। কারণ, তোমার মৃত্যু যে অতি সন্নিকটে।" তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান আমাকে বলল, "যখনই তাঁর আমলে ঘাটতি দেখা দিত, তিনি কাগজের এই টুকরাটি বের করে দেখতেন আর নতুন উদ্যমে আমল শুরু করতেন।"'[৪৭৪]

مَا زَالَ يَلْهَجُ بِالرَّحِيْلِ وَذِكْرِهِ *** حَتَّى أَنَاخَ بِبَابِهِ الْجَمَّالُ
فَأَصَابَهُ مُسْتَيْقِظًا مُتَشَمِّرًا *** ذَا أُهْبَةٍ لَمْ تُلْهِهِ الْآمَالُ

....

৪৭৩. কুরতুবি ﷺ কৃত আত-তাজকিরা : ১২
৪৭৪. তারতিবুল মাদারিক : ২/৫১৬

'সফরের প্রস্তুতির ব্যাপারে সে কখনো গাফিল ছিল না। সর্বদা মৃত্যুর স্মরণ জেগে ছিল তার অন্তরে। একসময় খাটিয়া এসে থামল তার দরোজায়। সে ছিল সম্পূর্ণ জাগ্রত তৎপর। সফরের পাথেয় প্রস্তুত তার। দীর্ঘ আশা তাকে কখনো প্রতারিত করতে পারেনি।'

০৪. দুআ

দুআ নবিদের সুন্নাহ। সকল কল্যাণের বাহক। রাসুল ﷺ বলেন :

أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ

'মানুষের মাঝে সবচেয়ে অক্ষম সে, যে দুআয় অক্ষম।'[৪৭৫]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُم فَلْيُكثِر، فَإِنَّمَا يَسأَلُ رَبَّهُ

'যখন তোমাদের কেউ প্রার্থনা করে, তখন যেন অধিক পরিমাণে প্রার্থনা করে। কারণ, সে তার রবের কাছে প্রার্থনা করছে।'[৪৭৬]

রাসুল ﷺ যখন ইবনে আব্বাস ﷠-এর মেধার প্রখরতা দেখলেন, তখন তাঁর জন্য দুআ করলেন—

اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

'হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন এবং তাকে দ্বীনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন।'[৪৭৭]

---

৪৭৫. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪৪৯৮, আল-মুজামুল আওসাত : ৫৫৯১; শুআবুল ইমান : ৮৩৯৪। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৭৬. আল-মুজামুল আওসাত : ২০৪০, মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৯৩৬৯, ইবনে হিব্বান ﵀ হাদিসটি উল্লেখ করে সহিহ বলেছেন। হাইসামি ﵀ বলেন, 'এ হাদিসের সনদের রাবিগণ সহিহ হাদিসের রাবি।' আল-মাজমা : ১০/১৫০।

৪৭৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৯৭

তিনি প্রতি সালাতের পর দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার জিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদতে সাহায্য করুন।'[৪৭৮]

০৫. উন্নত লক্ষ্য অর্জনে মন-মস্তিষ্ককে নিমগ্ন রাখা ও সদা ব্যাপৃত রাখা

এ ক্ষেত্রে সালাফ ও খালাফের জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম দৃষ্টান্ত। হাসান ﵀ বলেন, 'তুমি যদি নিজের নফসকে সত্য বিষয়ে ব্যস্ত না রাখো, তবে নফস তোমাকে ভ্রান্ত চিন্তায় লাগিয়ে দেবে।'

খলিল বিন আহমাদ ঘর থেকে বের হতেন। কাউকে টের পেতে দিতেন না। চুপিসারে মরু অঞ্চলে চলে যেতেন নিজের আমলে নিমগ্ন থাকতে। তিনি এমনটি করতেন, যাতে কেউ তার ইবাদত ও কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে।

এক লোক আবু তামাম ﵀-এর নিকট প্রবেশ করল। তিনি তখন কবিতা রচনায় মশগুল ছিলেন। তিনি এতটাই নিমগ্ন চিত্তে রচনায় ব্যস্ত ছিলেন যে, কে আসলো না আসলো, সেটা মোটেও উপলব্ধি করেননি।

ইবনে সাহনুন ﵀ একদা দাসীকে খাবার তৈরি করতে বলে লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিমগ্ন হয়ে পড়লেন বিরোধীদের জবাব লেখার কাজে। দাসী খাবার তৈরি করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর দাসী ইবনে সাহনুনকে লোকমা বানিয়ে খাওয়াতে শুরু করলেন। ইবনে সাহনুনের মুখে লোকমা পড়ল, তিনি চিবিয়ে গেলেন, খেতে থাকলেন; এদিকে তাঁর পূর্ণ মনোযোগ লেখালেখিতে। ফজর পর্যন্ত কাজ করার পর তাঁর সম্বিত ফিরল যে, দাসীকে তিনি খাবার তৈরি করতে বলেছেন। তখনই তিনি দাসীকে খাবার উপস্থিত করতে বললেন। দাসী তাঁকে জানাল, সে রাতেই তাঁকে খাবার খাইয়ে দিয়েছে, যা তিনি টেরও পাননি।

৪৭৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২; হাদিস সহিহ।

ইমাম আস-সুবকি ﵀ 'তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ' গ্রন্থে তাঁর পিতা ইমাম তাকি উদ্দিন ﵀-এর ব্যাপারে উল্লেখ করেন, 'তিনি অনেক ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি রাতের অধিকাংশ সময় এবং পুরো দিন কাজে নিমগ্ন থাকতেন। ফজরের সালাতের সময় ঘর থেকে বের হতেন। বিভিন্ন শাইখের কাছে ইলম শেখায় ব্যস্ত থাকতেন। জোহরের আগ মুহূর্তে বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি এসে দেখতেন, বাড়ির লোকজন তাঁর জন্য মুরগির বাচ্চা রান্না করেছে। তিনি খেয়েদেয়ে মাগরিব পর্যন্ত ব্যস্ততায় লেগে থাকতেন। তারপর মিষ্টিজাতীয় হালকা কিছু খেয়ে নিতেন। এরপর সারা রাতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তিনি এ ছাড়া আর কোনো কিছুর খবর রাখতেন না। একদিন তাঁর বাবা তাঁর মাকে বললেন, "এই যুবক কখনো এক দিরহাম বা অন্য কিছু চায়নি। হয়তো কোনো খাবার দেখে তার খাওয়ার ইচ্ছা হবে। তুমি তার রুমালে এক দিরহাম বা দুই দিরহাম রেখে দিয়ো।" তাঁর মা তাঁর রুমালে অর্ধ দিরহাম রেখে দিলেন। দাদি বলেন, "এভাবে প্রায় দুই জুমআ চলে গেল। রুমালে যে অর্ধ দিরহাম তিনি রেখেছেন, সেটা সেভাবেই ফেরত আসত। একপর্যায়ে রুমালটি ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, "এটি দিয়ে আমি কী করব? এটি নিয়ে যান।"'[৪৭৯]

'আলফিয়াহ'-সহ বহু গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম ইবনে মালিক আন-নাহবি ﵀ অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন করতেন। খুব দ্রুত রেফারেন্স দেখে নিতে পারতেন। নিজ স্মৃতি থেকে কিছু লেখতেন না তিনি, যতক্ষণ না সেটির উৎস দেখে নিতেন। তাঁকে সব সময় হয়তো সালাতে, না হয় তিলাওয়াতে কিংবা লেখালেখি অথবা অধ্যয়নরত দেখা যেত।

বর্ণিত আছে, তিনি একদিন সঙ্গীদের সাথে একটি দর্শনীয় স্থান দেখার উদ্দেশ্যে দামেস্কে গেলেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর সঙ্গীরা কিছু সময় তাঁর কথা ভুলে গেল। একটু পর তাঁকে না পেয়ে খুঁজতে লাগল সবাই। দীর্ঘ সময় খোঁজার পর সঙ্গীরা দেখলেন, তিনি এক জায়গায় বসে সাথে থাকা খাতার পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছেন।

قَلْبٌ يُطِلُّ عَلَى الْأَفْكَارِ، وَيَدٌ *** تُمْضِيْ الْأُمُوْرَ، وَنَفْسٌ لَهْوُهَا التَّعَبُ

....

৪৭৯. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ : ১০/১৪৪

'চাই এমন এক হৃদয়, ফিকিরগুলোকে যে পরিশোধন করবে। চাই এমন এক হাত, যা কর্মব্যস্ত থাকবে। চাই এমন এক হৃদয়, পরিশ্রমেই যে আনন্দ খুঁজে পাবে।

শাইখ আহমাদ বিন আলি নাজমুদ্দিন বিন রফআহ ﷺ। অনেক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত। একদিন তাঁর কব্জিতে ব্যথা উঠল। এমনকি কাপড় লাগলেও যন্ত্রণা করত। এতদসত্ত্বেও তিনি একটি কিতাব পড়েই যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে কখনো কখনো বেশ মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করছিলেন তিনি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর মাঝে মুনাজারা হওয়ার পর ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আমি এমন একজন শাইখকে দেখেছি, যার দাঁড়ি থেকে শাফিয়ি শাখাগুলো ঝরে পড়ছে।'

তাঁর ব্যাপারে ইসনাবি বলেন, 'ইবনুল হাদ্দাদের পর মিশর তাঁর চেয়ে বড় ফকিহ জন্ম দেয়নি।'[৪৮০]

বর্ণিত আছে, হাসান বিন হাইসামের নিকট মিশরের গভর্নর অনেক সম্পদ পাঠালেন। তখন তিনি গর্ভনরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার জন্য একদিনের খাবার, একটি বাঁদি ও সেবকই যথেষ্ট। একদিনের খাবারের বেশি যা, তা যদি আমি আটকে রাখি, তবে আমি তোমার খাদ্যের দায়িত্বশীল। আর যদি তা বিলিয়ে দিই, তবে আমি তোমার নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী। আর যদি আমি এই দুটি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তবে আমার কাজ ও ইলম নিয়ে কে ব্যস্ত হবে?'[৪৮১]

০৬. হতাশাগ্রস্ত পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসা

বলা বাহুল্য, একজন ব্যক্তির মাঝে সমাজের চারপাশের লোকজন আক্ষরিক অর্থেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমাজ যদি অলসতা, নিস্তেজতা ও হীনতাকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো রোগে জর্জরিত হয়, তবে উচ্চ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিকে সে সমাজ পরিত্যাগ করে এমন স্থানে যেতে হবে—যেখানে গেলে মনোবলের উচ্চতা ঠিক থাকবে এবং তা নিজের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। যাতে সে ঘুণেধরা সমাজের কুপ্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সুযোগ

....

৪৮০. আদ-দুরারুল কামিনাহ : ১/৩০৬

৪৮১. রিআয়াতুন নাবিগিন : ১৫৩

লাভ করতে পারে মহান কিছু অর্জনের।[৪৮২]

নতুন পরিবেশ গ্রহণ এবং হিম্মতকে জাগিয়ে তোলার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে সদ্য তাওবাকারীর। কারণ, গুনাহের পরিবেশ থেকে ইবাদতের পরিবেশে হিজরত করার মাধ্যমে তার অন্তর থেকে মন্দ সংশ্রব ও খারাপ স্থানের আকর্ষণ চলে যায়। তার হৃদয়ে স্থিরতা বজায় থাকে। শক্তিশালী হিম্মত, সততা ও দৃঢ়তার মাধ্যমে একটি নতুন জীবন শুরু করার প্রয়াস বজায় থাকে। একশ জন মানুষ হত্যাকারী ব্যক্তিকে এদিকেই ইশারা করে আলিম তার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তাওবা কবুল হবে। তার ও তাওবার মাঝে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে?' আলিম আরও বলেন, 'তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেন। তুমি তাদের সাথে ইবাদত করো। নিজ ভূমিতে ফিরে যেয়ো না। কেননা, সেটা মন্দ ভূমি।' যখন তার মৃত্যু চলে আসলো, তখন তাকে নিয়ে রহমত ও আজাবের ফেরেশতাদের মাঝে বিবাদ শুরু হলো। সে নিজের মন্দ এলাকার তুলনায় নেককারদের এলাকার অধিক নিকটে ছিল বিধায় রহমতের ফেরেশতারা তার জানকবজ করে তাকে নিয়ে যায়। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, 'সে নেককারদের এলাকার এক বিঘত পরিমাণ নিকটে ছিল। তাই সে এলাকার অধিবাসী হিসেবে গণ্য হয়।' অন্য এক বর্ণনা মতে, আল্লাহ তাআলা মন্দ এলাকার প্রতি নির্দেশ দিলেন, 'তুমি দূরবর্তী হয়ে যাও' এবং পুণ্যময় এলাকাকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও।' এরপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা এই দুই এলাকার মাঝে দূরত্ব মেপে দেখো। তখন ফেরেশতারা দূরত্ব মেপে তাকে নেককারদের এলাকার এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী পেল; ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।' অপর এক বর্ণনা মতে, 'সে তাওবাকারী বুকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে পুণ্যময় এলাকার দিকে সরে যায়।'

সম্ভবত এ হিসেবেই শরিয়ত অবিবাহিত ব্যভিচারীকে দেশান্তরের বিধান দিয়েছে এবং তাকে এক বছর পর্যন্ত দূরবর্তী কোনো এলাকায় নির্বাসনে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। যাতে বেত্রাঘাতের মতো দৈহিক শাস্তির সাথে দেশান্তরের মতো আত্মিক শাস্তিও একত্রিত হয় ব্যভিচারীর ওপর। আর সে সময় সে

....

৪৮২. যদি দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত হয়, তাহলে এই হিজরত ফরজ।

পাপাচারের ভূমি থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে নিজের পাপের স্মৃতিচারণ থেকেও মুক্ত থাকতে পারবে। আর তার সাথে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাজনক আচরণেরও কোনো অবকাশ থাকবে না। নিজেকে সংকীর্ণতার মাঝেও নিক্ষেপ করতে হবে না তাকে। নতুনভাবে একনিষ্ঠ তাওবা ও পবিত্র জীবন শুরু করার জন্য যথেষ্ট সুযোগও পাবে সে।

সম্ভবত শরয়ি এই দলিল-প্রমাণ থেকেই তাবলিগ জামাআত নিজেদের একটি নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, মাদউকে তার পরিবেশ থেকে বের করে আনতে হবে এবং তাকে দীর্ঘ ও যথেষ্ট একটি সময় পর্যন্ত ভিন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। তাহলে এই তাওবাকারীর মাঝে নতুন চিন্তাধারা বপন করা সহজ হবে। সাথে সাথে তার হৃদয় থেকে পুরোনো সকল মন্দ ধ্যানধারণাও অতি সহজে দূর করা যাবে। এভাবে সহজ-সাবলীল, স্বয়ংক্রিয় ও কার্যকরভাবে একজন তাওবাকারী নতুন এক আদর্শ মানুষে পরিণত হবে। তাবলিগ জামাআতের লোকেরা এ ক্ষেত্রে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকেন। তারা বলেন, 'যদি অপবিত্র কোনো স্থানে কোনো মুক্তা পড়ে যায়, তাহলে সেখানে রেখে সেটি পরিষ্কার করতে হলে আমাদের প্রচুর পানি ঢালতে হবে। কিন্তু আমরা যদি সেটি উঠিয়ে নিয়ে পরিষ্কার কোনো স্থানে রেখে তার ওপর পানি ঢালি, তাহলে সামান্য পানি দ্বারাই তা পরিষ্কার করা সম্ভব হবে।'[৪৮৩]

০৭. উচ্চ মনোবল অধিকারী লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করা এবং তাদের বিষয়ে অধ্যয়ন করা

পাখিরা তাদের সমশ্রেণির সাথেই ওঠাবসা করে। বস্তুত প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে। মুমিন বান্দা নেককারদের বাণী শ্রবণের চেয়ে তাদের সংশ্রবের মাধ্যমে বেশি উপকৃত হয়। কারণ, তাদের দর্শন আল্লাহ তাআলার স্মরণ এনে দেয়। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ

'মানুষের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি আছে, যারা কল্যাণের চাবি এবং অকল্যাণের জন্য তালাস্বরূপ।'[৪৮৪]

....

৪৮৩. মুহাম্মাদ শারকাবি রচিত 'আস-সিফাতুস সিত্তু ইনদা জামাআতিত তাবলিগ'।

৪৮৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৩৭। হাদিসের মান : হাসান।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবে।'[৪৮৫]

ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, 'এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুল ﷺ বলেছেন, "তারা ওই সকল লোক, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।"'[৪৮৬]

আবু উবাইদা বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, 'যখন রবি বিন খুসাইম আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের নিকট প্রবেশ করতেন, তখন তাঁরা পরস্পর থেকে অবসর হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কারও জন্য তাঁদের নিকট প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ইবনে মাসউদ ﷺ রবি বিন খুসাইমকে বললেন, "হে আবু জাইদ, যদি রাসুল ﷺ তোমাকে দেখতেন, তবে তোমাকে ভালোবাসতেন। তোমাকে দেখলে আমার অনুগত বান্দাদের কথা স্মরণ হয়।"'

আরবরা বলে, 'যদি পুণ্যবান লোকদের অনুকরণের বিষয়টি না থাকত, তবে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত।'

জাইনুল আবিদিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি ﷺ বলেন, 'লোকদের তার কাছেই বসা উচিত, যার মাধ্যমে তার দ্বীনি ফায়দা হবে।'

أَنْتَ فِيْ النَّاسِ تُقَاسُ *** بِالَّذِيْ اخْتَرْتَ خَلِيْلَا

فَاصْحَبِ الْأَخْيَارَ تَعْلُوْ *** وَتَنَلْ ذِكْرًا جَمِيْلَا

'মানুষ তোমার বন্ধুর মাধ্যমে তোমাকে বিচার করবে। তাই নেককারদের সংশ্রব গ্রহণ করো, নিজেও উচ্চতায় বরিত হবে এবং অন্যের প্রশংসাও পাবে।'

....

৪৮৫. সুরা ইউনুস : ৬২

৪৮৬. আবু নুআইম ﷺ কৃত আখবারু ইসবাহান; ওয়াহিদি ও দাইলামি ﷺ এটি বর্ণনা করেন। বর্ণনার সূত্র সহিহ।

জাফর ﷺ বলেন, 'যখন আমি নিজের হৃদয়ে কঠোরতা অনুভব করি, তখন মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ-এর চেহারার দিকে তাকাই। আর আমি যখন তাঁর চেহারার দিকে তাকাই, তাঁকে সন্তানহারা মায়ের মতো দুঃখী মনে হয়।'

ইবনুল মুবারক ﷺ বলেন, 'যখন আমি ফুজাইলের চেহারার দিকে তাকাই, তখন আমার দুশ্চিন্তার নবায়ন হয় এবং আমার প্রবৃত্তির চাহিদা ধ্বংস হয়।'

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর নিকট যখন কারও সংশোধন হওয়া বা দুনিয়াবিমুখতা অথবা কারও হক আদায়ে এগিয়ে যাওয়া বা সৎ কাজে আনুগত্যের খবর পৌঁছাত, তিনি তার খোঁজখবর নিতেন। ওই লোকের সাথে পরিচিত হতে চাইতেন। তার খোঁজখবর রাখা পছন্দ করতেন।

কারণ, কাউকে সান্নিধ্য দেওয়ার আগে তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যারা ইমাম আহমাদ ﷺ-এর নিকটবর্তী হতে চাইতেন, তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করতে চাইতেন—তাদের ব্যাপারে তিনি খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান করতেন। তাঁর ব্যাপারে এ বিষয়টি সবার কাছে ছড়িয়ে পড়ে।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ থেকে বিবিধ উপকারিতা অর্জনের আলোচনায় বলেন :

'আল্লাহ তাআলা জানেন, আমি কখনো ইবনে তাইমিয়া ﷺ-এর মতো সুখী মানুষ দেখিনি। যদিও তাঁর জীবনে সংকীর্ণতা ছিল। তিনি ছিলেন শৌখিনতা ও বিলাসিতা-বিরোধী। তাঁর চালচলন ছিল এ দুটোর বিপরীত। তিনি কারাবরণ করেছেন। ভয়ভীতি ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুখী, হৃদয়ের দিক থেকে সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী, লোক দেখানোর দিক থেকে সবচেয়ে বেশি গোপন। তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হতো জান্নাতের সজীবতা। যখন আমরা কঠিন ভয়ের শিকার হতাম, বিভিন্ন মন্দ ধারণা আমাদের বেষ্টন করে নিত এবং জমিন আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসত, তখন আমরা তাঁর কাছে আসতাম। তাঁকে দেখতাম আর তাঁর কথা শোনার মধ্যে মগ্ন থাকতাম। এভাবে আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যেত। দুশ্চিন্তার স্থলে অন্তরে শক্তি, বিশ্বাস ও প্রশান্তি ভরে উঠত।'[৪৮৭]

....

৪৮৭. আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব : ৮৬

কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করার নিমিত্তে যখন তুমি উচ্চ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তির সংশ্রব গ্রহণ করতে চাও, তখন মুহাম্মাদ বিন আলি সুলামি ﵀-এর এ কথাটি নিয়ে চিন্তা কোরো, 'আমি আলি বিন আখরাম ﵀-এর নিকট তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ নিতে গভীর রাতে উঠে রওয়ানা হলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, আমার আগেই তাঁর কাছে ত্রিশজন এসে অপেক্ষা করছে। আমি সেদিন আসরের আগ পর্যন্ত কোনো সুযোগই পেলাম না।'

আলি বিন হুসাইন বিন শাকিক ﵀ বলেন, 'আমি হিমশীতল একরাতে ইবনুল মুবারকের সাথে মসজিদ থেকে উঠে দাঁড়ালাম। দরজার নিকট তিনি একটি হাদিসের আলোচনা শুরু করলেন বা আমি একটি হাদিসের আলোচনা শুরু করলাম। আমরা এভাবে আলোচনা করতে থাকলাম। একসময় দেখলাম, মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিতে চলে এসেছেন।'

কবি ইকবাল আল্লাহর কাছে উচ্চ মনোবলের নিয়ামত প্রার্থনা করছেন। তিনি বলছেন :

هَبْ نَجِيًّا يَا وَلِيَّ النِّعْمَةِ *** مُحْرَمًا يُدْرِكُ مَا فِيْ فِطْرَتِيْ

هَبْ نَجِيًّا لَقِنًا ذَا جَنَّةٍ *** لَيْسَ بِالدُّنْيَا لَهُ مِنْ صِلَةٍ

'নিয়ামতের অধিকারী হে প্রভু, আমায় এমন একজন পবিত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু দিন, যে আমার মেজাজ বুঝতে পারে। প্রভু আমায় এমন এক বুদ্ধিমান অন্তরঙ্গ বন্ধু দিন, দুনিয়া নয় জান্নাতের সঙ্গে থাকবে যার সম্পর্ক।'

আমিরুল মুমিনিন উমর ﵁ বলেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে নেককার বন্ধুর চেয়ে উত্তম কোনো নিয়ামত দেওয়া হয়নি। তাই যখন তোমাদের কেউ তার বন্ধুর মাঝে হৃদ্যতা দেখতে পায়, তখন যেন সে তাকে আঁকড়ে ধরে।'

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'আমাদের ভাইয়েরা আমাদের কাছে নিজের পরিবার ও সন্তানাদি থেকে অধিক প্রিয়। কারণ, পরিবার আমাদের দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর আমাদের ভাইয়েরা আমাদের আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

উসতাজ ড. খালদুন আহদাব বলেন :

'সময়কে পুঁজি করে যারা জীবনমাঠে সোনার ফসল ফলেছেন আর তাদের জীবনের ফলাফলও ছিল বিস্ময়কর, আমরা এমন মানুষের প্রতি লক্ষ করলে দেখতে পাই—তারা কেবল সৎকর্ম সম্পাদনকারী পরিশ্রমী, মেধাবী ও সচেতন লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করেছেন, যারা সময়ের প্রতি নিজেদের জীবনের মতো গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, সময়ই জীবন।

মর্যাদাবান মানুষের কয়েক মিনিট কিংবা কয়েক সেকেন্ডের সংশ্রব মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। ইমাম ইবনে জারির তাবারি, ইবনে আকিল হাম্বলি, ইবনে আসাকির, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, ইবনুন নাফিস, মিজিইয়ি, জাহাবি ও ইবনে হাজার ﵏-এর মতো ব্যক্তিদের অঢেল পরিশ্রম ও বিরাট কারনামার পেছনে কাজ করেছে উত্তম সংশ্রবের ফলে প্রাপ্ত উচ্চ মনোবল।

"আল-ফুনুন" গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম ইবনে আকিল হাম্বলি ﵀ বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে যৌবনের শুরুতে বিভিন্নভাবে রক্ষা করেছেন। আমার ভালোবাসা শুধু ইলম ও আহলে ইলমের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই আমি কখনো খেলোয়াড়দের কাছে মিশতে যাইনি। যারা আমার মতো ইলমপিপাসু ছিল, তাদের ছাড়া অন্য কারও সাথে মেলামেশা ছিল না আমার।"

তাই তাওফিকপ্রাপ্ত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে শুধু আহলে ইলম ও আমলকারী, পরিশ্রম ও সাধনাকারী, হিকমত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ লোকদের সঙ্গেই দেখতে পাবে তুমি। উচ্চাভিলাষী এভাবে শ্রেষ্ঠ লোকদের মাঝে থাকা গুণাবলির পূর্ণ বা কিয়দাংশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে সে তাদের মতো বা তাদের কাছাকাছি মর্যাদায় আসীন হতে পারে।

শ্রেষ্ঠ মানুষের সংশ্রব সময়কে মূল্যায়নের শিক্ষা দেয়। আর অলস-অকর্মণ্যের সংশ্রব সময়কে অবমূল্যায়নের শিক্ষা দেয়।

আমাদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন, "মানুষকে তার সঙ্গীর মাধ্যমে মেপে নাও। কেননা, প্রত্যেকে নিজের সমশ্রেণির মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে।"

তাই আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে অলস-অকর্মণ্যদের সংশ্রব থেকে আশ্রয় কামনা করছি।'[৪৮৮]

ইমাম গাজালি ﷺ উল্লেখ করেন, 'ভদ্রলোকের ভদ্রতা হলো, মন্দলোকদের সাথে ওঠাবসা থেকে বেঁচে থাকা। যাতে তার হৃদয়রাজ্য জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকে। এভাবে তার হৃদয় শয়তানের নোংরামি থেকে পবিত্র থাকবে।'[৪৮৯]

উচ্চ মনোবল তৈরিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অনুপ্রেরণাদায়ক মাধ্যমগুলোর একটি হলো, তুমি আল্লাহর এমন এক বান্দার সংশ্রব গ্রহণ করবে, যিনি ইলম ও ইবাদতে সাধনা করেন। এমন ব্যক্তির কথাবার্তার প্রতি লক্ষ করবে। তার অনুসরণ করবে। জনৈক সালাফ বলেন, 'যখন আমার মাঝে অলসতা দেখা দিত, আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ-এর দিকে দৃষ্টি দিতাম, তাঁর পরিশ্রম ও সাধনা দেখতাম। আর এর মাধ্যমে আমি এক সপ্তাহ যাবৎ আমল করার অনুপ্রেরণা পেতাম।'

তবে অনেক সময় এভাবে চিকিৎসা প্রয়োগের সুযোগ মিলে না। কেননা, বর্তমান যুগে সালাফের মতো সাধনাকারী লোক নেই। এ ক্ষেত্রে সালাফের জীবনী পড়া ও শোনার মাধ্যমে তাঁদের সাক্ষাৎ ও পরিদর্শনের এ অভাবটি পূরণ হবে। এ ক্ষেত্রে এর চেয়ে অধিক উপকারী কিছু নেই। সালাফে সালিহিনের চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট-পরিশ্রমের ঘটনাবলি আমাদের জন্য অতি উত্তম অনুপ্রেরণা হবে। মনে রাখতে হবে, তাঁরা কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন—সে কষ্ট-পরিশ্রম এখন কিন্তু প্রতিদানে চিরস্থায়ী সুখ হিসেবে রয়ে গেছে। এর সুখ ও শান্তি কখনো শেষ হবে না।

مَاتُوْا وَغُيِّبَ فِيْ التُّرَابِ شُخُوْصُهُمْ *** وَالنَّشْرُ مِسْكٌ وَالْعِظَامُ رَمِيْمُ

'তারা চলে গেছেন। মাটিতে মিশে গেছে তাদের দেহ ও জীর্ণ হাড়।
কিন্তু তাদের ইলম মিশকের সুরভি হয়ে আজও ঘুরে বেড়ায় বাতাসে।'

---

৪৮৮. সাওয়ানিহ ওয়া তাআম্মুলাত ফি কিমাতিজ জামান : ৪৮

৪৮৯. আইয়ুহাল ওয়ালাদ : ১৩০

ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀ ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেন :

'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণতার পথ হলো পূর্ববর্তী লেখকদের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করা। তাদের লেখা অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে একজন ছাত্র পূর্ববর্তীদের ইলম ও উচ্চ মনোবল সম্পর্কে জানতে পারবে, যা তার হৃদয়কে শক্তিশালী করে তুলবে, তার সংকল্পকে নতুনভাবে নাড়া দেবে পরিশ্রম ও সাধনার পথে। বস্তুত কোনো কিতাবই উপকার থেকে শূন্য নয়।

আমরা যেসব লোকের সাথে চলাফেরা করছি, তাদের চরিত্র গ্রহণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা তাদের মাঝে উচ্চ মনোবলের অধিকারী অনুসরণীয় কাউকে দেখছি না যে, একজন প্রথম স্তরের মানুষ তার অনুসরণ করতে পারে। আমরা এ সময়ের লোকদের মাঝে এমন কোনো পরহেজগার লোককেও দেখছি না, যার থেকে কোনো দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে।

তাই সাবধান, সতর্ক থাকো। তোমরা সালাফের জীবনীকে আঁকড়ে ধরো। তাঁদের জীবনচরিত, তাঁদের প্রণীত কিতাবাদি অধ্যয়ন করো। তাঁদের কিতাবাদি অধিক পরিমাণে অধ্যয়ন তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়ার সমতুল্য। যেমন কবি বলেন :

فَاتَنِيْ أَنْ أَرَى الدِّيَارَ بِطَرْفِيْ *** فَلَعَلِّيْ أَرَى الدِّيَارَ بِسَمْعِيْ

'আমি পৃথিবীকে আপন চোখে তো দেখতে পারিনি, এখন তাদের কথা শুনেই দুই কানের মাধ্যমে তাদের দেখি।'

এরপর ইবনুল জাওজি ﵀ পূর্ববর্তীদের কিতাব অধ্যয়নের ফলাফল উল্লেখ করে বলেন, 'আমি সেসব মানুষের জীবনী, তাদের পাহাড়সম হিম্মত, তাদের মুখস্থশক্তি, তাদের ইবাদত-বন্দেগি ও বিরল জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি দিলাম—বহু উপকার পেলাম, জানলাম অনেক কিছু। যে তাদের ব্যাপারে অধ্যয়ন করেনি, সে এসব জানতে পারবে না।'[৪৯০]

....

৪৯০. সাইদুল খাতির : ৩৬৬-৩৬৭

০৮. মুখলিস বান্দাদের উপদেশ

রাসুল ﷺ বলেন : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» 'নিশ্চয় দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা করা।' আমরা (সাহাবিগণ) বললাম : (لِمَنْ؟) 'কার জন্য?'

রাসুল ﷺ বললেন :

«لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

'আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের ইমামদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।'[৪৯১]

- এই উপদেশ প্রদানকারী হতে পারেন স্নেহশীল পিতা

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ؓ বলেন, 'আমার বয়স যখন পনেরো, তখন আমার পিতা আমাকে বললেন, "তোমার থেকে শরিয়তের শৈশবের বিধান চলে গেছে। তাই এখন থেকে উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো। তবেই তুমি তার অধিকারী বলে গণ্য হবে।" আমি আমার পিতার এই উপদেশকে আমার কম্পাস বানিয়ে নিয়েছিলাম। এ উপদেশের সাহায্যেই আমি পথ চলতাম। কখনো তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম না।'

- এই উপদেশ প্রদানকারী হতে পারেন স্নেহময়ী মা

দুই ফিতার অধিকারিণী আসমা বিনতে আবু বকর ؓ-এর কাছে যখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ؓ উপদেশ চাইলেন, তখন তিনি বলেন, 'সাবধান, হে বৎস, যদি তুমি মনে করো, তুমি সত্যের ওপর আছ—যার প্রতি দাওয়াহ প্রদান করা দরকার, তাহলে তা-ই করো। তুমি নিজের গর্দান বনু উমাইয়ার গোলামিতে আবদ্ধ কোরো না। যদি তা করো, তবে তারা তোমাকে নিয়ে খেলায় মত্ত হবে। কিন্তু যদি তুমি দুনিয়াপ্রত্যাশী হও, তবে তুমি আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা। তুমি নিজেকে ও নিজের সাথিদের ধ্বংস করলে। যদি তুমি বলো, আমি সত্যের ওপর ছিলাম, কিন্তু যখন আমার সাথিরা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন আমার নিয়ত দুর্বল হয়ে পড়েছে—তাহলে তুমি কোনো

[৪৯১]. সহিহু মুসলিম : ৫৫

স্বাধীনচেতা লোক নও এবং কল্যাণকর লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত নও। দুনিয়াতে তোমার স্থায়িত্ব কত দিনের? হে ইবনে জুবাইর, তুমি যা পাবে, তার চেয়ে নিহত হওয়া উত্তম। আল্লাহর শপথ, সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত আমার কাছে লাঞ্ছনার সাথে বেত্রাঘাত থেকেও উত্তম।'

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ বললেন, 'আম্মা, আমি আশঙ্কা করছি, শামবাসী আমাকে হত্যার পর আমার শরীর বিকৃত করবে এবং শূলে চড়াবে।'

জননী আসমা ﷺ বললেন, 'আদরের ছেলে আমার, জবাইয়ের পর চামড়া ছিলে ফেলায় বকরির কোনো কষ্ট হয় না। নিজের দূরদৃষ্টির সাথে চলো। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।'

- কখনো উপদেশদাতা হয় নিজের বিশ্বস্ত স্ত্রী

স্ত্রী তার স্বামীকে কল্যাণকর কাজে উৎসাহ প্রদান করে। তার হিম্মত জাগিয়ে তোলে। যেমন আবু মুহাম্মাদ হাবিবের স্ত্রী। স্বামী ঘুমিয়ে থাকতেন। কিন্তু স্ত্রী ঠিকই রাতের বেলা জেগে উঠতেন। সাহরির সময় স্বামীকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'হে পুরুষ, জেগে ওঠো, রাত শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। দিবস অতি আসন্ন। সামনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু তোমার পাথেয় কম। নেককারদের কাফেলা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে। আর আমরা রয়ে গেছি পেছনে।'

বুদ্ধিমতী ও পুণ্যবতী স্ত্রী মাওজি বিনতে আবু ওয়াহতান। আমির মুহাম্মাদ বিন সাউদের স্ত্রী। হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে উম্মাহ যে নতুন সংস্কারবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে, তার সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী উপদেশ ছিল মহীয়সী এই নারীর। তিনিই তার স্বামীকে অনুপ্রাণিত করেছেন শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ-কে সাহায্য করার জন্য। তিনি তার স্বামীর কোমরকে শক্তিশালী করেছেন। তাওহিদের দাওয়াতের সাহায্য না করে যারা নিজেদের তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে তরবারি উঁচিয়ে ধরার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

- অনেক সময় উপদেশদাতা হয় সাধারণ মুসলিম

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ তাঁর পরীক্ষার সময়কার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আমরা রাহবায় গেলাম। গভীর রাতে সেখান থেকে রওয়ানা দিলাম। হঠাৎ আমাদের সামনে এক লোক এসে দাঁড়াল। সে বলল, "তোমাদের মাঝে আহমাদ বিন হাম্বল কে?" তখন বলা হলো, "ইনি"। সে উটচালককে বলল, "ধীরগতিতে চালাও।" এরপর আমার দিকে ফিরে বলল, "ওহে, যদি তোমাকে এখানে হত্যা করে দেওয়া হয় আর তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো, তবে তোমার কী অসুবিধা?" এরপর বলল, "আমি তোমাকে আল্লাহর আমানতে সোপর্দ করলাম।" তারপর সে চলে গেল। আমি তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, "সে আরবের রবিআ গোত্রের। গ্রামে পশমের কাজ করে। তাকে জাবির বিন আমির বলা হয়। ভালো মনে করা হয় তাকে।"'[৪৯২]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন, 'আমি (খলকে কুরআনের মাসআলায় পরীক্ষায় পড়ার পর) জনৈক বেদুইনের কথার চেয়ে শক্তিশালী কোনো কথা শুনিনি। সে আমার সাথে রাহবাহ তুকে[৪৯৩] কথা বলেছিল। সে বলল, "হে আহমাদ, যদি সত্যের জন্য তুমি নিহত হও, তবে তুমি শহিদ। আর যদি বেঁচে থাকো, তবে প্রশংসিত হয়ে বেঁচে থাকবে। সুতরাং হৃদয়কে শক্ত করো।"'[৪৯৪]

হাফিজ ইবনে কাসির ﷺ বর্ণনা করেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার সময় জনৈক বেদুইন তাঁকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, 'ওহে, তুমি হলে মানুষের নেতা। তুমি তাদের জন্য অকল্যাণকর হোয়ো না। তুমি বর্তমান যুগে মানুষের আমির। সুতরাং শাসকশ্রেণি তোমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছে, তার উত্তর প্রদানে সতর্ক থেকো, তাহলে তারাই তোমার ডাকে সাড়া দেবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন তুমিই তাদের পাপের বোঝা বহন করবে। যদি তুমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো, তাহলে তুমি যার ওপর আছ, তার ওপর সবর করো। কারণ, তোমার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক শুধু নিহত হওয়া।' ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, 'আমি তাদের

....

৪৯২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৪১

৪৯৩. ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত রাক্কা ও বাগদাদের মধ্যবর্তী একটি শহর।

৪৯৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৪১

যে কথায় সায় দিইনি, সত্যের ওপর অটল থেকেছি, এ ব্যাপারে সে বেদুইনের কথা আমার সংকল্পকে দৃঢ় করেছে।'[৪৯৫]

যখন ক্রুসেডাররা একজন মুসলিমকে বন্দী করে নেয়, তখন সে মসজিদে আকসার ভাষায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে ডেকে চমৎকার একটি কবিতা আবৃত্তি করে :

يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الَّذِيْ *** لِمَعَالِمِ الصُّلْبَانِ نَكَّسْ

جَاءَتْ إِلَيْكَ ظُلَامَةٌ *** تَسْعَى مِنَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسْ

كُلُّ الْمَسَاجِدِ طُهِّرَتْ *** وَأَنَا- عَلَى شَرَفِيْ- مُنَجَّسْ

'ক্রুশের নিদর্শন পদদলনকারী হে বাদশাহ, মজলুমের ডাক এসেছে তোমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে। পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদ পবিত্র হয়েছে। আর আমি এত মর্যাদাবান হয়েও আজও অপবিত্র!'

- আলিমদের উপদেশ

হিম্মত জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আলিমদের উপদেশের সৌন্দর্য ও গভীরতার ব্যাপারে প্রশ্ন কোরো না।

ইমাম আহমাদ ﷬-কে বেড়ি পরিয়ে খলিফা মামুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। খলিফার কাছে পৌঁছার আগে তাকে অনেক ভয়ভীতি দেখানো হলো। এমনকি এক খাদিম পর্যন্ত ইমাম আহমাদকে বলতে লাগল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, মামুন এমন এক তরবারি ধারালো করেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো করেনি। সে রাসুল ﷺ-এর আত্মীয়তার শপথ করেছে। যদি তুমি কুরআন মাখলুক হওয়ার দাবির প্রতি স্বীকৃতি না দাও, তবে সেই তরবারি দিয়ে তোমাকে হত্যা করবে সে।'[৪৯৬]

তখন আবু জাফর আম্বারি ইমামের কোমর শক্তিশালী করতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'যখন ইমামকে মামুনের কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমি অবহিত হলাম, তখন ফুরাত নদী পার হয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম,

৪৯৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৪১
৪৯৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/৩৩২

তিনি একটি সরাইখানায় বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "আবু জাফর, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।" আমি বললাম, "ওহে জনাব, আপনি হলেন বর্তমানে মানুষের নেতা। মানুষ আপনার অনুসরণ করে। আল্লাহর শপথ, যদি আপনি আজ কুরআন মাখলুক হওয়ার মিথ্যাটি স্বীকার করে নেন, তবে সব মানুষ তা বলবে। আর যদি আপনি এমন কথা থেকে বিরত থাকেন, তবে অধিকাংশ মানুষ তা বলা থেকে বিরত থাকবে। এ ছাড়াও যদি লোকটা আপনাকে হত্যা নাও করে, তবুও আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাদের ডাকে সাড়া প্রদান থেকে বিরত থাকুন।" তখন আহমাদ ﷺ কাঁদতে থাকলেন। তিনি বলেন, "মাশাআল্লাহ!" এরপর বললেন, "হে আবু জাফর, আবার বলো!" আমি আবার বললাম এবং তিনি বললেন, "মাশাআল্লাহ!""[৪৯৭]

এই পরীক্ষার সঙ্গীর কথা বর্ণনা করে ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, 'আমি কাউকে এত অল্প বয়সে, ইলম অনুযায়ী আল্লাহর বিধানের ওপর অধিক দৃঢ় মুহাম্মাদ বিন নুহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখিনি। আমি আশা করি কল্যাণের সাথে তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সে একদিন আমাকে বলল, "আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি আমার মতো নন। আপনি অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। মানুষ আপনার প্রতি গর্দান উঁচু করে তাকিয়ে আছে। দেখছে, আপনি কী করেন। তাই আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর বিধানের ওপর অবিচল থাকুন।" এ বলে সে মারা গেল এবং আমি তাঁর জানাজা পড়িয়ে তাঁকে দাফন করলাম।'[৪৯৮]

সরাসরি ইমাম আহমাদের সাথে যা ঘটেছে, তার সাথে যিনি সংযুক্ত হতে পারেননি, তিনি আফসোস করেছেন যে, ইমাম আহমাদ যে কষ্ট ও যন্ত্রণা পেয়েছেন, তাতে তিনি শরিক হতে পারেননি। বিশর বিন হারিস হাফিকে ইমাম আহমাদকে শাস্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হলো, 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে ঘণ্টায় সতেরোটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে।' বিশর তখন নিজের পা ও নলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহ, এই পা কতই না মন্দ! এই লোকটির সাহায্যে যার পরনে বেড়ি জোটেনি!'[৪৯৯]

....

৪৯৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৩৮

৪৯৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৪২

৪৯৯. ইবনুল জাওজি ﷺ কৃত মানাকিবুল ইমাম আহমাদ : ১১৯

ইমাম জাহাবি ﷺ বলেন, 'হাফিজ কাসিম বিন মুহাম্মাদ আল-বিরজালি ﷺ। তিনি আমাকে হাদিসের প্রেমিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমার লেখা দেখে বলেছিলেন, "তোমার লেখা মুহাদ্দিসদের লেখার মতো।" তাঁর এ কথা আমার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমি তাঁর কাছে হাদিস শিক্ষা করি। কয়েকটি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে সনদ লাভ করি।'

০৯. সকল পরিস্থিতিতে অবিচলতা, ধারাবাহিকতা ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে ইমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো, মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো, সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থিত হয়ে থাকো আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারো।'[৫০০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

'তোমরা আল্লাহর জন্য সাধনা করো যেভাবে সাধনা করা উচিত।'[৫০১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদের আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।'[৫০২]

....

৫০০. সুরা আলি ইমরান : ২০০

৫০১. সুরা আল-হাজ : ৭৮

৫০২. সুরা আল-আনকাবুত : ৬৯

উচ্চ মনোবলের অধিকারী পরিস্থিতিকে ভয় করে না। সে সম্মুখ ছুটে চলে, কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের হিম্মতের বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। হিম্মত যেন হারিয়ে না যায়, এ ব্যাপারে সে সতর্ক থাকে। প্রথম সুযোগেই সে কাজ সম্পাদন করে নেয়।

لَيْسَ فِيْ كُلِّ حَالٍ وَأَوَانٍ *** تَتَهَيَّأُ صَنَائِعُ الْإِحْسَــانِ

فَإِذَا أَمْكَنَتْ فَبَادِرْ إِلَيْهَا *** حَذَراً مِنْ تَعَذُّرِ الْإِمْكَانِ

'কল্যাণকর কাজগুলো যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় করা যায় না। যখনই উত্তম কাজের উপযুক্ত সময় ও পরিস্থিতি তৈরি হবে, তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে যাও। হয়তো পরে এই সুযোগ আর থাকবে না—কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

উচ্চ মনোবলের অধিকারী হলো আগুনের শিখার মতো। আগুনের মশাল যতই মাটির গহীন গুহায় নেওয়া হয়, সেটা কেবল ওপরে উঠতে চায়, উঁচুতে যেতে চায়, তার গতি আকাশের দিকে থাকে। তেমনই উচ্চ মনোবলের অধিকারী যদি কখনো গ্রেফতার হয়, পায়ে-গলে শিকলে আবদ্ধও হয়, তবুও সে এতটুকু প্রভাবিত হয় না, তার হিম্মতে কমতি আসে না। বরং সে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজের কাজে অটল থাকে। সর্বদা আপন কাজে প্রবৃত্ত থাকে।

আর যে ব্যক্তি সুযোগ কাজে না লাগিয়ে বিলম্ব করে, সে যেন নিশ্চিত জেনে নেয়, সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কবি বলেন :

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا *** فَعُقْبَى كُلِّ خَافِقَةٍ سُكُوْنُ

'যখনই বাতাস প্রবাহিত হয়, তাকে কাজে লাগাও, পাল নামিয়ে দাও, সামনে এগিয়ে যাও। অনুকূল বাতাসে পতপত করে ওড়া প্রতিটি বস্তুই বাতাসের অভাবে শান্ত হয়ে যায়।'

রাসুল ﷺ-এর মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি যখন হিজরত করে মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা করলেন, তখন আবু বকর ؓ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হিজরতের পথে মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি স্থানে তাঁদের দুজনের

সাথে বুরাইদা বিন হাসিব আসলামি ও তার সঙ্গে থাকা একদল লোকের সাক্ষাৎ হলো। রাসুল ﷺ তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করল।[৫০৩] এখানে দেখো, কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁরা। কুরাইশরা রাসুল ﷺ-কে হত্যার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে। আর তিনি এ কঠিন পরিস্থিতিতেও দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রতিকূল অবস্থায়ও আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব থেকে কেউ বিরত রাখতে পারেনি তাঁকে (ﷺ)।

নবি ইউসুফ ﷺ (কারাগারে দাওয়াত দেওয়ার) সুযোগ পেলেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। দুই বন্দীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াকে গনিমত মনে করলেন তিনি। সুযোগটা লুফে নিলেন তাদের দুজনকে তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তিনি বললেন :

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

> ‘হে কারাগারের সঙ্গীরা, পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?’[৫০৪]...

শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসি ﷺ তাঁর কিতাব ‘আল-মাবসুত’ প্রায় পনেরো ভলিয়মে লিখিয়েছেন। যখন তিনি কিতাবটি লেখান, তখন তিনি বন্দী ছিলেন। খাকানকে উপদেশ দেওয়ার ফলে তাঁকে একটি কূপে বন্দী করে রাখা হয়। কোনো কিতাব মুতালাআ ছাড়াই নিজের অন্তর থেকে বলে যেতেন, আর তাঁর ছাত্ররা কূপের ওপর বসে লিখে নিতেন। তিনি ইবাদত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষ করে লেখালেন, ‘এখানে শেষ হলো সুস্পষ্ট অর্থ ও সুসংক্ষিপ্ত ইবারতে ইবাদতের বিস্তারিত বিবরণ। যা লিখিয়েছে একজন বন্দী জামাআতের পক্ষে।’ ইকরার অধ্যায় শেষে লেখালেন, ‘ইকরার অধ্যায় এখানেই শেষ। যেখানে বিবিধ কঠিন বিষয়ের খোলাসা করা হয়েছে। যা লিখিত হয়েছে অসৎ লোকদের জেলখানার একজন বন্দী থেকে।’

উসুলে ফিকহেও তাঁর একটি কিতাব রয়েছে। আবার ‘সিয়ারুল কাবির’-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি তিনি কূপে বন্দী অবস্থায় লিখিয়েছেন। তিনি যখন ‘বাবুশ শুরুত’

....

৫০৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/২১৬-২১৭

৫০৪. সুরা ইউসুফ : ৩৯

পর্যন্ত পৌঁছালেন, তখন মুক্তি পেলেন সেখান থেকে। জীবনের এ শেষ সময়ে ফারগানায় চলে গেলেন তিনি। সেখানের আমির হাসান তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ছাত্ররা উপস্থিত হতে থাকে। তখন তিনি কিতাবটি পূর্ণ লিখিয়ে দেন।[৫০৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ জেলে বসে নিজের ফতওয়া লিখতেন। এরপর ছাত্রদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। যখন বাদশাহ তাঁর কাছে থাকা কিতাব, কলম ও কাগজ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি ফতওয়া ও রিসালা লিখতে থাকেন কয়লা দিয়ে জেলের দেয়ালে।

---

৫০৫. আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যা (১৫৮)-এর লেখক নকল করেছেন 'মিন আখলাকিল উলামা' (২০২-২০৩) থেকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাদের শিশুরা এবং উচ্চ মনোবল

শিশুরাই উম্মাহর ভবিষ্যৎ

এটি বাস্তব। রূপক কিছু নয়। বেখেয়ালি কিছু নয়। শিশুরাই ভবিষ্যৎ উম্মাহ। এ কারণেই উচ্চ হিম্মত ব্যয় করে তাদের গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা উম্মাহর ভবিষ্যতের কর্ণধার হতে পারে। আমাদের উচিত এ সকল কুঁড়ি-মুকুলদের প্রতি নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। বর্তমানে আমাদের কাছে তারা বিনোদনমূলক খেলনার মতো। আমরা তাদের মাধ্যমে প্রবোধ লাভ করি। তাদের গঠন ও পরিচর্যার ব্যাপারে অবহেলা করি। আমরা ভুলে থাকি, শিশুদের শিক্ষার সূচনা শৈশব থেকেই করতে হয়।

উসতাজ মুহাম্মাদ সাব্বাগ বলেন :

'আমি উসতাজ মালিক বিন নাবি ﵀ কাছ থেকে শুনেছি, এক লোক তাঁর নবজাত শিশুর পরিচর্যার ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে আসলো। উসতাজ মালিক জিজ্ঞেস করলেন, "তার বয়স কত?" লোকটা বলল, "এক মাস"। উসতাজ মালিক বললেন, "তোমার ট্রেন ছুটে গেছে।" তিনি বলে চললেন, "শুরুতে আমি মনে করেছিলাম, আমি বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু যখন ভালোভাবে লক্ষ করলাম, তখন দেখলাম, আমার কথাই সঠিক। কারণ, সন্তান যখন চিৎকার করে, তখন মা তাকে দুধ পান করায়। ফলে তার মনে এই বিষয়টি বসে যায় যে, কান্নাকাটি করলে নিজের লক্ষ্য পূরণ হয়। সে এভাবেই বড় হতে থাকে। যখন কোনো ইহুদি তার ওপর আঘাত করে, তখন সে নিরাপদ মজলিসে থেকেও কান্নাকাটি করে...আর মনে করে, এ কান্না ও চিৎকার তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেবে। অথচ বাস্তবতা এমন নয়।"'[৫০৬]

তাই সংশোধনকারীদের উচিত সন্তান পরিচর্যা ও প্রতিপালনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপারে সঠিক নীতিমালাসমূহ পিতামাতাদের বোঝানোর জন্য অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করা। যাতে শিশুরা সুস্থ মানসিকতা নিয়ে যৌবনে পদার্পণ

....

৫০৬. নাজারাতুন ফিল উসরাতিল মুসলিমা : ১৪৬-১৪৭; টীকা।

করে। অন্যথায় সন্তান প্রতিপালনে অবহেলার ক্ষতির পরিণাম উম্মাহর জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

শিশুর জন্য প্রথম নিরাপদ দুর্গ হলো পরিবার। সাধারণত এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর পিতামাতা হলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইমাম আবু হামিদ গাজালি ﷺ বলেন, 'প্রতিটি শিশু পিতামাতার কাছে আমানত। শিশুর হৃদয় মূল্যবান মুক্তা। যদি শিশুকে কল্যাণে অভ্যস্ত করে তাকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সেভাবেই সে গড়ে উঠবে। দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। আর যদি তাকে অকল্যাণে অভ্যস্ত করা হয়, চতুষ্পদ জন্তুর মতো অবহেলা করা হয়, তবে সে দুর্ভাগা ও ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।... শিশুকে অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি হলো, তাকে ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া, আদবকায়দা শেখানো, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া...।' ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'সন্তানদের বিশৃঙ্খলার পেছনে অনুসন্ধান করেছি। অধিকাংশের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার কারণ পেয়েছি সন্তানের পিতামাতাকে।'

এ ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এই আয়াতটি নাজিল করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর—যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা-ই করে।'[৫০৭]

আমিরুল মুমিনিন আলি ﷺ বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের ও পরিবারকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দাও এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও।'

....

৫০৭. সুরা আত-তাহরিম : ৬

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন—সে কি দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করেছে নাকি অবহেলা করেছে? এমনকি পুরুষকে তার পরিবারের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করা হবে।'[৫০৮]

মাকাল বিন ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ

'আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করেছেন, আর সে কল্যাণকামী হয়ে দায়িত্ব আদায় না করলে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।'[৫০৯]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৫১০]

আল্লাহ তার ওপর রহম করুন, যে বলেছে :

قَدْ يَنْفَعُ الْأَدَبُ الْأَوْلَادَ فِيْ صِغَرٍ *** وَلَيْسَ يَنْفَعُهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَدَبُ
إِنَّ الْغُصُوْنَ إِذَا عَدَّلْتَهَا اعْتَدَلَتْ *** وَلَا يَلِيْنُ وَلَوْ لَيَّنْتَهُ الْخَشَبُ

....

৫০৮. নাসায়ি ﷺ কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৯১২৯, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪৪৯২, আবু নুআইম ﷺ কৃত হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/২৩৪। হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ এ হাদিসটি উল্লেখ করে একে সহিহ বলেছেন, দেখুন, ফাতহুল বারি : ১৩/১১৩।

৫০৯. সহিহুল বুখারি : ৭১৫০

৫১০. সহিহুল বুখারি : ৫২০০

> ‘শৈশবেই সন্তানরা আদব শেখে। বড় হয়ে যাওয়ার পর আদব আর কোনো কাজে আসে না। যেমনিভাবে গাছের কচি ডাল তুমি চাইলেই সোজা করতে পারবে। কিন্তু সেটি যখন বড় হয়ে শক্ত হয়ে যাবে, তখন চাইলেও তুমি তা সোজা করতে পারবে না।’

ইবনে খালদুন ﷺ বলেন, ‘শৈশবের শিক্ষাই সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে অন্তরে প্রোথিত হয়। শৈশবের শিক্ষাই পরবর্তী জীবনের ভিত্তি।’[৫১১]

বর্তমান যুগে শিশুদের তারবিয়াতের বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে আমাদের শিশুরা সব দিক থেকে ফিতনার আক্রমণের শিকার হচ্ছে। ফিতনার অগ্নিশিখা আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করছে। ভ্রান্ত পথের এসব দায়িরা দেখতে আমাদেরই মতো। আমাদের ভাষায় কথা বলে। তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে আমাদের সন্তানদের থেকে এমন এক নাস্তিক প্রজন্ম তৈরি করা, যারা সেক্যুলারিজমকে রব, দ্বীন ও জীবনবিধান হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে। যদি পিতামাতারা সন্তানদের ভালোভাবে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত না করে, তবে নাস্তিক ধর্মনিরেপক্ষতাবাদ তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। এমনকি নিজের কাতারে নিয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবে যুদ্ধ করার জন্য। যেমনটি ওই সকল দেশে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, যেসব দেশ বিকৃত এই সেক্যুলার ধর্মের প্রতি নিজেদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।

> وَمَنْ رَعَى غَنَمًا فِيْ أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ *** وَنَامَ عَنْهَا: تَوَلَّى رَعْيَهَا الْأَسَدُ
>
> ‘যে রাখাল হিংস্র প্রাণীর অভয়ারণ্যে বকরির পাল চরায়, তার চোখে যদি একটু ঘুমও নেমে আসে, তবে সিংহ এসে তার বকরি সাবাড় করে দেবে।’

পূর্ববর্তীগণ এই মহৎ কাজটি সম্পাদনে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। খলিফা মানসুর যখন বুন উমাইয়ার জেলে বন্দীদের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই বন্দিশালায় তোমাদের ওপর কোন শাস্তিটি সবচেয়ে কঠিন?’ তারা বললেন, ‘এখানে বন্দী থাকার কারণে নিজ সন্তানদের তারবিয়াত দিতে না পারায় আমরা সবচেয়ে বেশি কষ্টে নিপতিত।’

....

৫১১. আল-মুকাদ্দামা : ৩৩৪

যারা হিম্মতকে শুধু বয়সে বড়দের দিকেই সম্পৃক্ত করে ছোটদের অবহেলা করে সালাফ তাদের অপছন্দ করতেন। কেননা, উম্মাহ তাদের প্রতিও মুখাপেক্ষী। উম্মাহর প্রয়োজন তাদের। তারা হলো সে মৌলিক স্তম্ভ, যার ওপর নির্মিত হবে উম্মাহর ভবিষ্যৎ।

- কাবার পাশে একটি হালাকা বসল। আমর বিন আস ﷺ-ও নিজের তাওয়াফ শেষ করে তাদের সাথে বসলেন। তখন কিছু মানুষ দুজন তরুণকে সরিয়ে দিতে চাইল। আমর বিন আস ﷺ তখন বললেন, 'তোমরা এমনটি করো না। তাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও। তাদের কাছে এনে বসিয়ে শিক্ষা দাও। কারণ, আজ তারা এক প্রজন্মের ছোট মানুষ, কিন্তু অচিরেই তারা পরবর্তী প্রজন্মের বড় হবে। আমরা এক প্রজন্মের ছোট ছিলাম। কিন্তু এখন অন্য প্রজন্মের বড় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছি।'

ইবনে মুফলিহ ﷺ এই বাক্যগুলোর পর টীকা সংযোজন করে বলেন, 'এটিই সত্য কথা, কোনো সন্দেহ নেই এতে। শৈশবের ইলম অধিক দৃঢ়তার সাথে প্রোথিত হয় মনের ভেতর। তাই ছোট ছোট ছাত্রদের প্রতি বেশি যত্নশীল হওয়া উচিত, তাদের গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত। বিশেষ করে তাদের, যারা সচেতন, মেধাবী এবং ইলম অর্জনে আগ্রহী। তাদের শৈশব, দারিদ্র্য বা দুর্বলতা যেন তাদের দেখাশোনা ও গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধানের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।'[৫১২]

ইমাম আশ-শাশি মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-ফকিহ আশ-শাফিয়ি ﷺ কবিতা আবৃত্তি করে বলেন :

تَعَلَّمْ يَا فَتَى وَالْعُوْدُ رَطْبٌ *** وَطِيْنُكَ لَيِّنٌ وَالطَّبْعُ قَابِلُ

'হে তরুণ, ডাল সজীব থাকা অবস্থায়, তোমার মাটি কোমল আর স্বভাব উপযুক্ত অবস্থায় তুমি ইলম শিখে নাও।'

....

৫১২. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ওয়াল মানহুল মারইয়্যাহ : ১/২২৫

উচ্চ মনোবল শৈশব থেকেই প্রকাশ পায়

সফলতার চিহ্ন ও প্রতিভাধর চিন্তাধারার নিদর্শন শৈশব থেকেই প্রকাশ পায় একজন মানুষের মাঝে। এ প্রতিভাধর মানুষদের সফলতার উচ্চতায় পৌঁছা, মর্যাদার উচ্চাসনে আরোহণ, নেতৃত্বের পদমর্যাদায় বরিত হওয়ার ব্যাপারে একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুমিন সন্দেহ করতে পারে না।

মুসলিমগণ প্রতিভাবান লোকদের চেনার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য বোঝার ব্যাপারে গবেষণা করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা সূক্ষ্ম কিছু মাপকাঠি তৈরি করেছেন। তারা ওই সকল শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন, যাদের মাঝে প্রতিভার নিদর্শন দেখা যেত।

ইমাম ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন :

'আমি ওই সকল লোককে নিয়ে চিন্তা করলাম, আল্লাহ তাআলা যাদের নিজের বিলায়াত ও নৈকট্য প্রদান করে ধন্য করেছেন। আমি তাদের গুণাবলি এবং যাকে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করেছি, তাদের গুণাবলি সম্পর্কে জেনেছি।

আমি দেখলাম, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিলায়াতের জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন, যে আকৃতিতে পূর্ণ গঠনের অধিকারী; তার আকৃতিতে কোনো দোষ থাকে না। তার স্বভাবেও কোনো কমতি থাকে না। আপনি তাকে সুন্দর চেহারা, সঠিক গঠনে পাবেন এবং শারীরিক ত্রুটি থেকে নিরাপদ পাবেন। একইভাবে সে অভ্যন্তরীণভাবেও পূর্ণতার অধিকারী হয়ে যাক। সে দানশীল, দয়াশীল, বুদ্ধিমান হয়; সে হয় ধোঁকা ও প্রবঞ্চনামুক্ত, হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এবং তার মাঝে অন্য কোনো অভ্যন্তরীণ দোষও থাকে না।

তারাই এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হন, যারা ছোট বয়স থেকেই সঠিক পরিচর্যা ও প্রতিপালন পেয়েছেন। তুমি দেখবে যে, শৈশবেও সে শিশুসুলভ আচরণ থেকে দূরে থাকে। কেমন যেন শৈশবেই সে বড় হয়ে গেছে। মন্দগুণ থেকে বেঁচে থাকে। দূরে থাকে নোংরা বিষয় থেকে। এভাবে সময়ের আবর্তনে তার হিম্মতের বৃক্ষ শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে যৌবনে সে হিম্মতের বৃক্ষের ডালে ফল পেকে ঝুলতে থাকে। সে ইলমের প্রতি আগ্রহী, আমলের প্রতি ধাবিত,

সময়ের প্রতি যত্নশীল, উত্তম গুণ অর্জনে দ্রুতগামী এবং মন্দ বিষয় থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

যদি তুমি দেখো আল্লাহর দেওয়া তাওফিক তাকে বেষ্টন করে রাখতে, তবে দেখবে সে তাওফিক কীভাবে পদস্খলনের সময় তার হাত আঁকড়ে ধরে এবং পাপের ইচ্ছা জাগ্রত হলে তাকে বাধা প্রদান করে। আল্লাহর তাওফিক তাকে উত্তম কাজে লাগিয়ে রাখে। একসময় তার থেকে অনুপম কারনামা প্রকাশ পায়।'[৫১৩]

- মুহাম্মাদ বিন জাহহাক বলেন, 'আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান র'সে জালুত বা ইবনে র'সে জালুতকে জিজ্ঞেস করলেন, "শিশুদের প্রতিভার মাপকাঠি কী? কীভাবে তোমরা এটা বুঝতে পারো?" তিনি বললেন, "তাদের ব্যাপারে আমাদের কাছে কিছুই নেই। কেননা, তারা একের পর এক সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আমরা তাদের পর্যবেক্ষণ করি। যদি আমরা তাদের কাউকে খেলার সময় বলতে শুনি যে, "আমার সঙ্গে কে কে খেলবে?" তাহলে তাকে উচ্চ মনোবলের অধিকারী এবং সহানুভূতিশীল মনে করি। আর যদি তাকে বলতে শুনি যে, "আমি কার সঙ্গে খেলব?" তাহলে আমরা তার এমন কথাকে অপছন্দ করি।"'

- আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে প্রথম জানা যায় এ ঘটনার মাধ্যমে—শৈশবে একদিন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন। এক লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের ওপর গলা হাঁকিয়ে কথা বলতে লাগল। সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু ইবনে জুবাইর কাহকারি তাদের নিকট গিয়ে বললেন, 'হে শিশুরা, তোমরা আমাকে তোমাদের আমির বানিয়ে দাও এবং আমার সাথে মিলে তার ওপর প্রকট হও।'

আরেক দিনের ঘটনা। ইবনে জুবাইর শিশুদের সাথে খেলছিলেন। সে সময় উমর বিন খাত্তাব ﷺ সে পথ ধরে যাচ্ছিলেন। উমর ﷺ-কে দেখামাত্র সব শিশুরা পালিয়ে গেল। কিন্তু ইবনে জুবাইর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উমর ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার সাথিদের সাথে পালিয়ে গেলে না?' তিনি বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কোনো অপরাধ করিনি যে, আমি ভয় করব। আর রাস্তাও সংকীর্ণ নয় যে, আপনার জন্য সরে গিয়ে রাস্তা প্রশস্ত করে দেবো।'

....

৫১৩. সাইদুল খাতির : ৪৪১

এমন মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারেই কবি বলেন :

رُفِعَتْ إِلَيْـكَ وَمَـا ثُغِـرْ *** تَ عُيُوْنُ مُسْتَمِعٍ وَّنَـاظِرِ

وَرَأَوْا عَلَيْكَ وَمِنْكَ فِي الْـ *** ـمَهْدِ النُّهَى ذَاتَ الْبَصَائِرِ

'তোমার তখন দুধদাঁতও পড়েনি। তখন তোমার প্রতি অনুসন্ধানী কিছু চোখ তাকিয়েছিল। দেখেছিল দোলনায় দোল খাওয়ার সময়টাতেই তোমার মাঝে প্রতিভা ও বিচক্ষণতার ছাপ।'

- হাতিয়াহ দেখলেন, অল্পবয়সী ইবনে আব্বাস ﷺ উমর ﷺ-এর মজলিসে বসে কথা বলছে। তিনি তখন বললেন, 'এই লোকটি কে—যে বয়সে সবার ছোট, কিন্তু কথায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে?' তখন ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, 'যদি সে আমাদের বয়সের হতো, তবে আমাদের কেউ তাঁর ইলমের দশভাগের এক ভাগেও পৌছাত না।'

- বুকাইর বিন আখনাস ﷺ মুহাল্লাব ﷺ-কে ছোটবেলায় দেখে বললেন :

خُذُوْنِيْ بِهِ إِنْ لَمْ يَسُدْ سَرَوَاتِهِمْ *** وَيَبْرَعْ حَتَّى لَا يَكُوْنَ لَهُ مَثَلُ

'তোমরা আমাকে পাকড়াও কোরো, যদি আমার এ কথা সত্যি না হয়। এ বালক একদিন নেতৃত্ব দেবে, এক অতুলনীয় মহাজ্ঞানী হবে।'

- হামজা বিন বিদ ﷺ মুখাল্লাদ বিন ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে লক্ষ্য করে বলেন :

بَلَغْتَ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ سِنِّيْ *** ـكَ مَا يَبْلُغُ السَّيِّدُ الْأَشْيَبُ

فَهَمُّكَ فِيْهَا جِسَـامُ الْأُمُـوْرِ *** وَهَمُّ لِدَاتِـكَ أَنْ يَلْـعَبُـوْا

'দশ বছর বয়স তোমার। এখনই তুমি সে স্থানে পৌছলে, যে স্থানে শুভ্রকেশী নেতা পৌছতে পারে। তোমার সংকল্প বিরাট কিছু করার। অথচ তোমার সমবয়সীরা সংকল্প করে খেলায় মত্ত হওয়ার।'

- মামুনের সভায় এক লোক আবু দুলাফের দিকে দৃষ্টি দিলেন। বললেন, 'তার হিম্মত তার বয়সকে ছাড়িয়ে যাবে।'

- ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব আল-আবিদ বলেন, 'আমাদের কাছে আবুল মুসান্না বর্ণনা করেছেন, আমি লোকদের বলতে শুনলাম, "সাওরি এসেছে। সাওরি এসেছে।" তাকে দেখার বাসনায় বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। এসে দেখি, এ যে বালকমাত্র। ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা পড়েছে মাত্র।'

- ইমাম জাহাবি ﷺ বলেন, 'ছোটবেলায় মেধার প্রখরতা ও মুখস্থশক্তির কারণে মানুষ বিশেষ প্রতিভাধর বলে প্রশংসা করত তাঁর। তিনি যুবক বয়সেই হাদিস বর্ণনা শুরু করেন।'

ইবনে মাহদি বলেন, 'আবু ইসহাক সাবিয়ি ﷺ সুফইয়ান সাওরিকে আসতে দেখে তিলাওয়াত করলেন :

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

"আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছি।"'[৫১৪]

- ইমাম বুখারি ﷺ ছিলেন খুব মেধাবী। তীক্ষ্ণ মুখস্থশক্তির অধিকারী। বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ করে ফেলেন তিনি। কোনো লেখার দিকে একবার দেখলেই সেসব মুখস্থ হয়ে যেত তাঁর।

মুহাম্মাদ বিন হাতিম বলেন, 'আমি ও অল্পবয়সী ইমাম বুখারি লেখকদের কাছে যাতায়াত করতাম। তিনি হাদিস শুনতেন। কিন্তু লিখতেন না। এভাবে কয়েক দিন করলেন তিনি। আমরা তাঁকে আমাদের মতো লিখতে বলতাম। যখন আমাদের লেখা হাদিসের সংখ্যা পনেরো হাজার হয়ে গেল, তাঁর কাছ থেকে সেগুলো শ্রবণ করতে চাইলাম আমরা। তিনি একেবারে সব হাদিস মুখস্থ পড়ে গেলেন। এরপর থেকে তাঁর মুখস্থ অনুযায়ী আমরা নিজেদের লেখা ঠিক করে নিতাম।'

....

৫১৪. সুরা মারইয়াম : ১২

- ইমাম জাহাবি ﷺ মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারিকে বলতে শুনেছি, 'শৈশবে আমি মারও এলাকায় ফকিহদের নিকট ইলম শিখতে যেতাম। তাঁদের নিকট গিয়ে সালাম দিতে লজ্জা পেতাম। (কারণ, মজলিসে সব বয়স্ক মানুষ বসা। ইলমের আলোচনা করতেন তাঁরা। আর বুখারি ﷺ তখন কেবল বালকমাত্র।) এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কতটি হাদিস লিখেছ?" আমি বললাম, "দুটি।" ফলে মজলিসে উপস্থিত সবাই হেসে দিল। তখন তাদের মধ্যকার এক শাইখ বললেন, "তোমরা তাকে নিয়ে হেসো না। হয়তো সে-ই একদিন তোমাদের নিয়ে হাসবে।" এ শাইখ বালক বুখারির মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আলামত দেখতে পেয়েছিলেন।'

বকর বিন মিম্বার বলেন, আমি বুখারি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আমি আবু হাফস বিন আহমাদ বিন হাফসের নিকট ছিলাম। আমার পিতা থেকে প্রাপ্ত কিতাবের মাধ্যমে আমি সুফইয়ান সাওরির "কিতাবুল জামি" শ্রবণ করছিলাম। তখন আবু হাফস এমন একটি হরফ পাঠ করছিলেন, যা আমার কিতাবে ছিল না। তাই আমি পুনরায় পাঠ করতে বললাম। এভাবে দুবার, তিনবার ঘটল। এরপর চুপ হয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর মজলিসের বাকিদের বললেন, "ইনি কে?" লোকেরা বলল, "ইসমাইলের ছেলে।" তিনি বললেন, "সে যেমন বলেছে, বিষয়টি তেমনই। আর তোমরা মনে রেখো, সে একদিন মহান ব্যক্তি হবে।"'

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরিস আশ-শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'আমি এতিম অবস্থায় মায়ের কোলে ছিলাম। মা আমাকে একজন শিক্ষকের কাছে পাঠালেন। কিন্তু শিক্ষককে দেওয়ার মতো মায়ের কাছে কিছুই ছিল না। শিক্ষক আমার ব্যাপারে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, যখন তিনি দাঁড়িয়ে যাবেন, তখন আমি তাঁর অনুসরণ করব। যখন কুরআন মুখস্থ হয়ে গেল, আমি মসজিদে গিয়ে আলিমদের মজলিসে বসতাম। আমি হাদিস ও মাসআলা শুনে শুনে তা মুখস্থ করে নিতাম। আমার মায়ের কাছে এতটুকু অর্থ ছিল না, যা দিয়ে আমি কাগজ কিনতে পারি। আমি হাড় কুড়িয়ে তাতে লিখে নিতাম। যখন হাড় পূর্ণ হয়ে যেত, তখন একটি বড় পাত্রে ফেলে রাখতাম। এভাবে আমি দুটি বড় বড় পাত্র ভর্তি করে ফেলি লিখিত হাড় দিয়ে।'

রবি ﵀ বলেন, আমি শাফিয়ি ﵀-কে বলতে শুনেছি, 'আমি শিক্ষকের নিকট কিতাব শ্রবণ করতাম। তিনি শিশুদের আয়াত শিক্ষা দিতেন। আমি তা মুখস্থ করে নিতাম। শিশুরা তাদের লেখা লিখে নিত। যতক্ষণে শিক্ষক শিশুদের লেখিয়ে দিতেন, ততক্ষণে আমি সব মুখস্থ করে নিতাম। একদা তিনি বললেন, "আমার জন্য তোমার থেকে কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না।"'

তিনি বলেন, 'এরপর যখন আমি শিক্ষকের নিকট থেকে বের হয়ে যেতাম, তখন চীনামাটির পাত্র, পাতলা চামড়া, খেজুর গাছের চওড়া পাতা, উটের কাঁধের হাড় কুড়াতাম এবং তাতে হাদিস লিখে নিতাম। লিপিকারদের কাছে এসে তাদের থেকে এক পিঠ লিখিত ফেলে দেওয়া কাগজ চেয়ে নিতাম, এরপর সেগুলোতে লিখতাম। আমার মায়ের কাছে দুটি বড় বড় পাত্র ছিল। আমি সে দুটি পাত্র লিখিত হাড়ে পূর্ণ করে ফেলি।'

- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ ছোটবেলায় কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন এবং ইলমে কিরাত ও লেখালেখি শিখে নেন। এরপর লেখার অনুশীলনের জন্য কাব্য সংকলকদের কাছে যেতে লাগলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি ছোটবেলায় শিক্ষকদের কাছে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করি। এরপর চোদ্দো বছর বয়সে কাব্য সংকলকদের কাছে গিয়ে লেখার অনুশীলন করি।' ছোটবেলা থেকেই তাঁর মাঝে প্রতিভা ও জ্ঞানের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। তাঁর জনৈক অভিভাবক বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের জন্য আদব শিক্ষা দিতে আলাদা শিক্ষক নিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি তাদের সফল হতে দেখিনি। আর আহমাদ বিন হাম্বল একটি এতিম ছেলে। তাঁর দিকে লক্ষ করো, সে কেমন?' তাঁর আদবকায়দা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যেত।

তাঁর চাচা জনৈক গভর্নরকে বাগদাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করে চিঠি পাঠালেন, যাতে তা খলিফাকে জানাতে পারেন। একদা তিনি চিঠি নিয়ে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমাদ বিন হাম্বলকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি অপবাদের ভয়ে তা পানিতে ফেলে দিলেন। কারণ, এতে মুসলিমদের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। বালক আহমাদের এমন প্রতিভা ও সতর্কতা অনেক আহলে ইলম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তাঁর সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। এমনকি হাইসাম বিন জামিল বলেন, 'যদি এই তরুণ বেঁচে থাকে, তবে সে নিজ জমানার লোকদের জন্য প্রমাণ হবে।'

- হাফিজ ইবনে আব্দুল হাদি বিন কুদামা ﷺ বলেন, 'আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, হালবের জনৈক আলিম দামেস্কে আগমন করেছেন। তিনি বলেন, "আমি শুনেছি, এই শহরে তীক্ষ্ণ মুখস্থশক্তির অধিকারী একটি শিশু আছে, যার নাম আহমাদ বিন তাইমিয়া। আমি তাঁকে দেখার আশায় এখানে এসেছি।" একজন দরজি তাঁকে বলল, "তাঁর মকতবে যাওয়ার পথ এটি। সে এখনো আসেনি। আপনি আমাদের সাথে কিছুক্ষণ বসুন। সে মকতবে যাওয়ার সময় আমাদের পাশ দিয়েই যাবে।" বালক ইবনে তাইমিয়া যাওয়ার সময় সে আলিমকে বলা হলো, "এই সে-ই ছেলে, যার সাথে বড় একটি স্লেট রয়েছে।" তখন সেই আলিম তাঁকে ডাকলেন। কাছে আসলে তাঁর স্লেটটি নিয়ে নিলেন। এরপর তিনি এগারোটি বা তেরোটি হাদিসের মতন লিখলেন। এরপর বললেন, "এগুলো পড়ো।" লেখার পর একবারই শুধু দৃষ্টি দিল বালক ইবনে তাইমিয়া। এরপর সে আলিম বললেন, "এগুলো আমাকে শুনাও।" বালক ইবনে তাইমিয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে সবগুলো শুনিয়ে দিলেন। এবার সে আলিম কিছু সনদ নির্বাচন করে লিখে দিলেন। আগের মতো এবারও বালক শুধু একবারই সেদিকে তাকাল। একবার দেখে সব মুখস্থ করে নিল। এবার শাইখ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, "এই ছেলে বেঁচে থাকলে মহান ব্যক্তি হবে। কারণ, তাঁর মতো কাউকে দেখা যায় না।" ভবিষ্যতেও তেমনই হয়েছিল, যেমনটি এই আলিম বলেছিলেন।'[৫১৫] সে বালক আহমাদ বিন তাইমিয়া যুগশ্রেষ্ঠ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ-তে পরিণত হলেন।

তাদের চেহারায় যেমন প্রতিভার নিদর্শন আছে, তেমনই তাদের কথায়ও প্রতিভার নিদর্শন আছে

আল্লাহ তাআলা অনেক সময় ছোট বালকের মুখ থেকে এমন কথা বের করে দেন, যা শীর্ষ জ্ঞানীরা বলতে পারেন না। আর এ কথাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত হিকমতের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা তাকে যে মেধা দিয়েছেন, তার আলামত।

৫১৫. গায়াতুল আমানি : ২/১৬৯-১৭০

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

'আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছি।'[৫১৬]

এই আয়াতের তাফসিরে মামার ﷺ বর্ণনা করেন, শিশুরা ইয়াহইয়া ﷺ-কে বললেন, 'এসো, আমরা খেলতে যাই।' তিনি বললেন, 'আমি খেলার জন্য সৃষ্টি হইনি।'[৫১৭]

- শাইখ ইয়াসিন বিন ইউসুফ মুররাকিশি ﷺ বলেন, 'আমি শাইখ আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারাফ নববিকে দশ বছর বয়সে নাওয়াতে দেখেছি। শিশুরা তাঁকে তাদের সাথে খেলার জন্য জোর করছিল। কিন্তু তিনি তাদের থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তাদের জোর করার কারণে কাঁদছিলেন। এই অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।' তিনি বলেন, 'ফলে আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগল। তাঁর পিতা তাঁকে দোকানের কাজে লাগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্রয়-বিক্রয় তাঁকে কুরআন পাঠ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।' তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে তাঁর কুরআনের শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেলাম, তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে। তাঁকে বললাম, "আশা করা যায়, এই শিশুটি যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও সবচেয়ে বড় জাহিদ হবে একদিন। মানুষ তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হবে।" সে আমাকে বলল, "তুমি কি কোনো জ্যোতিষী?" আমি বললাম, "না, তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে এই কথাগুলো বলিয়েছেন।" এরপর সেই কুরআন শিক্ষক তাঁর পিতামাতাকে বিষয়টি অবহিত করেন। ফলে তাঁর পিতা তাঁর হিফজের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তিনি বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে কুরআন খতম করে নেন।'[৫১৮]

- ইয়াস বিন মুআবিয়া ﷺ। আল্লামা আবু ওয়াসিল ইয়াস। বসরার প্রখ্যাত কাজি। মেধা, বুদ্ধি, নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতার উপমা দেওয়া হতো তাঁর কথা বলে। বাল্যকালের কথা। বালক ইয়াস গেলেন দামেস্কের কাজির নিকট।

....

৫১৬. সুরা মারইয়াম : ১২

৫১৭. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন : ১১/৮৭

৫১৮. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ : ৮/৩৯৬-৩৯৭

সাথে একজন বৃদ্ধ। বালক ইয়াস বললেন, 'আল্লাহ কাজি সাহেবকে সংশোধন করুন। এই বৃদ্ধ আমার ওপর জুলুম করেছেন। আমার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছেন। আমার সম্পদ নিয়ে গেছেন।' কাজি সাহেব বললেন, 'এই বৃদ্ধের প্রতি কোমল হও। বৃদ্ধকে এমন ভাষায় কথা বোলো না।' তখন ইয়াস বললেন, 'আল্লাহ কাজি সাহেবকে সংশোধন করুন। নিশ্চয় সত্য আমার, আপনার এবং তার চেয়েও বড়।' এবার কাজি বললেন, 'চুপ করো।' বালক ইয়াস বললেন, 'যদি আমি চুপ হয়ে যাই, তাহলে আমার দলিল পেশ করবে কে?' কাজি সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বলো। আল্লাহর কসম, আমি জানি, তুমি কোনো কল্যাণকর কথা বলবে না।' তখন ইয়াস বললেন, 'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং তাঁর কোনো শরিকও নেই।' এরপর সংবাদদাতা এই বিষয়টি খলিফাকে অবহিত করলেন। খলিফা কাজিকে বহিষ্কার করে ইয়াসকে তার স্থানে বসিয়ে দিলেন।

রশিদ ﵀-এর নিকট চার বছর বয়সী এক শিশু প্রবেশ করলে তিনি তাকে বললেন, 'তোমার প্রিয় কোন জিনিসটি আমি তোমাকে দিতে পারি?' সে শিশু বলল, 'আপনার উত্তম মতামত।'

- ইবনুল জাওজি ﵀ বর্ণনা করেন, খলিফা মুতাসিম খাকান অসুস্থ হলে তাকে দেখতে গেলেন। তখন ফাতহ শিশু। মুতাসিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিরুল মুমিনিনের ঘর আর তোমার পিতার ঘরের মধ্যে কোনটি বেশি সুন্দর?' শিশু ফাতহ বললেন, 'যখন আমিরুল মুমিনিন আমার পিতার ঘরে, তখন আমার পিতার ঘরই উত্তম।' মুতাসিম নিজের হাতের একটি আংটি দেখিয়ে বললেন, 'হে ফাতহ, এই আংটির চেয়ে সুন্দর কিছু কি তুমি দেখেছ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যে হাতে আছে, সে হাতটি।'

- হারিস মুহাসিবি তখন শিশু। এক খেজুর বিক্রেতার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বাড়ির সামনে শিশুরা খেলছিল। তিনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে খেজুরওয়ালা কিছু খেজুর নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল। লোকটা হারিসকে লক্ষ করে বলল, 'এই খেজুরগুলো খেয়ে নাও।' হারিস বললেন, 'খেজুরগুলো কোত্থেকে আসলো?' লোকটা জানাল, 'আমি কিছুক্ষণ আগে এক লোকের কাছে কিছু খেজুর বিক্রি করেছি। তার সে খেজুর

থেকে এগুলো পড়ে গেছে।' হারিস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি লোকটিকে চেনেন?' লোকটা বলল, 'হ্যাঁ'। তখন হারিস শিশুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মুরুব্বি কি মুসলিম?' ছেলেরা বলল, 'হ্যাঁ'। তখন হারিস তাকে ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন।

খেজুরওয়ালা তার পেছনে ছুটল। তাকে ধরে বলল, 'আল্লাহর শপথ, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না, যতক্ষণ না আমার সম্পর্কে তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বলবে!' হারিস জবাব দিলেন, 'শাইখ, যদি আপনি মুসলিম হন, তাহলে খেজুরের মালিককে খুঁজে বের করুন, যেমন তীব্র পিপাসার সময় আপনি পানি খোঁজেন। যাতে আপনি তার পাকড়াও থেকে মুক্তি পেতে পারেন। হে শাইখ, আপনি মুসলিম হয়ে মুসলিম সন্তানদের হারাম খাওয়াচ্ছেন?' লোকটি এবার বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমি আর কখনো দুনিয়ার লোভে ব্যবসা করব না।'

- 'সিফাতুল আওলিয়া' গ্রন্থের লেখক আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ﵀ বলেন, 'আমার কাছে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম নিশাপুরী ﵀ নিজ সূত্রে বর্ণনা করেন, ফাতহ মৌসিলি ﵀ বলেছেন, "আমি হজের উদ্দেশে বের হলাম। যখন আমি গ্রামের মাঝামাঝি পৌঁছালাম, তখন এমন এক শিশুকে দেখলাম, যার ওপর শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোথায় যাবে?" সে বলল, "আমার রবের ঘরে।" আমি বললাম, "তুমি তো ছোট। তোমার ওপর শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য হয়নি এখনো।" সে বলল, "আমি আমার চেয়ে ছোট বয়সী অনেককে মারা যেতে দেখেছি।" আমি বললাম, "তোমার পায়ের কদম ছোট ছোট।" সে বলল, "কদম ফেলা আমার কাজ, আর পৌঁছানো তাঁর কাজ। তিনি চাইলে আমাকে পৌঁছে দেবেন। আপনি কি শুনেননি তাঁর এই বাণী : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - "যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদের আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।""[৫১৯]

আমি বললাম, "তোমার সাথে তো কোনো পাথেয় দেখছি না?" সে বলল, "আমার পাথেয় আমার ইয়াকিন। আমি যেখানেই থাকি, বিশ্বাস করি, আল্লাহ

....

৫১৯. সুরা আল-আনকাবুত : ৬৯

তাআলা আমার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন।" আমি বললাম, "আমি তোমার পাথেয় বলতে রুটি ও পানি উদ্দেশ্য নিয়েছি।" সে বলল, "আপনার নাম কী?" আমি বললাম, "ফাতহ।" তখন সে বলল, "হে ফাতহ, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।" আমি বললাম, "করো।" সে বলল, "যদি আপনাকে আপনার দুনিয়ার কোনো বন্ধু তার ঘরে দাওয়াত দেয়, তাহলে কি আপনি এটিকে লজ্জাকর মনে করবেন না যে, আপনি নিজের সঙ্গে খাবার নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য?" আমি বললাম, "অবশ্যই।" সে বলল, "আমার রব আমাকে তাঁর ঘরে দাওয়াত দিয়েছেন। আর তিনিই আমাকে খাওয়াবেন এবং পান করাবেন।" ফাতহ সামনে বলেন, "ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার আলোচনা ও দুনিয়াবিমুখতা দেখে আমি বিস্মিত হলাম।'"

- 'সিফাতুল আওলিয়া' গ্রন্থের লেখক আরও বর্ণনা করেন, 'সাহল তিন বছর বয়সে আল্লাহর জিকির শুরু করেন। পাঁচ বছর বয়সে রোজা রাখা শুরু করেন, আর এ ধারাবাহিকতা তার মৃত্যু পর্যন্ত চলে। ইলম অর্জনে তার সফর শুরু হয়ে নয় বছর বয়সে। অনেক কঠিন কঠিন মাসআলা আলিমদের সামনে পেশ করা হতো, কিন্তু সেগুলোর উত্তর কেবল সাহলের কাছেই পাওয়া যেত। অথচ তিনি তখন বারো বছরের এক কিশোর মাত্র। তখন থেকেই তার কারামাত প্রকাশ পেতে থাকে।'

হুজ্জাতুদ দ্বীন মুহাম্মাদ বিন জাফর ﵀ (৫৬৭ হি.) 'আনবাউ নুজাবায়িল আবনা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, আবু মুহাম্মাদ সাহল ছয় বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেছেন। আর বারো বছর বয়স থেকে জুহদ ও তাকওয়া, মাকামাতুল ইরাদাতের ব্যাপারে ফতওয়া দেন। বয়স যখন তেরো, তখন তুসতারে যে মাসআলার উত্তর দেওয়ার মতো কোনো লোক পাওয়া যেত না, সে মাসআলা তাকে জিজ্ঞেস করা হতো। তিনি নিজ পরিবারকে বললেন, "আমাকে বসরায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দিন।" কিন্তু তিনি বসরায় গিয়ে ফতওয়া জিজ্ঞেস করার মতো কাউকে পেলেন না। তখন তাকে আবদান অঞ্চলের হামজা বিন আব্দুল্লাহর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলো। তিনি আবদানের উদ্দেশে রওয়ানা শুরু করলেন। তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হামজা বিন আব্দুল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণ হলো তাঁর। হামজার সংশ্রব গ্রহণ করলেন সাহল।'

- 'আনবাউ নুজাবায়িল আবনা'-এর গ্রন্থকার বলেন, 'আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, আবুল হুসাইন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ—যাকে আন-নুরি বলে ডাকা হতো—যখন কুরআন শেখা শুরু করেন, তখন তার পিতা তাকে নিজের সাথে দোকানে থাকতে বাধ্য করলেন। তাই সকাল হলেই তিনি খাতা আর দোয়াত নিয়ে চলে যেতেন আল্লাহর কিতাবের ইলম অর্জন করতে, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে নিজের অজ্ঞতা ঘোচাতে। যা বলা হতো, তা লিখে নিতেন। এরপর পিতার কাছে ফিরে আসতেন। পিতা যখন তাকে কোনো কাজে পাঠাতেন, তিনি স্লেট আর দোয়াত নিয়ে বের হতেন তখন। তার পাশ দিয়ে যখন কোনো আহলে ইলম অতিক্রম করত, তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। সঠিক সময়ে ফিরে না আসলে তার বাবা তাকে ধমকাতেন, ভয় দেখাতেন। অনেক সময় মারধরও করতেন। এমন অনেকবার ঘটতে থাকে। একদিন পিতা তাকে বললেন, "বৎস আমার, আমার বুঝে আসছে না, তুমি তোমার এই ইলম দিয়ে কী চাচ্ছ?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহকে চিনে আল্লাহর সাথে পরিচয় হতে চাচ্ছি।" পিতা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কীভাবে আল্লাহকে চিনবে?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বোঝার মাধ্যমে তাঁকে চিনব।" এবার তার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁর সাথে পরিচিত হবে কীভাবে?" তিনি বললেন, "তিনি আমাকে যে ইলম দান করবেন, তার ওপর আমল করার মাধ্যমে আমি তাঁর সাথে পরিচিত হব।" তখন তার পিতা বললেন, "হে বৎস, আমি যতদিন জীবিত আছি, তোমাকে এই ব্যাপারে আর কখনো বাধা দেবো না।"'

- আলি বিন জাদ বলেন, আবু ইউসুফ ﵀ বলেন, 'আমার পিতা ইবরাহিম বিন হাবিব ইনতিকাল করলেন। আমি তখন মায়ের কোলের ছোট্ট শিশু। (একটু বড় হলে) আমার মা আমাকে এক ধোপার কাছে কাজ করার জন্য দিয়ে আসেন। কিন্তু আমি ধোপার কাজ রেখে আবু হানিফার পাঠচক্রে এসে বসতাম। আমি সেখানে বসে হাদিস ও মাসআলা শুনতাম। কিন্তু আমার পেছন পেছনই আমার মা পাঠচক্রে চলে আসতেন আর হাত ধরে আমাকে ধোপার নিকট নিয়ে যেতেন। আবু হানিফা ﵀ মজলিসে আমার অংশগ্রহণ এবং ইলমের প্রতি আমার আগ্রহের বিষয়টি লক্ষ করলেন। আমার বারবার পালিয়ে এসে আবু হানিফার মজলিসে বসা যখন আমার মায়ের কাছে কঠিন হয়ে গেল, তখন তিনি আবু হানিফার উদ্দেশে বললেন, "আপনি কেন এই শিশুটিকে নষ্ট

করছেন? সে এতিম শিশু, তার সহায়-সম্পদ বলতে কিছুই নেই। আমি সুতার কাজ করে তাকে আহার করাই। আমি চাই, সে কিছু দানিক অর্জন করে নিজের খরচ মেটাবে।" তখন আবু হানিফা তাকে বললেন, "হে অস্থিরমতি, তুমি চলে যাও। এই ছেলে ইলম শিখে একদিন পেস্তা মেশানো ফালুদা খাবে।" তখন মা চলে যেতে যেতে বললেন, "আপনি বুদ্ধিভ্রষ্ট বুড়ো। আপনার মাথা গেছে।"

আবু ইউসুফ ﷺ বলেন, 'এরপর আমি আবু হানিফাকে আঁকড়ে ধরি। তিনি নিজ খরচে আমার দেখাশোনা করতেন। তিনি আমার জন্য হৃদ্যতার সকল দ্বার খুলে দিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করলেন। এবং এতটাই মর্যাদা দান করলেন যে, আমি বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হলাম। হারুনুর রশিদের সাথে আমি ওঠাবসা করতাম। তার সাথে একই দস্তরখানে খানা খেতাম। একদিন হারুনুর রশিদের সামনে ফালুদা পেশ করা হলো। তখন হারুন আমাকে বললেন, "হে ইয়াকুব, এখান থেকে খান। আমাদের জন্য এ খাবার প্রতিদিন তৈরি হয় না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো কী আমিরুল মুমিনিন?" তিনি বললেন, "পেস্তা মেশানো ফালুদা।" আমি হেসে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হাসলেন কেন?" বললাম, "আল্লাহ তাআলা আমিরুল মুমিনিনের কল্যাণ করুন।" তিনি "আপনাকে বলতেই হবে। কেন হাসলেন?" বলে আমাকে জোরাজুরি করতে লাগলেন। তখন আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের পুরো কাহিনি শুনালাম। তিনি আমার ঘটনা শুনে খুবই বিস্মিত হলেন এবং বললেন, "আমার জীবনের শপথ, ইলম দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই মর্যাদা ও উপকার বয়ে আনে।" তিনি আবু হানিফার প্রতি রহমতের দুআ করলেন এবং বললেন, "কপালের চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না, আবু হানিফা বুদ্ধির দৃষ্টিতে তা দেখতেন।'

- 'আনবাউ নুজাবায়িল আবনা'-এর গ্রন্থকার বলেন, 'আবু সুলাইমান দাউদ বিন নাসির আত-তায়ি। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে একজন শিক্ষকের হাতে অর্পণ করলেন। শিক্ষক তাঁকে কুরআন শেখানো শুরু করলেন। আত-তায়ি বেশ মেধাবী ছিলেন। যখন তিনি (هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) এ সুরায় পৌছালেন, সুরাটি মুখস্থ করে নিলেন।

এক জুমআর দিন তাঁর মা তাঁকে একটি দেয়ালের অভিমুখী দেখলেন। দেখলেন, দাউদ আত-তায়ি কী যেন চিন্তা করছেন আর হাত দিয়ে ইশারা করছেন। তাঁর মা এটি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে বললেন, "দাউদ, ওঠো। এখান থেকে গিয়ে শিশুদের সাথে খেলা করো।" কিন্তু দাউদ আত-তায়ি কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং ধ্বংসের বদদুআ ঝাড়তে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, "আম্মা, আপনার কী হয়েছে?" মা বললেন, "তোমার কি কিছু হয়েছে?" তিনি বললেন, "না"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তোমার খেয়াল কোথায় ছিল? আমি তোমার সাথে কথা বললাম, কিন্তু তুমি শোনোনি কেন?" তিনি বললেন, "আমার জেহেন আল্লাহর বান্দাদের সাথে ছিল।" মা জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কোথায়?" তিনি জবাব দিলেন, "জান্নাতে।" মা জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কী করছেন?" দাউত আত-তায়ি জবাব দিলেন :

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا -وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

"তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে অতি গরম ও অতি শীত অনুভব করবে না। জান্নাতের বৃক্ষছায়া তাদের ওপর থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের নাগালে থাকবে।"[৫২০]

এভাবে তিনি সুরাটি পড়তে থাকলেন। তাঁর চোখের অবস্থা এমন ছিল, যেন তিনি তাদের দেখতে পাচ্ছেন। তিনি যখন (وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا) 'তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।'[৫২১]—আয়াতে পৌঁছালেন, তাঁর মায়ের কাছে জানতে চাইলেন, "মা, তাদের প্রচেষ্টা কী ছিল?" কিন্তু তাঁর মা বুঝতে পারছিলেন না যে, তিনি কী উত্তর দেবেন।

এরপর বালক দাউদ আত-তায়ি বললেন, "আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান, যাতে আমি তাদের সাথে কিছু সময় অবস্থান করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি।" তার মা উঠে চলে গিয়ে তার বাবাকে পাঠালেন। তার বাবা

৫২০. সুরা আদ-দাহর : ১৩-১৪
৫২১. সুরা আদ-দাহর : ২২

এসে বললেন, "দাউদ, তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ, তারা বলেছিল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।" এরপর থেকে দাউদ কখনো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বলা পরিত্যাগ করেননি।'

- শাইখ ইবনে জাফর মাক্কি ﷺ বর্ণনা করেন, 'আবু ইয়াজিদ তাইফুর বিন ইসা বাসতামি যখন আল্লাহ তাআলার এই বাণী মুখস্থ করলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

"হে বস্ত্রাবৃত, রাতে সালাতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ ছাড়া।"[৫২২]

তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, আল্লাহ তাআলা কাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "বেটা, তিনি ছিলেন নবি ﷺ।" এবার জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, আপনি কেন রাসুল ﷺ-এর মতো (এ আমল) করছেন না?" তার বাবা বললেন, "হে বৎস, রাতের জাগরণ রাসুল ﷺ-এর জন্য বিশেষভাবে ফরজ ছিল, তার উম্মতের জন্য নয়।" তখন বালক তাইফুর চুপ হয়ে গেলেন।

যখন তাইফুর আল্লাহ তাআলার এই আয়াত মুখস্থ করলেন—

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

"আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম, কখনো অর্ধাংশ, কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়।"[৫২৩]

তিনি তার বাবাকে বললেন, "বাবা, আমি শুনেছি, একদল লোক রাতের বেলা সালাতে দণ্ডায়মান হতেন। তাঁরা কারা?" তিনি বললেন, "বেটা, তাঁরা ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সাহাবি।" তখন তাইফুর বললেন, "বাবা, যা রাসুল ﷺ ও তাঁর সাথিগণ করেছেন, তা পরিত্যাগে কী কল্যাণ রয়েছে?" এবার তার বাবা বললেন, "আমার আদরের ছেলে, তুমি সত্য বলেছ।"

....

৫২২. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল : ১-২
৫২৩. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল : ২০

এরপর থেকে তার বাবা রাতে জাগ্রত হতেন এবং তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এক রাতে আবু ইয়াজিদ জেগে দেখলেন, তার বাবা সালাত আদায় করছেন। তখন তিনি বললেন, “বাবা, আমাকে শেখাও যে, কীভাবে আমি পবিত্র হব। আমি আপনার সাথে সালাতে দাঁড়াব।” তখন তার পিতা বললেন, “তুমি তো এখনো ছোট। তুমি ঘুমাও।” বালক তাইফুর বললেন, “বাবা, যেদিন মানুষ দলে দলে সমবেত হবে, তাদের আমলনামা দেখানো হবে, সেদিন আমি আমার রবকে বলব, “আমি আমার পিতাকে বলেছি, আমি কীভাবে পবিত্র হয়ে আপনার সাথে সালাত আদায় করব? তখন তিনি আমাকে তা শেখাতে অস্বীকার করেছেন। এবং বলেছেন, “তুমি তো এখনো ছোট। তুমি ঘুমাও।” আপনি কি এটা পছন্দ করবেন?” তার বাবা তখন বলে উঠলেন, “আল্লাহর শপথ, হে আমার ছেলে, আমি এটা পছন্দ করব না।” তখন তার বাবা তাকে সালাত আদায় শিখিয়ে দিলেন। তাইফুর তার সাথে সালাত আদায় করতেন এরপর থেকে।’

প্রতিভাবানদের উচ্চ মনোবল : মর্যাদা অর্জনের সংক্ষিপ্ত পথ

উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীলদের আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু স্বভাবগত প্রতিভা ও যোগ্যতা দান করেছেন। তাদের দান করেছেন সত্তাগত কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তারা ক্লাস পরীক্ষা প্রদানে দক্ষ কিছু ব্যক্তি ছিলেন না, অথবা বিশেষ কিছু বিষয়ে দক্ষতা অর্জনকারী কতিপয় মানুষ ছিলেন না। বরং তারা ছিলেন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সুন্দর গঠন প্রকৃতির বিবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এগুলো দিয়ে তারা সমকালীন সাধারণ লোকদের ছাড়িয়ে যেতেন।

তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হলো : শারীরিক ত্রুটিমুক্ত, মুখস্থশক্তি, দ্রুত শিক্ষা গ্রহণকারী এবং ইলম অর্জনে সবার ঊর্ধ্বে।[৫২৪] সফলতার জন্য অনুসন্ধানপ্রিয় ও অনুপ্রেরণায় ভরপুর। আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন, অবিচল, সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, ইলমি অঙ্গনের আকর্ষণ ও সামাজিক অঙ্গনের পরিপক্ক, স্বচ্ছ ও পবিত্র পরিবেশে বেড়ে ওঠা পুণ্যবান মানুষ।’[৫২৫]

....

৫২৪. তাদের উদাহরণ এ যুগে দেখতে চাইলে আমি বালক সাইয়িদ জালাল আফগানির কথা বলব। জাহরানের জামিআ বেট্রলে সে যখন ভর্তি হয়, তখন তার বয়স ১০ বছর। বিশ্ববিদ্যালয় সেশন : ১৯৮০-১৯৮১। আট বছর বয়সে সে মাধ্যমিক শেষ করে। নয় বছর বয়সে উর্দু, ইংরেজি, রুশ ভাষা শেখে।

৫২৫. ড. কামাল ইবরাহিম মুরসি কৃত রিয়াআতুন নাবিগিন ফিল ইসলাম ওয়া ইলমিন নাফস : ১৪৩-১৪৪

মানুষ আলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। একদল মানুষ তাকে গড়ে তোলে, একটি পরিবেশ তাকে তৈরি করে, তার পড়ালেখা ইত্যাদির দেখাশোনা করে; যাতে সে কাঙ্ক্ষিত ইলমের বড় একটা অংশ অর্জন করতে পারে।

যে জাতি প্রতিভাবানদের গুরুত্ব প্রদান করে, সে জাতি তাদের দিয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কারণ, প্রতিভাবান লোকগুলো জাতির বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান করে দেয় এবং জাতির উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। আর যে জাতি তাদের প্রতিভাবানদের মূল্যায়ন করে না এবং তাদের ব্যাপারে অবহেলা করে, সে জাতির ভাগ্যে ব্যর্থতা নেমে আসে। এমনকি অজ্ঞ ও অক্ষম লোকেরা সে জাতির নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব গ্রহণ করে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। কখনো-বা আত্মিক রোগাক্রান্ত লোকেরা এমন জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করায়। কখনো-বা নিম্ন মানসিকতার লোকেরা এমন জাতির ঘাড়ে চেপে বসে স্বল্প মূল্যে জাতিকে শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়।

স্বভাবগত মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যখন তা উপযুক্ত পরিবেশ ও উন্নতির জন্য যথাযথ শিক্ষা না পায়, তখন সে মেধা ও যোগ্যতা পূর্ণতা অর্জন করে প্রতিভায় রূপ নিতে পারে না। তাই প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ, প্রতিভার উন্নয়ন ও উজ্জ্বলতার জন্য দরকার উত্তম তারবিয়াত।

পরিবার, বিশেষ করে পিতামাতা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে (ছোটদের) প্রতিভা বিকাশের জন্য পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ প্রস্তুত করতে হবে। বাচ্চাদের হৃদয়ে শৈশবেই উচ্চ হিম্মতের বীজ বপন করবে। একই পরিবার থেকে একের পর এক প্রতিভাধর লোক বের হওয়ার পেছনে আসল রহস্যটি আমাদের সামনে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ তাইমিয়া পরিবার। এই পরিবারে স্বভাবগত যোগ্যতা ও সৃজনশীল সক্ষমতা একত্রিত হয়েছে। সাথে সাথে সবাই সহযোগী পরিবেশ পাওয়ার ফলে তাঁদের মেধা ও যোগ্যতা বিকশিত হয়েছে, উন্নতি সাধন করেছে। এভাবে তাঁরা অতুলনীয় কিছু প্রতিভায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

ইলমের মহব্বতকারিণী মা বা ইলমে দক্ষ কোনো আলিম বাবা সন্তানের জন্য ইলমের পথ ও আলিমদের সাথে ওঠাবসা সহজ হওয়ার কারণ হয়ে যান। বাচ্চাদের প্রতিভার উন্নতি সাধনে এটা শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।

এই তো রাসুল ﷺ-এর অশ্বারোহী জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ। উমর ﷺ তাঁকে এক হাজার পুরুষের সমকক্ষ মনে করতেন। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর মা সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ-এর কোলে। যিনি রাসুল ﷺ-এর ফুফু ছিলেন। আল্লাহর সিংহ হামজা ﷺ-এর বোন ছিলেন। মহান কিছু মানুষের নাম মুখে নিচ্ছি আমরা—আব্দুল্লাহ, মুনজির ও উরওয়াহ। জুবাইর বিন আওয়ামের সন্তান। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁদের মা দুই ফিতার অধিকারিণী আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ-এর পরিচর্যা-প্রতিপালনের ফল।

আর আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবু তালিব ﷺ প্রতিপালিত হয়েছেন তাঁর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ﷺ-এর অধীনে।

আরব ঘোড়সওয়ারদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﷺ প্রতিপালিত হয়েছেন তাঁর মা আসমা বিনতে উমাইস ﷺ-এর অধীনে।

আরবের বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আমিরুল মুমিনিন আবু মুআবিয়া বিন আবু সুফইয়ান ﷺ তাঁর মা হিন্দা বিনতে উতবা ﷺ-এর কাছ থেকে এমন উচ্চ হিম্মতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, যে হিম্মত সুরাইয়া তারকাকেও ছাড়িয়ে যায়। মুআবিয়া ﷺ শৈশবে যখন তার কোলে তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি আশা করি, এই বালক তার জাতির নেতৃত্ব দেবে।... তার মা সন্তানহারা হোক, যদি সে নিজ জাতির নেতৃত্ব না দেয়।'

এ মায়ের কাছে তার আরেক সন্তান ইয়াজিদ বিন আবু সুফইয়ান ﷺ-এর মৃত্যুর সংবাদ আসলো। কিছু মানুষ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, 'আমরা আশা করি মুআবিয়া ইয়াজিদের মতো ভালো স্থলাভিষিক্ত হবে।' হিন্দা ﷺ তখন বললেন, 'মুআবিয়ার মতো যুবক কারও মতো হবে? কারও স্থলাভিষিক্ত হবে? আল্লাহর শপথ, যদি আরবের সব মানুষকে একত্র করা হয় আর মুআবিয়াকে তাদের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবুও মুআবিয়া যেখান থেকে ইচ্ছে করে নেতৃত্ব নিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

মুআবিয়া ﷺ যখন কোনো যোগ্যতার কারণে গৌরব অনুভব করতেন এবং যখন কোনো আকর্ষণীয় গৌরবময় অভিমত দিতেন, তখন তাঁর কৃতিত্ব তাঁর

মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করতেন। তখন উপস্থিত মানুষের কানে তাঁর এ কথাটা পৌঁছাত যে, 'আমি হলাম হিন্দার পুত্র।'

মহান ইমাম সুফইয়ান সাওরি ﷺ। তাঁর বিশাল ইলম তাঁর মায়ের প্রতিপালনের ফল। মা তাঁকে নিজ স্তন্য দান করেছেন। নিজের কোলে তাঁকে লালনপালন করেছেন। প্রতিপালন করেছেন উত্তমভাবে। ফলে একসময় মুসলিমদের ইমাম হতে পেরেছেন সুফইয়ান সাওরি। হাদিসের আমিরুল মুমিনিন হয়েছেন তিনি। শৈশবে তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, 'হে বৎস, তুমি ইলম অর্জন করো, আমার সুতার চরকা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।'

ইমাম সিকাহ সাবত আবু আমর আওজায়ি ﷺ। এতিম অবস্থায় নিজের মায়ের কোলে লালিতপালিত হয়েছেন। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে শহরের পর শহর ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁকে এমনভাবে প্রতিপালন করেছেন রাজা-বাদশাহরাও সেভাবে নিজ সন্তানদের প্রতিপালন করতে অক্ষম হয়েছেন। এ প্রতিপালনের ফলে আওজায়ি এমন উচ্চতায় বরিত হয়েছেন যে, তেরো বছর বয়সে ফিকহ বিষয়ে তাঁর কাছে ফতওয়া চাওয়া শুরু হয়।

একই কাজ করেছেন ইমাম মালিকের উসতাজ রবিআ বিন আবু আব্দুর রহমানের মা। রবিআকে গর্বে রেখে তার স্বামী ত্রিশ হাজার দিনার রেখে যান। চলে যান জিহাদের ময়দানে। তাঁর মা তাঁর পেছনে এসব সম্পদ ব্যয় করেন। শাইখ রবিআ তাঁর মায়ের প্রতিপালনের ফসল। তিনি গর্ভে থাকাকালীন সময়ে তাঁর বাবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। ফিরে আসেন সে সময়, যখন সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে শাইখের পদ গ্রহণ করেছে।

হিজরতের ভূমির ইমাম মালিক ﷺ-এর মায়ের কথা শোনো। মা তাঁকে ইলমের রঙে সজ্জিত করে ইলমের পোশাক পরিধান করিয়েছেন। মা তাঁকে বলেছিলেন, 'রবিআর কাছে যাও। তাঁর কাছে ইলমের আগে আদব শিক্ষা করো।'

ইমাম শাফিয়ি তখন মায়ের গর্ভে বা মায়ের কোলে দুগ্ধপানরত। এ সময় তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। তাঁর মা তাঁর প্রতিপালনে মনোযোগী হন। সন্তানের মাঝে নিজের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গাজা থেকে মক্কায় এসে তাঁর মামাদের সাথে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি তাদের মাঝে তাঁকে গড়ে তোলেন।

ইমাম শাফিয়ি প্রতিপালিত হয়েছেন এতিম ও দরিদ্র অবস্থায়। তাঁর মা উসতাজের বেতনও দিতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর উসতাজ বিনা বেতনে তাঁকে শিক্ষা দিতে রাজি হয়েছেন। তাঁকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যখন শিক্ষক বালক ইমাম শাফিয়ির মেধার প্রখরতা ও দ্রুত মুখস্থশক্তির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন ছাত্রদের মাঝে তাঁকে বিশেষ একটি স্থান দিলেন।

ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন, 'আমি আমার মায়ের কোলে এতিম অবস্থায় প্রতিপালিত হয়েছি। মায়ের কাছে শিক্ষককে (বেতন) দেওয়ার মতো কিছু থাকত না। শিক্ষক আমাকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে রাজি হয়ে যান। রাজি হন তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি দরসে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে।

ইমামুল মুহাদ্দিসিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি ﵀। শৈশবেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। মায়ের কোলে এতিম অবস্থায় বেড়ে ওঠেন তিনি। তাঁর মা ছিলেন একজন নেককার মহিলা, বহু কারামাতের অধিকারিণী।

আমাদের জন্য কি পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষা করা সম্ভব। পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপারে আমরা শুধু একজন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করি, উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀। যদি না নেক পরিবেশ উচ্চ হিম্মতের বীজ শৈশবে আমিরুল মুমিনিন উমর বিন আব্দুল আজিজের হৃদয়ে পুঁতে না দিত, তবে কি তাঁর পক্ষে নিজের যুগে নতুনভাবে দ্বীনি সংস্কার করা এবং সমাজটাকে দ্বীনের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল? ![৫২৬]

সাইদ বিন উফাইর বলেন, 'ইয়াকুব তাঁর পিতা থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান তাঁর ছেলে উমরকে মদিনায় আদব শেখার জন্য প্রেরণ করেন। সালিহ বিন কাইসানকে তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে চিঠি লেখেন। অন্য সবকিছুর মতো সালিহ বিন কাইসান উমর বিন

....

৫২৬. অধিকাংশ আলিমের মতে উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। 'আমরা এটা মানি। তবে এখানে আমরা বলব, উমর ﵀-এর জন্য এ বিস্তৃত ও বহুমুখী সংস্কার সম্ভব হতো না, যদি তাঁর সাথে তাঁকে সাহায্য করার মতো বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ তাবিয়ি ও নেতাগণ না থাকত। তাঁরা উমর ﵀-এর ডান হাত হয়ে তাঁর এ মহান তাজদিদ ও সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন।' - আল-বায়ান : ১৬-১৭; ৩য় সংখ্যা। আর সেসব নেতার মধ্যে একজন হলেন রজা বিন হাইওয়া। তিনিই সুলাইমান বিন আব্দুল মালিককে তাঁর মৃত্যুর সময় উমর বিন আব্দুল আজিজকে খলিফা বানানোর প্রতি ইঙ্গিত দেন। দেখুন, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/১২৩।

আব্দুল আজিজের নামাজ আদায়ের ব্যাপারে নেগরানি করতেন। একদিন উমরের নামাজ আদায়ে বিলম্ব দেখলেন তিনি। সালিহ তখন বললেন, "কেন দেরি করলে?" উমর বলল, "সেবিকা আমার চুল বিন্যস্ত করছিল, তাই দেরি হয়েছে।" সালিহ বললেন, "তোমার চুল বিন্যস্ত করা এতটাই বড় কিছু হয়ে গেছে যে, তুমি সেটাকে নামাজের ওপর প্রাধান্য দিলে!?" সালিহ আব্দুল আজিজের কাছে এই বিষয়টির বর্ণনা লিখে পাঠালেন। তখন আব্দুল আজিজ একজন দূত পাঠালেন। সে দূত উমরের কাছে আসলেন। একটা শব্দও বললেন না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সে তার মাথা মুণ্ডন করে দিলেন। উমর চুল বিন্যস্ত করাকে যথাসময়ে নামাজ আদায়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে তার পিতা আব্দুল আজিজ তাকে শাস্তি দিলেন, দূতকে বলে দিয়েছিলেন, "তার চুল মুণ্ডন না করা পর্যন্ত তার সাথে একটা কথাও বলবে না।'"

আবু কাবিল বর্ণনা করেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ বাল্যকালে একদিন কাঁদছিলেন। তাঁর মা লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" উমর বললেন, "আমি মৃত্যুর কথা স্মরণ করছি।" সেদিন উমর কুরআন হিফজ সমাপ্ত করেছিলেন। ছেলের কান্নার কারণ জানতে পেরে তার মা-ও কাঁদতে লাগলেন।'

জুবাইর বিন বাক্কার ﵀ আতাবি থেকে বর্ণনা করেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ সাধারণ কোনো মানুষ নন, তিনি যে এক বিরাট ব্যক্তি এ ব্যাপারটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাটি হলো, তার পিতা মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। উমর তখন অল্পবয়স্ক। সম্ভবত তখনও বালিগ হননি। তার পিতা তাকে আলাদা করে অন্য ঘর দিতে চাইলেন। উমর তখন বললেন, "বাবা, এ ছাড়া কি অন্য কিছু করা যায় না? হয়তো সেটি আমার-আপনার জন্য বেশি কল্যাণকর হবে। আমাকে মদিনায় পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানকার ফকিহদের সাথে বসব। তাঁদের থেকে আদব শিক্ষা করব।" এরপর উমরকে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অল্প বয়সেই তিনি ইলম ও বিচক্ষণতার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।'

- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﵀-এর পিতা কীভাবে অপ্রাপ্ত বয়সেই শাইখকে সামাজিক বিষয়ে পরিপক্ব করে গড়ে তুলেছেন, সে ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখুন। তাঁর পিতা ছোটবেলা থেকেই তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে থাকেন, তাঁর প্রতিভা শাণিত করতে থাকেন, দায়িত্বশীল

হিসেবে গড়ে তুলতে থাকেন তাঁকে। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে পাঠান। চিঠির কিছু বাক্য ছিল এমন, 'আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, সে পূর্ণ বারো বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই বালিগ হয়ে গেছে। তাকে আমি জামাআতে সালাত আদায় ও ইমামতির উপযুক্ত মনে করছি। আমি তাকে ইসলামের বিধিবিধান জানার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বালিগ হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে করিয়ে দিয়েছি। এরপর সে আমার কাছে বাইতুল্লাহয় গিয়ে হজ করার বাসনা প্রকাশ করল। আমি তার বাসনা পূরণ করলাম। তাকে তার লক্ষ্য পূরণে পাথেয়সহ প্রেরণ করলাম। সে হজ করেছে। ইসলামের একটি রুকন আদায় করে নিয়েছে।'[৫২৭]

এ ছাড়াও সাবালক হওয়ার আগেই সামাজিক বিষয়ে পরিপক্বতা ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন যোগ্যতা তৈরি করে এবং আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলে একটি শিশুকে। এ শিক্ষা পরনির্ভরতা, অন্যের অনুগত থাকা এবং শিশুসুলভ আচরণ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি সত্তাকে। যে সকল আলিম কিশোর ও তরুণ বয়সেই ইলম অর্জনের উদ্দেশে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের সেই ভ্রমণের বর্ণনা দানে আমরা অক্ষম। তারা পরিবার ও জন্মভূমিকে বিদায় জানিয়ে কোনো ক্লান্তি, অভিযোগ-অনুযোগ ব্যতীতই নানান কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছেন, হিম্মত করেছেন নববি ইলমের সরোবরে অবগাহন করতে।

* অনেক সময় বিলাসী পরিবেশ মর্যাদা অর্জনের পথে কঠিনভাবে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্চ মনোবলের অধিকারী এ বাধাকে অতিক্রম করে মর্যাদার উচ্চ আসনে বরিত হন। তারা মহান লক্ষ্য সাধনে বিলাসী জীবনকে তুচ্ছ মনে করেন। যেমন ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলি বিন হাজম ﷺ। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন বিলাসী পরিবেশে আয়েশি লালনপালনের মাঝে। কিন্তু তিনি দুনিয়ার ভোগসামগ্রী ও লোভলালসাকে বিসর্জন দিয়ে ইলমের পথ গ্রহণ করেছেন। একবার দুই ইমামের মাঝে একটি মুনাজারা অনুষ্ঠিত হয়। একজন ইমাম ইবনে হাজম। আরেকজন ইমাম আবুল ওয়ালিদ বাজি। মুনাজারা

....

৫২৭. রিআয়াতুন নাবিগিন : ১৬০

শেষে আল-বাজি ইবনে হাজমকে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার অধিকাংশ অধ্যয়ন ছিল প্রহরীদের বাতির আলোতে।' ইবনে হাজম বললেন, 'আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার অধিকাংশ অধ্যয়ন ছিল সোনা-রুপার বাতির আলোতে।'[৫২৮] ইয়াকুত আল-হামাবি বলেন, 'ইবনে হাজমের এ কথার অর্থ হচ্ছে, ধনাঢ্যতা দারিদ্র্য অপেক্ষা ইলমের জন্য বেশি ক্ষতিকর।'[৫২৯]

* অনেক সময় উচ্চ মনোবলের অধিকারী এমন ভয়াবহ ধ্বংসশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, যে পরিবেশ তার হিম্মত বিনষ্টে এবং প্রতিভা ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার জন্য আঁকড়ে ধরার মতো উপকরণ সহজ করে দেন। আবার কখনো আল্লাহ এমন কাউকে নিযুক্ত করে দেন, যে তার প্রতিভাসমূহের বিকাশ ঘটায় এবং তার তত্ত্বাবধান করে। উদাহরণত—

আরব্য কবি মুতানাব্বি বেড়ে উঠেছিলেন একটি দরিদ্র অশিক্ষিত পরিবারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুফার অভিজাত কিছু মানুষের মাধ্যমে তার জন্য বিশেষ শিক্ষকদের নিকট ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তাকে বিনা টাকায় কিতাব পাঠ করার সুযোগ করে দিতেন, তাকে উৎসাহ দিতেন।

বর্ণিত আছে, মুতানাব্বি সব সময় এক পুস্তক-বিক্রেতার সঙ্গে থাকতেন। এ পুস্তক-বিক্রেতা বলেন, 'একদিন মুতানাব্বি আমার কাছে ছিল। এমন সময় একলোক প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক নিয়ে বিক্রির জন্য হাজির হলো।

....

৫২৮. মুজামুল উদাবা : ১২/২৩৯

৫২৯. শাইখ আবু জাহরা দুই ইমামের ক্ষমা চাওয়ার ওপর টীকা উল্লেখ করেন, 'ইবনে হাজম মন্তব্য করলেন যে, অধিক ধনসম্পদ ও বিলাসী জীবন ইলমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মনের কাছে। তাই বিলাসী জীবনযাপনকারী কেউ ইলমের পথে হাঁটে না। কারণ, জীবন অনায়াস হয়ে গেলে, ভোগমত্ততা সহজ হলে, বিলাসের দুয়ার খুলে গেলে বন্ধ হয়ে যায় আলো ও জ্ঞানের দরজা। জীবন উপভোগ ও ভোগবিলাসের আধিক্য অন্তরের আলোকে নিভিয়ে দেয়, অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়, ইলম অর্জনের কষ্ট ও পরিশ্রমের ইচ্ছাকে দমিয়ে দেয়।

অন্যদিকে একজন দরিদ্র যদিও প্রয়োজনীয় রসদের জন্য ব্যস্ত থাকে কিছু সময়, কিন্তু দারিদ্র্যই তার ভোগ-উপভোগ ও বিলাসের দুয়ার বন্ধ করে রাখে। ফলে দরিদ্র ব্যক্তির অন্তর আলোকিত থাকে, তার মাঝে হিদায়াতের আলো উদ্ভাসিত হয়। এটা হচ্ছে ইবনে হাজামের অভিমত। অন্যদিকে আল-বাজির অভিমত হচ্ছে, দারিদ্র্য না থাকলে বস্তুনির্ভর জীবন সহজ ও অনায়াস হয়। তাহলে ইলম অর্জন সহজ হয়। এটাই আল-বাজির অভিমত। কিন্তু তিনি এ দিকটার প্রতি খেয়াল করেননি যে, বস্তুনির্ভর জীবনে যখন ধনাঢ্যতা আসে, তখন অধিকাংশ সময় এ ধনাঢ্যতা ইলমের পথ থেকে বিলাসিতার দিকে নিয়ে যায়।' - আবু জাহরা কৃত ইবনে হাজম : ৫৬।

মুতানাব্বি কিতাবটি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ দেখতে লাগল। আমি তাকে বললাম, "এই কী? আমি এটি কিনতে চাচ্ছি, অথচ তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ। যদি তুমি এটি মুখস্থ করতে চাও, তবে ইনশাআল্লাহ একমাস নাগাদ তা মুখস্থ করতে পারবে।" তখন মুতানাব্বি বলল, "যদি আমি এটি এই মুহূর্তে মুখস্থ বলতে পারি?" আমি বললাম, "তাহলে তোমাকে কিতাবটি দিয়ে দেবো।" মুতানাব্বি বলল, "তাহলে শোনো।" আমি কিতাবটি তার হাত থেকে নিয়ে নিলাম, আর তিনি শোনাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত শুনিয়ে দিলেন।'

প্রতিভাবান লোকদের অনুসন্ধান, তাদের দুরবস্থা থেকে উদ্ধার এবং ইলমের ময়দানে তাদের হাত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন, তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা নুমান ﷺ। ইমাম আবু হানিফা ﷺ তাঁর শাইখ হাম্মাদের পর পাঠচক্রের মুআল্লিম হিসেবে নিযুক্ত হন। তখন তিনি প্রতিভাধর ছাত্রদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের সম্পদ দিয়ে তাদের সহযোগিতা করতেন। অভাবের সময় তাদের সাহায্য করতেন। এমনকি যে ছাত্র অভাবের কারণে বিয়ে করতে পারছিলেন না, তিনি তার বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজনের প্রতি তিনি খেয়াল রাখতেন। তাঁর এক ছাত্র বলেন, 'তিনি ছাত্রদের অভাব-অনটন দূর করতেন। তার ও তার পরিবারের জন্য খরচ করতেন। যখন কোনো ছাত্র শিক্ষিত হয়ে যেত, তখন তিনি বলতেন, "তুমি হালাল ও হারাম জানার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় ধনাঢ্যতা অর্জন করেছ।" তিনি ছাত্রদের আত্মিক অবস্থার প্রতিও খেয়াল করতেন। উপদেশ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালন করতেন। যখন তাদের কাউকে ইলমের কারণে অহংকার করতে দেখতেন, তিনি কোনো কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে তার অহংকার দূর করে দিতেন। তাঁর এ পরীক্ষা প্রমাণ করে দিত যে, তার আরও ইলম শেখার প্রয়োজন আছে।'

- কারদারি ﷺ ইমাম আবু ইউসুফ ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি দরিদ্র থাকা সত্ত্বেও হাদিসের ইলম অর্জন করতাম। একদিন আমি ইমামের কাছে বসে আছি এমন সময় আমার পিতা এসে আমাকে বললেন, "হে বৎস, তুমি তার সাথে এভাবে আরাম করে বসে থেকো না। তার রুটি প্রস্তুত হয়ে আছে। অন্যদিকে তুমি দরিদ্র।" বাবার বারবার অনুরোধে হাদিসের ইলম অর্জন ছেড়ে উঠে গেলাম আর বাবার আনুগত্য করলাম। ইমাম সাহেব

আমাকে না পেয়ে বাকি ছাত্রদের কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। এরপর যখন আমাকে দেখলেন, তখন বললেন, "কী কারণে তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে?" বললাম, "জীবিকা উপার্জনের জন্য।" সেদিন যখন সকলে চলে গেল এবং আমিও চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন তিনি আমাকে একশ দিরহামের একটি থলে দিলেন। তিনি বললেন, "এটি খরচ করবে। যখন শেষ হয়ে যাবে আমাকে জানাবে। আর দরসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করবে।" কিছু দিন চলে যাওয়ার পর তিনি আবার একশ দিরহাম দিলেন। যখনই শেষ হয়ে যেত, তিনি বলা ছাড়াই একশ দিরহাম দিয়ে দিতেন। কেমন যেন কেউ তাকে শেষ হওয়ার ব্যাপারে জানিয়ে যেত প্রতিবার। এভাবে চলতে থাকে যতদিন না আমার ইলমের প্রয়োজন পূরণ হয়। আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানিফাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁর ক্ষমার চাদরে আচ্ছাদিত করুন।'

- কারদারি আরও বর্ণনা করেন, হাসান বিন জিয়াদ ﵀-ও দরিদ্র ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার সাথে লেগে থাকতেন। এদিকে তার পিতা বলতেন, 'আমাদের অনেকগুলো মেয়ে আছে। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনো ছেলে নেই। তাই তাদের জন্য কাজ করো।' বিষয়টি যখন ইমামের কানে পৌঁছাল, তখন তার জন্য তিনি ভাতা চালু করে দিলেন। এবং বললেন, 'ফিকহ অর্জনে ব্রত হও। কেননা, আমি কোনো ফকিহকে কখনো দরিদ্র দেখিনি।'

* কখনো কোনো উচ্চ মনোবলের অধিকারীর মাঝে প্রতিভার নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখলে সালাফ তাকে এ প্রতিভা দুনিয়া অর্জনের পেছনে ব্যয় না করে ইলম অর্জন করতে উৎসাহ দিতেন।

- ইমাম আবু হানিফা ﵀ বলেন, 'আমি একদিন ইমাম আশ-শাবি ﵀-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি তখন বসা ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "তুমি বারবার কোথায় যাও।" আমি বললাম, "অমুকের কাছে যাই।" তিনি বললেন, "বাজারের প্রতি মনোযোগী হয়ো না। আমি বারবার আলিমদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলাম।" আমি তাঁকে বললাম, "আমি তাঁদের কাছে কম যাই।" তিনি বললেন, "এমনটি কোরো না। তোমার ইলমের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং আলিমদের সাথে ওঠাবসা করা উচিত। কারণ, আমি তোমার মাঝে একটি বিচক্ষণতা ও প্রতিভার নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি।"

তাঁর এই কথাটি আমার হৃদয়ে বসে গেল। আমি বাজারে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়ে ইলম অর্জনে ব্রত হলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর এ কথার মাধ্যমে উপকৃত করলেন।'

- শাইখ মক্কি বিন ইবরাহিম ﷺ (ইমাম বুখারির উসতাজ) বলেন, 'আমি ছিলাম ব্যবসায়ী। একদিন আমি আবু হানিফার নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, "হে মক্কি, আমি দেখছি, তুমি ব্যবসা করছ। কিন্তু যখন ব্যবসা ইলমহীন হয়, তখন তাতে অনিষ্ট প্রবেশ করে। তুমি কেন ইলম শিখছ না, লিখছ না?" এরপর থেকে আবু হানিফার এ কথা সব সময় আমার মাঝে কাজ করতে থাকে। অবশেষে আমি ইলম অর্জন এবং তা লেখা শুরু করি। আল্লাহ আমাকে ইমাম আবু হানিফার মাধ্যমে অনেক কিছু দান করেছেন। তাই আমি প্রতি সালাতের পর তাঁর জন্য দুআ করে থাকি। যখনই তাঁর কথা স্মরণ হয়, দুআ করতে থাকি। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বরকতেই আমার জন্য ইলমের দরজা খুলে দিয়েছেন।'

* সম্ভবত ইমাম হাম্মাদের সংশ্রবে থেকে প্রভাবান্বিত হয়ে ইমাম আবু হানিফা ﷺ প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিকাশের কাজটি করেছেন। কারণ, ইমাম হাম্মাদ আবু হানিফার প্রতিভা ও উচ্চ মনোবলকে বিকশিত করেছেন। তাঁর প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হয়েছেন। তাঁকে নিজের মজলিসে নৈকট্য দান করেছেন। যাতে উম্মাহর মহান একটি ব্যক্তিত্ব উপহার দিতে পারেন তিনি।

- ইমাম আবু হানিফা ﷺ কুফার জামে মসজিদে শাইখ হাম্মাদ ﷺ-এর কাছে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। যখন শাইখ হাম্মাদ তার প্রতিভা, দ্রুত মুখস্থশক্তি এবং সুচিন্তার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেন, তাকে নিজের কাছে নিয়ে বসালেন। তার মতামতকে সম্মান করলেন। ইজতিহাদ ও স্বতন্ত্র চিন্তার ব্যাপারে তাকে অনুপ্রাণিত করলেন। ইমাম আবু হানিফার অধিক পরিমাণে প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা জানতে চাওয়ার কারণে তিনি কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। কারণ, তার প্রশ্নে গভীরতা ও সূক্ষ্মতা ছিল।

বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানিফা ﷺ হাম্মাদ ﷺ-কে কিছু প্রশ্ন করার পর তাঁর মজলিস থেকে চলে গেলেন। তিনি প্রশ্নগুলো নিয়ে অনেক পীড়াপীড়ি

করেছিলেন বলে হাম্মাদের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি পাশের জনৈক লোককে নিজের এই ছাত্রের যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "তাঁর পক্ষ থেকে যে অধিক প্রশ্ন দেখছ, এটা তাঁকে পুরো রাত জাগিয়ে রাখে।" ইমাম আবু হানিফা ﵀ তাঁর উসতাজের সংশ্রব গ্রহণ করেন আঠারো বছর। এ সময়ে তিনি নিজস্ব কোনো দরস চালু করেননি। শাইখ হাম্মাদের মৃত্যুর পর আবু হানিফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর দরসের আসনে।

* অনেক সময় একনিষ্ঠ কোনো আলিমের শিক্ষণীয় উপদেশে প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবন পরিবর্তনের মোড় নেয় কল্যাণের দিকে। একসময় এ প্রতিভাবান ব্যক্তি পুরো উম্মাহর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। উচ্চ মনোবলের অধিকারী প্রতিভাবান এক ব্যক্তির ঘটনা। তিনি হারাম শরিফের প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করলেন। এতদিন নিজ এলাকায় তালিম ও দাওয়াতের কাজ করেছিলেন। এখন হারাম শরিফের প্রতিবেশী হয়ে থাকবেন বলে এসেছেন। তখন এক আলিম তাকে বললেন, 'এটি তোমার জায়গা নয়।'

- ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর ইলম গ্রহণের কারণ উল্লেখ করে মুসআব বিন আব্দুল্লাহ জুবাইরি বলেন, 'ইমাম শাফিয়ি ﵀ প্রাথমিক অবস্থায় আরবের ইতিহাস ও সাহিত্য, কাব্য-কবিতা শিখতে লাগলেন। এরপর ফিকহ অর্জন শুরু করেন। তাঁর ইলমে ফিকহ অর্জনের কারণ হলো, একদিন তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে সফর করছিলেন। তাঁর পেছনে আমার পিতার এক কেরানি বসা ছিল। ইমাম শাফিয়ি কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করলেন। তখন সে কেরানি তাঁকে চাবুক মেরে বললেন, "তোমার মতো মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব এ রকম বিষয়ে নষ্ট করছ? তুমি ফিকহ অর্জন করছ না কেন?" এই বিষয়টি তাঁকে নাড়া দিল। ফলে তিনি মুসলিম বিন খালিদ আজ-জানজির মজলিসে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করলেন। তিনি ছিলেন মক্কার মুফতি। এরপর তিনি আমাদের কাছে এলেন। মালিক বিন আনাসের দরসে অংশগ্রহণ করলেন।'

শাফিয়ি ﵀ বলেন, 'আমি কবিতা নিয়ে পড়ে থাকতাম। মিনায় আমি পাহাড়ের দুর্গম পথে সফরকালে পেছন থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম, "তোমার উচিত ফিকহ অর্জন করা।"' হুমাইদি বলেন, 'ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেন, "আমি নাহু ও সাহিত্য শেখার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন আমার সাথে মুসলিম

বিন খালিদ আজ-জানজির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, "হে যুবক, তুমি কোথাকার অধিবাসী?" আমি বললাম, "মক্কার।" তিনি বললেন, "তোমার বাড়ি কোথায়?" আমি বললাম, "খাইফ অঞ্চলে।" তিনি বললেন, "তুমি কোন গোত্রের লোক?" আমি বললাম, "বনু আব্দি মানাফ।" তিনি বললেন, "বাহ! বাহ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করুন। তুমি কি নিজের বুদ্ধিকে ফিকহ অর্জনে ব্যয় করবে না? তাহলে এটি তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম হতো!'"

এরপর শাফিয়ি ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান আবু আব্দুল্লাহ মালিক বিন আনাস ﷺ-এর সংশ্রব গ্রহণ করতে। ইমাম শাফিয়ির ইলমি সফর নিয়ে প্রসিদ্ধ একটি সফরনামা রয়েছে। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে মুয়াত্তা মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। এতে মালিক ﷺ খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন। মালিক ﷺ তাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। অচিরেই তুমি বিশাল মর্যাদার অধিকারী হবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মালিক ﷺ তাকে বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার হৃদয়ে একটি নুর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তুমি সে নুর গুনাহের মাধ্যমে নিভিয়ে দিয়ো না।" শাফিয়ি ﷺ যখন মালিক ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল তেরো। এরপর তিনি সেখান থেকে ইয়ামান অভিমুখী হলেন।

মক্কার ইমাম ও মুফতি আবু খালিদ মুসলিম বিন খালিদ আজ-জানজি ﷺ তাঁকে ফতওয়া প্রদানের ব্যাপারে অনুমতি দান করেন এবং তাঁকে বলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, তুমি ফতওয়া প্রদান করো। আল্লাহর শপথ, তোমার ফতওয়া প্রদানের সময় হয়েছে।' তখন ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর বয়স ছিল পনেরো বছর। এ ব্যাপারে সে যুগের লোকদের অনেক প্রসিদ্ধ কথাবার্তা রয়েছে। সে যুগে পর্যাপ্ত আলিম থাকা সত্ত্বেও মানুষ তরুণ ইমাম শাফিয়ির কাছে ইলম নেওয়া শুরু করে। এটা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এসব কিছু তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলোতে লিখিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে।

- আল্লামা আল-কুরআনি ইমাম মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি ﷺ-এর পুত্র বর্ণনা করেন, শৈশবে যখন তার পিতার মাঝে প্রতিভা ও উচ্চ হিম্মতের লক্ষণ দেখলেন, তাঁর শাইখ তখন তাকে বললেন, 'হে বৎস, আলিমগণ বলেন,

"যে নিজের মাঝে এমন প্রতিভা ও যোগ্যতা দেখতে পায়, যা তাকে নেতৃত্বের উপযুক্ত করে তোলে, তার জন্য সেটা অর্জন করা আবশ্যক। দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জন করা তোমার জন্য আবশ্যক। তাই তুমি নিজেকে বিনষ্ট কোরো না।'"

- শিশুদের মাঝে উচ্চ হিম্মতের বীজ বপনে সফল ও আশ্চর্যজনক একটি দৃষ্টান্ত হলো শাইখ আগা শামসুদ্দিন ﷺ। তিনি ছিলেন সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ আল-উসমানি ﷺ-এর উসতাজ। তিনি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাত ধরে সমুদ্র উপকূলে চলে যেতেন এবং সুরক্ষিত সুউচ্চ কনস্টান্টিনোপলের উঁচু দেয়ালের দিকে ইশারা করে বলতেন, 'দূরের ওই শহরটির দিকে দেখো। এটির নাম কনস্টান্টিনোপল। রাসুল ﷺ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর উম্মতের জনৈক লোক নিজ বাহিনী নিয়ে এটি বিজয় করবে এবং এটি মুসলিম ভূমির অন্তর্ভুক্ত করবে। এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর হাদিসটি বর্ণনা করে শোনান, (لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ) "অচিরেই কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে। কতই না উত্তম হবে সে আমির! আর কতই না উত্তম হবে সে বাহিনী!"[৫৩০] তিনি এই হাদিসটি বারবার শিশু মুহাম্মাদের কানে প্রবেশ করাতে থাকেন। ফলে হিম্মতের চারা তার প্রতিভাবান হৃদয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে যে, তিনিই সে বিজয়ী আমির হবেন, যার ব্যাপারে সত্যবাদী নবি ﷺ সুসংবাদ দিয়েছেন।

তার পিতা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ছোটবেলা থেকে তাকে বিভিন্ন সময়ে রণাঙ্গনে নিয়ে যেতেন, যাতে যুদ্ধ ও আক্রমণের ভীতি তার অন্তর থেকে চলে যায়। যাতে সৈনিকদের প্রস্তুতি, চলাফেরা ও অবতরণ-আরোহণের দৃশ্য দেখে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাস্তবিকভাবে সৈনিকদের নেতৃত্ব ও সামরিক শাস্ত্র শিখে নিতে পারেন। যখন তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মতার সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

যখন নির্ধারিত দিন আসলো, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের সাথে আলাপকালে তাকে কনস্টান্টিনোপল মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিতে বললেন। যখন সম্রাটের কাছে এই সংবাদ পৌছাল, সে শহর অর্পণ

....

৫৩০. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯৫৭, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৩০০, তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ১২১৬

করতে অস্বীকার করল। তখন মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ বলেন, 'অচিরেই হয়তো কনস্টান্টিনোপলে আমার জন্য সিংহাসন তৈরি হবে, না হয় সেখানে আমার কবর রচিত হবে।'

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ একান্ন দিন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে রাখলেন। এই সময়ে কিছু তীব্র যুদ্ধ হয়। এরপর এই সুরক্ষিত শহরটি পদানত হয় মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে। যে শহর তাঁর আগে বহু বিজয়ীরা বিজয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ সে শহর বিজয় করলেন মাত্র ২৩ বছর বয়সে। রাসুল ﷺ-এর হাদিস সত্য হলো। বীর মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ মুসলিমদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছেন, যা মুসলিমগণ প্রায় আটশ বছর যাবৎ বুকে লালন করছিলেন। মুসলিমরা এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বহুবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। যেন এ সৌভাগ্য ও মর্যাদা সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের তাকদিরেই লেখা ছিল।

উৎসাহ প্রদান এবং হিম্মতের জাগরণে এর প্রভাব

ইসলাম উৎসাহ প্রদান করাকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, ইলম অর্জন, নেতৃত্ব ও ইমামতির মতো ফরজে কিফায়াসমূহ আদায়ে যারা অক্ষম, তাদের জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করার আমলটি ফরজ করে দিয়েছে। এই ধরনের ফরজের ক্ষেত্রে ফকিহদের বক্তব্য এমন—'এগুলো ফরজে কিফায়া। যদি কতক লোক এগুলো আদায় করে নেয়, তাহলে বাকিদের থেকে ফরজে কিফায়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ আদায় না করে, তবে সকলেই গুনাহগার হবে। সক্ষম ব্যক্তি গুনাহগার হবে, কারণ সে ত্রুটি করেছে। আর অক্ষম ব্যক্তি গুনাহগার হবে, কারণ নিজের সাধ্যের ভেতরের কাজটা করতে সেও ত্রুটি করেছে। আর এসব দায়িত্ব আদায়ে যে অক্ষম, তার দায়িত্ব হলো, যারা সক্ষম তাদের খুঁজে বের করা, আমলের জন্য অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা, কাজটি সম্পাদনে সাহায্য করা। বরং কাজটি করতে তাকে বাধ্য করা।'[৫৩১]

....

৫৩১. শাতিবি ﷺ কৃত আল-মুওআফাকাত : ১/১১৪

যুগে যুগে মুসলিমগণ প্রতিভাবান ও উচ্চ হিম্মতধারীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেছেন। তাদের উৎসাহিত করতেন প্রতিটি উপায়ে। তারা ইলম অর্জনে নিয়োজিত প্রতিভাবান ছাত্রদের পেছনে বিশাল অর্থ ব্যয় করতেন, যেন সেসব ছাত্র ইলম অর্জন থেকে সরে না যায়। আর যেন তাদের মানুষের কাছে চাইতে না হয় অথবা জীবিকা উপার্জন করতে গিয়ে ইলম অর্জন থেকে দূরে সরে পড়তে না হয়।

ইমাম আবু হাইয়ান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-গারনাতি ﷺ। তাঁর ব্যাপারে সাফাদি বলেন, 'আমি তাঁকে কেবল ইলম শ্রবণ, লিখন অথবা কিতাব অধ্যয়নে রত দেখতাম। অন্যকিছু করতে কখনো দেখিনি। তিনি মেধাবী ছাত্রদের স্তর অনুযায়ী তাদের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকতেন।'[৫৩২]

মিসরের মকতব, মসজিদ ও জামিআ আজহারের শিক্ষকগণ যখন কোনো শিশুর মাঝে তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর মুখস্থশক্তির প্রমাণ পেতেন, তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে ইলম শেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন। নিজেদের বিশেষ কোষাগার বা ওয়াকফের সম্পদ থেকে তাকে সহযোগিতা করতেন।

ইলম অর্জনকারীদের প্রেরণাদাতার মধ্যে অগ্রবর্তীদের দলে আছেন খলিফা ও আমিরগণ। ইমাম বুখারি ﷺ তাঁর 'সহিহুল বুখারি'-তে বর্ণনা করেন, অল্পবয়সী ইবনে আব্বাস ﷺ বদরি সাহাবিদের সাথে আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর নিকট যেতেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'তাদের একজন নিজের মনের মধ্যে যেন আমার স্বল্প বয়সের ব্যাপারটি পোষণ করছিলেন। তিনি বললেন, "কেন এই ছেলেটি আমাদের সাথে এখানে আসে, অথচ সে আমাদের সন্তানের বয়সী মাত্র!" উমর ﷺ জবাবে বলেন, "জানার দিক দিয়ে সে তোমাদের মতো।" একদিন উমর ﷺ তাঁকে ডাকলেন। তিনি অন্যদের সাথে প্রবেশ করালেন তাঁকে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আমি মনে করি যে, সেদিন তাদের দেখানোর জন্যই আমাকে ডেকে ছিলেন তিনি। উমর ﷺ সেদিন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার বাণী : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়)[৫৩৩]-এর ব্যাপারে কী বলো?"

....

৫৩২. আদ-দুরারুল কামিনাহ : ৫/৭০

৫৩৩. সুরা আন-নাসর : ১

তাদের কেউ বললেন, "আমাদের আদেশ করা হয়েছে, যখন সাহায্য আসবে এবং বিজয় হবে, তখন আমরা যেন আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।" আর কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ হয়ে রইলেন। তখন উমর ﵁ আমাকে বললেন, "হে ইবনে আব্বাস, তুমিও কি এ রকম বলো?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কী বলো?" আমি বললাম, "এখানে আল্লাহ রাসুল ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ - "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।" এটি হলো আপনার মৃত্যুর আগমনের আলামত। তাই فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا - "তখন আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।"[৫৩৪]

উমর ﵁ এবার বললেন, "এই ব্যাপারে আমি ইবনে আব্বাসের কথার চেয়ে বেশি কিছু জানি না।"'

এভাবেই আমিরুল মুমিনিন উমর ﵁ ইবনে আব্বাস ﵄-এর আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর হিম্মতকে উঁচু করেছেন। তাঁকে নিজেকে অবহেলা করা বা নিজের মাঝে ত্রুটি থাকার ধারণা থেকে বাঁচিয়েছেন। ইমাম বুখারি ﵀ তাঁর 'সহিহুল বুখারি'-তে বর্ণনা করেন, 'একবার উমর ﵁ কতিপয় সাহাবিকে কুরআনে কারিমের একটি আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই উত্তর দিতে পারলেন না। অল্পবয়সী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ তাঁদের মাঝেই ছিলেন। তিনি বললেন, "আমিরুল মুমিনিন, এ ব্যাপারে আমার মনে কিছু বিষয় উদিত হয়েছে।" উমর ﵁ বললেন, "তুমি বলো, ভাতিজা। নিজেকে ছোট ভেবো না।" তখন ইবনে আব্বাস উত্তর দিলেন।'

এভাবেই ইবনে আব্বাস ﵄ শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তিনি নিম্ন মাসকিতার কারও অপপ্ররোচনায় নিরাশ হননি। তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখন আমি এক আনসারি যুবককে বললাম, "চলো, নবিজির সাহাবিদের কাছে যাই এবং তাঁদের থেকে ইলম শিখি। এখনো তাঁরা অনেকে জীবিত আছেন।" সে আমাকে বলল, "ইবনে আব্বাস, আশ্চর্য! মানুষের মাঝে

....

৫৩৪. সুরা আন-নাসর : ৩

রাসুল ﷺ-এর এত সাহাবি থাকতে তুমি কি মনে করো, মানুষ প্রয়োজনে তোমার কাছে জানতে আসবে?" এরপর আমি তাকে ত্যাগ করলাম। আমি একাই এগিয়ে গেলাম। নবিজি ﷺ-এর সাথিদের খুঁজে ফিরতে লাগলাম। যখন রাসুল ﷺ-এর কোনো সাহাবি সম্পর্কে জানতে পারতাম যে, তিনি রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিস জানেন, ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। কখনো-বা দুপুরবেলা তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখতাম, তিনি কাইলুলা করছেন। তখন তাঁর দরজায় গায়ের চাদরটা শিথান বানিয়ে শুয়ে পড়তাম। বাতাস পথের ধুলো উড়িয়ে আমার ওপর এনে ফেলত। যথাসময়ে সেই সাহাবির ঘুম ভাঙলে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে দরজায় শায়িত দেখলে অবাক হয়ে বলতেন, "নবিজির চাচাতো ভাই, আপনি এখানে কেন? কাউকে পাঠিয়ে দিতেন, আমি চলে আসতাম!"

তখন আমি বলতাম, "না, আমারই আপনার কাছে আসার কথা।" এরপর আমি তাঁকে হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তারপর নবিজির সাহাবিগণ দুনিয়া থেকে চলে যান। তখন লোকজন এসে আমার পাশে ভিড় করেন। এ দেখে আমার আনসারি যুবক বন্ধু তখন বললেন, "এই যুবক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।"'

ইবনে শিহাব رحمه الله নিজের ছোট ছোট সন্তানদের উৎসাহ দিতেন। তিনি তাদের বলতেন, 'বয়স কম হওয়ায় নিজেদের তুচ্ছ ভেবো না। কেননা, উমর رضي الله عنه যখন কঠিন কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন তরুণদের ডেকে আনতেন। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাদের মেধার প্রখরতা যাচাই করে নিতেন।'[৫৩৫]

খলিফা হারুনুর রশিদ ছাত্র ও আলিমদের বিভিন্ন হাদিয়া-তুহফা দিতেন। এমনকি ইবনুল মুবারক বলেন, 'রাসুল ﷺ, খুলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবিদের যুগের পর হারুনুর রশিদের যুগের মতো এত আলিম, কুরআনের কারি, কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতাকারী এবং হারাম থেকে নিজেকে বিরতকারী দেখিনি। তখন আট বছর বয়সে বালকরা কুরআন হিফজ করত। আর এগারো বছর বয়সে ফিকহ ও ইলমের সাগরে সাঁতার কাটত, হাদিস বর্ণনা করত, কিতাব সংগ্রহ করত এবং উসতাজদের সাথে বহস করত।

কতিপয় শাসক ইলম ও আলিমদের এতই ভালোবাসতেন যে, আলিমদের নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখতেন। এমনই একজন আমির ছিলেন আল-

....

৫৩৫. জামিউ বায়ানিল ইলমি ও ফাজলিহি : ১/৮৫

মুইজ বিন বাদিস। ইনি ছিলেন আল-মাগরিবুল ইসলামির সানহাজি দাওলার আমির। তিনি যে মহান আলিমের কথাই শুনেছেন, তাকে নিজের কাছে উপস্থিত করেছেন এবং নিজের বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। তাকে সর্বাধিক সম্মান দিয়েছেন, তার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাকে উচ্চ বেতনে সম্মানিত করেছেন।...

এমনই ছিলেন খলিফা আল-মুওয়াহহিদি আস-সালিস আল-মানসুর ইয়াকুব বিন ইউসুফ বিন আব্দুল মুমিন। তিনি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরি করেছিলেন এবং নিজেই তার তত্ত্বাবধায়ন করতেন। প্রতিভাবান ছাত্রদের নিজের কাছে রাখার কারণে যখন নিজের নিকটস্থ কতিপয় লোকের হিংসার বিষয়টি তার কর্ণগোচর হলো, তখন তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, "হে একত্ববাদীগণ, তোমরা অনেকগুলো গোত্র। যখন তোমাদের কেউ বিপদগ্রস্ত হয়, তখন নিজের গোত্রের কাছে আশ্রয় নাও।... আর এই ছাত্রদের আমি ছাড়া কোনো গোত্র নেই। যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তখন আমিই তাদের আশ্রয়। আমার দিকেই তারা ধাবিত হয় এবং আমার দিকেই নিজেদের সম্পৃক্ত করে।"

খলিফা মানসুরের ব্যক্তিগত ডাক্তার আবু বকর বিন জাহরের প্রতি উদারতা ছিল বিরল। আবু বকর খলিফার নিকট দীর্ঘ দিন যাবৎ অবস্থান করছিলেন। এ কারণে পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার সফর করার কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি একটি কবিতায় নিজের ছোট ছেলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। মানসুর যখন এই কবিতাটি শুনলেন, তখন কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারকে আশবেলিয়ায় পাঠালেন। তাদেরকে ডা. আবু বকরের বাড়ি ও বাড়ির পাশের রাস্তার ম্যাপ করতে আদেশ করলেন এবং সে রকম একটি বাড়ি মারাকেশে তৈরি করতে বললেন। তারা আদেশ অনুযায়ী কাজ করল এবং তার পরিবারকে সেখানে নিয়ে এল। ইবনে জাহর এটি দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত খুশি হলেন। সে খুশি ভাষায় প্রকাশ করার মতো ছিল না। জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি ভালোবাসার এমন দৃষ্টান্তের কথা কি আর শ্রুত হয়েছে?

ষোড়শ শতাব্দীতে খিলাফতে উসমানিয়ার যুগে নতুন একটি সফল আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন শহর ও গ্রামের মেধাবী এবং প্রতিভাবান সকল লোককে জড়ো করে তাদের পূর্ণরূপে দেখাশোনা করা হয়। প্রত্যেককে নিজ শাস্ত্র ও

ইলমের বিভাগ অনুযায়ী তার উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এরা উসমানি সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও সামরিক অঙ্গনের বিকাশে সাহায্য করে। ফলে উসমানি খিলাফত যুদ্ধের ময়দানে ইউরোপের জন্য আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।'[৫৩৬]

- উসতাজ আলি তানতাবি ﷺ বলেন, 'একবার একটি ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিলাম। সেখানে দেখলাম, বিজ্ঞজনের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, "কোন জিনিসের ওপর জ্ঞান ও সাহিত্যের সমুন্নতি নির্ভর করে?" সুন্দর উত্তরদাতার জন্য মূল্যবান পুরস্কারের ঘোষণা ছিল। অবশেষে পুরস্কারটি পেয়েছিল প্রসিদ্ধ এক লেখিকা। তার উত্তর ছিল, "উৎসাহ।" লেখিকা আরও বলেন,

....

৫৩৬. দেখুন, রিয়াআতুন নাবিগিন ফিল ইসলাম ওয়া ইলমিন নাফস : ১৭১-১৭২
উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীর শুরু সময় পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিভাবান লোকেরা অবমূল্যায়িত হতে থাকে। কারণ, তাদের সমাজে প্রতিভাবান লোকদের ব্যাপারে একটি মন্দ ধারণা ছিল। এর কারণ সম্ভবত দুটি গ্রন্থ—যার একটির নাম : {Man of Genius} এবং লেখক হলো Iambroso আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো : {Insanity of Genius} এবং লেখক হলো : Nisbet। Man of Genius (প্রতিভাবান মানুষ) ও Insanity of Genius (প্রতিভাধরের পাগলামি) এই দুটি গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় লন্ডন ও নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থেই প্রতিভা ও পাগলামির মাঝে একটি সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রতিভাবান লোকেরা পাগল।
এরপর ১৯৪৭ সালে যখন Terman তার বই {The gifted children grown up} বা (প্রতিভাবান শিশু পথ দেখাবে) প্রকাশ করেন, তখন পশ্চিমারা প্রতিভাবান লোকদের ব্যাপারে ভালো কিছু উপলব্ধি করে। এই বইতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মেধাবী শিশুরা আত্মিক, শারীরিক এবং সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে সুস্থ। এর সাহায্যে প্রতিভাবানদের সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হয় সাধারণ মানুষের মনে।
এমনকি বিংশ শতাব্দীর মধ্যসময় পর্যন্ত আমেরিকানরা প্রতিভাবানদের তত্ত্বাবধানকে বিলাসিতা বিবেচনা করত। তারা প্রতিভাবানদের জন্য তেমন কোনো জোর প্রচেষ্টা চালাত না। এরপর ১৯৫৭ সালে রাশিয়ানরা যখন প্রথম মহাকাশযান প্রেরণ করে, তখন আমেরিকানরা বিপদ অনুভব করে যে, রাশিয়ানরা তাদের পেছনে ফেলে দিচ্ছে। তাই তখন আমেরিকানরা প্রতিভাবানদের তত্ত্বাবধান করতে শুরু করে এবং এটাকে জীবন-মরণ সমস্যা বলে গণ্য করে। প্রতিভাবানদের সঠিক তত্ত্বাবধানের জন্য তারা প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান, আত্মিকজ্ঞান ও সমাজবিষয়ক জ্ঞানীদের একটি বাহিনী তৈরি করে। প্রতিভাবানদের তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন পরিষদ ও সংগঠন নির্মাণ করে। এসব সংগঠনকে প্রতিটি জায়গা থেকে প্রতিভাবান লোক খুঁজে বের করার প্রতি উৎসাহ দিতে থাকে। এমনকি আমেরিকার অনেক স্টেইটে প্রতিভাবানদের নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গসংগঠন গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৭০০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেগুলোর দেখাশুনায় নিয়োজিত থাকে প্রায় ৩০০ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়। একইভাবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্প ও শিক্ষা সংগঠন প্রতিভাবানদের খোঁজ ও তত্ত্বাবধানের এ প্রোগ্রামের পেছনে আর্থিক সাহায্যে অংশগ্রহণ করে।
- রিয়াআতুন নাবিগিন : ১৭৩-১৭৪। ঈষৎ পরিমার্জিত।

'এমনকি তিনি এ বয়সেও এবং এত প্রসিদ্ধি ও সম্মান পাওয়ার পরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই তাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে আর কখনো নিরুৎসাহমূলক কিছু শুনলে এখনো তিনি থমকে দাঁড়ান এবং সামনে চলা বন্ধ করে দেন।' নিরুৎসাহের মাঝে একটা মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।

- এরপর শাইখ তানতাবি গলা টিপে প্রতিভা হত্যা করা ও উম্মাহকে প্রতিভাবান মানুষের প্রতিভা ও আবির্ভাব থেকে বঞ্চিত করার পেছনে নিরুৎসাহিত করার মন্দ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'শাইখ মুহাম্মাদ আমিন বিন আবিদিন বালক তখন। হতোদ্যমকারীরা ইলমের প্রতি ইবনে আবিদিনের ঝোঁক উপলব্ধি করতে পারল। তারা তার স্মৃতি ও মেধার প্রখরতার বিষয়টি বুঝতে পেরে তার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়ল। তার পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তারা তার পিতাকে এ ব্যাপারে সম্মত করার চেষ্টা করল যে, তিনি যেন ইবনে আবিদিনকে নিজের ব্যবসার কাজে লাগান এবং ইলমের পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনেন। তারা তার পিতার কাছে গিয়ে তার কথা বলা শুরু করল। আবার কেউ কেউ তার কাছে বিভিন্ন লোকদের পাঠাতে লাগল। তার কাছে বিভিন্ন চিঠিও পাঠাতে লাগল। এবং তার সাথি ও বন্ধুদের মাধ্যমেও তার বিপক্ষে লেগে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের কল্যাণের ইচ্ছা করলেন এবং তার পিতাকে দৃঢ়তা দান করলেন। পরবর্তীকালে এ বালক ইবনে আবিদিন লিখলেন "আল-হাশিয়া" গ্রন্থটি। ফিকহে হানাফির শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ এটি।

এমন লোকেরা আমাদের উসতাজ আল্লামা মুহাম্মাদ বিন কুরদ আলিকেও ইলম থেকে দূরে সরাতে চেয়েছিল। তারা তার কাছে নিজেদের গোত্রের দুজন সহোদরকে পাঠাল। সে দুজন ইনতিকাল করেছে। আমি তাদের নাম উল্লেখ করছি না। তারা প্রায় চল্লিশের অধিক ছাত্রকে ইলম থেকে বঞ্চিত করেছে। এরা মুহাম্মাদ বিন কুরদের পিতার পেছনে লেগে রইল। তার পিতা আলিম ছিলেন না। এ দুজন সব সময় তাকে অসদুপদেশ দিত, নিজের ছেলেকে ইলম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো কাজ শেখাতে। কারণ, ইলম শিখিয়ে কোনো উপকার নেই এবং এর দ্বারা কোনো কল্যাণ হাসিল হবে না।... এমনকি তারা তার ওপর পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এ পীড়াপীড়ি অবিরাম চালিয়ে গেল তারা। একপর্যায়ে তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের

তাড়িয়ে দিলেন। এই ছেলেই একদিন উসতাজ মুহাম্মাদ বিন কুরদ আলি হলেন। যিনি সিরিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক রেনেসাঁর জনক। ছিলেন সিরিয়ার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী। সিরিয়ার গৌরব তিনি। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো : খুতাতুশ শাম, গরায়িবুল গারব, আল-কাদিম ওয়াল হাদিস, আল-মুহাদারাত, গবিরুল আন্দালুস ও হাজিরুহা, আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, আল-ইসলাম ওয়াল হাজারাতুল আরাবিয়্যাহ, আল-মুকতাবিস।...আরও আছে : আল-মাজমাউল ইলমি আল-আরাবি বি-দিমাশক, আশ-শুআরা ওয়াল কুত্তাব মিনাশ শাবাব।

ইবনে আবিদিন ও কুরদ আলির ক্ষেত্রে যে হতাশা সৃষ্টিকারীদের আবির্ভাব হয়েছে, যদি এমন মানুষরা না থাকত, তাহলে হয়তো আজকে আমরা আরও বেশি পরিমাণে প্রতিভাবান লোক পেতাম। এই তো শাইখ সালিম আল-বুখারি ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর লিখিত পুস্তিকা কেবল একটি। অথচ তিনি ছিলেন একজন মহান আলিম, ক্ষুরধার লেখক ও শক্তিশালী ইলমের অধিকারী এবং সুভাষী বক্তা। এর কারণ হলো, তিনি ছাত্র অবস্থায় তর্কশাস্ত্র নিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। অনেক সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখেন পুস্তিকাটি। তর্কশাস্ত্রের কঠিন ইবারাত, বোধ-কাঠিন্য দূর করে এ পুস্তিকাটি। তিনি এটি তাঁর শাইখের সামনে পেশ করেন, কিন্তু শাইখ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, “হে প্রবঞ্চিত, তুমি কি লেখার যোগ্য হয়েছ? অথচ তুমি.... তুমি....।” এরপর তিনি পুস্তিকাটি নিয়ে চুলায় জ্বালিয়ে দিলেন। আর এটিই ছিল শাইখ সালিম আল-বুখারির শুরু ও শেষ লেখা।

আমাদের দেশে সর্বপ্রথম যিনি উৎসাহ-অনুপ্রেরণার এই সুন্নাহকে চালু করেন তিনি হলেন উসতাজ শাইখ তাহির আল-জাজায়িরি ﷺ। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সুতার্কিক। তাঁর উৎসাহ-অনুপ্রেরণার ফল হলো, সিরিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, আল-মাকতাবাতুজ জাহিরিয়্যাহ, উসতাজ মুহাম্মাদ কুরদ আলি বেক, আমার মামা উসতাজ মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব।... তিনি হতাশা সৃষ্টিকারীদের নিন্দা করে বলেন :

'আমি ওই সকল লোককে দেখে আশ্চর্য হই, যারা এই যুগে হিম্মত বিনষ্ট করার চেষ্টা করে, যে যুগে গাফিল ব্যক্তিও সতর্ক।...

তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি দয়া করার অধিক উপযুক্ত। তাদের নিজেদের ওপর আপতিত বিপদ থেকে বাঁচতে সচেষ্ট ও অন্যের কল্যাণে ব্রত হওয়া উচিত। অতীত বা বর্তমানে কোনো নিরাশাকারীকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে দেখা যায়নি। তাই বড় বড় পত্রিকাসমূহের উচিত এই বদঅভ্যাসের ক্ষতির ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে তোলা। যাতে এই ব্যাধিতে পূর্ণরূপে আক্রান্ত নয়—এমন লোকেরা এ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এবং সব মানুষ যেন এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকে।'

শাইখ নিজের জীবনে প্রতিটি লোককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কাউকে নিজের নেক লক্ষ্য থেকে হতাশ করেননি। এমনকি তাঁর এক নিকটতম লোক আমাদের বলেন, 'শাইখ তাকে বলেন, "যদি কেউ তোমার কাছে তিন দিনে আরবি ব্যাকরণ শিখতে আসে, তবে তুমি বোলো না যে, "এটি অসম্ভব।" তাহলে তার মনোবল ভেঙে যাবে। তার সংকল্প নষ্ট হয়ে যাবে। এটা না বলে বরং তাকে তুমি পড়াও এবং তার ভেতরে এ বিষয়ের ভালোবাসা ঢুকিয়ে দাও, তাহলে হয়তো তার ভালো লেগে উঠলে সে তা পাঠে একাগ্র হবে।"'

- উৎসাহ-অনুপ্রেরণা প্রতিভার বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়, সুপ্ত প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। একসময় তার ফল পরিপক্ব হয়ে প্রকাশিত হয়। কত পেশাধারী বা ব্যবসায়ীর সন্তানকে যখন অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তার হাত ধরে ইলমের পথে তাকে কেউ চালিত করেছে, তো সে-ই একদিন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হয়েছে বা হয়েছে বড় কোনো পণ্ডিত, সাহিত্যিক।

বিগত শতাব্দীর সিরিয়ান আলিমদের মধ্যে যারা নিজেদের চেষ্টা-সাধনা, অনুপ্রেরণার ফলে মুফতির পদ ও গম্বুজের নিচে দরসের আসন গ্রহণ করেছেন, তাদের একজন হলেন মুহাম্মাদ ইসমাইল। তিনি একজন সাধারণ তাঁতি হিসেবে বেড়ে ওঠেন। কিন্তু ইলম ও আলিমদের মহব্বত করতেন। আলিমদের মজলিসে উপস্থিত হতেন বারাকাহ অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাদের পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করতেন কিছু শোনার জন্য, বারাকাহ পাওয়ার জন্য।

তিনি সব সময় দরসে উপস্থিত থাকতেন। প্রথম কাতার ছুটত না কখনো। তার ধারাবাহিক উপস্থিতি ও অগ্রগামিতা দেখে দরসের শাইখ তাকে ঘনিষ্ঠ করে নিতেন, তাকে স্নেহ করতেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন বাকিদের।

একসময় তার হৃদয়ে ইলমের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প তৈরি হলো। তিনি কিতাব কিনে নিলেন। অধ্যয়নে রাতকে সজীব রাখতেন। দক্ষ ছাত্রদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করতেন। এভাবে একটা সময় কাটিয়ে দিলেন তিনি। একপর্যায়ে প্রাসঙ্গিক ইলমসমূহ আত্মস্থ করে নিলেন। এরপর তিনি নিজ যুগে ফিকহ ও উসুলের একক ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। কিন্তু তখনও তিনি নিজ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। লোকজন তার এলাকায় বিভিন্ন জটিল মাসআলা ও যুগ-জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হতো। যেসব মাসআলায় বড় বড় আলিমগণ অক্ষম হয়ে পড়তেন, তিনি সেসবের উত্তর দিয়ে দিতেন। মানুষ ধীরে ধীরে ইমাদি বংশীয় মুফতির থেকে পৃথক হতে লাগল। এতে তারা খুব ব্যথিত হলো। তারা শাইখের অনিষ্ট সাধনের সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কোনো সুযোগ পায়নি তারা। তিনি নিজ পেশার মাধ্যমে জীবনযাপন করতেন আর মানুষ জীবনযাপন করত তার ইলমের মাধ্যমে।

তিনি প্রতিদিন ইমাদিদের বাড়ির সামনে দিয়ে সাদা ছোপযুক্ত একটি গাধির পিঠে চড়ে যাতায়াত করতেন। তাদের দেখলে সালাম দিতেন। তারাও সালামের উত্তর দিত। প্রতিদিনের মতো একদিন তিনি সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ির দরজায় প্রধান মুফতি সাহেবের এক ভাইকে দেখতে পেলেন তিনি। তিনি সালাম দিলে সে সালামের উত্তর দিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলল, 'শাইখ কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কি ফতওয়ার কর্তৃত্বের সনদ আনতে ইস্তাম্বুল যাচ্ছেন?' এ কথা বলে সেও হাসল এবং তার পাশের লোকেরাও হাসল। শাইখ শুধু বললেন, 'ইনশাআল্লাহ!' এর বেশি কিছু বললেন না। তিনি নিজ পথে যেতে লাগলেন। তাদের থেকে কিছু দূর গিয়ে একটি গলিতে ঘুরে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। পরিবারকে ভরণপোষণের খরচা দিয়ে তাদের বিদায় জানিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়লেন। শহরের পর শহর ডিঙিয়ে চললেন। অবশেষে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করে সেখানের শিক্ষক-ভবনের পাশে একটি সরাইখানায় অবস্থান করলেন।

তিনি দরজার সামনে বসে কিতাব অধ্যয়ন বা কোনো কিছু লেখালেখি করতেন। মানুষ তাঁর আকৃতি ও বেশভূষা দেখে বুঝত তিনি আরবদেশীয়। তারা তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে লাগল। তারা আরবদের সম্মান করত, কারণ তারা রাসুল ﷺ-এর উম্মতের সে অংশ, যাদের মাধ্যমে অন্যরা হিদায়াত পেয়েছে।

মানুষের সাথে শাইখের আলাপ-পরিচয় হলো। লোকেরা তাঁর কাছে বসে কথা বলতে লাগল। একদিন তাদের একজন বলল, 'বাদশাহ শাইখ-নিকেতনে একটি বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। প্রশ্নটি সেখানকার আলিমদের পেরেশান করে দিয়েছে। তারা সেটির কোনো উত্তর পাচ্ছেন না। কিন্তু বাদশাহ তাদের জোর করছেন। তাই তারা খুবই চিন্তিত। আপনি কি বিষয়টি একটু দেখবেন? হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য উত্তর দেওয়া সহজ করে দেবেন।'

মুহাম্মাদ ইসমাইল বললেন, 'হ্যাঁ'

লোকটি বলল, 'তাহলে আমার সাথে শাইখ-নিকেতনে চলুন।'

মুহাম্মাদ ইসমাইল, 'বিসমিল্লাহ।'

তারা গিয়ে শিক্ষক ভবনের সেক্রেটারির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। শাইখ ইসমাইল সেক্রেটারির কাছে মাসআলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। লোকটা মাথা তুলে তাকাল। অবহেলার দৃষ্টিতে একবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। শাইখের অবস্থা তার কাছে সন্তোষজনক ঠেকল না। সে মাসআলার কাগজটি শাইখের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিল। শাইখ চশমা বের করে চোখে লাগালেন। মাসআলাটি পড়লেন। সাথে থাকা একটি লম্বা মস্যাধার বের করলেন। মস্যাধার হলো, তামার তৈরি দোয়াতপাত্র। আলিমগণ ও ছাত্ররা এটি লেখার কাজ এবং নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যবহার করতেন। তিনি একটি বাঁশের কলম বের করে কলমের মাথা সরু করে নিলেন। এরপর সুন্দর হস্তলিপিতে লেখা শুরু করলেন। দশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করে ফেললেন কালো কালিতে। উত্তরে কোনো কিতাবের রেফারেন্স দিলেন না তিনি। উত্তর লেখা শেষে সেটি সেক্রেটারির কাছে হস্তান্তর করে নিজের আবাসের ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন। সেক্রেটারি যখন এটি শাইখুল ইসলামের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন শাইখুল ইসলাম এটি পাঠ করে অবাক হয়ে গেলেন, পুলকিত হলেন।

তিনি বললেন, 'ধ্বংস হও! কে এই উত্তর লিখেছে?'

সে বলল, 'সিরিয়ার একজন শাইখ। দেখতে এমন এমন...।'

তিনি বললেন, 'আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

তারা তাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসলো এবং কীভাবে শাইখুল ইসলামকে সালাম দিতে হয়, তা তাকে শিখিয়ে দিল যে, 'ঝুঁকে বুকের ওপর হাত রেখে তাকে সালাম দিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে হেঁটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।...' এভাবে আরও অনেক কিছু শিখিয়ে দিল, কিন্তু শাইখ ভুলে গেলেন। এগুলোর কিছুই মনে রাখতে পারলেন না।

তিনি শাইখুল ইসলামের কাছে প্রবেশ করে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।' তারপর গিয়ে শাইখুল ইসলামের কাছের একটা জায়গায় বসে পড়লেন। তাঁর কর্ম দেখে উপস্থিত সবাই অবাক। কিন্তু শাইখুল ইসলাম ইসলামি পদ্ধতিতে সালাম দেখে খুশিই হলেন। তাঁর সাথে কথোপকথন শুরু করলেন।

একপর্যায়ে শাইখুল ইসলাম তাঁকে বললেন, 'আপনার প্রয়োজন বলুন।'

শাইখ মুহাম্মাদ বললেন, 'শামে ফতওয়ার দায়িত্ব এবং মসজিদে দরস।'

তিনি বললেন, 'এদুটি আপনার জন্য নিশ্চিত। আপনি আগামীকাল আসুন।'

পরের দিন শাইখ তার কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে দায়িত্বের ফরমান দিয়ে দিলেন এবং এক হাজার দিনারের একটি থলেও সাথে দিলেন।

শাইখ দামেস্কে ফিরে এলেন। মাদি গাধাটায় চড়ে বসলেন। চলতে চলতে একসময় ইমাদিদের ঘরের সামনে আসলেন। মুফতির সেই ভাই তখন দরজার সামনে বসা। লোকটা শাইখকে অন্যান্য সময়ের মতো তিরস্কার করতে লাগল এবং বলল, 'হে শাইখ, কোথা থেকে আসলেন?'

শাইখ বললেন, 'ইস্তাম্বুল থেকে। আমি ফতওয়ার ফরমান নিয়ে এসেছি, যেমনটি আপনি মহাশয় আদেশ করেছিলেন।'

এরপর তিনি গভর্নর ভবনে গেলেন। গভর্নর ফরমান গ্রহণ করলেন। একটি সমাবেশে শাইখের কাজের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করলেন।

> هِمَمُ الرِّجَالِ إِذَا مَضَتْ لَمْ يَثْنِهَا *** خُدَعُ الثَّنَاءِ وَلَا عَوَادِي الذَّامِّ
>
> 'বীরপুরুষের হিম্মত যখন জেগে ওঠে, তখন কেউ তাকে ফেরাতে পারে না। না প্রশংসা শুনে সে প্রতারিত হয় না নিন্দুকের পরোয়া করে।'

- শাইখ আলি কাজবার। উমাইয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মিসকিয়্যা বাজারের একজন দরজি। নিজ কাজ থেকে অবসর হলে মসজিদে পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করতেন। শাইখের আলোচনা শুনতেন। শাইখ উঠে গেলে তিনি গিয়ে তাঁর খিদমত করতেন। শাইখ তার খিদমত দেখে তাকে আপন করে নেন। তাকে পড়ালেখায় উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকেন। তিনিও পড়ালেখা শুরু করলেন। অধ্যয়নে মনোযোগী হলেন। এভাবে একদিন তিনি পাঠচক্রে সবার মাঝে শাইখের সামনে পড়া শুরু করলেন। এভাবে কিছু কাল অতিবাহিত হলো। তিনি দোকানের কাজও চালিয়ে গেলেন পড়ার পাশাপাশি। শেষ পর্যন্ত ইলমের ময়দানে একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন, সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন।

যখন শাইখ মারা গেলেন, তখন বড় বড় আলিম, জ্ঞান-গুণী লোকেরা নতুন শিক্ষকের প্রথম দরসে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন। তারা এসে সহকারী শিক্ষকের খোঁজ করলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। শেষে তারা দোকানে গিয়ে দেখলেন, তিনি সেলাইয়ের কাজ করছেন। তাঁকে নিয়ে আসা হলো। তিনি দরস শুরু করলেন। এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন যে, উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেল। সবাই তাকে নিয়ে আনন্দিত হলো। এরপর থেকে তিনিই শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। পনেরো বছর তিনি দরস প্রদান করলেন সে মসজিদে। তাঁর পরে আজও তাঁর বংশের উত্তরাধিকারীগণ খুতবার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।'[৫৩৭]

....

৫৩৭. ফিকার ওয়া মাবাহিস : ১২৮-১৩৪। ঈষৎ পরিমার্জিত।

বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে গনিমত মনে করো

যৌবন হলো আমলের সময়। কারণ, এ সময়টা দুটি দুর্বলতার মাঝে একটি শক্তিশালী সময়। একদিকে শৈশবের দুর্বলতা, অন্যদিকে বার্ধক্যের দুর্বলতা আর মাঝখানে যৌবনের শক্তিমত্তা। এ কারণেই রাসুল ﷺ বলেছেন :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসের মূল্যায়ন করো : তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে ধনাঢ্যতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।'[৫৩৮]

ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, 'আমি যৌবনকে শুধু এমন একটি জিনিসের সাথেই তুলনা করি, যা আমার আস্তিনে ছিল—তারপর তা পড়ে গেল।'

যৌবন আনুগত্যে সক্ষমতার সময়। এটি দ্রুত প্রত্যাবর্তনশীল একজন মেহমান। যদি কোনো বুদ্ধিমান এ সময়টাকে মূল্যায়ন না করে, তাহলে তার আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না।

কবি বলেন :

مَا قُلْتُ لِلشَّبَابِ: (فِيْ كَنْفِ اللهِ *** وَلَا حِفْظِهِ) غَدَاةَ اسْتَقَلَّا

ضَيْفٌ زَارَنَا أَقَامَ عِنْدَنَا قَلِيْلًا *** سَوَّدَ الصُّحُفَ بِالذُّنُوْبِ وَوَلَّى

'যৌবনকে আমি বিদায় সম্ভাষণ জানাইনি। বলিনি, "ফি আমানিল্লাহ।" কারণ, যৌবন আমার সে মেহমান, যে আমাদের কাছে ছিল কিছু দিন আর যেতে যেতে জীবনের পাতাগুলো গুনাহে কালো করে দিয়ে গেছে।'

....

৫৩৮. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৪৬। হাদিসটি বুখারি-মুসলিমের শর্তে সহিহ।

যৌবন এক অমূল্য সম্পদ। তাই তো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দাকে যৌবনের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, তা সে কীভাবে ব্যয় করেছে এবং কোন কাজে তা ক্ষয় করেছে। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟

'কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানের কদম তার রবের সামনে থেকে ততক্ষণ সরবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জবাবদিহি করা হবে। ১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কীভাবে তা অতিবাহিত করেছে? ২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কীভাবে তা ক্ষয় করেছে? ৩-৪. তার ধনসম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে? এবং ৫. ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?'[৫৩৯]

যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যে সাত শ্রেণির মানুষকে তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন, তাদের একজন হলেন :

وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ

'এমন যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে।'[৫৪০]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যুবক বয়সেই বান্দাকে ইলম দান করেন। আর কল্যাণের পুরো অংশই রয়েছে যৌবনের মাঝে। এ বলে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

....

৫৩৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৬। গরিব হাদিস, কিন্তু হাদিসটি তার শাওয়াহিদের কারণে হাসান পর্যায়ের।

৫৪০. সহিহুল বুখারি : ১৪২৩, সহিহু মুসলিম : ১০৩১

'কতক লোক বলল, আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি। তাকে ইবরাহিম বলা হয়।'[৫৪১]

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'[৫৪২]

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

'আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছি।'[৫৪৩]

হাফসা বিনতে সিরিন ﷺ বলেন, 'হে যুবকদল, তোমরা আমল করো। কেননা, যৌবনই আমলের (যথার্থ) সময়।'

আহনাফ বিন কাইস ﷺ বলেন, 'যৌবনই আসল জীবন। যৌবনই মর্যাদা লাভের সময়।'

রাসুল ﷺ-এর প্রতি যাঁরা ইমান এনেছিলেন, তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং যে নুর তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে—তার অনুসরণ করেছেন, সেসব সাহাবি (তাঁদের অধিকাংশ) কি যুবক ছিলেন, না বুড়ো ছিলেন?

উসামা বিন জাইদ ﷺ। তাঁকে রাসুল ﷺ সেনাপ্রধান নিযুক্ত করলেন। অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। রাসুল ﷺ যখন হুনাইনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন, তখন মক্কার আমির বানিয়ে গেলেন আত্তাব বিন উসাইদ ﷺ-কে। তখন তাঁর বয়স বিশের কিছু বেশি। এমন যুবকদের উদাহরণ অসংখ্য, যারা ইসলামের বাণী বহনে সর্বোচ্চ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। এসব যুবক ইসলামের আলোকে জগৎময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

....

৫৪১. সুরা আল-আম্বিয়া : ৬০

৫৪২. সুরা আল-কাহফ : ১৩

৫৪৩. সুরা মারইয়াম : ১২

- আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-কে শাফিয়ি ﷺ-এর পেছনে ঘুরতে দেখে ইয়াহইয়া বিন মাইন তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি সুফইয়ানের উচ্চতা সত্ত্বেও তাঁর হাদিস পরিত্যাগ করেছেন, আর এই তরুণের খচ্চরের পেছনে ঘুরে তাঁর থেকে হাদিস শ্রবণ করছেন?' তখন ইমাম আহমাদ বললেন, 'যদি তুমি জানতে, তবে অপর প্রান্তে তুমিও হাঁটতে। সুফইয়ান থেকে উচ্চ সনদে ইলম শেখার সৌভাগ্য হারালেও তার চেয়ে নিম্নমানের সনদে সে ইলম পেয়ে যাব। কিন্তু যদি এ যুবকের বিচক্ষণতা হারিয়ে ফেলি, তবে আমি সেটা উচ্চ বা নিম্ন কোনো মাধ্যমেই পাব না।'

- ইরাক থেকে উমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট একদল লোক আসলো। তিনি দেখলেন, তাদের মাঝে এক যুবক কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। উমর ﷺ তখন বললেন, 'বড় কাউকে সামনে আসতে দাও।' তখন সে যুবক বলে উঠল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, বিষয়টি বয়সের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যদি বিষয়টি এমনই হতো, তাহলে আপনার চেয়ে আরও বয়স্ক কেউ মুসলিমদের খলিফা হতো।' উমর ﷺ বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ। তুমিই কথা বলো।'

- 'শারহুল মাকামাত' গ্রন্থে মাসউদি বর্ণনা করেন, যখন মাহদি বসরায় প্রবেশ করে দেখেন, তরুণ ইয়াস বিন মুআবিয়া ﷺ-এর পেছনে চারশ আলিম ও বুজুর্গ হাঁটছেন আর তিনি সবার সামনে চলছেন। মাহদি তখন বললেন, 'এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এই তরুণ ছাড়া কি তাদের মাঝে কোনো শাইখ নেই?' এরপর মাহদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে যুবক, তোমার বয়স কত?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমিরের হায়াত দীর্ঘ করুন! আমার বয়স উসামা বিন জাইদের সেই বয়সের সমান, যে বয়সে রাসুল ﷺ তাঁকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছেন, যে সেনাদলের মাঝে ছিলেন আবু বকর ও উমর ﷺ।' তখন মাহদি বললেন, 'এগিয়ে যাও, আল্লাহ তোমার মাঝে বরকত দান করুন।'

- খতিব আল-বাগদাদি তাঁর 'তারিখু বাগদাদ' নামক ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ইয়াহইয়া বিন আকসাম বসরার বিচারক নিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর বয়স বিশ অথবা বিশের কাছাকাছি। লোকেরা তাঁকে অবহেলা করতে লাগল। তারা বলল, "কাজির বয়স কত?" তিনি বললেন, "আমি আত্তাব বিন আসিদ

ﷺ থেকে (তাঁর দায়িত্ব পালনকালীন সে সময়ের বয়স অপেক্ষা) বড়, যাকে রাসুল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সেখানকার বিচারক নিযুক্ত করেছেন।[৫৪৪] আমি মুআজ বিন জাবাল ﷺ থেকে (তাঁর দায়িত্ব পালনকালীন সে সময়ের বয়স অপেক্ষা) বড়, যাকে রাসুল ﷺ ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। আমি কাব বিন সুয়াইদ থেকে (তাঁর দায়িত্ব পালনকালীন সে সময়ের বয়স অপেক্ষা) বড়, যাকে উমর ﷺ বসরার বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।" বিচক্ষণতার সাথে প্রদত্ত এ উত্তরই তার পক্ষে দলিল হয়ে গেল।'

- আবুল ইয়াকজান বলেন, 'হাজ্জাজ মুহাম্মাদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন হাকাম আস-সাকাফি ﷺ-কে পারস্যের কুর্দিদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে আমির নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি তাদের নির্মূল করে আসলেন। এরপর তাকে সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের যুদ্ধে আমির নিযুক্ত করেন। তিনি সিন্ধু ও হিন্দুস্তান বিজয় করে আসেন। তিনি সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন, অথচ তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। কবি বলেন :

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوْءَةَ وَالنَّـدَى *** لِمُحَمَّـدِ بْنِ قَاسِـمِ بْنِ مُحَمَّدِ

قَادَ الْجُيُوْشَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً *** يَا قُرْبَ ذَالِكَ سُؤْدَدًا مِنْ مَوْلِدِ!

'মর্যাদা, পৌরুষ আর বীরত্ব মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সঙ্গেই যায়। সতেরো বছর বয়সেই পরিচালনা করেছেন কত সেনাদল। অথচ জন্মের পর এত কম সময়ে কে কবে নেতা হয়েছে!'

- হুতাইত জাইয়াত। তরুণ আলিম। তাঁকে যখন হাজ্জাজের কাছে নিয়ে আসা হলো, তখন হাজ্জাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই কি হুতাইত?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ... তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো। কারণ, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি : যদি তুমি আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করো, তাহলে সত্য বলব। যদি শাস্তি দাও, তবে সবর করব। যদি কেবল ঘৃণা রেখে আমাকে ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহর শোকর আদায় করব।' হাজ্জাজ বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?' হুতাইত বললেন, 'আমি বলি,

৫৪৪. তখন আত্তাব বিন আসিদ ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫ বছর।

ঙ:মিনে তুমি আল্লাহর শত্রুদের একজন। মুসলিমদের সম্মান বিনষ্ট করছ তুমি। ধারণার বশবর্তী হয়ে হত্যা করেছ।' হাজ্জাজ বলল, 'আমিরুল মুমিনিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?' হুতাইত বললেন, 'আমি বলি, অপরাধে সে তোমার চেয়ে অগ্রগামী। তুমি তো তার পাপরাশির একটি পাপ মাত্র।'

এরপর হাজ্জাজ তার ওপর শাস্তির আদেশ দিল। শাস্তি প্রক্রিয়া শুরু হলো। বাঁশ চেরা হলো। হুতাইত জাইয়াতকে তারা রশিতে বাঁধল। এরপর চেরা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তার শরীরের চামড়া তুলে নিল। মারাত্মক এ শাস্তির একপর্যায়ে তারা হুতাইতের কোনো আওয়াজ পেল না।

হাজ্জাজকে তাঁর ব্যাপারে অবহিত করা হলো। বলা হলো, 'হুতাইত শেষ নিশ্বাস ফেলছে।' হাজ্জাজ আদেশ দিল, 'তাকে বের করে রাস্তায় ফেলে দাও।' হুকুম তামিল হলো। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে হুতাইত। এ সময় এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'কোনো কিছু প্রয়োজন?' হুতাইত শুধু এতটুকুই বললেন, 'এক ঢোক পানি ছাড়া তোমাদের দুনিয়ার আর কিছুই আমার প্রয়োজন নেই।' পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি পানি পান করেই মৃত্যুবরণ করলেন। তখন তার বয়স আঠারো বছর।

- উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হলেন তেইশ বছর বয়সে। মুআবিয়া ﵁ তাঁকে খুরাসানে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

মুআজ ﵁ যখন ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত হন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশেরও কম ছিল।

আবু মুসলিম একুশ বছর বয়সে দাওয়াত ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মানুষ ইবরাহিম আন-নাখয়ি থেকে যখন ইলম নেওয়া শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর।

- ইমামুন নাহু ও হুজ্জাতুল আরব সিবাওয়াইহ মৃত্যুবরণ করেন বত্রিশ বছর বয়সে।

বুহতারি বলেন :

لَا تَنْـظُـرَنَّ إِلَى الْعَــبَّــاسِ مِنْ صِــغَرٍ

فِيْ السِّنِّ ، وَانْظُرْ إِلَى الْمَجْــدِ الَّذِيْ شَادَا

إِنَّ النُّــجُوْمَ نُجُــوْمُ الْأُفُــقِ أَصْــغَرُهَا

فِيْ الْــعَيْنِ أَذْهَبُــهَا فِيْ الْجَوِّ إِصْــعَــادَا

'আব্বাস বয়সে ছোট ওই দিকে দেখো না। বরং তার অর্জিত সুমহান মর্যাদার দিকে তাকাও। দূরদিগন্তের ঝলমলে তারকারাজির দিকে তাকাও। যে তারাটি তোমার চোখে যত বেশি ছোট সেটি মহাশূন্যের তত বেশি উচ্চতায় অধিষ্ঠিত।'

যুবকরাই উম্মাহর কর্মোদ্যমী অংশ। তারাই উম্মাহর মেরুদণ্ড ও শক্তিশালী অংশ। যুবকরাই উম্মাহর প্রাণ। উম্মাহর আত্মরক্ষার ঢাল। যুবকদের সাহস ও শক্তির প্রয়োগ ছাড়া কোনো সফল দাওয়াত বা আন্দোলনের কথা চিন্তাই করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উম্মাহ ও ব্যক্তি সংশোধনে উচ্চ মনোবলের প্রভাব

পেছনের আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, কল্যাণের সকল পথে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছার সিঁড়ি হচ্ছে উচ্চ মনোবল। বিশেষ করে মর্যাদা সমুন্নত করার মাধ্যম ইলম ও জিহাদের ক্ষেত্রে উচ্চ মনোবল অপরিহার্য। যে এই গুণে গুণান্বিত হবে, তার জন্য সকল কাঠিন্য সহজ হয়ে যাবে। এ উম্মাহর ইমানি শক্তি যতই জীর্ণ হয়ে যাক না কেন, এ উম্মাহকে সে ব্যক্তিই প্রাণবন্ত করতে পারবে, যে উচ্চ মনোবলের বর্ম পরবে। কেননা, 'মানুষের হিম্মত পাহাড়কেও টলিয়ে দেয়।'

هِمَمُ الْأَحْرَارِ تُحْيِيْ الرِّمَمَا *** نَفْحَةُ الْأَبْرَارِ تُحْيِيْ الْأُمَمَا

'স্বাধীন মানুষের হিম্মত মৃত শরীরকেও জাগিয়ে তোলে। পুণ্যবানের সৌরভে জীবন ফিরে পায় গোটা জাতি।'

উচ্চ মনোবলের অধিকারীগণই মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে শক্তি ব্যয় করতে সক্ষম। এরাই তারা, যারা জগতের চিন্তাকে পরিবর্তন করে। এরাই তারা, যারা ত্যাগ ও জিহাদের মাধ্যমে জীবনের গতিপথকে পরিবর্তন করে। এরাই সেসব স্বল্প লোক, যারা মুক্তি আনে। এরাই সেসব বাছাইকৃত মানুষ, যারা ওয়াহানের চোরাবালি থেকে, নিরাশার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে হতভাগাদের।

শাইখ মুহাম্মাদ খাদির হুসাইন ﷺ উচ্চ মনোবলের প্রভাব বর্ণনা করেন বলেন :

'চরিত্রের এ অংশটিই তার অধিকারীকে উচ্চতায় নিয়ে যায়। এরপর এটি তার অধিকারীকে নিয়ে বড় বড় কর্মের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করে। এটিই দুর্বলকে নির্যাতন ও অপদস্থতা থেকে উঠিয়ে আনে। ফলে একসময়ের নির্যাতিত ও অপদস্থ দুর্বল মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়। এটিই উম্মাহকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে। এটিই তাদের নিষ্ক্রিয়তাকে সক্রিয়তায়, পরাধীনতাকে স্বাধীনতায় এবং অন্ধ আনুগত্যকে বীরত্বে রূপান্তর করে।

এই চরিত্রটিই নিজের মুসলিম জামাআতকে শত্রুর চাটুকারিতা থেকে রক্ষা করে।...

আর নিম্ন হিম্মত ও মনোবলহীন মানুষরা শত্রুকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হিসেবে দেখে। ফলে তারা ভয়ে শত্রুর সামনে নত হয়ে যায়; লজ্জার মাথা খেয়ে অবনত শিরে তাদের দরজায় করাঘাত করে। এরপর শত্রুর প্রতিটি হুকুমই তামিল করতে থাকে তারা। শত্রুরা যেভাবে চায়, সেভাবে কাজটি করার জন্য, তাদের মন জোগানার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এমন মানুষ।...'[৫৪৫]

নিম্ন হিম্মতের ঘোর এই অমানিশায় আমাদের উম্মাহ তাদের পূর্ণিমার আলো হারিয়ে বসেছে। যুগের মহাপুরুষের আগমন অপেক্ষায় বসে আছে। উম্মাহ আঁকড়ে আছে সে ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার আশায়, যখন ঘোষণা দেওয়া হবে প্রতীক্ষিত সে মুজাদ্দিদের আগমনের। যার ব্যাপারে রাসুল ﷺ সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

'আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহর জন্য প্রতি একশ বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) পাঠাবেন, যিনি তাদের মাঝে দ্বীনি সংস্কার করবেন।'[৫৪৬]

ইসলামের যুবকগণ, প্রশিক্ষণ-প্রস্তুতির দরজা উন্মোচন করা হয়েছে। আসো, উচ্চ মর্যাদা অর্জনে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হও। আসো, আসমান ও জমিনসম প্রশস্ত জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা করো। নিজেদের জন্য সম্মানের পথের পরিকল্পনা গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ, বধিরদের সাহচর্যে কখনো কাফেলার নেতার আওয়াজ উচ্চ হয় না। সফলতার শিখর তো উঁচু থাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জন্যই।

....

৫৪৫. মিন রাসায়িলিল ইসলাহ : ২/৮৮

৫৪৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪২২৯। হাদিসের মান : সহিহ।

প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদ সে যুগে দ্বীনের যে বিভাগগুলো অবহেলিত ও অচর্চিত থাকে, সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আলিমদের মতে, আমাদের যুগেও সে মুজাদ্দিদের আগমন ঘটেছে। কিন্তু আমরা কজনই-বা তাঁকে চিনলাম! - অনুবাদক।

سَتَعْلَمُ أُمَّتُــــنَا أَنَّنَـــا *** رَكِبْنَا الْخُطُوْبَ هِيَامًا بِـهَا

فَإِنْ نَحْنُ فُزْنَا فَيَا طَالَمَا *** تَذِلُّ الصِّعَابُ لِـــطُلَّابِهَا

وَإِنْ نَلْقَ حَتْفًا فَقَدْ قُدِّمَتْ ** كُؤُوسُ الْمَنَايَا لِشُرَّابِهَا

'উম্মাহ অচিরেই জানতে পারবে, তাদের প্রতি তীব্র ভালোবাসাই আমাদের নিয়ে এসেছে এই কঠিন বিপদসংকুল পথে। যদি আমরা সফল হই, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই হে ভাই, কত অজেয় ঘাঁটি বাহাদুর স্বাপ্নিকদের পদানত হয়েছে। আর যদি আমাদের মৃত্যু এসে যায়, এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই! তৃষ্ণার্তের মুখেই তুলে ধরা হয়েছে শাহাদাতের পেয়ালা।'

তোমাদের মাঝে কে আছে, যে নিজেকে এ মহান কাজে নিযুক্ত করবে, যার ব্যাপারে মহান মুজাদ্দিদ—পাহাড়সম অটল ব্যক্তি আমিরুল মুমিনিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলেছেন :

'আমি এমন একটি কাজে লেগে আছি, যে কাজে কেবল আল্লাহ তাআলাই সাহায্য করেন। এর জন্য বড়রা নিজেদের কুরবান করেছেন। ছোটরা বড় হয়েছে এর জন্য। এর জন্যই অনারবি হয়েছেন (আরবি ভাষায়) সুভাষী আর আরবি হয়েছেন মুহাজির। এমনকি তারা এটিকে এমন দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করেছেন, এটি ভিন্ন কোনো কিছুতে সত্য দেখেননি তারা, কেবল এটিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন।'

তোমাদের মাঝে কে আছে, যে লোকসান বা সীমালঙ্ঘন ব্যতীত নিজের আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করবে—নিজেকে এই পবিত্র দায়িত্বের জন্য উপযোগী মনে করবে? দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিজেকে সঁপে দেবে আল্লাহর রাহে?

তোমাদের মাঝে কে আছে, যে এ স্বপ্নের ইউসুফ হবে। যে আত্মবিশ্বাসের সাথে বুকে আঘাত করে বলবে, "আমিই এর উপযোগী...আমিই এর উপযোগী।" যদি তুমি যোগ্য ও উপযুক্ত হও, তাহলে তুমি মনোনীত হয়েছ। সামনে বাড়ো দূরদর্শিতার সাথে। আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত আর পেছনে ফিরে তাকিয়ো

না। সাবধান থেকো অসতর্ক হোয়ো না। এক মুহূর্তের অসতর্কতাও মারাত্মক এখানে।

لَحْظَةً يَا صَاحِبِيْ إِنْ تَغْــفَلِ *** أَلْفَ مِيْلٍ زَادَ بُعْــدُ الْمَنْزِلِ
رَامَ نَقْشَ الشَّوْكِ حِيْنًا رَجُلٌ *** فَاخْتَفَى عَنْ نَاظِرَيْهِ الْمَحْمَلُ

'বন্ধু আমার, এক মুহূর্তের জন্যও যদি তুমি গাফিল হয়ে যাও, তবে গন্তব্যের দূরত্ব হাজার মাইল বেড়ে যায়। মরুর বুকে বাহন দেখে যে লোকটা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। পায়ে কাঁটা বিঁধে এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হতেই তার সামনে থাকা বাহনটা হারিয়ে যায়।'

সালাফ ও খালাফের যুগের মহান মুজাদ্দিদদের কাফেলার অনুসারীদের নিজের সাহায্যকারী হিসেবে নাও। দেরি করো না। দেরি করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, সময় বহমান। সময় নির্দয়। তাগুতরা যত বেশি সময় পাবে, তত বেশি পাকাপোক্ত হয়ে বসবে। তুমি যখনই পরাজিত মানসিকতার লোকদের তাদের পরাধীনতার কারণ তাদের মনের ভেতরে প্রবেশ করাবে, তখনই তোমার জন্য আবশ্যক হবে তড়িৎগতিতে তাদের এ পরাজিত মানসিকতা থেকে মুক্তি করা। যাদের মাঝে একটু হলেও দ্বীন থাকে, তাদের শরীরে একটু হলেও প্রাণস্পন্দন বাকি থাকে, সুপ্ত থাকে আল্লাহর দেওয়া ফিতরাত।'[৫৪৭]

قَدْ هَيَّئُوْكَ لِأَمْرٍ لَوْ فَطِنْتَ لَهُ *** فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الْهَمَلْ

'তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক মহান উদ্দেশ্যে, যদি তুমি তা বুঝতে! তাই আসো, সে মহান উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে আসো, আর প্রভুর দরবারে হাত তুলে নিজেকে অশ্রুতে ভাসিয়ে দাও।'

কোনো ধারণাকারী যেন এটা মনে না করে যে, মহান সালাফের উচ্চ মনোবল নিয়ে আমাদের এ আলোচনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ থেকে সরে গিয়ে কেবলই অতীতের স্মৃতিচারণ। এমন কিছু কেউ মনে করলে তো আমরা কেবল অতীতের ঘটনাগুলোর বয়ানকারী হলাম আর বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তাই করলাম না, কোনো পথ ও পন্থা বাতলে দিলাম না। না, এসব বাণী ও ঘটনাকে

৫৪৭. আল-মুনতালিক : ৫৯

আমরা অবহেলা করতে পারি না। কেননা, এর মধ্যেই সে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিহিত রয়েছে, যেটা আমাদের মুক্তির পাথেয় হবে।

কেউ যেন এটাও ধারণা না করে যে, সালাফে সালিহিনের হিম্মত নিয়ে আমাদের এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা পশ্চাতে ফিরে যাচ্ছি, অথচ বর্তমান যুগটা হলো এমন যুগ, যে যুগে সকল জাতিই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত। এমনটা যেন কেউ ধারণা না করে যে, আমরা এসব আলোচনা করে অধঃপতনে যাচ্ছি। কেননা, আমাদের আদর্শ হলেন উম্মাহর সে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাঁদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। আর তাঁদের অনুসরণেই আমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। আমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ওই প্রজন্মের অনুসরণ-অনুকরণে—মানব ইতিহাসে যাঁরা অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। আর এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপনই উম্মাহর হিম্মতকে জাগিয়ে তোলার সহজ উপায়। কারণ, এই উম্মাহর শেষ অংশও সেভাবে সংশোধিত হবে, যেভাবে সংশোধিত হয়েছে এ উম্মাহর প্রথম অংশ।

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি—এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝো না?'[৫৪৮]

সম্মান ও মর্যাদার পথ সব সময় খোলা। প্রত্যেক আগ্রহীকে এ পথ স্বাগত জানায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

إِذَا أَعْجَبَتْكَ خِصَالُ امْرِئٍ *** فَكُنْهُ يَكُنْ مِنْكَ مَا يُعْجِبُكْ

فَلَيْسَ لَدَى الْمَجْدِ وَالْمَكْرُمَاتِ *** إِذَا جِئْتَهَا حَاجِبٌ يَحْجُبُكْ

'যদি কারও কোনো মর্যাদা তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তার মতো হও। তুমি যে মর্যাদায় মুগ্ধ হয়েছিলে, সে মর্যাদা তোমারও হবে। মর্যাদা ও সম্মান অর্জনে যখন তুমি চেষ্টা করবে, তখন তুমি সেটা পাবে, তোমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না কোনো প্রতিবন্ধকতা।'

....

৫৪৮. সুরা আল-আম্বিয়া : ১০

ওহে, যে এ দরজায় প্রবেশ-প্রত্যাশী, বাস্তবতা উপলব্ধি করো। নিজের কদম ফেলার জায়গাটা দেখে নাও। বুঝে শুনে কদম ফেলো। অচিরে মুসলিমরা জেগে উঠবে (আর তখন আমরাও জেগে উঠব) এ আশায় আশায় পৃথিবী ধ্বংসের অপেক্ষায় থেকো না। মনে করো না আকস্মিকভাবে অলৌকিক কিছু হয়ে মুসলিমদের এ দুর্দশা মুছে যাবে, ঘুচে যাবে সকল দুঃখ-যাতনা। কেননা, মুসলিমদের নিজেদের দুর্দশা নিজেদেরই মেটাতে হবে, নিজেদের সম্মান নিজেদেরই ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাই আল্লাহর সুন্নাহ। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত বিধি ও নিয়ম। যে এ সুন্নাহ ও বিধির সম্মান করে উপযুক্ত কাজটি করে না, আল্লাহর সুন্নাহ ও বিধি তার পক্ষাবলম্বন করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[৫৪৯]

বদরের সে সময়ের কথা স্মরণ করো, 'কুরাইশের তিনজন কাফির মুষ্টিযুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসলো। রাসুল ﷺ আনসারদের তিনজনকে তাদের মোকাবেলায় পাঠালেন। কুরাইশ কাফিররা বলল, "আল্লাহর শপথ, আমরা তাদের বংশ ও মর্যাদা জানি না। আমাদের সামনে আমাদের সমকক্ষদের পাঠাও।" তখন রাসুল ﷺ আলি, হামজা ও আবু সুফইয়ান বিন হারিস ﷺ-কে পাঠালেন মুষ্টিযুদ্ধে। এ তিন সাহাবি তিন কাফিরকে হত্যা করে ফেললেন সেখানে।

এমনভাবে সব সময়ই মানুষ তার সমকক্ষকে ভালোবাসে। এমনকি যখন তারা নিহত হয়, তখনও চায় তাদের সমকক্ষ কোনো মানুষের হাতে যেন তাদের মৃত্যু হয়। বর্তমান কুরাইশরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, শৈল্পিক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সব ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বর্তমান যুগের ইসলামের দায়িদের জন্যও আবশ্যক মুষ্টিযুদ্ধের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হওয়া।'[৫৫০]

....

৫৪৯. সুরা আর-রাদ : ১১

৫৫০. সানাআতুল হায়াত : ৫১; ঈষৎ পরিমার্জিত।

তুমি...তুমিই হয়তো সে প্রতীক্ষিত সংস্কারক। তুমিই হয়তো সে প্রত্যাশিত মুজাদ্দিদ। অচিরেই তুমি আল্লাহর আদেশে জীবন পাবে, চাই ফিরআওন তোমার থেকে বাঁচতে যতই পাঁয়তারা করুক না কেন। যদিও ফিরআওন এক মুসাকে ঠেকাতে শতসহস্র শিশুকে মেরে ফেলে, তবুও মুসা তো আসবেই। আল্লাহর বিধান না যায় খণ্ডন। হয়তো তুমি এখন কালের গর্ভে লুকিয়ে আছ, কিছু সময় পরই তোমার জন্ম হবে, আবির্ভাব হবে। কিংবা হয়তো তুমি এখন মায়ের কোলে দুগ্ধপানরত অথবা হয়তো তুমি এখন বেড়ে উঠেছ, তরুণ হয়েছ, আর এ কবিতাটি পড়ছ—

أَنْتَ نَشْءٌ وَكَلَامِيْ شُعَلٌ *** عَلَّ شَذْوِيْ مُضْرِمٌ فِيْكَ حَرِيْقًا

لَيْسَ فِيْ قَلْبِيْ إِلَّا أَنْ أَرَى *** قَطْرَةً فِيْكَ غَدَتْ بَحْرًا عَمِيْقًا

لَا عَرَى الرُّوْحَ هُدُوْءٌ، وَلْتَكُنْ *** بِحَيَاةِ الْكَدِّ وَالْكَدْحِ خَلِيْقًا

'তুমি উদ্যমে ভরা যুবক, রক্ত টগবগে তরুণ। আমার এ কথন কিছু অঙ্গার। এ অঙ্গারে জ্বলবে তোমার ভেতরে থাকা আগুন। আমার দিব্য চোখে দেখছি আমি। এখন তুমি এক ফোঁটা পানি। যে ফোঁটা আগামীকাল পরিণত হবে এক বিরাট উত্তাল সাগরে। আরামের নিদ ভাঙো। এসো, আগুয়ান হও। সাধনা ও পরিশ্রমে জীবনে জীবন আনো।'[৫৫১]

উম্মাহ তোমার দিকে চেয়ে আছে। প্রতীক্ষায় আছে তুমিই হবে সে উমর। এ ঘন কালো কুচকুচে গহীন আঁধারে তুমিই হবে সে উমরি চেতনা, যে চেতনা উম্মাহর অন্তরে জ্বালিয়ে দেবে উচ্চ হিম্মত ও উন্নত মনোবলের মশাল।

উম্মাহ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতীক্ষায় আছে তুমিই হবে এ যুগের সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। আইয়ুবি হুংকারে তুমি উম্মাহর অন্তরে আশার বীজ বপন করবে, হতাশার অনুর্বর মরুতে গজাবে সজীব বৃক্ষ।

নিজের সবটা দিয়ে চেষ্টা করে যাও। যথাসাধ্য চেষ্টা করো। আল্লাহর সাহায্য আসবেই। থেমে যেও না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে পথ চলতে থাকো।

৫৫১. আল-মুনতালিক : ৩৮

قَدْ نَهَضْنَا لِلْمَعَالِيْ *** وَمَضَى عَنَّا الْجُمُوْدُ

وَرَسَمْنَاهَا خُطًى لِلْـ ** ـعِزِّ وَالنَّصْرِ تَقُوْدُ

فَتَقَدَّمْ يَا أَخَا الْإِسْـ *** ـلَامِ قَدْ سَارَ الْجُنُوْدُ

وَمَضَوْا لِلْمَجْدِ إِنَّ *** الْمَجْدَ بِالْعَزْمِ يَعُوْدُ

'সব স্থবিরতা ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠেছি আমরা। বিজয় ও সাফল্যের নিখুঁত প্ল্যান অনুসরণ করে এগিয়ে চলছি দুর্বার গতিতে। হে মুসলিম ভাই, চলো বিজয়ের পানে—ওই দেখো, মার্চ করে অগ্রসর হচ্ছে ইসলামের বাহিনী। দৃঢ় সংকল্প আর উন্নত মনোবলই ফিরিয়ে আনতে পারে হৃত মর্যাদা।'[৫৫২]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

'আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। আর তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত।'[৫৫৩]

রাসুল ﷺ বলেন :

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

'আমার উম্মাহর উদাহরণ বৃষ্টির ন্যায়, যার ব্যাপারে জানা যায় না যে, এর প্রথম ভাগ অধিক ভালো না শেষ ভাগ।'[৫৫৪]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

لَا يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ

....

৫৫২. আর-রাকায়িক : ১৪৯

৫৫৩. সুরা আশ-শুরা : ২৮

৫৫৪. মুসনাদু আহমাদ : ১২৩২৭, সুনানুত তিরমিজি : ২৮৬৯। হাদিসের মান : হাসান।

'আল্লাহ তাআলা সর্বদা এ দ্বীনের মধ্যে চারা রোপণ করতে থাকেন, যাদের তিনি নিজ আনুগত্যে নিয়োজিত করবেন।'[৫৫৫]

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

'আল্লাহ তাআলা জমিনকে গুটিয়ে আমার সামনে রাখলেন। আমি এর পূর্ব-পশ্চিম একত্রে দেখতে পেলাম। পৃথিবীর যতটুকু আমার সামনে গুটিয়ে রাখা হয়েছে, ততটুকু পর্যন্ত আমার উম্মতের কর্তৃত্ব পৌঁছাবে।'[৫৫৬]

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ

'অবশ্যই এ দ্বীন সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে রাত ও দিন হয়। আল্লাহ তাআলা কাঁচা-পাকা সব ঘরেই এই দ্বীনের প্রবেশ ঘটাবেন। হয়তো সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান বজায় রেখে, নয়তো অপদস্থ ব্যক্তিকে অপমান করে—অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সম্মানিত ব্যক্তির মাধ্যমে ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি করবেন; আর অপদস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে কুফরির অসম্মান বৃদ্ধি করবেন।'[৫৫৭]

....

৫৫৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৮, মুসনাদু আহমাদ : ১৭৭৮৭। হাদিসের মান : হাসান।

৫৫৬. সহিহু মুসলিম : ২৮৮৯

৫৫৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯৫৬; এ হাদিসের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহিহ। বাইহাকি ﷬ কৃত আস-সুনান : ৯/১৮১, বুখারি ﷬ কৃত আত-তারিখ : ২/১৫০, তাহাবি ﷬ কৃত শারহু মুশকিলিল আসার : ৬১৫৫, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৪৩০; হাকিম ﷬ এ হাদিসকে শাইখাইনের শর্তে সহিহ বলেছেন, ইমাম জাহাবি ﷬ তাঁর সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এ কথাগুলো আমাদের জন্য মিশকের মতো বানিয়ে দিন। আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

আলেকজান্দ্রিয়া

৭ রবিউল আখির, ১৪১৬ হিজরি

মোতোবেক ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ ইসায়ি

উচ্চ মনোবল কাজের সূচনা। মহৎকর্মের প্রবেশিকা। শুরু থেকে যার মনোবল উচ্চ থাকে, তার সফর হয় সহজ-অনায়াসে। বস্তুত, উচ্চ মনোবলের অধিকারী জীবন চলার পথে আপতিত সকল দুঃখকষ্টকে সয়ে যায় হাসিমুখে—সব ধরনের বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সে সামনে এগিয়ে চলে; ফলে তার পথচলা হয়ে ওঠে আনন্দময়। অধ্যবসায় ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে একসময় সে পৌঁছে যায় সাফল্যের শিখরে...

www.ruhamapublication.com